রইল না মোর
সোনায় মোড়া দিনগুলি

মানিক রায় (বারীন)

২৭/৩৮, কে. এম. নস্কর রোড,
কলিকাতা-৭০০০৪০

প্রকাশক ঃ
শ্রীমানিক রায় (বারীন)
২৭/৩৮, কে. এম. নস্কর রোড,
কলিকাতা-৭০০০৪০

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৭
৯ই আগষ্ট, ১৯৬০

মুদ্রক ঃ
প্রতাপরঞ্জন রায়
রামকৃষ্ণ প্রেস
১৭, রামধন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শান্তি বুক স্টল
১৫৪/১, এন্. এস্. সি. বসু রোড,
(রাণীকুটি), কলিকাতা-৭০০০৪০

নিউ কালীমাতা বুক স্টল
৬, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মিত্র লাইব্রেরী
৭, চন্ডী ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৪০

বামা পুস্তকালয়
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

উৎসর্গ

স্বর্গতা পরম প্রিয় জীবন সঙ্গিনী

প্রতিমা রায়-এর (বাণী) স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

ভূমিকা

সব চিন্তনশীল মানুষই জীবনের কোন না কোন সময়ে নিজের মুখোমুখি বসে, দেখে যে উৎস থেকে উদ্ভব ও যাত্রার বন্ধুর পথে বিবিধ প্রাঙ্গণে ব্যাপ্তি, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি, তাতে চরিতার্থতার স্বাক্ষর মেলে কিনা। স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে, অনেকটা দূরে থেকে অতীত অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করা অথবা অন্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলকভাবে এর বিশ্লেষণ করার মধ্যে যেমন আনন্দ তেমনি তাতে নিজেকে জানাও যায় নতুনভাবে। আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে এ একটা মস্ত জিনিস। আর, এভাবে অতীত অভিজ্ঞতা যেমন উন্মোচিত হতে থাকে তেমনি সেই কালও নতুন তাৎপর্যে নতুন অর্থে উদ্ভাসিত হয়, ঘটনাপুঞ্জকে অন্য এক প্রেক্ষিত থেকে বিচার করা যায়। সেদিক থেকে স্মৃতি-চারণা এবং আত্মজীবন চরিত অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল।

এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখে বর্তমান গ্রন্থটির গুণাগুণ যাচাই করবেন, পাঠকদের প্রতি এই অনুরোধ জানিয়ে গ্রন্থের লেখক শ্রীবারীন্দ্র নাথ রায় সম্পর্কে দু-চার কথা এবং আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ সংযোজন করা উচিত। বারীনকে আমরা এই নামে ততটা চিনি না, যতটা চিনি তাঁর ডাক নাম মানিক বলে। পরিচয়ের সূত্রপাত একেবারে বাল্যকালে, ময়মনসিংহ শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারি কর্মচারি, সঙ্গীতরসিক, সুগায়ক, বিশেষ কীর্তন গানে ছিল অসামান্য পারদর্শিতা। আমার পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী, অন্যদিকে সঙ্গীতরসিক, কীর্তন ও মৃদঙ্গবাদনে সুদক্ষ। সঙ্গীত দুই পিতাকে এক সঙ্গে মিলায়, এবং সেই সূত্রে দুই পরিবারকে। পরে মানিকের পিতা কিশোরগঞ্জে বদলি হয়ে যান, আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন না হলেও ক্ষীণ হয়ে আসে। সেই সময়ে ময়মনসিংহে অল্প বয়স্ক স্কুল ছাত্রদের জন্য একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো—তার নাম ছিল লীলাবতী শিল্ড প্রতিযোগিতা। এই প্রতি-যোগিতায় প্রতি বছর মানিক স্কুল টিমে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিত—সেই সুবাদে সমগ্র শহরে তাঁর একটা পরিচিতি, নামডাক হয়। বস্তুত, বালক কালেই, ও ছিল ফুটবল মাঠে আমাদের গৌরব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তখন, পরিণত বয়সে সে ক্রীড়াজগতে যশের শিখরে আরোহণ করবে। সেদিকে কিছুটা

অগ্রসরও হয়েছিল সে ; কিন্তু অস্তিত্বের বাধ্যবাধকতা, পারিবারিক সংঘাত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরূপতা, ইত্যাদি সে পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অপর দিকে, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ কিশোর যেমন বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়, মানিকও হয়েছিলেন। আমি অচ্ছেদ্যভাবে তাতে জড়িয়ে পড়লাম, মানিক সেভাবে বাঁধা পড়েননি। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক বিভাগের চাকুরিতে বহাল হয়ে তাঁর জীবন সম্পূর্ণ নতুন এবং অভাবনীয় পথে বাঁক নেয়।

কিন্তু যা অভাবনীয় তা যখন জীবনের বাস্তব হয়ে ওঠে, তখন জীবনকেও অভিনব তালে ছন্দে বিস্তারে আন্দোলিত হতে হয়--কর্তব্যের আকর্ষণে ও দায়-বদ্ধতায় অভিজ্ঞতার সীমা হয় সুবিস্তৃত। কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক বিভাগের অফিসারের, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। সেজন্য, শিলচরে অবস্থানকালে মানিককে যেমন উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে "অভিযান" চালিয়ে বর্মা সীমান্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে, তেমনি কলকাতা-হাওড়ার পার্শ্ববর্তী কলকারখানায় দীর্ঘকাল নজরদারি রাখতে হয়েছে ; তাছাড়া কখনও সখনও বাংলার বাইরেও বিশেষ পরি-দর্শনে যাবার হুকুম তালিম করতে হয়েছে। এর উপরে ছিল ভারতের ভূ-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগের আকর্ষণ। এর মধ্য দিয়ে মানব বিশ্বের বিচিত্র পরিচয়, মানুষের প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, শঠতা, নীচতা, অসাধুতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সত্যতার মধ্য দিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর যাতায়াতও ছিল বিভিন্ন প্রাঙ্গণে –খেলাধুলো, রাজনীতি, সঙ্গীত, সিনেমা-থিয়েটার, সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সংগঠকদের মধ্যে। ফলে, সব ভুবনের খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তিরা এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেছেন, অবশ্যই মানিকের প্রেক্ষিতের বিশিষ্ট কোণ থেকে। এতসব অভিজ্ঞতা ও মানুষের ভীড় সত্ত্বেও সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কিশোরগঞ্জ অপরিমেয় মমতায় ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; প্রায়শঃই তাঁকে আক্ষেপ করতে দেখা যায়, "সুন্দর, মিষ্টি ও সোনার সেই কিশোরগঞ্জের ঐ আত্মীয় বা অনাত্মীয়, সুন্দর ও আন্তরিক আবেগে ভরা" মানুষগুলো যেন "ফুরিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে"। অথচ, তাদের ধরে রাখার কী নিবিড় আন্তরিকতা তাঁর।

সত্যি, মানুষের জীবনে শৈশব ও কিশোর বয়সের অভিজ্ঞতা কী প্রবলভাবে সত্য হয়ে ওঠে তার সামান্য পরিচয় ইংরেজ লেখিকা মিসেস হ্যামিলটনের (M. M. Kaye) আত্মকথার বিবরণ থেকে পাওয়া যেতে পারে। তাঁর পিতা ছিলেন

বৃটিশ সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার, কর্মস্থল ভারতবর্ষ। সুতরাং মলি হ্যামিলটনের জন্ম এদেশে, শৈশব কেটেছে দিল্লী-সিমলা এলাকায় ভারতীয়দের সংস্পর্শে। লেখাপড়ার জন্য যখন তিনি ও তাঁর বোনকে ইংল্যান্ডে পাঠান হয়, তখন ঘর ছাড়া হবার বেদনায় তাঁরা আপ্লুত হয়ে পড়েন। হিন্দুস্থানি ভাষায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে স্কুল, শিক্ষিকা, সহপাঠিনী, প্রভৃতি সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও গালমন্দ করতেন, আর কবে বাড়ি ফিরবেন তার জন্য গোপনে কাঁদতেন। পরবর্তীকালে, অবসর নেবার পর, তাঁর পিতাকে আবার কলকাতা আসতে হয় গোয়েন্দা বিভাগেরই এক প্রয়োজনে। মিসেস হ্যামিলটন সঙ্গে আসেন। কিন্তু, অন্তরে তাঁর সংশয়— কলকাতা তো আগে কখনও আসেন নি, সেটা কি তাঁর স্বদেশ? কিন্তু হাওড়া স্টেশন থেকে বের হবার পরই কাটা-ফল-ওয়ালার ঠেলা গাড়ি, ফিরিওয়ালাদের চিৎকার, রাস্তায় জনগণের ভীড় আর আবর্জনা দেখা মাত্রই তাঁর হৃদয় আনন্দে আত্মহারা—আমি বাড়ি ফিরে এসেছি, আমি বাড়ি ফিরে এসেছি (I'm home! I'm home!) কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে মানিকেরও এমনি নির্মল হৃদয়াবেগ। কলকাতায়, তার শহরতলীতে, ভিন্ রাজ্যে, বা কোন প্রত্যন্ত জায়গায় কিশোরগঞ্জের কোন মানুষ বা স্মৃতিবহ কোন ঘটনার উল্লেখ হওয়া মাত্রই বাড়ি ফেরার আনন্দে তিনি বিভোর হয়েছেন। তাঁর প্রেমপ্রীতি ভালবাসা আর প্রাণ চাঞ্চল্যের মুহূর্তগুলো, সংগ্রামেরও, ঐ শহরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিধৃত। তাঁর স্মৃতিকথার এটাই কেন্দ্রবিন্দু, সেজন্য ঘুরে ফিরে এই বিন্দুতেই তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আনন্দের অতিশয়তায় হৃদয় হয়েছে আর্দ্র, চোখে জমেছে জল।

বলা বাহুল্য যে, মানিক সাহিত্য সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে গ্রন্থ রচনায় হাত দেন নি। সে অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, সেরূপ দীক্ষাও তাঁর নেই, নিজেই তা মেনে নিয়েছেন। তবু যে এত অভিজ্ঞতায় পূর্ণ জীবনের নির্বাচিত মুহূর্তগুলো তিনি এখানে ধরে রেখেছেন, তার কারণ আগেই বলেছি নতুন মন ও চোখ নিয়ে নিজেরই মুখোমুখি হওয়া। বিশেষত, স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার পর যে শূন্যতা তাঁকে গ্রাস করেছিল তা থেকে আত্মরক্ষা করা ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সেজন্য, সাহিত্যিক সুলভ দম্ভ বা অভিমান কোথায়ও নেই, যেমন নেই কাঠামোগত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস; বরং বলা যায়, যেন খানিকটা অগোছালোভাবেই মানিক তাঁর কথাগুলোকে উপস্থাপন করেছেন—যেন সব কথাই তাঁর প্রসারিত ব্যক্তিত্ব।

আমাদের মত বার্ধক্যের ভারে যাঁরা অবনত, অথচ যাঁরা কৈশোরে ও যৌবনে

সম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্য দিয়ে লালিত ও বর্ধিত হয়েছেন, তাঁদের নিকট বর্তমান যুগের মূল্যবোধহীনতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমাদের দৃষ্টিতে যা মূল্যহীন বা আদর্শচ্যুত তার মধ্যে নতুন যুগের মানুষেরা কিসের সন্ধান পান অথবা প্রচলিত সামাজিক আবরণ ও বিধিব্যবস্থার বদলে কোন্ আদর্শ সংস্থাপনে উদ্যোগী তা অনুমান করা কঠিন। তবে, আমাদের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করি বলেই সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের নিকট সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে বোধ হয়। অবক্ষয়ের লক্ষণ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই, তাই ক্ষোভে দুঃখে আমরা বিচলিত হই, ক্রুদ্ধ হই, ব্যক্তিগত সম্পর্কে চিড় ধরে। মানিকও ক্ষুব্ধ হয়েছেন ; গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অনেক কাহিনীর পেছনেই লুকানো রয়েছে তাঁর বিক্ষোভ, অভিমান, এবং ক্রোধও। কিন্তু উপায় নেই। এক পুরুষের শ্রেয়বোধ অন্য পুরুষের শ্রেয়বোধ থেকে স্বতন্ত্র ; তা থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত।

কিন্তু, এহ বাহ্য, অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ও রূপায়ণই প্রধান কথা। মানিকের অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং বিচিত্র। তারই ভিত্তিতে তিনি যেসব সত্য কাহিনী পরম সততায় উপহার দিয়েছেন, তার মধ্যে দীনতা ও ভণ্ডামি যেমন আছে, তেমনি আছে মানবিক প্রেমে ভাস্বর কিছু উজ্জ্বল চরিত্র। বিশেষ করে একটি লুসাই মেয়ের সঙ্গে একটি আইরিশ সৈনিকের প্রেম, বিবাহের প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিকূল পরিবেশ ও বাধা পার হয়ে সে প্রতিশ্রুতি পালন—এ কাহিনী মানুষের প্রতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে। পুনরায় বলি, ব্যক্তিগত সম্পর্কের সরসতা দিয়ে উন্মোচিত সব কাহিনী তাঁর ব্যক্তিত্বকেও পাঠকের নিকট প্রকাশ করে। সে অর্থে সমগ্র গ্রন্থটি তাঁরই সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব। রচনায় অপটুতা যদি থাকেও, সহৃদয় হৃদয় সংবেদনার সাহায্যে এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের স্বাদ সহজেই গ্রহণ করা যায়।

অরবিন্দ পোদ্দার

প্রাক্‌কথা

আমি না লেখক না সাহিত্যিক। অনেকে ঠাট্টা করে বলতেন, 'jack of all trade, আমি হেসে জবাব দিতাম, 'yes ! but master of none !' সব কথা গুছিয়ে লিখতে পারিনি। আমার জীবনটাই আবোল-তাবোল। কোন ডাইরী রাখিনি। স্মৃতি রোমন্থন করে কিছু লেখা, তা-ও যৎপরোনাস্তি সংক্ষেপে।

বর্তমানে আমার বয়েস একাত্তর। ইংরেজি গত ৩রা ফেব্রুয়ারী উনিশ শ একানব্বই তারিখে, স্ত্রী প্রতিমা রায়ের (বাণী) মৃত্যুর কিছুদিন পরে, বড়ছেলে গৌতম (ফল্গু/কাশীনাথ) আমায় একদিন বলে, আমাদের দেশ 'পূর্ববঙ্গের' কথা মাঝে মাঝে তোমার ও মার নিকট জেনেছি, মাসি-পিসিদের কাছে তোমাদের বিয়ের টুকরো টুকরো গল্প শুনেছি। তুমি একটা খাতায় দেশের ও তোমাদের বিয়ের কথা লেখ, সেটা পড়ে আমরা সব জানতে পারব। আর ঐ খাতাটা দেশের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বহন করবে।

আমিও ভাবলাম, এই লেখার ভেতর দিয়ে আমারও দুঃখের সময় অনেকটাই কেটে যাবে। তাই হালকা মনে, কোন কাঠামো ঠিক না করেই লেখা সুরু করলাম। কয়েকদিন লেখার পরই যেন সীরিয়াস হয়ে গেলাম। এই সময়ে খুব নিকট প্রতিবেশী বন্ধুবর প্রয়াত গোপাল মুখার্জী এবং মাসতুত ভাই শ্রীঅনিল দত্ত আমাকে খুব উৎসাহিত করতে থাকেন। তারপর বরাহনগরের ভগ্নীপতি শ্রীনির্মল ভৌমিক ও ছোটবোন খনা, তার ননদ দীপালি, বাণীর খুড়তুত বোন ও সহপাঠী রেখা ও তার ছোটবোন কৃষ্ণা, বাণীর ছোটবোন হিমানী ও কল্যাণী, কৈশোরের বন্ধু ও ভগ্নীপতি শ্রীরবি করও আমায় খুব উৎসাহ দেয়। কেউ কেউ এই লেখাটাকে বই আকারে ছাপাতে অনুরোধ করেন। রবি তো বাস্তবিক পক্ষে ছাপানোর কথা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। শ্রীরামপুরের বন্ধুবর 'কারঙ্কার' মনি, পাটনার মনু (ডাঃ মনোরঞ্জন ঘোষ), জামসেদপুরের নামীদামি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়িকা ও নাতনী ডঃ আরাধনা দে, আইজলের লুসাই বান্ধবী ও মিজোরামের এম. এল. এ মিসেস রোসিয়ামা, ইম্ফলের বোন সোয়ামী (রোসিয়ামার ছোট ও মণিপুর সরকারের কর্মসচিব মিঃ এন. জি. উলিং, আই. এ. এস.-এর স্ত্রী) এবং আরও অনেকে চিঠিতে ও টেলিফোনে আমাকে উৎসাহিত করতে থাকে এবং বই-এর কপির জন্য তাগিদ দেয়। এদের সকলকেই, আর যাদের নামধাম মনে করতে পারলাম না তাদেরও সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাই।

আমি আমজনতার একজন। কিন্তু জীবনে চলার পথে ঘটনার স্রোত আমাকে কিছু বিশিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে নিয়ে যায়। তাঁদের কারো কারো কথা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। সেগুলো পাঠক-পাঠিকাদের খুশি করলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমাদের পরের প্রজন্মের অনেক আপনজনই বাণীকে রুগ্না দেখেছে। কিন্তু বাল্য থেকে পঞ্চাশ বছর অবধি বাণী যে কতটা কর্মঠ ও দুর্ধর্ষ ছিল, স্নেহ-মমতা ও পরোপকারের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় তার মন-প্রাণ কতখানি ভরপুর ছিল. সে যে কতটা সুশিক্ষিতা (cultured) ছিল, তার পিতৃ-মাতৃকুল যে শুধু উচ্চশিক্ষাই নয় তৎসঙ্গে কি পরিমাণে সুশিক্ষিত ছিলেন, যাঁদের কারো কারো সর্বভারতীয় পরিচিতিও ছিল, আমার লেখায় যদি তার কিয়ৎ পরিমাণও প্রকাশ করতে পেরে থাকি, তবেই আমার এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। এবং বাণীর প্রতি আমার তো বটেই, আমাদের কারোও কারোও বহু ত্রুটির এক ভগ্নাংশও অন্ততঃ পরিশোধিত হয়েছে বলে গণ্য করতে সাহস পাব।

আমাদের মূল ঘটনা ছাড়া আর যে সব কাহিনী খুব ছোট করে উল্লেখ করেছি, সেগুলো বিস্তারিতভাবে লিখলে প্রত্যেকটাই একেকটা ছোট বা বড় গল্প হতে পারত। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বিরত রয়েছি।

আমার বড় দুর্বলতা বাংলা বানানে। সেগুলো সংশোধন করে দিতে কাউকে পেলাম না। ছোট ছেলে বাপ্পা (টুসুন/কুট্টুস) প্রথমদিকে কিছুটা করেছিল, সবটা নয়। সুতরাং সেই ত্রুটি রয়েই গেল। সেজন্য আমি মার্জনা প্রার্থী।

কাউকে দুঃখ বা আঘাত দিতে আমি কিছু লিখিনি। এ লেখায় সেরকম কোন উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না। তবে এই কাহিনী লেখার পাঁচ-ছ মাস সময় কালে, পরিবার-পরিজনদের কারো কারো নিকট থেকে চরম আঘাত পেয়ে পেয়ে, কখনো সখনো, কাহিনীর বাইরে. দুঃখ ও অভিমানের কিছু কথা হয়তো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বার হয়ে গেছে, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। রাজনৈতিক মতভেদ যাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরও কোনদিন আমি শত্রু বলে মনে করিনি। সত্যকে আদর্শ করেই সব কিছু লিখেছি। তবু যদি কোন ঘটনার উল্লেখে কেউ দুঃখ পান, তার জন্য তাঁদের কাছেও আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখলাম।

লেখাটা সুরু করে ভেবেছিলাম, অবসরপ্রাপ্ত বেকার জীবনে অন্ততঃ একটা ব'ছর বাণীর মৃত্যুশোক আমি নীরবে-নিভৃতে তার চিন্তা ও ধ্যানে পালন করব, আর শোকার্ত মনের লেখায় আমাদের ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী দরদী ভাষা

পাবে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আঘাতগুলো আমাকে জর্জরিত করে ফেললো, শোকার্ত মনে সেগুলো শেলের মতো বিঁধতে লাগলো। লেখাটার দিকে মন দিতে পারি না! ভাবি, মাত্র একটা বছরও আমার মন-মেজাজ, দোষ-ত্রুটি ওরা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করতে পারল না! রাতের পর রাত তখন অঘুমে কাটিয়ে চলেছি। বহু রাতে দুটো-তিনটের সময় অস্থির ও ভারাক্রান্ত মনকে অন্যদিকে ফেরাতে এই লেখাটা নিয়ে ভোর ছটা-সাতটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিতাম। এমনি করে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেল। ভয় হলো জীবনের আর বেশি দিন বুঝি বাকি নেই। তাই উঠে পড়ে লেখাটা শেষ করে ফেললাম। কিন্তু এটাকে কিছুদিন বাক্সবন্দী করে রেখে, আবার পড়ে সংশোধন ও সম্পাদন করার সময়টুকু নিতে সাহস পেলাম না। স্থানীয় এক শিক্ষক বন্ধুর খুব জানাশুনো একটা প্রেসে, যেখানে তাঁদের কলেজের যাবতীয় ছাপার কাজ তাঁরই তত্বাবধানে করা হয় বলেই সেই প্রেসের টিকি তাঁর কাছে বাঁধা ও অন্যদিকে দুমাসের মধ্যেই ছাপার কাজ শেষ করে দেবে, প্রেস মালিকের এই ভরসা সেই শিক্ষক বন্ধুর সামনেই দেয়ায়, ছাপার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ আমি, ১৯৭৯ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন গরীব অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, ওঁদের হাতে বেশ কয়েক হাজার টাকা আগাম দিয়ে দিলাম।

তখন হয়তো আমার মনে ছিল না যে বিপদ তো কখনো একলা আসে না! তাই, দেখতে দেখতে ছ-সাত মাস কেটে গেল। ষোল পৃষ্ঠার আঠের-উনিশ ফরমার বই-এর মাত্র সাতটা ফরমার প্রুফ ছাপা হলো। একেকটা ফরমা পাঁচবার ছবার সংশোধন করে দিলেও ভুল ও ত্রুটিহীন ছাপা হয় না। কোন প্রিন্ট ভাঙ্গা, কোনটা অস্পষ্ট, কোনটা কদাকার। অন্যদিকে মাঝে মাঝেই প্রেস-মালিকের ছেলের অসুখ, মার অসুখ ইত্যাদির অজুহাতে অন্তর্ধান। আর দিনে একবার দুবার শিক্ষক বন্ধুর বাড়িতে আমার ছোটাছুটি। কিন্তু তাতেও কাজ এগুয় না। তখন এই বৃদ্ধ-অসুস্থ্য শরীরেও একটু নড়াচড়া করতে হলো। কিন্তু তাতে যেটুকু জানলাম, তাতেই তো আমার চোখ কপালে ওঠার অবস্থা! ঐ প্রেস থেকে আজ পর্যন্ত কোন বই ছাপা হয়েছে কিনা সন্দেহ। কলেজের ম্যাগাজিন এ প্রেস সে প্রেস থেকে ছাপিয়ে দেয়। আমার বই ছাপাবার মূল্য ধরেছে দেড়গুণ বেশি। ওদিকে ষোল পৃষ্ঠার একেকটা ফরমার প্রুফ্ পাঁচ-ছবার করে দিনে-রাতে দেখতে যেয়ে আমার চশমার পাওয়ার বদলাতে হয়েছে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি যেন মাঝে মাঝে স্বপ্নে, 'সাক্ষাতেই মিষ্টি হাসির এক

মাণিক জোড়' দেখে চমকে উঠি। এই পরিস্থিতিতে, প্রেসের অক্ষমতা ও গাফিলতি নিয়ে শিক্ষক বন্ধুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে, বন্ধুত্ব যখন প্রায় বিসর্জনের দোর গোড়ায়, তখন ঠিক হয় যে এই প্রেসে আর ছাপানোর কাজ নয়। এবার অনুগ্রহ করে আমার পাণ্ডুলিপিটা ফেরত পেলেই বর্তে যাই। ভাগ্য-গুণে পাণ্ডুলিপিটা ফেরত পেলাম। বই ছাপানোর সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা তখন আমার উবে গেছে। পাণ্ডুলিপি বাক্সবন্দী করে ঠিক করি, কিছুদিন চুপ করে থেকে এই ধাক্কাটা সামলে নিই। তারপর আবার দেখা যাবে। এই ছ-সাত মাসে আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠি বাণীর আপন পিসতুত ভাই, কিশোরগঞ্জ 'বামনকচুরের' বিখ্যাত দত্তরায় বংশের শান্তি দত্তরায় চুচুড়ায় আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেল। ঠিক একমাস পূর্বে কিশোরগঞ্জ 'কারঙ্কার' শ্রী বিনয় চক্রবর্তী (মনি) শ্রীরামপুরে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে, স্মৃতি শক্তি হারিয়ে এখন যমের সঙ্গে লড়াই করছে। আমার লেখায় বহু স্থানেই এঁদের উল্লেখ আছে। টেলিফোনে ও চিঠিতে এঁরা দুজনাই আমার বইখানার জন্য তাগাদা করতো। আর তো করবে না!

ঠিক এই সময় যেন ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূতীর মতো শ্রীমতি সুমিত্রা ব্যানার্জীর (ঝর্ণা) সাক্ষাৎ পাই। লোকে বলে, 'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।' এও তাই। ঢাকার টিকাটুলির বিখ্যাত জজ্ বাড়ির এক পুত্র জজ্ সাহেব প্রয়াত সুশীল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি' বই খানার সুলেখিকা ও আমাদের অতি প্রিয় মাসিমা শ্রীমতি উমারাণী মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা এই ঝর্ণা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিষদের গবেষিকা। ঝর্ণার বড়দি টুকটুক্ ছিল কিশোরগঞ্জে বাণীর সহপাঠি বান্ধবী। টুকটুকের পরের বোন বুলবুলকে আমার ছোট বোন হেনা গান শেখাতো। কিশোরগঞ্জে আমাদের তিন পরিবারের সকলেই সকলের পরিচিত ছিল। এই সময়ে একদিন মাসীমা আমার বই ছাপানোর বিপর্যয়ের কথা শুনে আমাকে ঝর্ণার কাছে পাঠালেন। ঝর্ণার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই আমার সব মুশকিল আসান হয়ে গেল। অন্যদিকে প্রায় একই সঙ্গে বর্তমান জগতের দৈত্যকুলের ভীড়ের মধ্যে বহুকষ্টে খুঁজে পাওয়া দু-একটি প্রহ্লাদের মতো এগিয়ে এলেন ঝর্ণার স্বামী শ্রী বিজন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন নামীদামি এঞ্জিনিয়ার। ওঁরা উভয়ে মিলে, কলেজস্ট্রীটের 'গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেডের' কর্মচারী ওঁদের স্নেহধন্য শ্রী জগদীশ দাসকে আমার পাণ্ডুলিপি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই বইখানা ভাল করে ছাপাবার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একেবারে বাধানো বই ওঁর হাতে তুলে দেবে। এর মাঝে আর কোনও রকম বিরক্ত করবে না।" উক্ত মাসীমার বইখানা এবং ফাদার দাঁতিয়েনের একখানা

বইও এই শ্রী জগদীশ দাসই ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওঁর আন্তরিকতা ও সততার জন্য ফাদার দাঁতিয়েন ওঁকে খুব সুন্দর একটা সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন।

আমি এখন দেখছি, প্রুফ দেখার ঝামেলা আমার নেই। তা সত্ত্বেও ছাপানোর মূল্য অনেক কম। শুধু প্রয়োজন মতো খরচার যোগান দিয়ে যাচ্ছি। আমি এখন আবার, শোকার্ত হলেও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছি। বই-এর দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে সারারাত বসে থাকতে হয় না। এর জন্য কন্যাসম আমাদের আদরে ঝর্ণা ও তার বর শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে কোন ভাষায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না।

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বহু পুরানো স্মৃতির ঝাঁপি অন্বেষণ ও ঝাড়াই-বাছাই করে, সকলের ভাল লাগতে পারে এমন কিছু কাহিনী লেখার প্রচেষ্টায়, প্রকৃত ঘটনা বা সঠিক সময় বা সালের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে। তেমন হয়ে থাকলে, আমি মার্জনা প্রার্থী। আর বই এর কোন কোনও কাহিনী ও নাম কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে যদি আমার অজ্ঞাতে, সেগুলোর কোন সাদৃশ্য ঘটে থাকে, তবে তার জন্যও আমি ক্ষমা প্রার্থী।

শুধু একটাই দুঃখ রয়ে গেল যে জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে সাতটা মাস অযথা নষ্ট হয়ে গেল একটা বিপর্যয়ের অশান্তিতে। দুজন অতি প্রিয় বাল্য বন্ধু, যারা আমার এই লেখার সঙ্গে জড়িত এবং বইটি শেষ হবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত ছিল, তারা পুরানো স্মৃতির পঠন-পাঠনের সুখানুভূতি থেকে বঞ্চিত হল। আরও কজন হবে জানিনা। ছাপাবার পূর্বে পাণ্ডুলিপিটা, আরও সময় নিয়ে পুনঃপরীক্ষা ও সম্পাদন করতে সাহস পেলাম না। তাই অনেক ঘটনা বা কাহিনী সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না।

তবে, আমাদের সেই সারা দেশ ব্যাপী, ১৯৪২ এর পবিত্র 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সুবর্ণজয়ন্তীর আনন্দময় লগ্ন, বাণীর স্মৃতির প্রতি ৯ই আগস্ট আমার সামান্য উৎসর্গকে হয়তো মহিমান্বিত করল।

আর, বাল্যবন্ধু ও কৈশোরে একই বিপ্লবী স্বপ্নের সহযাত্রী, রবীন্দ্র-ভারতীর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সু-সাহিত্যিক ও সমালোচক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করলেন।

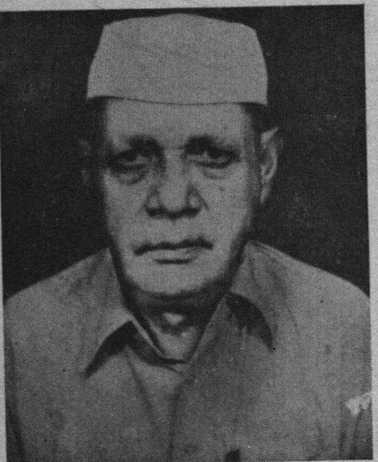
২৪শে শ্রাবণ (রবিবার), ১৩৬৭ — মানিক রায় (বারীন)

৯ই আগস্ট, ১৯৬০

২৭/৩৮, কে এম. নস্কর রোড

কলিকাতা-৭০০০৪০

সূচীপত্র



কমরেড্ ওয়ালিনোয়াজ খান।

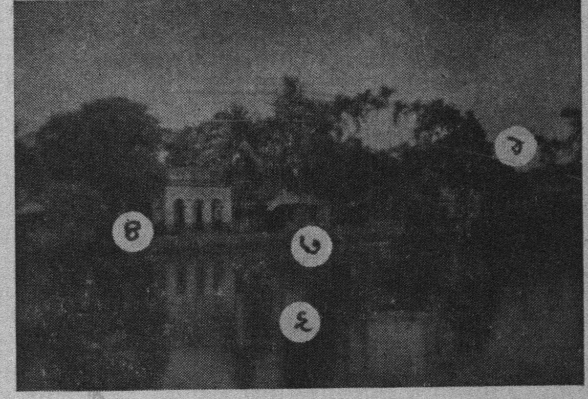


লেখক।



প্রতিমা রায় (বাণী)





১) জজ্‌সাহেব প্রয়াত জ্যোতী বীরের বাড়ি। ২) কিশোরগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির বড় পুকুর।

৩) ইট্‌-বাঁধানো ঘাট আর তার ঠিক উপরেই

প্রয়াত ডাঃ প্রফুল্ল বীরের সেই বিখ্যাত 'নয়া ঘর' যেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি দেশবরেণ্য নেতারা থেকে গেছেন।

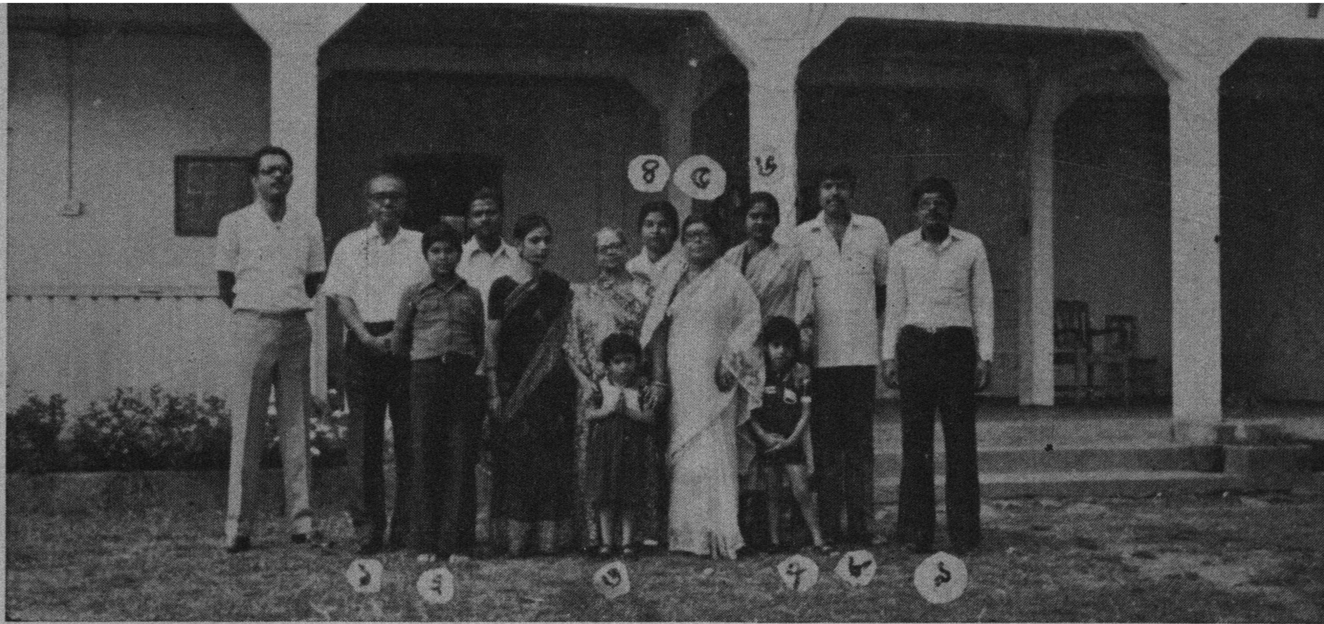
৪) ডাঃ বীরের বাড়ির প্রবেশ পথ। ১৯৪৬ এর ১লা অগাস্ট বৃষ্টি-ভেজা রাতে ঐ পথ দিয়েই বাণী বার হয়ে এসেছিল। ৫) লেখকদের ভাড়াটে বাড়ির বৈঠকখানা ঘর, যেখানে লেখক বাণীর অপেক্ষায় বসে ছিলেন। ৬) ভাড়াটে বাড়ির দক্ষিণ দিকের ঐ রাস্তা দিয়েই লেখক ও বাণী তাঁদের মহাযাত্রার পথে চলে গিয়েছিলেন। ৭) বাসনা মাসীমাদের ভাড়াটে বাড়ি।



'নিশা-কুমুদের' ঘর।

(লেখকের মা নিজের হাতে লাগানো গাছের

'অপরাজিতা ফুল তুলছেন।)



১) লেখক। ২) বড় ছেলের ঘরের বড় নাতি—সপ্তর্ষি। ৩) ছোট ছেলের ঘরের বড় নাতনী—শ্রেয়সী।
৪) ছোট বৌ—রত্না। ৫) প্রতিমা রায় (বাণী)। ৬) বড় বৌ—কৃষ্ণা।
৭) বড় ছেলের ঘরের ছোট নাতি—দেবর্ষি। ৮) বড় ছেলে—গৌতম। ৯) ছোট ছেলে—বাপ্পা।

(১৯৮৫ সালের গরমে শিলিগুড়ির নিকটে 'রোহিনী' চা বাগানের মালিকের বাংলোতে কয়েকদিন অতিথি হয়েছিলাম, দার্জ্জিলিং, গেনটক ও কালিম্পং হয়ে ফেরার পথে। ছোট ছেলের ছোট মেয়ে শ্রীময়ীর তখনো জন্ম হয়নি। নাতি-নাতনীদের সবার নামই বাণীর দেয়া।)

কিশোরগঞ্জের কথা লিখতে বসে যাঁর কথা প্রথমেই মনে পড়ছে, যিনি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসায়, নিজের অসীম ও অতুলনীয় ত্যাগে এবং উদারতায় আমাকে আপ্লুত করে বেঁধে রেখে, কিশোরগঞ্জকে আমার কাছে এতো আপন করেছিলেন, সেই উদার ও মহৎ হৃদয় আমার স্ত্রী প্রতিমা রায় (বাণী) আর ইহজগতে নেই ! মাত্র সামান্য কিছুদিন পূর্বে ১৯৯১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে পরলোকে চলে গেছেন। আজ দুপুরে এই এত বড় বাড়িতে একতলায় বসে সেই কিশোরগঞ্জের কথা লিখতে বসে আমার হাত কাঁপছে, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে ! যে টেবিলে বসে লিখছি তারই পেছনের একটা খাটে শুয়ে এই সময়ে হয় উনি কোন বই পড়তেন, নয়তো ঘুমোতেন। এই তো মাত্র দু-তিন মাস পূর্বেও, গত বছরের ১৬ই ডিসেম্বরে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করার পূর্বেও। ঐ খাটের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয় না, উনি নেই। মনে হয় বাথরুমে বা বাড়িতেই এদিক ওদিক কোথাও গেছেন, এখনই এসে বলবেন, "আবার কোথায় চিঠি লিখছ, তুমি চিঠি লিখতেও পার !" চিঠি লিখতে বসে একথাটা আমার প্রায়ই শুনতে হত। ওনাকে আজও আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে কিশোরগঞ্জের কথা আরম্ভ করছি।

ইং ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি, আমার বাবা ময়মনসিংহ থেকে বদলি হয়ে কিশোরগঞ্জে যান, আদালতের 'সেরেস্তাদার' হয়ে। আমি তখন কলকাতার ভবানীপুরে সাউথ্ সুবারবন মেন্ স্কুলে পড়ছিলাম। পরে, ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কিশোরগঞ্জের আজিমুদ্দিন হাইস্কুলের ক্লাশ এইটে ভর্তি হই। বাবা বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া পাড়ার মিউনিসিপ্যালিটির পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ওটি ছিল বিখ্যাত মোক্তার এবং হয়বতনগরের দেওয়ান সাহেবের এস্টেটের ম্যানেজার ৺জ্ঞানচন্দ্র বীর মহাশয়ের একটা ভাড়াটে বাসা-বাড়ি। আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে ছিল একই রকমের আরও একটা ভাড়াটে বাড়ি, আর তার উত্তরেই ৺জ্ঞান বীরের নিজস্ব বড় দালান বাড়ি। তাঁর বড় ছেলে প্রফুল্ল বীর ছিলেন তৎকালীন আমলের M. B. ডাক্তার। শহরে আরও দু-একজন M. B. ডাক্তার থাকলেও উনিই ছিলেন সব চাইতে নামজাদা ডাক্তার, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি।

কিশোরগঞ্জ ছিল ময়মনসিংহের একটি বড় মহকুমা শহর। এখন এটি বাংলাদেশের জিলা শহর। ১৯৩৪-৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্তও ওখানে কোন পাকা রাস্তা ছিল না, ছিল না বিদ্যুৎ। ছেলেদের ছিল দুটো হাইস্কুল ও মেয়েদের একটি। রামানন্দ বা কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল, আজিমুদ্দিন হাইস্কুল ও মেয়েদের সরযূ বিদ্যানিকেতন। একটা কেমন গ্রাম্য গ্রাম্য ভাব। আমাদের ঢাকার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। তবে আমি নিজে গাছ-গাছালি ও গ্রাম ভালবাসতাম বলে শহরটা আমার খুব একটা খারাপ লাগত না। শহরের বুকের উপর রামানন্দ হাইস্কুল ছেড়ে শহরতলির আজিমুদ্দিন হাইস্কুলে আমার ভর্তি হওয়াও এই কারণেই। অথচ এর পূর্বে আমি ময়মনসিংহ জেলা শহরের বুকে সিটি কলেজিয়েট স্কুল ও কলকাতা-ভবানীপুরের সাউথ সুবারবন্ মেন স্কুলে পড়েছি। আমরা তখন ছিলাম দু ভাই চার বোন। বড় বোন নীহারদি (বাবার প্রথম পক্ষের) আমার চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। উনি তখন ইম্ফলে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন। আমি, হেনা, পল্টু, খনা ও মঞ্জু তখন বাবা-মার সঙ্গে কিশোরগঞ্জে আছি। যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৪ সালে আমি যখন কলকাতায়, তখনই বোধ হয় বোন মঞ্জুর জন্ম হয় কিশোরগঞ্জে। তারপর সেখানে আমাদের আরও একটি ভাই ঝুণ্টু ও এক বোন শিখার জন্ম হয়। ঝুণ্টু চার বছর বয়সে ডিফ্থেরিয়া রোগে মারা যায়। সেখানের "রাকুয়াইলের" শ্মশান ঘাটে আমি বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে নিজ হাতে তাকে দাহ করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন আমাদের দেশের বাড়ির অরুণদা ও ডাঃ বীরের কমপাউন্ডার বিলাসদা। (বর্তমানে হুগলীতে বাড়ি করে আছেন)। এই ভাই ৺ঝুণ্টু আমার এতই "নেওটা" ছিল যে তার জেদ উঠলে, আমি ছাড়া কেউ তাকে শান্ত করতে পারত না। স্কুল ছুটির দিনে আমার কোল বা কাঁধ ছেড়ে সে কারও কাছেই যেত না। আর আমার কোলেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এতই ব্যথা পেয়েছিলাম তার মৃত্যুতে যে ৪০ বছর পর যখন ইং ১৯৩৫ সালে ২১ ও ২২শে মার্চে মাত্র দেড়দিনের জন্য আমি কিশোরগঞ্জে গিয়েছিলাম, তখন চারদিকের দেখা-সাক্ষাতের ব্যস্ততার মধ্যেও শহরতলীর ঐ শ্মশানে গিয়ে মৃত ভাইয়ের জন্য দুফোঁটা চোখের জল না ফেলে পারিনি। অন্যদিকে আবার এই সত্তর বছর বয়েসের অভিজ্ঞতায় একথাও মনে হয়েছিল ঝুণ্টু বেঁচে থাকলে কি সে তার ছোটবেলার মতো আজও আমায় সেইভাবেই ভালবাসত?

কিশোরগঞ্জ তখন একটা খুবই বড় মহকুমা ছিলো যার একটা দিক ছিল "হাওয়র (বিল) বাওয়ের" দেশ। যেমন, 'নিখলিদাম পাড়া, অষ্টগ্রাম, লাউন্দ', ইত্যাদি আরও কিছু জায়গা বিল ও খালে ভরা ছিল, যার জন্য এই সব অঞ্চলকে 'ভাটি' অঞ্চল বলা হতো। বর্ষাকালে নৌকো ছাড়া ওই সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব হত না। অন্য দিকটা ছিল উঁচু, সেখানে 'হাওয়র-বাওয়র' ছিল না। কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে না ঘুরলে ওই সব বিরাট বিরাট হাওরের কোন খোঁজই পাওয়া যেত না। শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে 'নরসুন্দা' নদী। ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে "কাউনিয়া" হয়ে এই শাখা নদী কিশোরগঞ্জের ভেতর দিয়ে বয়ে যেয়ে "কুলিয়ারচর-ভৈরব-বাজারে" পৌঁছে মেঘনা নদীতে পড়েছে। আমাদের সময়ে "নরসুন্দা" নদী প্রায় মরে এসেছে। শুধু বর্ষায় কিছু জল জমে নদী চালু হত এবং তখন নৌকো চলাচল করত, তাও মাত্র ২।৩ মাসের জন্য। ভৌগোলিক কারণে উক্ত "কাউনিয়ার" মুখে নদীর তলার মাটি অনেকটা উঁচু হয়ে যাওয়ায় ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ঐ নদীতে আর জল প্রবেশ করতে পারত না, অন্যদিকে ময়মনসিংহেও ব্রহ্মপুত্র নদ তখন প্রায় মরে এসেছিল। কিশোরগঞ্জের প্রাচীন লোকেদের মুখে শুনেছি যে বর্ষাকালের রাতে "নরসুন্দার" জলস্রোতের ডাক আমাদের শোলাকিয়া অঞ্চল থেকেও শোনা যেত।

যতই দিন যাচ্ছিল ততই কিশোরগঞ্জের মাহাত্ম্য বুঝতে পারছিলাম। বাইরের যারাই চাকুরী বা ব্যবসা ইত্যাদির জন্যে ওখানে যেত, তারাই কিশোরগঞ্জের প্রায় সবরকম খাবার-দাবারের প্রাচুর্য্যের কথা আর ওখানের লোকজনের আতিথেয়তার কথা এক বাক্যে স্বীকার করতো। কাঁচা দুধে হাত ডোবালে হাতে মাখন বা ননী লেগে থাকত। দুধের মাপও ছিল, ময়মনসিংহের পৌনে দুসেরে কিশোর-গঞ্জের এক সের। প্রতি সেরের দাম তখন পুরানো চার পয়সা থেকে ছ পয়সা। 'আমের' হিসাব ছিল একশ চল্লিশটায় একশ আম। চুইলদা নামক গ্রাম থেকে গোয়ালারা 'ঘি' নিয়ে আসত দুটাকা করে সের। এক বাড়িতে বসে বিক্রী করলে আশেপাশের বাড়ি থেকে তার গন্ধ পাওয়া যেত। কোন বাড়িতে সোনা-মুগের ডাল রান্না করলে আশেপাশের বাড়ি বাতাসে সেই গন্ধ পেত। প্রতি মঙ্গলবারে এক রকমের লিচু আসতো শহরে, তার নামই ছিল "মঙ্গলবাইরা" লিচু। খুব বড় সাইজের, ছোট্ট বিচি আর রসে টইটম্বুর। একশ লিচুর দাম মাত্র তৎকালীন দশ পয়সা। আমরা সম-বয়সীরা খেলার মাঠে

বিকেল বেলায়, একেক জন, একেক শত লিচু কিনে বসে বসে খেতাম আর গল্পগুজব করতাম আর খেলা থাকলে তাও দেখতাম। 'লট্‌কা' বা 'ভুবি' নামে এক রকমের ছোট ছোট গোল ফলের প্রাচুর্য্য ছিল। ভেতরে তিনটে করে বিচি, টক্‌-মিষ্টি স্বাদ। কাঁঠালের এমন প্রাচুর্য্য আমি আর কোথাও দেখিনি। যেমন বড় বড় আকারের কাঁঠাল তেমনই সুস্বাদু। আবার দেখেছি, অনেকেই এক জায়গায় বসে একাই একটা বড় কাঁঠাল খেয়ে ফেলত। কত লিখব, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে, সব কথা আর মনে নেই। মাছেরও প্রাচুর্য্যের সীমা ছিল না। সব রকম মাছতো পাওয়া যেত-ই। বড় বড় রুই-কাতলার এক জোড়া পেটি দশ পয়সায় আমি নিজেও কত কিনেছি। শহরতলিতে 'যশোদল' নামে একটা গ্রাম ছিল। সেখানকার গোঁসাইরা ছিল বিখ্যাত। বহু বড় বড় পণ্ডিতের জন্মস্থান ঐ যশোদল বা তার গোঁসাই-বাজারে। কিশোরগঞ্জের চার সের দুধে ওখানের এক সের। এ নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে। গোঁসাই-বাজারের এক বাড়িতে বাইরে থেকে তাদের এক কুলগুরু আসেন। কুলগুরুকে প্রণাম করে সমাদরে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে বাড়ির মালিক ছেলেকে বলেন তাড়াতাড়ি বাজার থেকে একপো দুধ আনতে। কুলগুরু একপো দুধের কথা শুনে ভাবেন, তাঁর এই শিষ্য বোধহয় খুবই কৃপণ। কিন্তু খেতে বসে দুধের নানান রকমের খাদ্য দেখে শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, একপো দুধে এত প্রকারের খাদ্য তৈরী হল কি করে। তখন উনি জানতে পারেন যে গোঁসাই-বাজারের এক্‌পো দুধ কতটা। এই গোঁসাই বাজারের এক ছেলে-ই কলকাতা 'মোহনবাগান' ক্লাবের বিখ্যাত ফুটবলার চুনী গোস্বামী। একটু দূরেরই গচিহাটা-বনগ্রামের ছেলে ৺রাখাল মজুমদার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের বিখ্যাত ফুটবলার ছিল। কিশোরগঞ্জে আরও একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিল ৺এম্‌ দত্তরায় (ওরফে ভানু দত্ত)। তিনি ইষ্টবেঙ্গলে খেলতেন এবং বহুপূর্বে আই. এফ্‌ এ ফুটবল টিম নিয়ে তৎকালীন "জাভায়" ক্যাপ্‌টেন হয়ে গিয়েছিলেন। কিশোরগঞ্জে আরও একজন বিখ্যাত ফুটবলার ছিলেন হাঁচু দাস। তিনি আই এফ্‌. এ.-র 'এ' ডিভিসানে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় দু-তিন দিনের বেশি খেলতে পারেন নি, যদিও তৎকালীন কলকাতার বহু ফুট্‌বলারের চাইতে তিনি অনেক বড় খেলোয়াড় ছিলেন। এই হতভাগ্য লেখককেও উনি নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায় 'এ' ডিভিসানে খেলাতে। কিন্তু সেই একই ভাগ্য বিড়ম্বনায় দুদিনের বেশি খেলতে পারিনি। কিশোরগঞ্জের সংলগ্ন সদর

মহকুমার গৌরীপুরের মানুষ ছিলেন বিখ্যাত ফুটবলার পাখি সেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলতেন। বিখ্যাত ইন্টলিংটন কোরিনথিয়ান্‌স ফুটবল টীম ১৯৩৬ কি ১৯৩৭ সালে তৎকালীন বাংলাদেশে এসেছিল প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে। কলকাতা বা অন্য কোথাও হারেনি। কিন্তু ঢাকায় খেলতে যেয়ে এক গোলে হারে। সেই জয়সূচক গোলটি করে ঐ পাখি সেন একদিনেই ভারত বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন।

"ময়মনসিংহ গীতিকার" প্রায় সকল কাহিনীই কিশোরগঞ্জের। কবি চন্দ্রাবতীর বাড়িও ছিলো নিকটেই 'পাতুয়াইর' গ্রামে। এই গ্রামেরই শ্রীননী মজুমদার, আমাদের সমবয়েসী ও তার আত্মীয়া বাণীদের সমবয়েসী বীণা, ১৯৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের খুব সাহায্য করেছিল। এক রাতে, থানার কাছাকাছি পোস্টার লাগাতে গিয়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আমার বাবার নাম লেখা পেতলের আঠার বাটি ফেলে ননী পালিয়ে এলে, গভীর রাতে যেয়ে আমরা সেটা উদ্ধার করে আনি। আমাদের পাশের ভাড়াটে বাড়িতে ওরা থাকত। কিশোরগঞ্জ অনেক নামি দামী ও বিখ্যাত লোকের জন্মস্থান। বহু বিপ্লবীরও জন্ম এইখানে। প্রয়াত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ক্ষীরোদ চৌধুরী ও তাঁর ভাই লণ্ডনবাসী প্রথিতযশা লেখক নীরোদ সি. চৌধুরী এই কিশোরগঞ্জেরই এক পরিবারের মানুষ। তাঁদের কিশোরগঞ্জ শহরের বাড়ি আমাদের পূর্বে উল্লেখিত শোলাকিয়া পাড়ায়। গত ১৯৯০ সালের একুশ-বাইশে মার্চে ওখানে যেয়ে চৌধুরীদের ঐ বাড়িতে একটি "মস্‌জিদ" তৈরি হয়েছে দেখে এসেছি। বিখ্যাত বিপ্লবী প্রয়াত মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর জন্মও কিশোরগঞ্জের সরারচর রেল স্টেশনের নিকটেই 'কাপাসাটিয়া' গ্রামে। তাঁর বিখ্যাত বই "ত্রিশ বছর জেলে।" অবশ্য এর পরেও, পাকিস্তান আমলে, পূর্বে উল্লেখিত ৺ডাঃ প্রফুল্ল বীর, কিশোরগঞ্জের ডেডিকেটেড্ কম্যুনিস্ট নেতা ৺নগেন সরকারের সঙ্গে জেল খেটেছেন ময়মনসিংহ জেলে। উনি ছিলেন বিপ্লবী, অনুশীলন পার্টির একজন বড় ও জাঁদরেল নেতা।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঠিক পূর্বে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা করাতে ও প্রাচীন বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে। এখানে পৌঁছুতেই দিল্লী থেকে ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির নেতা প্রয়াত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ময়মনসিংহের অনুশীলন পার্টির নেতাকে দিল্লী যেতে আমন্ত্রণ করলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে, এটা আমাদের কাছে খুবই রহস্যজনক ছিল। সে রহস্য অবশ্য পরে পরিষ্কার হয়ে যায়। যাহোক "মহারাজ"কে দিল্লী যাবার পূর্বেই টালিগঞ্জের কুদঘাটের "অনুশীলন ভবন" অভ্যর্থনা দিলে, আমি ও আমার স্ত্রী "অনুশীলন ভবনে" গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে পরিচয় দিলে, উনি খুব আদর করে ওনার দুপাশে আমাদের বসিয়ে, আমার স্ত্রীকে বলেন, "এখানে আসার পূর্বে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে, "অনুশীলন ভবনে" গেলে আমার মেয়ের বাড়ি ঘুরে আসবেন, ওরা খুব নিকটেই থাকে। তোমরা এসে ভালই করেছ। আজতো আমার সময় হবে না, এরা এখানেই রাত্রি এগারোটা বাজিয়ে দেবে। দিল্লী থেকে ফিরে এসে তোমাদের বাড়িতে যাব।" এই বলে ওঁনার একজন সহকারীকে ডেকে ওঁনার প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসার কথাটা লিখিয়ে নিলেন, আর ওঁনার কলকাতার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে, একটা তারিখ দিয়ে আমাকে যোগাযোগ করতে বললেন।

সকলেই জানে, দিল্লী থেকে ওঁনার মরদেহই শুধু আবার এই 'অনুশীলন ভবনে' ফিরে এসেছিল এবং সেখানে ডাঃ প্রফুল্ল বীরের নামে (তখনও উনি জীবিত) আমি ও আমার স্ত্রী একটা পুষ্পস্তবক দিলে সেটা কলকাতা বেতার ও দূরদর্শনকেন্দ্র থেকে প্রচার করলে, ডাঃ বীর এখানেই আছেন ভেবে ভুল করে, আশেপাশের কিছু কিশোরগঞ্জের লোক আমাদের বাড়িতে ডাঃ প্রফুল্ল বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অন্যদিকে তখন ডাঃ বীর কিশোরগঞ্জে বসে আকাশবাণীতে এই খবর শুনে ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়েছিলেন। আমি ও বাণী কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জলে, ভারতবিখ্যাত এই বিপ্লবী নেতার অন্তিম যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলাম জন-সমুদ্রের মধ্যে।

সিনেমা জগতের বিখ্যাত সত্যজিৎ রায় ও তাঁর পিতা প্রয়াত সুকুমার রায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত প্রফুল্ল ঘোষের প্রথম মন্ত্রীসভার আইন মন্ত্রী শ্রীনিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বিখ্যাত অঙ্কন শিল্পী প্রয়াত হেমেন্দ্র মজুমদার, ঐতিহাসিক শ্রীনিশীতরঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিখ্যাত গায়ক প্রয়াত দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জদা), ভবানীপুরের বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ও জমিদার প্রয়াত দ্বারিক চক্রবর্তী, এরা সকলেই কিশোরগঞ্জের মানুষ। ভারতের প্রথম রেংলার প্রয়াত আনন্দমোহন বসুর দেশও কিশোরগঞ্জে। 'ময়মনসিংহ গীতিকার' রচয়িতা প্রয়াত

দীনেশ চন্দ্র সেন, বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস' রচয়িতা প্রয়াত নীহাররঞ্জন রায়, বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা, যার নামে কলকাতায় সি পি. আই অফিস, 'ভূপেশ ভবন' সেই প্রয়াত ভূপেশ গুপ্ত, এঁরাও সকলেই কিশোরগঞ্জের মানুষ। প্রয়াত দেবব্রত বিশ্বাসের (জর্জদা) এক বোন বুড়িদি ছিলেন বাণীদের স্কুলের খুব প্রিয় একজন শিক্ষয়িত্রী। বাণী ও রেখার মুখে বুড়িদির কথা খুব শুনতাম। তাঁর ছোট বোন সান্ত্বনাও বোধ হয় ওদের আর এক শিক্ষয়িত্রী ছিল। ওঁরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। সান্ত্বনার বিয়েতে বাণী ও রেখা ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। সেই বিয়ের দিন, ওদের আচার্য্যের বাংলায় মন্ত্র পড়ার ফাঁকে ফাঁকে জর্জদা বহু রবীন্দ্র ও ব্রাহ্ম সঙ্গীত গেয়েছিলেন। দেশভাগের পরেও বাণীদের নাটোর পার্কের ভাড়া বাড়িতে বেশ কয়েকবার দেখা করতে যেয়ে জর্জদা তাদের গান শোনাতেন আর খুব পান খেতেন।

কিশোরগঞ্জের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ওয়ালিনোয়াজ খানের কথা না লিখে পারছি না। অল্প বয়সেই বিপ্লবী অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে একেবারে পুলিশের বিভীষিকায় রূপান্তরিত হন। মুসলমান সন্তান হয়েও, সেই সময়ের কিশোরগঞ্জের প্রায় গ্রাম্য সমাজে প্রত্যহ ভোরে উঠে অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দানের উৎসাহ পেতে গীতা পাঠ করতেন। এটা আমি তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেছি। তারপর পলাতক জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও পুলিশের অবিচার-অত্যাচার সহ্য করে বহুদিন নানান জেলে কাটিয়ে পুনরায় যখন কিশোরগঞ্জে ফিরে আসেন, তখন তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত প্রায়। এই সময় কিশোরগঞ্জে ১৯৩৮ সালে, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় বোধ হয় আত্মীয়তা ছাড়িয়ে যায়। এই একটি মানুষের প্রচেষ্টা ও অবদানে কিশোরগঞ্জে তাঁর সময়ে কোনদিন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হতে পারেনি। ময়মনসিংহ জেলার মানুষ এক ডাকে তাঁকে চিনত। জেল থেকেই কম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বার হয়ে এসেছিলেন। পূর্ব বাংলার বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা ৺মনি সিং (যিনি কয়েক মাস পূর্বে ঢাকা মিড্‌ফোর্ড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) ও ময়মনসিংহের প্রয়াত স্নেহাংশু আচার্য্য চৌধুরী ও কিশোরগঞ্জের প্রয়াত কমরেড বিখ্যাত ভূপেশ গুপ্ত যে ওয়ালিনোয়াজ খানকে কতটা ভালবাসতেন তা সচক্ষে আমি দেখেছি। ফর্সা, সুন্দর, ভদ্র চেহারার মানুষটির মুখে হাসি লেগেই থাকতো। আবার রেগে গেলে মনে হত যেন একটা আগুনের গোলা। আমার জীবনের একটা অতি কঠিন সন্ধিক্ষণে, তাঁর

সাহায্য আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সময় ও সুযোগ পেলে সে কাহিনীও লিখে যাব।

১৯৩৫-এর শোলাকিয়া পাড়ায়, আমাদের ভাড়াটে বাসার উত্তর দিকের একই লাইনের চারটি বাড়ির মধ্যে, তিন বাড়ির, তিনটি সাত বা আট বছরের মেয়ে ফ্রক্ পরে ফুর্ ফুর্ করে পাড়া ঘুরে বেড়াতো। একটি আমার ছোট বোন হেনা, অন্যটি ডাঃ বীরের মেয়ে বাণী, তৃতীয়টি বাণীরই খুড়তুতো বোন রেখা, সে সময়ের এক মুনসেফের মেয়ে, পরে যিনি ডিস্ট্রিক্ট্ ও সেসন জজ হয়ে রিটায়ার করেন। এই রেখা বর্তমানে বেহালার পর্ণশ্রীতে বাড়ি করে স্বামী সহ আছে। "আমরা এক বোঁটাতে ফোটা তিনটি ফুল" এই বাক্যের সুর দিয়ে তখন একটা গানও আমি গাইতাম এবং আমার ও বন্ধু মনুর তত্বাবধানে, পাড়ায় আমাদের বালকদের "কর্ণার্জুন" থিয়েটারে ঐ তিনটি মেয়েকে উক্ত গানটি, নাচিয়ে নাচিয়ে স্টেজে গাইয়েছিলাম। কর্ণের রোলটাও আবার আমাকেই করতে হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে ওদের তিন জনকে একসঙ্গে দেখলেই আমি ওদের "আমরা এক বোঁটাতে ফোটা তিনটি ফুল" বলে সম্বোধন করতাম, ওরাও খুব খুশী হত। গত ৩রা ফেব্রুয়ারি (১৯৯১)-তে বাণীর মৃত্যুর পর, রেখা আমার বাড়িতে দেখা করতে এসে, চোখে জল নিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "মানিকদা, 'আমরা এক বোঁটাতে ফোটা তিনটি ফুলের' কথা আপনার মনে আছে ?" আমি বললাম, "তার একটি তো ঝরে গেল বোন!" দুজনাই অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমার বোন হেনাও নিকটেই ছিল, দেখলাম তার চোখেও জল। ওই তিন সাথীর মধ্যে বাণীর রং ছিল খুব ফরসা, এত ফরসা রং বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তার অভিভাবকরা তাকে মাঝে মাঝেই লাল সিলকের ফ্রক পরিয়ে দিত। তাতে তাকে খুব সুন্দর লাগতো। খুব প্রাণ-চঞ্চল ছিল বাণী। মনটা ছিল একেবারেই সরল। লেখা-পড়ায় ছিল খুব ভাল। রেখা আর বাণী, দুইবোনের ক্লাসে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নিয়ে ওদের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা হত।

তিন বন্ধুই মোটামুটি সাঁতার শিখেছিল। কিন্তু আমার নিকট নানান রকমের সাঁতার শিখত। বাণীদের বাড়িতে খুব ভাল একটা কুল গাছ ছিল। আমি অনেক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ গাছ থেকে কুল পাড়তাম, ওরা দেখলে ওদেরও দিতে বলত, কিন্তু বাণী বা রেখা কুল পাড়ছি বলে বাড়িতে বলে দিত না। আমাদের এই রকমের আরও নানা মেলামেশা বা খেলাধুলোর মাঝে

কোনও অনুরাগ বা ভালবাসার প্রশ্নই ছিল না। এগুলো ছিল বাল্য-কৈশোরের মেলামেশা। রেখা এবং বাণী দুজনকেই আমার খুব ভাল লাগত। তবে বাণী খুব প্রাণ-চঞ্চল ছিল আর কাছাকাছি থাকত বলে, আমাদের বাড়িতে আসতও বেশি, এই জন্য তাকে হয়তো একটু বেশি ভাল লাগত বা অন্তরঙ্গতা তার সঙ্গে একটু বেশি ছিল। আমিও মোটামুটি ওদের বাড়ি যেতাম। বাণীর দাদু প্রয়াত জ্ঞান বীর আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বাংলা থেকে ইংরেজী ট্র্যানস্লেশন্ করে তাঁকে দেখাতে বলতেন। উনি আমার ইংরেজী লেখার প্রশংসা করতেন এবং আরও ভাল লিখতে উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন। বাণীদের দালান ঘরের রাস্তার দিকে অনেকগুলো ধাপের লম্বা সিঁড়ি ছিল। সিঁড়ির পরে অল্প একটু মাঠ, মাঠের পরে দশ-বার ফিট্ চওড়া মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা আর তারপরই বিরাট পুকুর আর ওদের ঐ দালানের ঠিক সামনেই পুকুরের পাকা ইঁট-বাঁধানো ঘাট। চাঁদনী রাতে এই জায়গাটা খুব মনোরম লাগত। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পুকুরের চার পারের কুটিরগুলোর উপর এবং পুকুরের জলে পড়ে যেন একটা স্বপ্নের আবেশ তৈরী হত। বাণীর মা, আমার মা এবং আরও কিছু মা-মাসীমারা সন্ধ্যের পর উক্ত দালানের সিঁড়িতে বসে গল্প-গুজব করতেন। আমি মোটামুটি গান গাইতে পারতাম বলে, ঐ সময়ে আমাকে বাণীর মা, মানে আমার মাসীমা পুকুরের ঘাটে বসিয়ে আমাকে অর্ডার দিয়ে গান করাতেন। ইন্টার স্কুল ফুটবলে বেস্ট প্লেয়ারের সম্মান পেয়েছিলাম দুবার। তারপর ব্যাডমিণ্টনে জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান, ক্যারমবোর্ডে শহরে আমি ছিলাম অপরাজিত। ইন্টার স্কুল সাঁতার ও স্পোর্টসেও প্রাইজ পেতাম। এসবের জন্য বাণীর বাবা ডাঃ বীরও আমাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন এবং উৎসাহ দিতেন।

কিশোরগঞ্জে খুব বড় রথের মেলা বসত। একবার রথের মেলায় দেখি বাণী ফ্রক ছেড়ে সখ করে একটা কালো খুব সুন্দর শাড়ী পরে, একটা মাটির পুতুলের দোকানের সামনে, বাড়ির ভৃত্যকে খুব ধমকাচ্ছে। কেন সব টাকা ফুরিয়ে গেল, এখন সে তার পছন্দের পুতুলটা কিনবে কি দিয়ে। বাণীকে ঐ কালো শাড়ীতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে কয়েকটা টাকা হাতে দিয়ে বাণীর মা কি ঠাকুমা, ঐ ভৃত্যের সঙ্গে বাণীকে মেলায় পাঠিয়েছিলেন, এটা ওটা কিনতে টাকা ফুরিয়ে গেছে, তাই তার পছন্দের ১২ পয়সা দামের পুতুলটা কিনে দিতে পারছে না। আর সেই জন্যই

এই রাগারাগি। আমি পুতুলটা কিনে দিতে চাইলে বাণী রাজী হল না। তখন আমি ওকে রাজী করার জন্য বুঝিয়ে বললাম যে মনে কর পুতুলটার দাম তুমি আমার কাছে ধার নিচ্ছ। বাড়ি ফিরে যেয়ে ঐ পয়সাটা আমাকে ফেরত দিয়ে দিও। পরে, সেই দিনই বাড়ি ফিরে এসে, আমাদের বাড়িতে আমার মার সামনে ঐ বার পয়সা ফেরত দিতে যেয়ে, উঁনার কাছে ধমক খেয়ে লজ্জিত মুখে বাণী ফিরে যায়। এমনি আরও কত ঘটনা আছে, তার সব আজ আর মনে নেই, যা যা আছে, তা-ও লিখতে গেলে কোথায় ও কবে এর শেষ হবে জানি না।

বাণীরা ছিল দু'ভাই আর চার বোন। বাণী দ্বিতীয়। বয়েস অনুপাতে অমল, বাণী, তমাল, হিমানী, কল্যাণী, শিবানী। হিমানীর পরে আরও একটি বোন হয়েছিল, নাম মঞ্জু, ফর্সা টুকটুকে, একেবারে ছবির মতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মঞ্জু অল্প বয়সেই মারা যায় টাইফয়েডে। অন্যদিকে আমরা তখন দুই ভাই পাঁচ বোন- বড়দি (নীহারের) কথা পূর্বেই লিখেছি, তারপর আমি, হেনা, পল্টু, খনু, মঞ্জু ও শিখা।

বাণীর বাবা প্রয়াত ডাঃ প্রফুল্ল বীর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তো শহরের এক নম্বর নাগরিক ছিলেন-ই, তাছাড়া শহরের নামজাদা ডাক্তার ও মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং বেঙ্গল মেডিকেল কাউনসেলের মেম্বার হিসাবেও খুব মান্যগণ্য লোক ছিলেন। সর্দি, কাশি, জ্বর বা সাধারণ পেটের অসুখের বাইরে রোগের একটু এদিক-ওদিক হলেই উঁনাকে দেখানো ছাড়া কোন গতি ছিল না। সেই জন্যে, সেই ব্রিটিশ বা ইংরেজ আমলের I. C. S. S D. O বা I. P. S. D. P. O. রাও ডাঃ বীরকে খুব খাতির করতেন। এছাড়া বহুরকম কমিটির উনি-ই চেয়ারম্যান ইত্যাদি থাকতেন। অন্যদিকে বহু জায়গা-জমি থাকাতে আর্থিক অবস্থাও ছিল ভাল। চাল, ডাল ইত্যাদি অনেক চাষের জিনিষই সারা বছরে ওদের উদ্‌বৃত্ত হত।

আমি নিজেও কিছু দেখেছি এবং কিছু শুনেছি যে সে সময়ের বহু ছোট বড় সর্বভারতীয়, প্রদেশ ও জেলাস্তরের নেতা বাণীদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। যেমন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, তাঁর দাদা প্রয়াত শরৎচন্দ্র বসু, খাদি-সঙ্ঘের প্রয়াত সতীশ দাশগুপ্ত, ভারত সরকারের প্রয়াত অর্থমন্ত্রী ক্ষিতীশচন্দ নিয়োগী, তৎকালীন বি পি. সি সি-র সভাপতি ও পরে কেন্দ্রের রাজ্যসভার সদস্য প্রয়াত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (মধুদা) রাশিয়ার নাগরিক প্রয়াত ডঃ অক্ষয় সাহা ও তাঁর

রাশিয়ান পত্নী শ্রীমতি তাতীয়ানা, বাংলাদেশের মুজিব মন্ত্রীসভার সদস্য ও পরে তাদের জাপানের রাষ্ট্রদূত শ্রীমনোরঞ্জন ধর, ইত্যাদি ব্যক্তিকে যাতায়াত করতে আমিই দেখেছি, এঁরা এলে, বাণীদের বাড়ির নিম্নে বর্ণিত 'নয়া' ঘরে থাকতেন।

ক্ষিতীশ নিয়োগীর সঙ্গে এক গাড়িতে বসে ১৯৪৫।৪৬ সালে মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়সে বাণীকে তার ইলেক্‌শন ক্যাম্পেন করতে দেখেছি এবং রথখলার (কিশোরগঞ্জ) মাঠে, মহিলাদের মুষ্টিমেয় জমায়েত দেখে আশেপাশের বাড়ি থেকে বহু মহিলাদের ডেকে নিয়ে এসে বিরাট জমায়েত করে সভা করতেও দেখেছি। উপস্থিত কংগ্রেস নেতাদের কাজে বাণীর এই কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন নিয়োগী মহাশয় এবং সেন্ট্রাল অ্যাসেম্ব্লির ঐ ইলেক্‌শনে সেবার উনি জয়ীও হয়েছিলেন। এছাড়া প্রত্যেকটি রাজ্য অ্যাসেম্ব্লি এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটির নির্বাচনে বাণীকে তার বাবার পাশে থেকে কাজ করতেও দেখেছি। বহুবার তাঁদের ইলেক্‌শন এজেন্টের কাজও করতে হয়েছে। একবার তো কিশোরগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচনে নির্দলীয় কাউনসেলর প্রয়াত ক্ষেত্র সাহা, এড্‌ভোকেটকে, ডাঃ বীরের বিপক্ষ দল তাদের দিকে ভোট দিতে প্রভাবিত করে ফেললে, ডাঃ বীরের চেয়ারম্যান হবার আর কোন আশাই ছিল না। পূর্বোক্ত ওয়ালিনোয়াজ খানও সেবার বিপক্ষ দলের কাউনসেলর ছিলেন। এই ক্ষেত্র সাহার এক মেয়ে বাণীর সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়ত। পিতার পরামর্শ মত বাণী একলা একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে ক্ষেত্র সাহার বাড়ি গিয়ে সহপাঠী বান্ধবী ও তার মাকে প্রভাবিত করে ক্ষেত্র সাহার ভোট তার পিতার জন্য নিশ্চিত করে ফিরে আসে। ডাঃ বীর সেবারও চেয়ারম্যান হন। বহুদিন পর নির্বাচনী গল্প গুজবের মধ্যে ওয়ালিনোয়াজ খান আমাকেও এই গল্প করেছিলেন। কিশোরগঞ্জে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে বাণীকে উক্ত কাজের জন্য ওয়ালিনোয়াজ বাহবা দিয়ে বলেছিল যে সেবার ঐ মেয়েটার জন্যই আমরা হেরে গেলাম।

তাছাড়া, স্কুলের নাটক থিয়েটার, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ইত্যাদিতেও বাণী নানাভাবে কাজ করত। ১৯৪২ কি ১৯৪৩-এর ইংরেজকৃত সেই কুখ্যাত দুর্ভিক্ষে, গুজাদিয়ার মাঠে বিরাট লঙ্গরখানা খুলে বহু মেয়ে জোগাড় করে বড় বড় হাঁড়িতে নিজেরাই খিচুড়ি রান্না করে দিনের পর দিন বহু অভুক্ত নরনারীকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখে এক অদ্ভুত কর্মযজ্ঞের পত্তন করে শহরের সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল বাণী, রেখা ও হেনারা।

মেয়েদের স্কুলের তো বটেই, শহরের যে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রেখা

আর বাণীতো থাকতই, আর সেখানে গানের কিছু থাকলে আমার ছোট বোন হেনাও থাকতো। যেখানেই মেয়ে ভলান্টীয়ার প্রয়োজন সেখানেও ওদের থাকতেই হতো। ১৯৪২।৪৩ থেকে কয়েক ব'ছর, মানে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত, শিক্ষিত এবং শান্তিনিকেতনে থেকে রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল দুটি পরিবার কার্যোপলক্ষে কিশোরগঞ্জে ছিল। অন্যদিকে কিশোরগঞ্জেরই ছেলে প্রয়াত বীরেন পালিত, শান্তিনিকেতনে গানের ছাত্র হয়ে যোগ দিয়ে, সেখানে শিক্ষকতার সুযোগ পান। এই বীরেন পালিত ও উক্ত দুই পরিবার বাস্তবিক কিশোরগঞ্জে সংস্কৃতির প্লাবন এনে দেন। এই প্লাবনের ধারায়, হেনা, রেখা, বাণী ও আরও অনেকেই বড় হয়ে ওঠে। ১৯৪২।৪৩ সাল থেকে কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জোয়ারে ভেসে চলে। ১৯৩৫ সালে প্রথম এসে একটা গ্রাম্য পরিবেশের যে ব্যাক্‌ওয়ার্ড কিশোরগঞ্জ দেখেছিলাম, সেটা তখন হারিয়ে গেছে। একটা নবজাগরণের (Renaissance) আগমনী যেন তার চেহারা একেবারে পাল্টে দিয়েছে। ১৯৩৫ সালের আর ১৯৪২।৪৩ সালের কিশোরগঞ্জের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল ফারাক।

মেয়েদের স্কুলে ভাল ভাল নাটক থিয়েটার লেগেই থাকতো। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পরে তার সবগুলোর কথা মনে নেই। বিসর্জন, বাল্মীকির প্রতিভা, মার্চেণ্ট অব ভেনিস, এই তিনটের কথা মনে আছে। ** এর সবগুলোতেই রেখা আর বাণীর ভাল ভাল রোল ছিল। আর রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, যা আমরা এখন প্রতি বছর কলকাতার রবীন্দ্র সদনে দেখি, তার অনেকগুলিই বাণী, রেখা, হেনারা সেই প'য়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেই কিশোরগঞ্জে করতো। বাণী জীবিত থাকতে প্রতি বৈশাখে এখানের রবীন্দ্র সদনের ঐ অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ ছাড়তো না।

গত ১৪।৮।৯১ তারিখে, রেখা তার বর দেবব্রতবাবুকে নিয়ে আমায় দেখতে এলে, এই খাতাটা * সামান্য নাড়াচাড়া করে আমায় বলল যে মানিকদা, আপনি তো আমাদের শুধু নানা রকম সাঁতারই শেখান নি, আমাদের সকলকে নিয়ে 'দোলে' রং খেলেও কত আনন্দ করেছেন। একবার তো আমার মাথায় একটা ডিম ভেঙে দিয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে উপরের দু-তিনটি অনুচ্ছেদ রেখার কথা

---

* সোনায় মোড়া দিনগুলির খসড়া করা ডায়েরি।

** বিসর্জনে 'গোবিন্দ মাণিক্য' ও মার্চেণ্ট অব ভেনিসে গোরসিয়া পাঠ করেছিল বাণী।

মতোই সংযোজন করলাম। আজ বাণী আর নেই, রেখাও বেশ দূরেই থাকে। রেখার সঙ্গে মাঝে-মাঝেই আলোচনা করার সুযোগ থাকলে, সেদিনের আরও কত সুন্দর স্মৃতিই না মনে পড়তো!

বাণীদের বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে একটা সুন্দর ঘর ছিল ইটের দেয়াল আর টিনের ছাদের। তাতে সংলগ্ন একটা স্যানিট্যারি P. V. সমেত বাথরুম ছিল। ঐ ঘরে সব নেতারা থাকতেন। এটার নাম ছিল 'নয়া-ঘর'। গত ২।৭।১৯৩৭ তারিখে হিমাচল প্রদেশের ডালাহৌসি থেকে কিশোরগঞ্জের ডাঃ প্রফুল্ল বীরকে লেখা সুভাষ বসুর চিঠির একটা ফটো কপি আমার বাড়িতে বাঁধানো অবস্থায় আছে। মূল চিঠিখানা নেতাজী ভবনের মিউজিয়ামে আছে। এখানেও একটা কপি দিলাম।

C/o Dr. N. R. Sharma
Dalhousie, Punjab.
2/7/37

সবিনয় নিবেদন,

[illegible]

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

C/o Dr. N. R. Dharmasri
Dalhousia, Punjab
২।৭।৩৭

সবিনয় নিবেদন,

আমার মুক্তির পর আপনার শুভেচ্ছাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

গোঁসাইজীর (যশোদানন্দ গোস্বামী) খবর আমি পাইতে ইচ্ছা করি। তিনি কোথায় ও কেমন আছেন ? তাঁহার আশ্রমের খবরই বা কি ?

আপনাদের সকলের কুশল সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি।

আমার শরীর এখানে আসিয়া পূর্বাপেক্ষা কতকটা ভাল। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি
আপনাদের
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

এই সময় সুভাষ বসু জেলেই প্লুরোসিতে আক্রান্ত হলে ইংরেজ সরকার দায়িত্ব এড়াতে তাঁকে মুক্তি দেয়। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের পিতা ডাঃ ধরমবীর, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সুভাষ বসুকে তার হিমাচল প্রদেশের (তখন পাঞ্জাব) ডালাহৌসির বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করেন। সুভাষবাবু ডালাহৌসির ঐ বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণে বার হয়ে প্রায় এক মাইল দূরে এসে গান্ধীচকের নিকটে একটা ঝরনার জল খেতেন, যে জলে অনেক উপকারী মিনারেলস্ মিশ্রিত আছে বলে সকলের বিশ্বাস। সুভাষ বসু ওখানে থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমানে হিমাচল প্রদেশ সরকার ঐ ঝরনার চারদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে লোকের বসার স্থান করে দিয়েছে আর সুভাষ বসুর ঐ জলপানের কথা উল্লেখ করে, ঐ ঝরনার নামকরণ করেছে 'সুভাষ-বাউলি'। ১৯৮৯ সালে বাণী ও আমাদের পরিবারের সকলে ডালাহৌসি বেড়াতে গিয়ে, ঐ বাড়ি খুঁজে বার করে জানতে পারি যে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর বর্তমানে দিল্লী থাকেন আর ডালাহৌসির ঐ বাড়ি তাঁর এক কন্যাকে দান করেছেন। সেই কন্যা তাঁর ডাক্তার স্বামীকে নিয়ে ঐ বাড়িতে থাকেন। আমরা সকলে মিলে 'সুভাষ-বাউলিতে' যাই। সেখানে

বসে আমরা শুধু শান্তি-ই পাইনি, গর্বও অনুভব করেছি। বাণী আবিষ্ট মনে শুধু ঐ চিঠির কথাই বলেনি, আরও বলেছিল যে সুভাষবাবু দুবার ওদের কিশোরগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছিলেন আর তাদের ঐ 'নয়া-ঘরেই' ছিলেন। প্রথম বার যখন গিয়েছিলেন তখন বাণী ফ্রক পরতো। সেবার সুভাষবাবুর সব খাবার-দাবার সে নিজের হাতে পরিবেশন করেছিলো। সুভাষবাবু সেবার তাকে কোলে বসিয়ে আদর করে বলেছিলেন, বড় হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে। দ্বিতীয়বার উনি এলেন ১৯৩৭।৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি হয়ে। সুভাষবাবুর সঙ্গে সেবার ছিলেন, ময়মনসিংহ কালীপুরের জমিদার প্রয়াত ডি কে লাহিড়ী চৌধুরী। সেবার আমি নিজেও ভলানটিয়ার হয়ে ওঁদেরকে আরও অনেকের সঙ্গে কিশোরগঞ্জ স্টেশান থেকে মোটর গাড়িতে রথখলার মাঠের সভায় নিয়ে এসেছিলাম। সভার মঞ্চে বসেছিলেন ঐ দুই অপরূপ সুন্দর পুরুষ। কে বেশী সুন্দর? বাণীর সঙ্গে এই ঘটনার কথোপকথন একটা ক্যাসেটে তোলা আছে। সেবার বাণী বোধহয় ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। সেবারও সুভাষবাবু তাদের বাড়িতে গেলে, বাণীকেই তাঁর দেখাশুনো ও পরিচর্যা করতে হয়েছিল। আর গরমে তালপাতার হাতপাখা নিয়ে আমরা ভলানটীয়াররা মাঝে মাঝে হাওয়া করেছিলাম, আর সেই সঙ্গে দুএকটি প্রশ্নের জবাব দেবার সৌভাগ্যও হয়েছিল।

সুভাষবাবুর দাদা প্রয়াত শরৎ বসু বাণীদের বাড়িতে কিশোরগঞ্জের তৈরী লাল চিনি খেয়ে খুব প্রশংসা করেছিলেন। এজন্য ডাঃ বীর কার্য্যোপলক্ষে কলকাতা এলেই, এক ডিবে লাল চিনি ওঁনার হাতে দিয়ে বাণীর ঠাকুমা বলতেন, "শরতের জন্য নিয়ে যা। আমি চিনি পাঠাবো বলে তাকে কথা দিয়েছিলাম।"

১৯৩৮।৩৯ সালে, আমি যখন ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজে পড়ি, তখন আমাদের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল শ্রীসোমেশ্বর মুখার্জী করপোরেশান ইলেক্শনে অলডারম্যানের জন্য দাঁড়ান এবং আমাদের কলেজের বাছাই করা পঁচিশ-তিরিশ জন ছেলেকে ওঁকে মনোনয়ন দেবার জন্য ক্যানভাস করতে সুভাষবাবুর কাছে যেতে অনুরোধ করেন। আমরা ঐ সন্ধ্যায় এল্গিন রোডের বাড়িতে এসে ওঁনার ভাইপো শ্রীঅরবিন্দ বসুর নিকট জানতে পারি যে সুভাষবাবু মিটিং-এ আছেন, সুতরাং দেখা হবে না। দেখা না করে আমরা যাব না বলে বারান্দায় বসে পড়ি। কিছুক্ষণ পরেই সেই বিখ্যাত মানুষটি খদ্দরের ধুতি আর ফতুয়া গায়ে মৃদু হাসি মুখে আমাদের সামনে এসে আমাদের অভিপ্রায় জানতে চান।

আমরা আমাদের দাবি জানালে উনি বলেন, কংগ্রেসের তালিকা তো ফাইনাল হয়ে গেছে, আমরা আরও পূর্বে এলাম না কেন? আমরা তবু বালক-সুলভ দাবী জানাতে থাকলে, উনি চেষ্টা করবেন বলে আমাদের কথা দেন। নির্বাচনের ফল বার হলে দেখা গেল, আমরা সফল হয়েছি। এই রকম নেতার সংস্পর্শে এলে কার না আনন্দ ও গর্ব হয়।

যাহোক, বহু বিখ্যাত মানুষের স্পর্শ লাগা বাণীদের সেই পবিত্র ও বিখ্যাত 'নয়া-ঘরে' আমরাও কত থেকেছি। আমাদের বিয়ের পর ঐ বাড়িতে গেলে, আমি ও বাণী ঐ 'নয়া-ঘরেই' থাকতাম, যদিও থাকার আরও বহু জায়গা ছিল। ১৯৪২-এর আন্দোলনে ঐ নয়া ঘরেই আত্মগোপন করে নানাভাবে আন্দোলনের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতাম। শহরের মহিলা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখতো বাণী। বাণীর সাহায্য ও নেতৃত্বেই কিশোরগঞ্জে সরযূ বিদ্যানিকেতনে ও হাইস্কুলে হরতাল বা স্ট্রাইক করিয়ে ১৯৪২-এর আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিলাম ঐ 'নয়া-ঘর' থেকেই। এই ঘরে বসেই শত শত পোস্টার লেখা হত এবং রাত্রির অন্ধকারে শহরের দিকে দিকে গোপনে আন্দোলনকারীদের হাতে সেগুলো আমরা পৌঁছে দিতাম। পরের দিন সকালে সারা শহর পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে যেতে দেখে থানার দারোগাবাবুরা মাথা চুলকিয়ে ভাবতে বসতেন। এই পোস্টার লেখায় আমার বন্ধু ও পরে ভগ্নীপতি আঠারবাড়ির রবীন্দ্রনাথ করও খুব সাহায্য করেছে। বাণীর ধনদা অমল আন্দোলন পরিচালনায় থাকতো আর বাণী থাকতো মহিলাদের আন্দোলন পরিচালনায়। আমি থাকতাম একেবারেই অন্ধকারে, বাবা সরকারী চাকুরী করতেন বলে। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীর অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার ময়মনসিংহে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আমার কাছে এলে, ঐ 'নয়া-ঘরে'ই তাঁকে কয়েকদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর একদিন, কিশোরগঞ্জে রেললাইনের তার কাটা গেলে, সেই সময়ের S. D. O.-র কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্কের পরামর্শে আমি কিশোরগঞ্জ থেকে পালিয়ে যাই আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ঢাকা, হামছাদি, তাছপুর ও ময়মনসিংহ ঘুরে, আন্দোলন থেমে গেলে, সেই সময়ের র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায়ের) বই ও পত্রিকা ইত্যাদি বগলদাবা করে কিশোরগঞ্জে ফিরে আসি। ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের ঐ পার্টির নেতাদের সঙ্গে আই বি ডিপার্টমেন্টের কথা কাটাকাটি হয় আমাকে নিয়ে। আই বি-রা বলেন আমি আন্দোলনকারীরা এবং রেললাইনের তার কাটার

ব্যাপারে ছিলাম, আর ঐ নেতারা বলেন আমি তাদেরই কমরেড, পার্টির পরামর্শ মতো, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিশে ভাল ভাল ছেলে রিক্রুট করাই ছিল আমার কাজ। তখন কম্যুনিস্ট পার্টি ও র‍্যাডিকেল পার্টির কমরেডদের অ্যারেস্ট করা হত না। কারণ তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এলাইড্ ফোর্সের সাহায্যকারী ছিল। এইভাবে পুলিশের হাত থেকে বাঁচলেও, অন্যদিকে প্রায় খুনই হতে চলেছিলাম। ময়মনসিংহ জেলে তখন কিশোরগঞ্জের বহু আন্দোলনকারী জেলবাস করছে। তারা প্রায় রোজই আমাকে জেলে দেখবার আশায় থাকত। পরে তাদের কাছে র‍্যাডিকেল পার্টির সঙ্গে আমার মেলামেশার খবর পেঁছায়। তাতে আন্দোলনকারীরা ক্ষেপে গিয়ে আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি দিতে জেলেই একটি সভা করে। ভাগ্যক্রমে ময়মনসিংহের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অমর রায় (আমার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু, বর্তমানে নাকতলার শ্রীগুরু আশ্রমের সেক্রেটারি) ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। আমার চরম শাস্তির বিরুদ্ধে অমর বলে যে "আমি মানিককে খুব ভাল করে জানি, তার বাবা সরকারী চাকুরী করেন বলে, অ্যারেস্ট এড়াতে হয়তো সে ঐ ভেক্ ধরেছে। আমরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।" এতে আমার ফাঁড়া কেটে যায়। অমর জেল থেকে বার হয়ে এলে আমি এই খবর পাই। অন্যদিকে, আমার আর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, ময়মনসিংহের সেরপুরের 'নয় আনির' জমিদার বাড়ির কল্যাণ চৌধুরীও ঐ জেলসভায় ছিল। সে-ও জেল থেকে বার হয়ে এসে আমাকে এই খবর দেয়।

যাক্, আবার পূর্ব কথায় আসি। প্রায় পাশাপাশি আমাদের দুই বাড়ির (বাণীদের ও আমাদের) গুরুজনেরা ও ছেলে-মেয়েরা আন্তরিক মেলামেশায় সুখে-দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। আমি যখন নবম এবং দশম শ্রেণীতে পড়ি তখন নানান খেলাধুলোয় বিশেষ করে ফুটবলে বেশ নামি-দামী হয়ে গেছি। স্থানীয় বা বাইরের ক্লাবটীম আমাকে বাইরে খেলতে নিয়ে যেত। কিশোরগঞ্জের একজন খুব জনপ্রিয় এস. ডি. ও. ৺পি. কে. ভট্টাচার্য মহাশয় একবার ময়মনসিংহ জেলা শহরে আই. সি. এস. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর মহকুমার স্কুলের একটি ছোট ছেলের খেলা দেখাতে বাবাকে অনুরোধ করে আমাকে ময়মনসিংহের সদরে নিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বে উক্ত "কোরিনথিয়ান্স" টীম কিশোরগঞ্জে খেলতে এলে, কিশোরগঞ্জ এগার জনের টীমে আমিও নির্বাচিত হয়েছিলাম, কিন্তু আমার বয়স তখন মাত্র ১৪।১৫। এই জন্য "কোরিনথিয়ান্স" টীমের ছয় ফুট, সাড়ে ছয় ফুট

লম্বা দৈত্যের মত চেহারার সব সাহেবদের বিরুদ্ধে খেলতে বাবা কিছুতেই মত না দেয়ায়, আমাকে রিজার্ভ লিস্টে রাখা হয়েছিল।

ধীরে ধীরে দিন কেটে যাচ্ছে, আমরাও সব কৈশোর ডিঙ্গিয়ে যৌবনের দিকে পা বাড়াচ্ছি। পাড়ার লোক বলত, মানিক খেলাধুলোয় ভাল হলেও প্রচণ্ড বাঁদর, স্কুলের পণ্ডিতমশাই আমাকে নাম দিয়েছিলেন "Without tail"। পাড়ার যাঁরা ছেলেপিলেদের বাঁদরামি পছন্দ করতেন না, তাঁরা আমার উপর বেশ বিরক্ত ছিলেন। কেন জানিনা, রাতের অন্ধকারে টিনের চালে ঢিল মেরে আওয়াজ তুলতে এবং তৎজনিত কারণে, সেই সব বাড়ির লোকজনের হৈ চৈ শুনে আমি খুব আনন্দ পেতাম। রথের মেলা থেকে বিকট ও ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষুসে মুখোস কিনে এনে, বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাতের অন্ধকারে, পাড়ার নির্জন পথে ঘাটে, বিশেষত বাঁশঝাড়ের তলায়, বা কোন কোন বাড়ির বৈঠকখানায়, শোবার ঘরে বা রান্না ঘরে, ঐ মুখোস দেখে অনেকের কাপড়চোপড় নষ্ট হত। কিন্তু কোনদিন কেউ আমাকে হাতেনাতে ধরতে পারত না। এ ব্যাপারে আমার সামান্য কয়েকজন খুব বিশ্বাসী শিষ্য-সামন্ত ছিল। আমার প্রতি সন্দেহ দূরীকরণের জন্য, মাঝে মাঝে যে বাড়ি আক্রান্ত হবে, পূর্বেই সেই বাড়িতে যেয়ে গল্প করতে বসতাম, আর একটু পরেই সে বাড়িতে হয় ঢিল পড়ত অথবা মুখোসের আবির্ভাব হত। এতে আমার প্রতি অনেকের সন্দেহ-ই কেটে যেত।

কিশোরগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি প্রয়াত হেম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এতো খেলাধুলো, নাটক-থিয়েটার, গান-বাজনা ও নানান রকমের দুষ্টুমি করেও যখন ১৯৩৮ সালে কলকাতা ইউনিভারসিটির ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় ভাল করে প্রথম বিভাগে পাশ করলাম, তখন ঐ হেমবাবু একটা কাগজে আমাকে লিস্ট করে আট-নটা বাড়িতে, যাঁরা আমার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, প্রথমেই যেয়ে তাঁদের প্রণাম করে আসতে বললেন। ঐ প্রণাম করার সময় ঐ সব বাড়ির মানুষের মুখের হাবভাব আমার খুবই আনন্দের খোরাক হয়েছিল। অন্যদিকে আজিমুদ্দিন স্কুলের সে সময়ের হেডমাস্টার প্রয়াত মহেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একেবারে আমাদের বাড়িতে এসে আমার বাবার সম্মুখেই আনন্দাশ্রু সহ যখন আমাকে জড়িয়ে অন্যান্য লোকের উপস্থিতিতেই বললেন যে, "মানিক খেলার জন্য আমাদের স্কুলের গর্ব ছিল ঠিক-ই, কিন্তু সে যে হাই-ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেও আমাদের মুখোজ্জ্বল করবে, সেটা ধারণাও করতে পারিনি। তাছাড়া, গত দু'বছর প্রতি সপ্তাহে, সে নিজের কাঁধে

মুষ্টি ভিক্ষার চালের বস্তা বয়ে এখানের রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম প্রতিষ্ঠায় আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছে, তাও আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।" ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসে, উনি যতদূর মনে পড়ে বেলুড় মঠ থেকে আগত প্রয়াত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে বিশেষভাবে আমাকে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। যাহোক ওঁনার ঐ সব সারটিফিকেটে পাড়ায় আমার দুষ্টুমিজনিত বিরক্তি অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। স্কুল জীবনে আমি তিনটে স্কুলে পড়েছি। কিন্তু উক্ত হেডমাস্টার প্রয়াত মহেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের মত স্নেহপ্রবণ ও হৃদয়বান মানুষ আর কোথাও পাইনি। ওঁনার স্নেহ-ভালবাসার সেই পুরানো সব স্মৃতি নিয়ে একটা বড় অনুচ্ছেদ-ই লিখে ফেলা যায়।

ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে ময়মনসিংহ বা ঢাকায় পড়তে না যেয়ে পড়তে এলাম কলকাতায়। কেউ জানত না যে এর মধ্যেই গোপনে তৎকালীন সিনেমা জগতের পথিকৃৎ, পরিচালক, আলোকশিল্পী ও নায়ক প্রয়াত প্রমথেশ বড়ুয়া মহাশয়ের সঙ্গে আমার চিঠির আদান-প্রদান হতো। কলকাতায় পড়তে আসার আমার এটাই কারণ। ভবানীপুরে মামার বাসায় থেকে আশুতোষ কলেজে পড়তাম ও কলেজের ফুটবল টীমে খেলতাম। এই সময়ে সিনেমা জগতের অনেকের সংস্পর্শে এসে, এই জগতের কালো কুৎসিত দিকটা আমার চোখে পড়ে এবং মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তবু শুধু জেদ বজায় রাখতে আনোয়ার-সা রোডের ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে প্রয়াত প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় "পরশমণি" ছবিতে একটি কোরাস গানে এবং এর নায়ক প্রয়াত দুর্গাদাস ব্যানার্জী ও নায়িকা জ্যোৎস্না গুপ্তার সঙ্গে দু-চার কথার ডায়োলগ্ সমেত একটা ছোট রোল পাই। এই বই-এর সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত সুরকার, ৺হিমাংশু সুর-সাগর। আমাদের গানের রিহার্সাল রুমে এই মানুষটির খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতুল্য মানুষ। আজও তাঁর সেই সুন্দর মুখখানি চোখে ভাসে। সুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে, নায়ক দুর্গাদাস ব্যানার্জী আমাদের দুতিনজনকে রিহার্সাল রুমে ডেকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে রিহার্সাল দিতেন আর ভুল সংশোধন করে দিতেন। তখনকার দিনে অমন সুন্দর ও সুপুরুষ ও ভরাট গলার নায়ক কি স্টেজে কি সিনেমা জগতে আর কেউ ছিল না। উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমরা গর্ববোধ করতাম।

এই ছবির অর্ধেক শেষ করে, একদিন ভুল করে মুখের মেক্ আপের রং না

ধুয়ে বেশি রাতে বাসায় ফিরে, মামার কাছে ধরা পড়ে যাই। আমার সিনেমা জগৎও এইখানেই খতম হয়ে যায়।

আই-এ পাশ করে, বাবার জোরাজুরিতে ঢাকার আসানুল্লা স্কুলে চার বছরের *এনজিনীয়ারিং কোর্স পড়তে যাই।* একমাস পরেই বুঝলাম আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি আসানুল্লা স্কুল ফুটবল-টীমে খেলতাম আর ঢাকার বাইরে *ওখানকার বিখ্যাত "ভিকটোরিয়া" ক্লাবেও খেলতাম।*

আসানুল্লা স্কুলে যখন পড়বই না বলে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম অথচ বাবাকে সেকথা জানাতে পারব না, তখন প্রায় এগার মাস যা খুশী তাই করে বেড়াতাম। এ সময়ে আমার জীবনে বহু ঘটনা ঘটে। যে সব লিখতে গেলে, বর্তমান বিষয়ের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, তাই বিরত থেকে, শুধু মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আসানুল্লার ছাত্র হিসাবেই ঢাকার প্রয়াত ডাকসাইটে ও সুভাষ বোসের স্নেহধন্যা বি ভি. পার্টির বিপ্লবী নেত্রী প্রয়াতা লীলা রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর বাড়িতে। রাজনৈতিক অনেক শিক্ষাই তাঁর কাছে পেয়েছিলাম। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা আমি খুব কমই দেখেছি। আমাদের হামছাদি গ্রামের পাশে বারদী ছিল ওঁনার দেশ। লীলা নাগ, পরে বিপ্লবী ৺অনিল রায়কে বিয়ে করে লীলা রায় হন। বেশ কয়েকবছর পূর্বে, কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে বহুদিন রোগশয্যায় কষ্ট পেয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। হয়তো এখবর অনেকেই জানেন।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো, আসানুল্লা মেস্ হোস্টেলে ১৯৪০ সালে আমি ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে, বন্ধু ও সহপাঠীরা আমাকে এক সন্ধ্যায় মিড্ফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসে। সেই রাতেই ১৯৪০ সালের ঢাকার কুখ্যাত হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হয়। সেই রাতে তো আমার প্রায় জ্ঞানই ছিল না। পরের দিন সকালে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি আমার বেডের দুই পাশেই এবং অন্যান্য বেডেরও উভয় পাশের ফ্লোরে, গুলিতে বা ছুরিতে আহত মানুষ কাতারে কাতারে শুয়ে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দ্বিতীয় রাতে চারদিকে শহরের বাড়ি-ঘর আগুনে জ্বলতে দেখে একটি ডিউটিরত নেপালী নার্স আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে সেই দৃশ্য দেখায় এবং ভয়ে কাঁপতে থাকে। আমি-ই তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিই। প্রত্যেক দিন কত রকমের আহত রুগী যে আমাদের ওয়ার্ডে আসতে লাগল তার আর শেষ নেই, আর প্রত্যেক রাতেই দেখলাম শহরের চারদিকে ঘরবাড়ি পোড়ার আগুন। পরে জেনেছিলাম, হামছাদি গ্রাম

থেকে আমার জেঠামশাই আর কিশোরগঞ্জ থেকে বাবা টেলিগ্রাম পেয়ে আমায় দেখতে এসেও দাঙ্গার জন্য হাসপাতালে পৌঁছুতে না পেরে ফিরে যান। অন্য-দিকে চারদিনের পর আমি সুস্থ হয়ে গেলে হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে ডিস্‌চার্জ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু ডাক্তার ও ছাত্র, আমাকে আসানুল্লা ফুটবল-টীমের নামজাদা খেলোয়াড় বলে আমার বেডেই থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন, এবং ঐ ওয়ার্ডের দুজন নার্সকে আমার খাবারের দিকটাও দেখতে বলেন। দাঙ্গার কারণে আমাকে আরও চার/পাঁচ দিন বাধ্য হয়ে মিড্‌ফোর্ডে থাকতে হয়। সহপাঠীরা আমার জামা কাপড় দিয়ে যেতে পারছে না। ঐ সময় একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স শ্রীমতি সুসান ডিয়াজ ও একটি বাঙালী নার্স শ্রীমতি প্রিয় রায় আমায় অসীম দুর্গতি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা তাঁদের শাড়ী আমাকে লুঙ্গির মতন করে পরতে দিয়ে, আমার জামা-কাপড় একদিনেই পরিষ্কার করে দিয়ে যেতেন এবং তাদের মেস বা হোস্টেল থেকে আমার খাবার পাঠাতেন। তাদের এই উপকারের কথা আমি এই সত্তর বছর বয়সেও ভুলতে পারিনি। জানি না, সেই সুন্দরী ও স্নেহময়ী শ্রীমতি সুসান ডিয়াজ আজ কোথায় আছেন। শ্রীমতি প্রিয় রায় দেশ ভাগের পর হারিয়ে যেয়েও, অবসর নিয়ে, হুগলীর কোন্নগরে বাড়ি করে এখন ওখানেই আছেন এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

তখন বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের খুব অপ্রিয় আর হিন্দুদের খুব প্রিয় I. C. S. শ্রী রণজিৎ রায় ঢাকার A. D. M ছিলেন এবং দাঙ্গায় খুব জোরালো ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করায়, তাঁকে টেলিগ্রামে বদলী করে দেয়া হয়। একদিন সকাল ৯টায় উনি কয়েক বস্তা, লুটের বেওয়ারিশ চিনির বস্তা হাসপাতালে জমা দিতে এলে, আমি তাঁকে আমার অসহায় অবস্থার কথা বলে, আমাকে আসানুল্লার মেন্‌ হোস্টেলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করি, উনি চেষ্টা করবেন বলে চলে যান। পরের দিন সকাল ৯টায় চারজন বন্দুকধারী পুলিশ একটা ঘোড়ার গাড়ী করে হাসপাতালে এসে আমার হাতে কিশোরগঞ্জের 'বকুল-তলার' জীতু রায় মহাশয়ের একখানি চিঠি দেয়। জীতুদা তখন ঢাকার লালবাগ থানার ও. সি.। সেই ঘোড়ার গাড়ীতে ওঁনার থানা-কোয়ার্টারে যেয়ে স্নান-খাওয়া সেরে সেই দিনই আবার আমি পুলিশ এসকর্টে আমার হোস্টেলে ফিরে আসি। ঐ জীতুদা ও তাঁর ছোট ভাই অনিল রায় (আমার সহপাঠী) এখন পশ্চিম পুটিয়ারীতে বাড়ি করে আছেন। জীতুদা বছর খানেক পূর্বে মারা গেছেন, অনিল বর্তমানে প্রায় চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় তার বাড়িতে আছে। মাঝে মাঝে

তাকে দেখতে যাই। এঁরা ছিল কিশোরগঞ্জের ছোট খাটো তালুকদার। সদর রাস্তার উপর পাকা সুন্দর পুকুর-ঘাট সমেত ও বাগান ঘেরা বাড়ির মালিক। পুকুর ঘাটের উপর বৃহৎ ও প্রাচীন একটা বকুল গাছ এখনও আছে।

উক্ত I. C. S. রয়েল বেঙ্গল টাইগার শ্রী রণজিৎ রায় সম্বন্ধে আরও একটা ঘটনা উল্লেখ না করলে বোধ হয় ঠিক হবে না। ১৯৭০-৭১ সালে নকসাল আন্দোলনের সময় শ্রীরায় শান্তিনিকেতনে বা শ্রীনিকেতনে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। একদিন ভোরে নকসাল বলে কথিত কয়েকটি যুবক ওঁনার বাড়িতে যেয়ে ওঁনার রিভলবারটি তাদের দিয়ে দিতে দাবি করে। যুবকদের বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বলে উনি বাড়ির ভেতর থেকে রিভলবারটি নিয়ে আসার কথা বলে, বৈঠকখানায় ফিরে এসেই একটি যুবককে সোজাসুজি গুলি করে মেরে ফেলেন, অন্য যুবকরা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

ঢাকা শহরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা না লিখলে বোধ হয় ঠিক হবে না, অথচ সেটা লিখতে যেয়ে আবার কলকাতায় পিছিয়ে যেতে বা ফ্লাশব্যাক করতে হচ্ছে। 'আসানুল্লায়' পড়তে যাবার পূর্বে যখন ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজে পড়তাম, তখন ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখার জন্য প্রয়াত ওস্তাদ সুখেন্দু গোস্বামীর কাছে 'নাড়া' বেঁধেছিলাম। ফুটবল ও ক্ল্যাসিক্যাল গান এক সঙ্গে চালাতে গিয়ে গোস্বামী মহাশয়ের কাছে প্রায়ই ধমক খেতাম। বলতেন দু নৌকোয় পা দিয়ে চলতে পারবে না। একটা ছাড়ো। কিন্তু আমি কোনটাই ছাড়তে পারতাম না। অবশ্য কলকাতা ছেড়ে ১৯৪০ সালে ঢাকার 'আসানুল্লা' স্কুলে যেতেই ওস্তাদের অভাবে আমার ক্ল্যাসিক্যাল গানের ইতি হয়ে যায়। তবে যে দুবছর গোস্বামী মহাশয়ের সংস্পর্শে ছিলাম, তাতে লাভ ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল অনেক। অবসর জীবন কাটাবার জন্য উনি নাকতলায় বাড়ি করেছিলেন এবং ঐ বাড়ি তৈরীর দেখাশুনা করার যাতায়াতের পথে, আমার বর্তমান বাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দুবার এসেছিলেন। যা হোক, ১৯৩৮-৪০ সালে ভবানীপুর ও কালীঘাটের ওঁনার সব ভাড়াটে বাড়িতেই আমি শিক্ষা গ্রহণ করতে যেতাম এবং প্রায় প্রতি রবিবার সকালেই তাঁর ঐ সব বাড়িতে নানান গুণীজনের আবির্ভাব হত, যাঁদের অনেকের সঙ্গে সুখেনদার প্রিয় ছাত্র ও দেশের লোক বলে আমারও বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। যেমন প্রয়াত তারাপদ চক্রবর্তী (নাকু বাবু), সুধীরলাল চক্রবর্তী, দেবেশ বাগচি, রথীন গাঙ্গুলী, হীরু গাঙ্গুলীর ছাত্র তবলিয়া মাস্টার ফুলু, পাহাড়ি সান্যাল, বিখ্যাত গীতিকার প্রয়াত অজয় ভট্টাচার্য ইত্যাদি।

সুধীরদা তো সুখেনদার বাসায় বেশ কয়েক মাস ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডাও দিতাম। ঐ সব বাড়িতে তখনকার দিনের কয়েকটি হিট্ করা আধুনিক গানের সৃষ্টিও দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, যেমন সুধীর লালের "রজনী গো যেওনা চলে" "চেয়েছিনু, জোছনা কৃষ্ণা রাতে", সুখেনদার "মরমের গীতি গাঁথা" ইত্যাদি। সুখেনদার প্রিয় ছিলাম বলে, উনি আমায় বড় বড় আসরেও, ওঁনার তানপুরাটা আমার কাঁধে চাপিয়ে, ঢুকিয়ে দিতেন। ঐ সুযোগে কলকাতার বহু বিখ্যাত বাড়িতে, প্রবেশ করে সে সময়ের বিখ্যাত গায়কদের গান কাছে বসেই শোনার সুযোগ হয়েছিল, যেমন প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীনদেব বর্মন ইত্যাদির। "পৃথিবী আমারে চায়" ওই বিখ্যাত হিট্ করা গানের গায়ক প্রয়াত সত্য চৌধুরী সে সময় আশুতোষ কলেজের চতুর্থ বর্ষে পড়তেন, আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। কারণ, কলেজের সোসাল ফাংসানে আমি বিনা খরচায় সুখেনদাকে নিয়ে আসতাম। পরে সত্য চৌধুরীর সঙ্গে আত্মীয়তাও হয়েছিল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে প্রয়াত অখিল বন্ধু ঘোষের কথাও না লিখে পারছি না। সে ছিল আমার কৈশোরের বন্ধু। ১৯৩৪ সালে ভবানীপুরের গোয়ালটুলি (বর্তমানে টার্ফ) রোডে থাকতো। আমি ওকে 'যেদো' বলেই ডাকতাম। আর সংলগ্ন শাঁখারী পাড়া রোডে আমার মামার দোতলা বাসাবাড়ির ছাদে বসে গলাগলি করে "তব চরণতলে হৃদয় আমার", "ঝরা ফুল দলে কে অতিথি" ইত্যাদি গান গাইতাম। তার সঙ্গে বরাবরই মোটামুটি যোগাযোগ ছিল।

এই সময়েই সুখেনদার বাসায়, হাস্য-কৌতুক অভিনেতা রমনী ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়। ১৯৪০-এ আমি যখন আসানুল্লা স্কুলের মেন হোস্টেলে ছিলাম তখন রমনীদার একখানা চিঠি পাই যে সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণকারী বিখ্যাত রামনাথ বিশ্বাসকে নিয়ে লেক্চার টুরে তিনি অমুক তারিখে ঢাকা (ফুলবাইরা) রেলস্টেশনে পেঁছুবেন। ঢাকার বহু ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান রামনাথকে তাদের অতিথি করে নিয়ে যেতে ঢাকা স্টেশনে সেদিন উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু আমি যদি তাদেরকে চারদিন আমাদের হোস্টেলে অতিথি করে রাখতে চাই, তবে ঐ সম্মান উনি আমাকেই দেবেন।

আমি হোস্টেলের প্রথম বর্ষের সহপাঠী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে এবং হোস্টেল সুপার শ্রী কে. পি আর. মিত্র অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে ফুলের মালা ও বেশ বড় দলবল নিয়ে ঢাকা স্টেশনে উপস্থিত থেকে বহু ক্লাব ও

প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নাকের ডগার উপর দিয়ে রমণীদা ও রামনাথ বিশ্বাসকে অতিথি করে তিনখানা ঘোড়ার গাড়ীর মিছিল করে আমাদের হোস্টেলে নিয়ে এলাম। ঢাকা স্টেশনে অনেকেই রামনাথ বিশ্বাসের গলায় মালা পরাতে গেলে উনি কারুর মালাই গ্রহণ না করে বলেছিলেন, "আমার মতো ভ্যাগাবণ্ডকে মালা না পরিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জেল খাটছেন, অত্যাচারিত হচ্ছেন, তাদের গলায় এ মালা দিন।" এ ব্যাপারে যে সহপাঠী বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করেছিল, তাদের একজন চট্টগ্রামের জীনাপদ বড়ুয়া এখন শিবপুরে (হাওড়া) থাকে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা হয়। আর একজন ফরিদপুরের সুনীল বসু রায়চৌধুরী এখন কোথায় আছে জানি না।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণকারী এবং যতদূর জানি ভারতবর্ষের রামনাথ বিশ্বাসই প্রথম, তখন "মরণবিজয়ী চীন" বইখানা লিখে ফেলেছেন। বড়ই সুন্দর লিখেছিলেন এবং বহু কপিও হু হু করে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। বইখানা, এই পরিচয়ের পূর্বেই আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে মাউ সে তুং ক্ষমতায় এলে ভেবে দেখেছিলাম যে "মরণবিজয়ী চীনের" বহু কথা ও ভবিষ্যৎ-বাণীই মিলে গিয়েছিল। উনি কামাল আতাতুর্কের তুরস্ক নিয়ে একখানা এবং আরও বেশ কয়েকখানা বই লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বইগুলো পড়ার সুযোগ আমার হয়নি।

উনি প্রায় প্রত্যহই, জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ইত্যাদিতে বিকেলে লেকচার ট্যুরে বার হয়ে যেতেন। আর রাত্রি সাড়ে নটার মধ্যে ফিরে আসতেন। এই জন্যে সকালের দিকে আমার ঘরে আমাদের অনেককে নিয়েই ওঁনার আড্ডা বসত। সে সময় ওঁনার লেখা বা বইয়ের বাইরেরও বহু অভিজ্ঞতার কথা উনি আমাদের বলেছিলেন। আজ আর সব মনে নেই। যা-ও বা আছে, তা-ও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে লেখা থেকে বিরত থাকতে হল।

আমাদের হোস্টেলের মেন্ গেট রাত্রি সাড়ে নটায় বন্ধ হয়ে যেত। চাবি জমা পড়ত হোস্টেল সুপারের কাছে। এই জন্য রমণীদাকে আমার বলা ছিল, কোন কারণেই যেন তাঁরা ফিরতে বিলম্ব না করেন। একদিন, ঢাকা বা জগন্নাথ হল থেকে ফেরার পথে একটু বিলম্ব হয়ে গেলে, ঘোড়ার গাড়ীর ভেতর থেকে হাস্যরসিক রমণীদা গাড়ীর "কাচ্‌ম্যান* বা কচুয়ানকে বারে বারেই বলছিলেন,

---

* ঢাকার এই কোচ্‌ম্যানরা 'কুট্টি' সম্প্রদায়ভুক্ত বলে পরিচিত।

"আরে ভাই পঙ্খীরাজ চালাও, পঙ্খীরাজ চালাও, দেরি অইয়া গেল।" কচুয়ান মাঝ পথে হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে বেশ ধীরে সুস্থে তার জায়গা থেকে নেমে এসে, গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে রমণীদাকে বলে, "মহারাজ! মোটর গাড়ীতে চড়ছেন নাকি?" রমণীদা তখন হাত জোড় করে বাবারে-ধনরে ইত্যাদি বলাতে গাড়ী সামান্য জোরে চালিয়ে আমাদের হোস্টেলগেটে দশ-মিনিট বিলম্বে, মানে রাত্রি ৯-৫০-এ পৌঁছায়। আমি তখন নিজের দায়িত্বে দারোয়ানের হাত থেকে চাবি নিজের হাতে নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে। পরে গেট বন্ধ করিয়ে দারোয়ানকে নিয়ে সুপারের হাতে চাবি দিয়ে আসি। সুপার আমাকে খুব ভালবাসতেন বলে কোন গোলমাল হয়নি।

খেতে বসে রমণীদা কচুয়ানের কাহিনী বললে, আমরা বলি, "ঘোড়ার গাড়ী গেটে থাকতেই কথাটা বললে, ওকে ভাল করে ইয়ারকী মারা শিখিয়ে দিতাম।"

এই প্রসঙ্গে রমণীদা আমাদের একটি নতুন শিক্ষা দেন। উনি বললেন, "এইটে তোমাদের একটা মস্ত বড় ভুল। ঢাকার এই কুট্টিদের রেডি উইট্ সত্যই বড় সুন্দর জিনিষ এবং উপভোগ করার মতো। বাংলা দেশের আর কোথাও এটা পাবে না। ওদের এরকম 'উইটি' বহু কথাই সারা বাংলা দেশে গপ্পের খোরাক। আজ আমি যে তাদের কাছে নতুন একটা উইটি কথা শুনলাম, তাতে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করছি।" এই কথায় আমাদেরও মনের এতো পরিবর্তন হয়েছিল যে পরে আর ওদের ঐ সব কথায় আমরা কোন দিন রাগ বা ঝগড়া করিনি, উপভোগই করেছি।

লোভ সামলাতে না পেরে বিশ্বাস মশাই-এর 'কাবুল' ভ্রমণের একটা অতি হাস্যকর ঘটনা খুবই ছোট করে বলছি। ওখানের এক কাবুলিওয়ালা রামনাথ বিশ্বাসকে বাঙ্গালী বলে চিনতে পেরে, অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে কাবুলিওয়ালার স্ত্রী তার বোরখা খুলে নিজের মুখ দেখিয়ে বিশ্বাস মশাইকে বিশুদ্ধ বাংলায় বলে যে দেখুন তো আমায় চিনতে পারেন কিনা? মনে হয় উনি বাঙ্গালী মেয়ে, বিশ্বাস মশাই একথা জানালে, বৌটি বলে যে সে সত্যি বাঙ্গালী, বাংলাদেশে ঐ কাবুলিওয়ালাকে ভালবেসে কাবুলে এসে তাকে বিয়ে করে, সে-ও এখন কাবুলিওয়ালী বনে গেছে। তার নাম 'লক্ষ্মী'। ওদিকে তখন কাবুলিওয়ালা বিশ্বাস মশাইকে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখিয়ে, আভি তো বাংলা মুলুক্‌কা সব আদমী হামারা শ্যালা হ্যায়'। পরে শুনেছি, যে ওঁনার কোন বই-এ এই ঘটনা বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে।

নীচে, রামনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের একটা কার্ডের কপি দিলাম। ঢাকা ছেড়ে যাবার পূর্বে আমার হাতে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যদি তোমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তবে এই কার্ডখানা আমায় দেখালেই বুঝব, তুমি আমার খুবই অন্তরঙ্গ। কিন্তু 'সাক্ষাৎ' আর হয়নি।

RAMNATH BISWAS, World Tourist
Round Five Continents on Push Bike.
Starting from Singapore on July 7th, 1931,
I have travelled through :

Malaya, Siam, Indo-China, China, Korea, Japan, Philiphine Islands, Bali, Java, Hindusthan, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Lavant, Turkey, Bulgaria, Jogoslavia, Hungary, Austria, Czechoslovakia. Germany, Holland, Belgium, France, Great Britain, British, East Africa, (Kenya, Uganda, Tanganyika), Nyasaland, North and South Rhodesia, Portuguese East-Africa, South Africa (Transval, Natal, Cape Province), South West Canada, United States of America.

I wish to travel rest of the World.

Ramnath Biswas.

আরও একটা ঘটনা এই যে ঐ আসানুল্লা স্কুলে পড়ার সময়েই, ১৯৩৯ সালে জগদ্বিখ্যাত নৃত্য-বিশারদ প্রয়াত উদয়শঙ্কর তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকার সদর ঘাটে "মুকুল" সিনেমা হলে তাঁর প্রদর্শনী করতে আসেন। এক রাতে কয়েকজন সহপাঠী সহ এই নৃত্য-প্রদর্শনী দেখতে যাই। উদয়শঙ্করের সঙ্গে তখন ছিলেন, বিখ্যাত নৃত্যপটিয়সী 'সিমকী' আর উজারা, জোহারা ও অনেকটা একস্ট্রা মতন অমলা নন্দী (পরে শঙ্কর) ও উদয় শঙ্করের ভ্রাতা রবিশঙ্কর ঐ একস্ট্রা মতন নাচের জন্য (এখন অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত সেতারী)। আরও যতদূর মনে পড়ে সুর-শিল্পী তিমিরবরণ ও বিশ্ববিখ্যাত সরোদ বাদক আলাউদ্দিন সাহেব। উদয়শঙ্কর-সিমকীর কথা কি আর লিখব! ঐ নৃত্যের পরিবেশনা, আবেগ ও স্টাইল ইত্যাদি পূর্বে ও পরে, আজও কোথাও দেখিনি বা তার কাছাকাছিও কিছুই কোথাও দেখিনি। উদয়শঙ্কর ও সিমকীকে দেখে মনে হয়েছিল, এরা যেন ঈশ্বর-প্রেরিত জুটি যার দ্বিতীয় আর কিছু হতে পারে না।

দর্শকদের দাবীতে বৃদ্ধ আলাউদ্দিন সাহেবকেও কিছুক্ষণের জন্য শুধু

সরোদ বাজাতে হয়েছিল। বাজনা শুনে সত্যিই মনে হচ্ছিল যে ওর আঙ্গুলে বুঝি যাদুকরী কোন মেশিন লাগানো। একবার সরোদের তার ছিঁড়ে গেলে, মেয়ে অন্নপূর্ণা উইকংসের ভেতর থেকে পিতাকে যখন সরোদের তার দিতে এলেন, আমরা সকলেই দেখলাম, সত্যিকারের অন্নপূর্ণাই বুঝি মঞ্চে আবির্ভূতা হয়েছেন।

বহুদিন পরে জেনেছিলাম উদয়শঙ্কর অমলা নন্দিকেই বিয়ে করেছিলেন (এই অমলা আমাদের সময়ে আশুতোষ কলেজে পড়ে বলেই জানতাম)! বোধ হয় ১৯৩৯-৬০ সালে, অফিসের একটা সার্ভের কাজে বার হয়ে গলফক্লাব রোডের একটা বাড়িতে উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্করকে পেয়েছিলাম। তাঁদের তখনকার অবস্থা ও ঢাকায় ১৯৩৯ সালের তাঁদের গ্ল্যামারের কথা তুলনা করে মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলাম। তারও বহুদিন পরে যখন উদয়শঙ্করের মহা-প্রয়াণ হল তখন, খবরের কাগজে ছোট্ট একটি খবর পড়ে চোখের জল আটকে রাখতে পারিনি আমার এই পরিণত বয়সেও। খবরটা এই রকম যে, লণ্ডনে 'উজারা' কি 'জোহারা' সিম্‌কীর লণ্ডনের বাড়িতে টেলিফোন করলে, কোন পরিচারিকা তাকে জানায় যে সিম্‌কী বাড়ি নেই। উজারা বা জোহারা নিজের নাম উল্লেখ করে বিশেষ করে অনুরোধ করলে খানিকক্ষণ পরে এসে সিম্‌কী টেলিফোন ধরলে, উজারা বা জোহারা উদয়শঙ্করের মৃত্যু সংবাদ জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে শুধু "জানি" এইটুকুই বলে সিম্‌কী রিসিভার রেখে দেন। ঐ খবর থেকে জানতে পারি যে অমলাশঙ্করের বিয়ের পর থেকেই নাকি সিম্‌কী Secluded (নিভৃত, নির্জন) জীবন যাপন করে আসছেন। হয়তো এইজন্যই আমরা দীর্ঘদিন সিম্‌কীর কোনও খবর পাইনি। আর তাই মাঝে মাঝেই আমাদের মনে হত, অমন একজন সুন্দরী ও নৃত্যপটিয়সী শিল্পী হঠাৎ একেবারে কোথায় উবে গেল।

আলাউদ্দিন সাহেবের কন্যা অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করেছিলেন বিখ্যাত সেতারী রবিশঙ্কর। ১৯৩৯ সালে কিছুদিন বম্বে ছিলাম। সেখানের কোনও খবরের কাগজে ছোট্ট একটা খবর পড়েও বড় ব্যথা পেয়েছিলাম এই জন্য যে, সেই আমাদের ঢাকার দেখা সত্যিকারের অন্নপূর্ণা বম্বের একটা বাড়িতে তখন সিম্‌কীর মতোই secluded (নির্জন) জীবন যাপন করছেন।

১৯৬০ সালে বম্বের 'মালাড্' অঞ্চলে এই সময় ছোট পুত্র টুসুনের ফ্লাটে তিন মাসের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম আমি ও স্ত্রী বাণী। বার্দ্ধক্যের বৈকালিক ভ্রমণের জন্য ওদের ফ্লাটের দক্ষিণে 'সুন্দরনগর' নামে একটি ফাঁকা জায়গার খবর

টুসনু আমাকে দিয়েছিল। যে সব রাস্তা দিয়ে আমি এবং মাঝে মাঝে বাণীও ঐ দিকে বেড়াতে যেতাম, তার প্রথমটার নামই ছিল 'পান্নালাল বসু মার্গ'। ভারত বিখ্যাত এই বাঁশী বাদকের উত্থান এই কলকাতা থেকেই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত সুখেন্দু গোস্বামীর বাড়িতে প্রতি রবিবাসরীয় আসরে অনেক গুণীজনের সঙ্গে এই পান্নালাল বসুও মাঝে মাঝে আসতেন। প্রয়াত পাহাড়ী সান্যাল ও তাঁর স্ত্রী মীরা সান্যালের রাসবিহারী এভেন্যুর বাসায়, মনে হয় তাঁদের বিবাহ-বার্ষিকী বা ঐ রকম কোনও অনুষ্ঠানে, ১৯৩৯ সালের এক সকালে, সুখেনদার সহায়তায় আমার যাবার সুযোগ ঘটে যায়। সেই সকালের গানের আসরের মধ্যমণি ছিলেন, প্রয়াত তারাপদ চক্রবর্তী (নাকুবাবু)। তাঁর দুপাশে দু'টো তানপুরা নিয়ে বসেছিলেন প্রয়াত সুখেনদা ও সুধীরলাল চক্রবর্তী। নাকুবাবু বেলা ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্য্যন্ত সেদিন প্রায় একটানা গেয়ে চলেছিলেন, তবু মাঝে মাঝে চা, সিঙ্গাড়া ও সিগারেট খেতে যে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই ফাঁকে ফাঁকে রাগিনীর রেস রাখার জন্য সুখেনদা ও সুধীরলাল 'ধুঁয়ো ধরছিলেন। প্রয়াত ভারতবিখ্যাত তবলীয়া হীরু গাঙ্গুলীর ছাত্র মাস্টার ফুলু ছিলেন তবলায়, হারমোনিয়ামে ভবানীপুরের বিখ্যাত মন্টুবাবু (উপাধি বোধহয় ব্যানার্জী) আর বাঁশী বাজাচ্ছিলেন এই পান্নালাল বসু। জীবনে বহু গানের আসরে প্রবেশের সুযোগ আমার এসেছে, কিন্তু সেদিনের মতো এমন মাতোয়ারা কোনদিন হইনি। নাকুদা বা পান্নালাল বাবুকেও এমন মন মাতানো গান আর বাঁশী বাজাতে আর কোনদিন শুনিনি। শেষরাতের ফিঁকে আঁধার কেটে যেয়ে যেমন ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, সেদিন বেলা একটায় আসর ভেঙে গেলেও অন্তত পাঁচ সাত মিনিট লেগেছিল কলকাতার বাস্তব পরিবেশে আমাদের ফিরে আসতে! এর কিছুদিন পরই প্রয়াত হিমাংশু রায়-এর আহ্বানে পান্নালাল বসু বম্বে টকিজে চলে যান এবং কাজের সুবিধার জন্য বম্বে টকিজ স্টুডিওর খুব নিকটেই মালাডে থাকতে আরম্ভ করেন। মালাডের ছোট ছেলের ফ্লাট থেকে বার হয়েই পান্নালাল বসু মার্গে পড়তে হত, আর ঐ মার্গের উপরই ছিল তাঁর বাড়ি। তাঁর ওয়ারিশানরা তখন ঐ বাড়িতেই থাকেন বলে শুনেছি। সুদূর বম্বেতে বাঙ্গালী শিল্পীর নামে রাস্তা বা মার্গ দিয়ে চলাফেরা করতে কেমন যেন একটা আনন্দ বোধ করতাম।

ঐ রাস্তা দিয়ে অল্প খানিকটা যেয়ে ডান দিকে বাঁক ঘুরেই বাজার হাটের কিছুটা ঘিঞ্জি অঞ্চল পার হয়ে গেলেই বাঁ দিকে পড়তো বম্বে টকিজ স্টুডিও। এখন

অনেকটা 'হানাবাড়ির' মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখানে পৌঁছুলেই আমার মন গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠতো, "মেরে বুলবুল শো রহ্যা হ্যায়," আর "ম্যায় বন্‌কি চিড়িয়া বন্‌কি বন্‌বন্ ভু·· উ উ উ···লু···, উ উ উ রে।" অশোককুমার আর দেবীকারাণীর সেই বিখ্যাত 'অচ্ছ্যুত কন্যার' দুটো গান। প্রায় প্রত্যহ বিকেলেই ঐ স্টুডিও বাড়ির পাশ দিয়ে 'সুন্দরনগরের' দিকে হেটে যেয়ে, আবার একই রাস্তায় ছেলের ফ্লাটে ফিরে আসতাম। ঐ স্টুডিওর হানাবাড়িটাকে দেখে মনে বড় দুঃখ হত। আমাদের যৌবনকালে কি সব ক্লাসিকেল ছবি বার হত এই স্টুডিওটা থেকে। অচ্ছুত কন্যা, কংকন, বন্ধন, ঝুলা, বসন্ত, কিস্মৎ, আরও নাম ভুলে যাওয়া কত সুন্দর সুন্দর ছবি! সেই সময়ের ঐসব বিখ্যাত এবং সারা ভারতে সাড়া জাগানো ছবির নায়ক-নায়িকাদের নাম আজ প্রায় ভুলে গেছি। অশোককুমার, দেবীকারাণী, কিশোরসাহু লীলা চিট্‌নীস্, মমতাজ শান্তি ছাড়া আর কোন নাম মনে করতে পারছি না, বার্দ্ধক্যের করাল গ্রাসে!

একদিকে বম্বে টকিজের ঐ রমরমা দিন, অন্যদিকে কলকাতার নিউ-থিয়েটার্‌সের জয়জয়াকার। আবার দুটোই দুই বাঙ্গালী কর্মবীরের কীর্তি; একদিকে প্রয়াত হিমাংশু রায় অন্যদিকে প্রয়াত বীরেন সরকার। সিনেমা জগতে সেটা বোধ হয় আমাদের স্বর্ণযুগ! আর আজ? বম্বে টকিজ স্টুডিও তো হানাবাড়ির রূপ নিয়েছে আর নিউ থিয়েটারস স্টুডিও করছে ধুক ধুক!

আসানুল্লা এনজিনীয়ারিং স্কুলে এক বছরের জীবনে আরও বহু ঘটনাই এমনকি, একবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে আমার ফিরে আসার ঘটনাও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে উহ্য রেখে এবার ময়মনসিংহ জেলা শহরে চলছি। আসানুল্লা স্কুল থেকে মুক্তির জন্যই হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত মেন হোস্টেলের প্রাঙ্গণে সরকারী আদেশ অমান্য করে, "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত গেয়ে, আসানুল্লা থেকে বিতাড়িত হয়ে, শহীদ সেজে বাবার কাছে উপস্থিত হলে, উনি বোধ হয় আমার চাতুর্য্য বুঝতে পেরে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে, কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত ফুটবলার প্রয়াত "হাছুদাস" আমাকে ময়মনসিংহ সহরে "ফ্রেণ্ডস ইলেভন্" ক্লাবের হয়ে খেলতে নিয়ে যান। সেদিন খেলা ছিল ওখানের বিখ্যাত পণ্ডিতপাড়া ক্লাবের সঙ্গে। এ দুটি ক্লাবের সম্পর্ক ছিল অনেকটা কলকাতার 'মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের' মতো। সেদিনের খেলায় ফ্রেণ্ডস ইলেভনের জয় হয়। মাঠে উপস্থিত ছিলেন ওখানের আনন্দমোহন কলেজের প্রয়াত প্রিন্‌সিপাল কুমুদ চক্রবর্তী ও ফিজিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাকটার প্রয়াত বেঙ্গা ঘোষ। সেদিন

রাতেই ময়মনসিংহের বিখ্যাত উকিল প্রয়াত মহীম রায়ের বাড়িতে যেখানে ক্লাব থেকে আমাকে রাখা হয়েছিল, সেখানে বেঙ্গাবাবু এসে আমাকে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হতে অনুরোধ করেন এবং বাবা আমার পড়ার কোন খরচ দেবেন না জেনে, প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে পরামর্শ করে, কলেজে এবং হোস্টেলে আমাকে সব ফ্রি করে দেন এবং পরে আমার মাসিক দশটাকা হাত খরচের ব্যবস্থাও করা হয়। কুমুদ চক্রবর্তী মহাশয়ের আমার প্রতি অন্ধ স্নেহ ও ভালবাসার কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না। ঐ ভালবাসা ও স্নেহের সুযোগ নিয়ে আমি বহু ছাত্র ও সহপাঠীর অনেক উপকারও করেছি। প্রিন্সিপাল মহাশয় কোনদিন আমার কোন অনুরোধ কঠিন হলেও না-মঞ্জুর করেন নি। আমিও আমার প্রাণ দিয়ে কলেজের জন্য খেলেছি। কলেজ ম্যাগাজিনে একবার শুধু আমি কলেজকে কতবার নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাঁচিয়েছি, তাই নিয়ে কয়েকপাতা লেখা হয়েছিল। সেটা আর আজ আমার হাতে নেই।

এই ময়মনসিংহের স্কুল (সিটি কলেজিয়েট স্কুলঃ -১৯২৯—১৯৩৩ ও কলেজ জীবনের (১৯৪০ –১৯৪৩) বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকলেও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে শুধু দুটো ঘটনাই উল্লেখ করব। আমি যখন সিটি স্কুলের ক্লাস V-এ পড়ি তখন প্রয়াত মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁর মৃতা স্ত্রী লীলাদেবীর নামে, একটা শীল্ড জুনিয়ার ইন্টার স্কুল ফুটবল খেলার জন্য আয়োজন করেন। খেলোয়াড়দের উচ্চতার মান ছিল চার ফুট আট ইঞ্চি। আমি তখন সেণ্টার ফরওয়ার্ডে খেলি। ফাইনাল খেলায় জেলাস্কুলের বিরুদ্ধে আমি একাই তিন গোল দিয়ে সিটি স্কুলকে জয়ী করি। মাঠে সেদিন মহারাজ শশীকান্ত উপস্থিত থেকে নিজের মোটর গাড়িতে বসেই খেলা দেখছিলেন। খেলার শেষে ঐ গাড়িতে আমায় ডেকে নিয়ে খুব আদর যত্ন করেন। অন্যদিকে ব্রংকাইটিসের জন্য আমার প্রায় সবরকম খেলাধুলোই বারণ ছিল। কোথাও খেলেছি জানতে পারলে বাবা কঠিন শাসন করতেন। এইজন্য আমি মহারাজের গাড়ি থেকে কোনও ক্রমে নেমে, প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি দৌড়ে, বাসায় পেঁছেই হাত মুখ ধুয়ে একেবারে শান্তশিষ্ট ছেলের মতো বৈঠকখানা ঘরে, বাবা আপিস থেকে ফেরার পূর্বেই পড়তে বসে যাই। ওদিকে স্কুল থেকে কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়ি নানা রকমের আলো দিয়ে সাজিয়ে শীল্ড নিয়ে বিরাট মিছিল বার হবার সময় মাস্টারমশাই ও ছাত্ররা আমাকে খুঁজে না পেয়ে বিস্মিত হলে, আমার অন্তরঙ্গ দুএকজন বন্ধু আমার অসুবিধের কথা তাঁদের জানায়। কিন্তু মিছিল বড় রাস্তা

ধরে আমাদের বাসার কাছে পেঁছে, শীল্ড সমেত বহু ছাত্র আমাদের বাসার সামনে নেমে গিয়ে "থ্রি চীয়ারস্ ফর 'মানিক', হিপ্ হিপ্ হুররে" বলে চেঁচাতে থাকে। আমি তখন একটা গেঞ্জী গায়ে হাফ্প্যাণ্ট পরে সুবোধ বালকের মতো পড়ছিলাম। ভেতর বাড়ি থেকে বাবা বার হয়ে এলে সব ছাত্ররা আমাকে মিছিলে নিয়ে যেতে দাবী করতে থাকে। তারা একজন মাস্টার মহাশয়কেও ধরে এনে বাবাকে অনুরোধ করায়। বাধ্য হয়ে বাবা মত দেন। আমি জামা কাপড় বদলে মিছিলে গেলেও শান্তি পাই না এই ভেবে যে বাসায় ফিরে এসে বাবার কোন মূর্তি দেখব। অবশ্য সেদিন ফিরে এসে মারধর খাই নি। তবে বাবার সঙ্গে দেখাও হয় নি।

আনন্দমোহন কলেজে পড়ার সময়, ১৯৪১ সালে কলেজ টীম নিয়ে ময়মনসিংহের কাছেই গৌরীপুরের মাঠে একটা ফাইনাল গেম খেলতে যাই। যতদূর মনে পড়ে শীল্ডটা কালীপুরের জমিদার বিখ্যাত শ্রী ডি. কে. লাহিড়ী চৌধুরীর প্রয়াত পিতার নামে। লাহিড়ী চৌধুরী মশাইও এখন প্রয়াত। সে খেলায় কলেজ জয়ী হয়। আমার হাতে একটা হ্যাণ্ডবিল আসে, সেটা স্থানীয় ফুটবল কমিটি বেশি টিকিট বিক্রী ও দর্শক সমাগমের জন্য প্রচার করেছিল। ঐ হ্যাণ্ডবিলে আমার সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল ময়মনসিংহের জুম্বা খাঁ মানিকও আনন্দমোহন কলেজের পক্ষে খেলবেন। যাহোক খেলার শেষে জমিদার লাহিড়ী চৌধুরী মশাই সন্ধ্যের পরে তার প্রাসাদে আমাকে দেখা করতে বলেন। সেই সাক্ষাতে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। উনি আমাকে বলেন যে, আমি যেন তাকে Senior friend বলে ভাবি এবং বিনা সঙ্কোচে কথা বলি। উনি প্রতি শনিবারেই ময়মনসিংহ থেকে তাঁর কালীপুরের প্রাসাদে আসতে এবং রবিবার ওখানে কাটিয়ে সোমবার ফিরে যেয়ে কলেজ করতে অনুরোধ করেন।

এটা করা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তবে বহুবার কালীপুরে তাঁর প্রাসাদে গিয়েছি ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে, খুব আদর যত্নও পেয়েছি আর সবচাইতে উপকার হয়েছে এই যে তাঁর নিকট এমন অনেক কথা জেনেছি, যা বই বা খবরের কাগজ পড়ে জানা সম্ভব ছিল না। সেই সময়ের বহু সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর কাছে লেখা ঐ সব অনেক নেতার চিঠি দেখেছি ও পড়েছি। কিছু কিছু নেতার প্রাইভেট লাইফের কথাও জেনেছি, যার সব কিছু লেখা সম্ভব নয়। উনি বহুদিন সেণ্ট্রাল এসেম্ব্রীর সভ্য ছিলেন। কখনও কংগ্রেসের হয়ে আবার প্রয়োজনে নির্দলীয়

ভাবে। ১৯৪৬ সালের পোস্টাল ধর্মঘটের প্রস্তুতির সময় উনি ছিলেন All India Postal Union-এর সভাপতি। এক জীবনে সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ বসু এই রকম সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে চিঠি বা testimonial গোছের কিছু না কিছু নিয়ে রাশিয়া ও জার্মানীতে সরকারি অতিথি ছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে ডি. ভেলেরার সঙ্গে দেখা করেছেন। এমন ম্যানেজ মাস্টার ছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়, ময়মনসিংহের ইংরেজ পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের প্রাসাদে বসে নিষিদ্ধ বার্লিন এবং টোকিও রেডিও শুনতেন।

১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ ভারতের শেষ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় এসেমব্লীর (Central Assembly) নির্বাচনে উনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান। সে সময়ে আমি ওঁনার প্রাসাদে গিয়েছিলাম, এমনি শুধু দেখা করতে। উনি নির্দলীয় প্রার্থী হয়েছেন কেন জানতে চাইলে, বললেন, উনি Jamindary Constituencyর প্রার্থী। কংগ্রেস জমিদারি উঠিয়ে দেবে বলাতে বহু জমিদার ওঁকে ভোট দেবে না। এই বলে উনি আমাকে তাঁর বেডরুমে নিয়ে তালা খুলে একটা ড্রয়ার থেকে ট্রেসিং-পেপারে সুন্দর করে বাঁধানো নেতাজী সুভাষ বসুর দাদা প্রয়াত শরৎচন্দ্র বসুর ইংরেজীতে লেখা একটা সার্টিফিকেট দেখালেন আমাকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে, যে এর কথা কোথাও প্রকাশ করব না। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে আর ঐসব ব্যাপারের কোন মূল্য নেই বলেই এটা প্রকাশ করতে পারছি। শরৎ বসু ঐ সার্টিফিকেটে যা লিখেছিলেন তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায় যে, "যদিও শ্রীধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় এবারের নির্বাচনে নিরপেক্ষ প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন তবু আমরা জানি উনি জয়ী হলে আমাদের সঙ্গে এক আদর্শেই কাজ করবেন।" লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় এটা দেখিয়ে আমায় বললেন যে আবার বহু কট্টর কংগ্রেসী জমিদার আছে যাঁরা বলছেন এবং বলবেন যে আপনি কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ান নি বলে আপনাকে ভোট দেব না। কিন্তু তাঁদের শরৎবাবুর ঐ সার্টিফিকেট দেখালেই তাঁরা আমাকে ভোট দিতে রাজী হচ্ছেন, আর এর নামই রাজনীতি। ১৯৪৬-এর নির্বাচনেও উনি জয়ী হয়েছিলেন।

উনি জমিদার ছিলেন, আমি তখন অনেকটা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে ওঁদের জমিদারি পন্থা ইত্যাদির নানা রকম শোষণের বিরুদ্ধে খোঁচা দিয়ে আমার কর্মস্থল থেকে চিঠি দিতাম। উনি রেগে গিয়ে আমাকে বড় বড় চিঠি লিখতেন। ওঁনার কিছু চিঠি এখনও আমার একটা ফাইলে আছে। তাঁর কয়েকখানা চিঠির

কপি এখানে প্রকাশ করলাম। এই চিঠিগুলোতে বিশেষ করে তৎকালীন রাশিয়ার কথা আর আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার কথা ও সেদিনের ভারতবর্ষের কিছু বিখ্যাত মানুষের কথা হয়তো অনেকেরই ভাল লাগতে পারে।

Kalipur
P. O. GOURIPUR
DIST MYMENSINGH
The 24. 5. 1944

KALIPUR CHHOTA TARAF ESTATE
D. K. Lahiri Choudhuri M. L. A.
ZEMINDER

My dear Tulsi,

I have much pleasure in introducing to you my young friend Babu Barindra Nath Roy who hails from Kishorganj in my district. He appeared at the recent B. A. Examination and made an attempt to join the Aviation section of the University Training Corps. Put as such an employment involves considerable risk to life and limb, I have dissuaded him from going in for the same.

I understand, numerous appointments are now being made in the Civil Supplies and Rationing Departments. Those posts are in the gift of Hon'ble Mr. Suhrawardy I shall feel much obliged if you will be so good as to recommend the bearer to you Hon'ble colleague for a suitable job Barin, I can assure your, is a highly deserving boy.

yours affectionately,
Hari

পুঃ—ভাই ছেলেটির জন্যে বিশেষ চেষ্টা করলে সুখী হব। কারণ আমি নিজেই তাকে aviation এ join করতে ইচ্ছা করি না। তার মারও অমত। তুমি ভাই চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এর একটা ব্যবস্থা হয়। ইতি

হরি

উক্ত চিঠির কিছু লোকের পরিচয় ঃ

(১) Tulsi ঃ শ্রীরামপুরের (হুগলী) রাজ পরিবারের বিখ্যাত ৺তুলসী গোস্বামী। ইংরেজীতে খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। কোন সভায় বাংলায় বক্তৃতা দিলে, জনতা বাধা দিয়ে বলতো, আমরা আপনার ইংরেজী বক্তৃতা শুনতে চাই। ১৯৪৪ সালের অখণ্ড বাংলার নাজিমুদ্দীন (প্রীমিয়ার) মন্ত্রীসভার অর্থ মন্ত্রী ছিলেন। তখনকার অবিভক্ত বাংলার প্রয়াত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, কিরণ শঙ্কর রায়, তুলসী গোস্বামী ও বীরেন রায়কে বাংলার বিগ্ ফাইভ (Big Five) বলা হত। আবার নিন্দুকেরা অন্য কথাও বলতো। তবে এঁরা, বিশেষ করে প্রথম দুজন ছিলেন বিরাট কর্মবীর। ডাঃ রায়কে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। কিন্তু ময়মনসিংহের নেত্রকোনাবাসী আর ডাঃ রায়ের জিগ্‌রী দোস্ত নলিনী সরকার যে ডাঃ রায়েরও বহু পূর্বেই বিপুল কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিলেন, মনে হয় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই তার খবর রাখেন না। রাজ্যের (Boundary adjustment)-এর প্রথম আওয়াজ (Give us some breathing space) পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিনিই প্রথম তুলেছিলেন। হিন্দুস্থান লাইফ্ ইনসিওরেন্স ও রসুই কোম্পানী, স্টেট বাস (রিফুউজি যুবকদের চাকুরীর জন্যে), নিউ আলিপুর ও পর্ণশ্রী আবাসন ইত্যাদির পরিকল্পনা ঐ নলিনী সরকার মহাশয়েরই প্রয়াস। স্বাধীনতার পূর্বে কোন এক সময়ে তিনি ভাইসরয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউনসিলেরও ফিনান্স মেম্বার ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর অকাল মৃত্যু এবং বিশেষ করে কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত "বীণা সরকারের বড়কাকার" মামলায় জড়িয়ে পড়ায়, জবরদস্ত 'বসু' কোটারির প্রভাবে তাকে কংগ্রেস থেকে বিশ বছরের জন্য বহিস্কৃত করে দেয়ায়, নলিনী সরকারের নাম আজ আর কেউ উচ্চারণ করে না।

(২) Hon'ble Mr. Suhrawardy ঃ

হাসান শহীদ সুরাবর্দ্দী। ঐ চিঠির সময়ে অখণ্ড বাংলার ফুড মিনিষ্টার। ১৯৪৩ সালে অখণ্ড বাংলার প্রিমিয়ার। ১৯৪৬ সালে কলকাতার ১৬ই আগস্টের হিন্দু-মুসলমানের "গ্রেট কিলিং"-এর হোতা। পরে পাকিস্তানের প্রাইম মিনিষ্টার।

১৯৪৬-এর আগস্টে, তার গুণ্ডা-সর্দার 'মীনা পেশোয়ারির' মুণ্ডুটা, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ফেন্‌সিং-এর লোহার শলাকায় এক ভোরে কে বা কারা গেঁথে রেখেছিল, কপালে একটা লেবেল্ সেঁটে "সুরাবর্দ্দী সাহেবের প্রিয় মীনা পেশোয়ারি।"

Mr, D. K. Lahiri Choudhuri M L. A. (Central),
Jaminder-এর চিঠি

Kalipur
30 6. 44

My dear Barin,

তোমার চিঠি পেলাম। ভাই অনেক কথাই লিখেছ বনিয়াদি গৎ হিসেবে। বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক অন্যরকম দেখেছি স্বচক্ষে। রুশিয়াতে বেশীদিন পূর্বে নয় ইংরেজি ১৯৩৫ সালে স্টালিনেরই অতিথি হয়েছি ও থেকেছি। এবং তাতে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। সেখানে দেখেছি মস্কো শহরে তিন রকম খাদ্যের ব্যবস্থা। অর্থাৎ একজাতীয় খাদ্য সর্বসাধারণের, অপরজাতীয় খাদ্য হচ্ছে বিশেষ বিশেষ উচ্চপদস্থদের জন্যে ও আর এক প্রকার খাদ্য হচ্ছে বিদেশীদের জন্যে যাঁরা রুশিয়াতে পরিভ্রমণার্থ গমন করেন। এমনকি স্বচক্ষে দেখেছি দোকান পর্য্যন্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সংস্থান থাকলেও সাধারণ যারা তারা অন্য জাতীয় খাদ্য পেতে অক্ষম এমনকি তাদের নির্বাচিত দোকান ব্যতীত অন্য উপর শ্রেণীর দোকানে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত নেই। বাইরে থেকে অনেক কিছুই শোনা যায় কিন্তু ভেতরে গিয়ে পড়লে ধারণার পরিবর্তন অনিবার্য্য। কথায় বলে "শুনেছি সোনার গাঁও বিক্রমপুর গিয়ে দেখি শুধুই মাটি।" ঠিক এই ভাব। পরিধেয় সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। যিনি আমার দোভাষী বা চালক ছিলেন তাঁর দেখেছি প্রতিক্ষণেই নূতন বেশে ভূষিত হয়ে দেখা দিয়েছেন। অথচ রাস্তায় বের হয়ে দেখেছি অনেকের বস্ত্রের এতই অভাব যে ছিন্ন পরিধেয়য় শেলাই চালিয়েছেন চামড়ার তালিকার দ্বারা। আমি প্রশ্ন করেছি এই বৈষম্য নিয়ে। তার উত্তর হয়েছে এই যে সমাজ রক্ষা করতে হলে বৈষম্য ব্যক্তিগতভাবে থাকবেই। তবে বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে কাহারও জন্মগত অধিকার দ্বারা পিতার ধনে অধিকার জন্মাবে না। State সব করবে বলা যত সহজ কাজে পরিণত করা ঠিক ততটা সহজ নয়। ভারতের সমস্ত অর্থ একত্রিত করলেও per capita income চৌষট্টি টাকার ঊর্ধ্বে বর্তমানে যাবে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে সামান্য খাদ্য সমস্যার মীমাংসার্থ ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার মিলিত চেষ্টার ফলেও দেশে কি ঘোরতর গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে। কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না। অবশ্য এই ব্যাপারে capitalist বা hoarders বা Black

market-ই হচ্ছে গণ্ডগোলের পক্ষে প্রধানত দায়ী। এছাড়াও খাদ্যমীমাংসা ব্যাপারটা*

* বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই চিঠির শেষ অংশটুকু খুঁজে পাওয়া যায়নি।

Kalipur
P. O. Gouripur
Mymensingha
4.1.46

My dear Barin,**

তোমার নববর্ষের বারতা যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু স্থানান্তরে যাওয়ায় উত্তর দিতে দেরী হল বলে আমায় ক্ষমা করো। নূতন নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে দিল্লীর নব অধিবেশনে যোগদান করবার জন্যে আগামী ১৩ই জানুয়ারি দিল্লী রওনা হচ্ছি। কবে যে তোমার দেখা পাব একমাত্র ভগবানই জানেন। আমার ভালবাসা জেনো।

তোমারই
শ্রীধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

** বিঃ দ্রঃ—১৯৪৫-৪৬ সালের ইংরেজ রাজত্বের সেণ্ট্রাল এসেম্ব্লীর শেষ নির্বাচনে কৌশল করে নিরপেক্ষ (Independent) প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়ে অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার পূর্বে এই চিঠি লিখে যান।

2/A, Western Court
New Delhi
24/2/46

My dear Barin,

তোমার[১] দুখানা চিঠিই পেয়েছি[২]। Congress partyর কাজে খুব ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে দেরী হল বলে আশা করি ক্ষমা করবে। অনেক কথাই লিখেছো against Non-Violence Policy of Congress. কিন্তু ভাই এটা ভুলনা যে There is a great deal of difference between a Creed and a policy. To Mahatma Non-Violence is a Creed whereas to many illegible to adopt it as a policy.

কাল as the President of all India Postal, Telegraph and R.M.S. union, strike-এর notice দিয়েছি। যদি Govt. of India আমাদের legitimate demand meet না করেন তবে 25th, all India strike সুরু হবে। চেষ্টা চলছে for a reasonable settlement. দেখা যাক্ কি হয়।

কলকাতা হয়ে আসবার সময় খোঁজ করে জানলাম ধীরেনদা* on tour ছিলেন কাজেই কোন কথা হতে পারেনি।

আজ এই পর্যন্তই। আমার ভালবাসা জেনো।

yours affectionately,

sd / D. K. Lahiri Choudhuri.

বিঃ দ্রঃ—(১) গান্ধীজীর বা কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে চিঠি আমি লিখেছিলাম তারই জবাবে এই চিঠি।

(২) All India Postal, Telegraph and R. M. S. union-এর President হিসাবে India Govt.কে strike-এর নোটিশ দিয়ে এই চিঠি লিখেছিলেন।

ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের একটি-ই মাত্র ছেলে ছিল। ওঁর ময়মনসিংহ-গৌরীপুর কালীপুরের প্রাসাদে ঐ ছেলেটিকে দেখতে পেতাম। দু একদিন সামান্য পরিচয়ও হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে আমি বি. এ. পাশ করলে চৌধুরী মহাশয় আমাকে মাত্র একবছর তাঁর প্রাসাদে থাকতে বলেছিলেন, ঐ ছেলেটিকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও খেলাধূলো শেখাতে। বলেছিলেন, আমার গেস্ট-হাউসে থাকবে ও খাবে, তাতে তোমার একপয়সাও খরচা হবে না, উপরন্তু মাসিক একশত টাকা হাত খরচা পাবে। আর এক ব'ছর পরে আমি-ই তোমাকে একটা ভাল চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেব। আমি জানতাম সে ক্ষমতা ওঁনার আছে। কিন্তু কিছুটা পরিবারের প্রয়োজনে, আর অন্যদিকে বাণীর দায়িত্ব নেবার প্রস্তুতির প্রয়োজনেও আমি লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের ঐ প্রস্তাবেও যেমন রাজী হতে পারিনি, তেমনই অন্যদিকে আমাদের দেশের জামাই ভারত বিখ্যাত ক্রীড়া-বিশারদ, প্রয়াত পঙ্কজ গুপ্তের ১৯৪৫ সাল থেকে আই. এফ-এর প্রথম ডিভিসান

---

* প্রয়াত রায় বাহাদুর ডি. এন. মুখার্জী তখন Additional Collector of Central Excise, Calcutta.

লীগে ফুটবল খেলতে বা গুপ্ত মহাশয়ের রেফারেন্সে তখনকার প্রথম ডিভিসান রেলওয়ে ফুটবল টীমে, চাকুরী সহ ১৯৪৫ সালে খেলার তৎকালিন ঐ টীমের কর্তা মেজর আব্বাসির প্রস্তাবও উপেক্ষা করে, কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের ইন্সপেক্টরের চাকুরী নিয়ে প্রথমে ঢাকা ও দু'তিন মাস পরে আসামের কাছাড় জেলার হেড্ কোয়ার্টার শিলচরে চলে যাই।

শ্রীধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী বা ডি কে. লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের সাথে তাঁর ভবানীপুরের স্কুল রো-এর বাড়িতেও দেশ বিভাগের পর, মনে হয় ১৯৫০-৫১ সালে, আমি হুগলীর শ্রীরামপুরে চাকুরীরত অবস্থায় দেখা করেছিলাম। তখন দেশ ছেড়ে এসে ঐ বাড়ি তৈরী করে উনি ওখানেই থাকতেন। (১৯৩৮-৪০ সালে আশুতোষ কলেজে পড়া কালীন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঐ বাড়ির খালি জমিতে আমরা বারোয়ারি দুর্গা পুজো করতাম)। ওঁনার সঙ্গে ঐ শেষ দেখা। ওঁনার ছেলে তখন, মানে দেশভাগের পরে শুনেছিলাম আশুতোষ কলেজে প্রফেসারের চাকুরী করতেন। যতদূর মনে পড়ে ঐ ছেলের নাম শ্রীধৃতি কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। এখন কখনো-সখনো খবরের কাগজে বা মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায়, ঐ ছেলেটিকে একজন বিখ্যাত হস্তীবিশারদ রূপে পরিচয় পাই, ডি. কে. লাহিড়ী চৌধুরী নামে। এতে সত্যি আমি খুব আনন্দ পাই; ঐ নামটি শুনে আমার মন ছুটে চলে যায় বর্তমান বাংলাদেশের ঐ কালীপুরে, সেই ফেলে আসা নানা রংএর দিনগুলোর মধ্যে। ওদের কালীপুরের প্রাসাদের সিনিয়ার ও জুনিয়ার দুজন ডি কে. লাহিড়ী চৌধুরীর কথাই মনে পড়ে। বর্তমানকে হারিয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণের জন্য সেই পুরানো দিনগুলোতে চলে যাই, কি ভালই না লাগে। মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিশাপে পৃথিবীর যে দেশগুলো ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তার প্রায় সবইতো ধীরে ধীরে এক হয়ে যাচ্ছে, আমাদেরও যদি তাই হতো, তবে জীবনের আর কয়েকটা বছর ওখানেই কাটিয়ে দিতাম। জানি, পূর্বের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, তবুও তো বহু কিছুই এখনও আছে, সেইগুলোর মধ্যে স্বপ্নের স্মৃতি-মাখা দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতেই তো এ জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু সবার হলেও আমাদের ভাঙ্গা বঙ্গ বোধ হয় কোনদিনই এক হতে পারবে না, কারণ ধর্মের বাধা! তাই মাঝে মাঝে ভাবি ধর্মটা কি মানুষের জীবনে আশীর্বাদ না অভিশাপ!

১৯৯০ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, প্রায় চুয়াল্লিস বছর পর যেদিন কিশোরগঞ্জ থেকে ট্রেনে ময়মনসিংহ রওনা হলাম সকাল সাড়ে ছটায়, তখন

গৌরীপুর জংশন স্টেশনে গাড়ী প্রবেশ করার পূর্বেই আমি আমাদের কামরার ডানপাশের দরজা খুলে, গৌরীপুরের ও কালীপুরের জমিদারী প্রাসাদ গুলো দেখার লোভে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। গৌরীপুরের প্রাসাদের কিছুটা দেখা গেলেও, কালীপুরের প্রাসাদের কিছুই দেখা গেল না। জংশন স্টেশন বলে, গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। আমি একবার এই দরজায় একবার উল্টোদিকের দরজায় দাঁড়িয়ে সব দেখছি। কত অসংখ্য বার এই গৌরীপুর জংশন দিয়ে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ-কালীপুর, আঠারবাড়ি, ঈশ্বরগঞ্জ যাতায়াত করেছি। সেই সব মধুর স্মৃতি মনে পড়ে চোখ বেয়ে হু হু করে জল বার হয়ে আসছে। কামরার মুসলমান যাত্রীভাইরা সবাই অবাক হয়ে আমায় দেখছে। স্টেশন বাড়ির গায়ে বড় বড় করে লেখা "জারিয়া-জঞ্জাল যাইতে হইলে এইখানে গাড়ী বদলাইতে হইবে।" জারিয়া-জঞ্জাল, সেই স্বপ্নের সুসং বা সুষঙ্গ, সেখানের একটি "গারো ছেলে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে আমার সঙ্গে একই টীমে ফুটবল খেলত, ভালই খেলত আর আমার খুব "নেওটা" ছিল। বহুবার আমাকে তাদের পাহাড়ী দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু যাওয়া হয়নি। জানিনা, সে আজ কোথায়! নামটাও মনে পড়ছেনা, কিন্তু তার সরল মুখখানা মনে পড়ছে। একবার এই গৌরীপুর জংশন হয়েই, আমি, মা, হেনা ও শিখা নেত্রকোনা মিউজিক্ কন্ফারেন্সে গিয়েছিলাম। হেনা আমার শেখান একটা ভজন গেয়ে প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। সেই "ভজনটা" আমি পেয়েছিলাম, পূর্বে উল্লিখিত ৺সত্য চৌধুরীর নিকট থেকে। এক সময় ধীরে ধীরে গাড়ী ময়মনসিংহের দিকে রওনা হল। যতক্ষণ দেখা যায়, কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে, গৌরীপুর স্টেশনের মধুর ও সুন্দর স্মৃতি মাখা সব কিছুর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এইতো শেষ দেখা! একসময় সে সব কিছুই চোখের আড়ালে চলে গেল!

ময়মনসিংহের সত্যি সত্যি একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ছেড়ে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা এতই বিরল যে আমার এই ৭০ বৎসর বয়সে এমন ঘটনা কোথাও দেখিনি, শুনিওনি বা পড়িওনি, আর সেইজন্যই এটা উল্লেখ করছি। কোনও প্রকার আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু কাহিনীর পটভূমিকা বোঝাতেই এই কথাগুলো লিখতে হচ্ছে যে ময়মনসিংহ কলেজে বি. এ. পড়ার সময় ফুটবল খেলায় আমি যতটা নয়, তার চাইতেও বোধহয় আমার নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল বেশি, তাতে ওখানের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আমার ফ্যান বা সমর্থকও ছিল

অনেক। আমার স্বাস্থ্য ছিল খুবই ভাল, দেখতেও কুরূপ ছিলাম না। বন্ধু-বান্ধবরা আমার চোখে এ. সি. কারেন্ট আছে বলে ঠাট্টা করত।

১৯৪৩ সালের কোন একসময়ে, আমাদের কলেজ হোস্টেল যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার দখল করে নিলে, আমরা হোস্টেলের ছাত্ররা বাস্তুহারা হয়ে শহরের নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম রকমারি অসুবিধার মধ্যে। তাই টেস্ট-পরীক্ষা দিয়েই প্রায় আড়াই বা তিন মাসের জন্য আমি কিশোরগঞ্জের বাসায় গিয়ে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। তখন ময়মনসিংহে থাকা ও খাওয়ার কোন ভাল হোটেল ছিল না। কিশোরগঞ্জে আমাদের পাড়ার বন্ধু স্থানীয় একটি ছেলে তখন ময়মনসিংহ কলেজে বি. এস. সি. পড়ত। হোস্টেলের অভাবে, ছেলেটি পণ্ডিতপাড়ার এক উকিল বাড়ির শ্রীবঙ্কিম গাঙ্গুলীর বাইরের একটা ঘরে, যেটা উনি তাঁর চেম্বারের মত ব্যবহার করতেন, তারই পার্টিশন করা একটা ঘরে থাকত আর হোটেলে খেত। তার নাম ছিল বিনীত বসু। ঐ বিনীত কিশোরগঞ্জে আমায় নিজে থেকেই বলল যে ফাইনাল পরীক্ষার সময়, আমি তার সঙ্গে ঐ একই ঘরে দশ-বার দিন থেকে পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারি। সেই মতো ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে একদিন বিনীতের ঐ ময়মনসিংহের আস্তানায় এসে উঠলাম বি. এ ফাইনাল পরীক্ষা দিতে। এমনিতে খেলাধুলোর জন্য ৩০% এর বেশি ক্লাস আমি করতেই পারিনি, তাতেই পড়ার অনেক ক্ষতি হয়েছিল। আবার টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে কিশোরগঞ্জে আড়াই তিন মাস থাকায়, বাণীর আর আমার লুকোচুরি খেলায়ও পড়ার বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল। সেইজন্য হাতের ঐ দশ-বারোটা দিন আমার কাছে ছিল খুবই মূল্যবান। ভেবেছিলাম যে এই কটা দিন একেবারে দিনরাত পড়াশুনো করে যতটা সম্ভব পরীক্ষার জন্য তৈরী হব। কিন্তু ঐ ঘরে মাখন নামে আমাদের অনেক জুনিয়ার ঐ পাড়ার একটি ছেলে বিনীতের কাছে আসত আর আমাকে ওখানে থাকতে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করল! ঐ ছেলেটির যাতায়াত ও বসে গল্পগুজব করাতে আমি খুব disturbed অনুভব করতাম এবং তাকে অবহেলা করে চলার চেষ্টা করতাম। দু-তিনদিন পরই, বিনীত কলেজে চলে গেলে, ঐ মাখন এক দুপুরে এসে আমার হাতে ভাঁজ করা একটি কাগজ দিয়ে বলে, এই নিন্ আপনার একটা চিঠি। জিজ্ঞাসা করে জানলাম চিঠিটা মাখনের মামাতো বোনের। চিঠিটা পড়ে খুব কৌতুক বোধ করলাম। মনে হল ওটা কাঁচা বয়সের কাঁচা হাতের লেখায়, একটি প্রেম-পাগল মেয়ের বয়ান। মেয়েটি ক্লাস এইট না নাইনে পড়ে। আমাকে

কোনদিন দেখেনি। ঐ ভাই ও তার বন্ধুদের কাছে আমার গল্প শুনে আমাকে তার খুব ভাল লেগেছে। তাই তার আবেদন যে তার ভালবাসা গ্রহণ করে যেন তার জীবন আমি ধন্য করি। আজও লিখেছে যে তার স্কুলে যাতায়াতের সময় যেন আমি আমার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে একদিন দেখা দি-ই। মাখন এই চিঠির জবাব নিতে কখন আসবে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলেছিলাম, পরীক্ষার পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত আছি, এখন যাও, পরে দেখা যাবে। মাখনকে খুব হালকা চরিত্রের ছেলে বলে মনে হল। কারণ আম্যর এ কথার পরেও সে বলল, দিদি আপনাকে একদিন ওদের বাড়িতে চা-খাবার জন্য নিয়ে যেতে বলেছে, কবে যাবেন বলুন। আমি তখনকার মত ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিই। কলেজ থেকে বিনীত ফিরে এলে তাকে চিঠিটা দেখিয়ে মেয়েটিকে চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, চেনেনা। বিনীত উল্টে ঠাট্টা বা ঈর্ষা করে বলল, তোমারই তো দিন, মেয়েরা তোমায় দেখলেই ঢলে পড়ে, আমাদের কেউ পোঁছেও না। পূর্বে উল্লিখিত আমার বন্ধু রবি কর, যে ১৯৪২-এর আন্দোলনে আমাদের পোস্টার লিখে দিত, সে-ও তখন নিকটেই থাকতো। তাকে খবর দিয়ে এনে জানলাম, সেও মেয়েটিকে চেনে না, তবে বলল যে দু'একদিনের মধ্যে সে বিস্তারিত খবর এনে দিতে পারবে। এদিকে রাত্রি আটটার মধ্যে মাখন তিনবার এবং মেয়েটির ফ্রক পরা দশ কি এগার বছরের ছোট বোন চিঠির জবারের জন্য আমায় তাগাদা দিয়ে গেল। আমার ভয় হল একেই তো পরীক্ষার জন্য আমি পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারিনি, তার মধ্যে এভাবে মেয়েলী উপদ্রব হলে তো আমার পরীক্ষার বারোটা বেজে যাবে। পরের দিন সেইভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে একটা জবাব মাখনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম আবেদন, নিবেদন দুঃখ, আক্ষেপ ও অভিমান জানিয়ে আবার মেয়েটির চিঠি এল। তার নাম ছিল বুলবুল। শুধু চিঠি দিলেও এক কথা ছিল। কিন্তু একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসরের মত চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই তাগাদার পর তাগাদা। আমি বুঝলাম, আমার কপালটাই মন্দ। কারণ আগের বছর Emergency (king's) Commission-এ Selected হয়েও ময়মনসিংহের I. B Report-এর জন্য আমার সেকেণ্ড লেফ্‌টেনেন্টের চাকুরিটাও হ'ল না এবং Interview আর Medical test-এর জন্য ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, কলকাতা ফোর্টউইলিয়াম ও লক্ষ্ণৌ ছুটোছুটি করে পরীক্ষার জন্য তৈরীও হতে পারিনি। আর এবার বোধহয় বুলবুল আমায় ডোবাল। আমার ধারণা

হয়েছিল যে সিনেমা দেখেই হোক বা বটতলার উপন্যাস পড়েই হোক বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের প্রেমলীলা দেখেই হোক, বুলবুলের রক্তমাংসে প্রেম-ভালবাসা এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে তার একজন প্রেমিক না হলে আর চলছে না। এর মধ্যেই তার তিন চারখানা চিঠি পেয়ে কোনও রকমে বুঝিয়ে পড়িয়ে একখানা জবাব দিয়ে রামনাম জপতে জপতে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বন্ধু রবি অবশ্য বুলবুলের বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে আমায় জানিয়েছিল, তবে তা উল্লেখ করার মত কিছু নয়। ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিনে একটাই পেপার ছিল বলে বেলা একটার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। আমি সেদিন রাতেই এগারটার সুরমা মেলে কিশোরগঞ্জ রওনা হয়ে যাওয়া ঠিক করি। মনে সন্দেহ জাগে, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কত সুন্দর স্মৃতিমাখা এই ময়মনসিংহে আর কোনও দিন আসার সুযোগ পাব কিনা কে জানে। এজন্য পরীক্ষার শেষেই অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল শ্রীকুমুদবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয়কে ও তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছিলাম। তারপর বেলা চারটায় একাই গিয়ে আলেকজ্যান্দার ক্যাসেলের সামনে ব্রহ্মপুত্র নদের মনোরম তীরে বসে কত কথাই না সেদিন ভাবতে বসেছিলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ ওখানে তখন মরে এলেও, নদের বুকের (bed) সেই প্রকাণ্ড রূপ তখনও বর্তমান। ওপারের শম্ভুগঞ্জের শস্যক্ষেত ও গাছপালা ছাড়িয়ে নীল আকাশের সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পরিচিত গারো পাহাড়। বাবা ও মার কাছে শুনেছি আমার জন্মের সাত-আট মাস পরেই বাবা, মাকে ও আমাকে নিয়ে আসেন ময়মনসিংহের বাসায়। তারপর আর হয়তো পাঁচ বছর বয়েস পর্য্যন্ত কোন স্মৃতিই আমার মনে নেই। কিন্তু সিটি কলেজিয়েট্ স্কুলের Class II থেকে Class VI, হেমাঙ্গবাবুর ও অবনীবাবুর কোচিং স্কুল, স্টেশনের কাছে অনুশীলন পার্টির ছদ্মবেশী বিবেকানন্দ লাইব্রেরী, সেখানে ব্রজেনদার (ব্রজেন্দ্র রায়) মত একজন একেবারে সাচ্চা বিপ্লবী, বাল্য-বয়সের ঐ বিবেকানন্দ লাইব্রেরীর মাঠে আলেকজ্যান্দার-পুরুর 'বন্দীবীর' নাটক, তাতে খ্যাতনামা ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার আর কলকাতার বেতার শিল্পী, পল্লীগীতি গায়ক প্রয়াত শশাংক সিংহের (সুষঙ্গ রাজ পরিবারের ছেলে) বাল্যবয়সের গান, স্টেশনের নিকটেই খ্রীস্টানদের Gospel Hall, ঠিক তার উল্টোদিকে পুলিশ সেক্সানের মাঠে আমার ফুটবলের হাতে খড়ি, 'বাসাবাড়ির' ও বড়বাজার মাঠের ফুটবল খেলা, লীলাদেবী চ্যালেঞ্জ শীল্ড সিটি স্কুলের পক্ষ হয়ে জয় করে আনা, ধীরেন সেনের ব্যায়ামের আঁখড়া, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের লাঠি ছোরা খেলার আঁখড়া,

১৯২৮/৩০ সালের গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, সুভাষ বসু ও জে. এম. সেনগুপ্তের আগমন, অমরাবতী ও পরে ছায়াবানী নামের হলে জে এম. সেনগুপ্তের উপস্থিতিতেই অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মারামারি, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর শহরে সেনাবাহিনীর আগমন ও স্থিতি, শহীদ ভগৎসিংহের ফাঁসির প্রতিবাদে বিরাট মিছিল, গুরুসদয় দত্ত, I C. -এর কচুরীপানা যজ্ঞ আর ব্রতচারী নৃত্য, বিখ্যাত গণপতি রায়ের ম্যাজিক ও তার শিষ্য বিখ্যাত প্রতুল সরকারের অ্যামেচার ম্যাজিক, পি সি. পালের অগ্নিঝাঁপ, এরিয়ান পরে 'অলকা' নামের সিনেমা হলের জন্ম, ভারত ক্রিকেটের টেষ্ট দলে প্রবেশের পূর্বে ভারত বিখ্যাত ক্রিকেটের রামজী, গুট্টো ও মেঠার মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর দৌলতে ময়মনসিংহের মাঠে একটা সীজন্ খেলা, ময়মনসিংহের 'ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান, মানে ফ্রেণ্ডস্ ইলেভন্ ও পণ্ডিত পাড়া টীমের খেলা, নিজের ফ্রেণ্ডস ইলেভন ও কলেজ টীমের হয়ে খেলা ও বাৎসরিক ঢাকা Vs ময়মনসিংহের ফুটবল প্রদর্শনী খেলা ইত্যাদি আরও কত কিছু একটার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে ভেবে চলেছি, মাঝে মাঝে চোখ ভিজে যাচ্ছে, এমন সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনীত এসে আমার পাশে বসে বলল যে কলেজ থেকে ফিরে তোমাকে ঘরে না দেখেই ভেবেছি, তুমি নিশ্চয় এখানে এসে বসেছ, কারণ তুমি যে খুব ভাবুক সেটাতো আমি জানি।

বিনীতের আগমনে, ময়মনসিংহ নিয়ে আমার সুখ স্মৃতির স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আরম্ভ হয় মামুলী কথাবার্তা। বিনীত বলে যদি অপরাধ না নাও তবে তোমাকে একটা অনুরোধ করব। বুলবুলকে তো তোমার কোন প্রয়োজন নেই, মেয়েটাকে আমার হাতে দিয়ে যাও। শুধু ঐ প্রস্তাবই নয়, তার প্রকাশ করার ভাষাতেও আমার শরীর একেবারে রি রি করে উঠল। কোন কথা বলতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমার মনোভাব বুঝতে না পেরে বিনীত বলল, কি আমার কথায় রাগ করলে? বললাম, না রাগ নয়, ভাবছি এমন একটা কথা তুমি আমায় বললে কি করে? বুলবুলকে তোমার হাতে দিয়ে গেলে তুমি কি করবে? বিয়ে করবে? সে বলল, না বিয়ে নয়, একটু প্রেম-টেম করব আর কি! তোমরা তো কত মেয়ের সান্নিধ্য পাও, ভালবাসা পাও, আর আমাদের মত ছেলেদের তো কেউ পাত্তাই দেয় না। অন্য কোন ছেলে এই সব কথা বললে কি করতাম জানি না, কারণ আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। বিনীত শুধু আমার অন্তরঙ্গই ছিল না, কিশোরগঞ্জে তাদের পরিবার ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠ

প্রতিবেশী, যদিও ওদের দেশ ছিল পশ্চিমবঙ্গে। তার পিতা কার্যোপলক্ষে কিশোরগঞ্জে ছিলেন transferable post-এ। বললাম, বিনীত কোনও মেয়ে বা নারীর সঙ্গে প্রেম বা ভালবাসাকে এতটা হালকা ভাবে নিও না। এটা জোর করে পাওয়া যায় না, নিজের থেকেই আসে। তোমার বয়স আর কত! তোমার জীবনেও হয়তো কোনদিন কোন নারীর ভালবাসার জোয়ার আসতে পারে। এটাকে খুব সুন্দর ও পবিত্র ভাবে নিও, সেই ভাবেই চিন্তা করো। প্রেম করব, বিয়ে করব না, প্রথম থেকেই এই মনোভাব থাকাটা একটা অসামাজিক ও নোংরামীর উদাহরণ। তোমার এই প্রস্তাব আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক। চল এবারে উঠি বলে, সেই আলোচনায় ইতি টেনে দিলাম। বিনীত একটু অন্যদিকে যাবে বলে সারকিট হাউস মাঠের দিকে চলে গেল। আমি ঠিক উলটো দিকে আপিস-কাছারি বাড়িগুলোর দিকে বা জুবলী ঘাটের দিকে রওনা হলাম। আমার পায়ে কাবুলী চটি, মানে পায়ের গোড়ালির দিকটা প্রায় খোলা। নদীর পাড়ের রাস্তা একেবারেই হাঁটার অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে, পাশের মাঠ ধরে হাঁটছিলাম। রাস্তায় আলো থাকলেও মাঠ ছিল অন্ধকার। কিছুদূরে হেঁটে যেয়ে যখন আমার বাঁ পা সামনে আর ডান পা পেছনে, তখন বাঁ পায়ের গোড়ালিতে প্রায় বরফের মত ঠাণ্ডা একটা শিহরণ অনুভব করে, অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে স্ট্যাচিউর মত দাঁড়িয়ে গেলাম। আর বাঁ দিকে শুধু মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম সাত-আট ফিট্ লম্বা একটা কাল সাপ বাঁ দিকের নদীর পারের রাস্তার দিকে যাচ্ছে। হাতের কাছে না পেলাম একটা উপযুক্ত লাঠি, না কোন আস্ত বা আধলা ইঁটের টুকরো। কিন্তু তখনই আমরা উল্টো দিক থেকে একটা মিলিটারি ট্রাক্ নক্ষত্র বেগে ছুটে আসছে দেখলাম। সাপটাও রাস্তা পার হচ্ছে আর ঐ ট্রাকটাও তার উপর দিয়ে চলে গেল। রাস্তার আলোয় আমি ঐ মাঠে দাঁড়িয়ে যখন সাপটার ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ দেখব বলে তাকিয়ে আছি, তখন ট্রাকটা চলে যেতেই দেখি সাপটা প্রকাণ্ড ফনা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে আর রাস্তার উপরই কয়েকবার ছোবল মেরে জুবলী ঘাটের পাশ দিয়ে নদীতে নেমে গেল। জীবনে আমি বহুপ্রকারের সাপ মেরেছি। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সাপ বড় একটা নিস্তার পেতনা। ঐ মাঠে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল যে আমার আর ঐ গোখুরো সাপের সেদিন ভাগ্য ছিল তুঙ্গে। মিলিটারী ট্রাকের তলায় পড়ে তার বেঁচে যাওয়া আর সৌভাগ্যবশতঃ মাঠে তার শরীরের উপর আমার পা না পড়া। কারণ ঐ মাঠে ঐ সাপের ছোবল খেলে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও তা কারুর কানে

পৌঁছুত না, আর পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যেই আমার আয়ু শেষ হয়ে যেত। আজ তা হলে বসে বসে এসব ঘটনাও লেখা হত না আর ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের পর থেকে যে সব ঘটনার কথা এ খাতায় লিখেছি তাও হত না। যা হোক অনেকটা পুনর্জন্ম নিয়ে সেই রাতেই কিশোরগঞ্জে ফিরে এলাম।

অনেকে বলে, "ঈশ্বরের মার, দুনিয়ার বার।" ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে শিলচরে চাকুরী করছি। ওখানের জল সহ্য হচ্ছিল না বলে বাণীকে কিশোরগঞ্জে রেখে এসেছি। বন্ধু রবিও তখন ময়মনসিংহে চাকুরী করছে। আমার বোন হেনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। একদিন শিলচরে, রবির নিকট থেকে এলো এক বিরাট চিঠি। সে লিখেছে "ময়মনসিংহে বি. এ ফাইনাল পরীক্ষা দেবার সময় বুলবুল নামে মেয়েটির কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। ব্রহ্মপুত্রের পারে বসে বিনীত তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল, সেটাও তুমি আমায় জানিয়েছিলে। গতকল্য সেই বিনীত ও বুলবুলের বিয়ে হয়ে গেল। তারই বিস্তারিত বিবরণ তোমায় দিচ্ছি। বি. এ. পরীক্ষার শেষে তুমি কিশোরগঞ্জ চলে গেলে, বিনীত সিনেমা দেখিয়ে, রেস্টুরেণ্টে খাইয়ে বুলবুলের ভাই মাখনকে হাত করে। কয়েক-দিনের মধ্যেই তোমার নাম দিয়ে বুলবুলকে প্রেমপত্র লিখে তার ভালবাসাকে গ্রহণ করে, আর জানায় যে এতদিন তোমাকে পুরো বিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি তোমাকে নিজের হাতে চিঠি লিখিনি, লিখিয়েছি অন্যকে দিয়ে। এখন কিশোরগঞ্জ থেকে আমি তোমায় চিঠি পাঠাবো বিনীতের ঠিকানায়। তোমার জবাব বিনীতের কাছে পৌঁছে দিলেই সে আমাকে কিশোরগঞ্জে পাঠিয়ে দেবে। এই ভাবে কিছুদিন ওদের চিঠির আদান প্রদান চললো। বুলবুলকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বা গরীবও বলা চলে। তাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরী করতে তার বাবার প্রাইভেট টিউটার রাখার ক্ষমতা ছিল না। সেই সুযোগে ভাই মাখনের যোগাযোগে বিনীত বুলবুলের ফ্রি প্রাইভেট টিউটার হয়ে গেল। তারপর এই ভাবে অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে, একদিন বুলবুলকে পড়ার টেবিলে বসে বিনীত বলেই ফেলল, যে তোমাকে এতদিন "মানিকের" নাম দিয়ে আমি-ই চিঠি লিখেছি, আমি-ই তোমাকে ভালবাসি। আমাকে ক্ষমা করো। একথা শুনে বুলবুল উঠে বাড়ির ভেতর চলে যায়। তিনদিন আর বিনীতের কাছে পড়তে আসেনি। বিনীত তাদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে ফিরে আসে। তারপর মাখনের দৌলত্যে আবার পড়াশুনো আরম্ভ হয়। বুলবুল বিনীতকে মেনে নেয়। বুলবুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর, তার বাবা বিনীতকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে

দুটো অসুবিধার কথা বলে, এক, সে এখনো একটা ভাল চাকুরী যোগাড় করতে পারেনি, দুই, ধীরে ধীরে তার বাবার মত নিতে সে চেষ্টা করছে। বুলবুলের বাবাও খুব ধড়িবাজ লোক ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জে যেয়ে, (আমাদের পাশের বাসার পোষ্ট-মাষ্টার তার আত্মীয়), সেখানে উঠে, দুদিন তিনি বিনীতের বাবার কাছে ঐ বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসে, ঐ বাড়িতে তাঁর আত্মীয়দের বলে যান, "আমি পণ্ডিত পাড়ার ওমুক! বিনীতের বাবা আমায় চেনে না এবার চিনিয়ে দেব।" বিনীতের বাবার তখন বদলী হয়ে যাবারও সময় হয়ে গেছে। বিনীতও সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বুলবুলের বাবা ময়মনসিংহে ফিরে এসে, পণ্ডিত পাড়ার কিছু গুণ্ডা ছেলেদের সাহায্যে, এক রাতে বিনীতকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিয়ে ময়মনসিংহ কালীবাড়ির কাছে একটা খালি বাড়িতে নিয়ে যায়। এবং ছুরি ভোজালি, তরবারী ইত্যাদি নিয়ে ঐ বাড়ি পাহারারত অবস্থায় বিনীত আর বুলবুলের হিন্দু মতে বিয়ে দিয়ে দেয়।"

রবি আরও লিখেছে যে বিনীত খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে, সে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় আছে বুলবুলকে ফেলে, কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ পাড়ার ছেলেরা তার উপর নজর রাখছে। আর আমিও তাকে দুবেলাই বোঝাচ্ছি।

আমি রবির চিঠিটা কিশোরগঞ্জে বাণীকে পাঠিয়ে দিলাম। সেবার ১৯৪৪ সালে ময়মনসিংহ থেকে ফিরেই বুলবুলের ঘটনা আমি বাণীকে বলেছিলাম এবং বুলবুলের চিঠিগুলোও তাকে পড়তে দিয়েছিলাম। তখনও আমাদের বিয়ের দুবছর বাকী। বাণী আমাকে বলেছিল, তুমি যেখানে যাও, সেখানেই গোলমাল পাকাও। মাত্র দশদিনে এক গোলমাল পাকিয়ে এসেছো। এইজন্যই লোকে বলে, তুমি 'কলির কেষ্ট।' রবির চিঠি পড়ে বাণী খুব খুশী হয়ে আমায় জানিয়েছিল, ঠিক হয়েছে, একটু প্রেমটেম্ করব, বিয়ে করবনা, এটা এতো সোজা নয়।

বুলবুলের চিঠিগুলো এখনও আমার পুরানো একটা ফাইলে আছে। এপার বাংলায় এসেও বিনীত ও বুলবুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে অন্য ইতিহাস! বাণীর মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে পড়ে বিনীত আমায় বহুদূর থেকে ফোনে সমবেদনা জানিয়েছিল, ১৯৯১ সালের ৭ই এপ্রিল, তখনই জেনেছিলাম বুলবুলও কয়েক ব'ছর পূর্বে পরলোকে চলে গেছে।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে শুধু ফুটবল খেলার জন্য কত জায়গায় যেতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কলিকাতা সমেত পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা ছাড়া, প্রত্যেকটি জেলা ও বহু মহকুমা, করদ রাজত্বের আমলে কোচবিহার

ও ত্রিপুরা রাজ্য, জলপাইগুড়ি, শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বিহারের মজঃফরপুর, পাটনা, বেতীয়া ও লক্ষ্ণৌ (UP) ইত্যাদি আরও অনেক জায়গার নাম এখন আর মনে নেই। এজন্য যে পড়াশুনোর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, শুধু তাই নয়, বি এ. কোর্সের ফিলজফি ক্লাসে আমরা মাত্র পাঁচ ছয় জন ছাত্র পড়তাম বলে, সেই ক্লাসে প্রক্সি দেবার সুবিধা না থাকায়, ঐ ক্লাসে আমার উপস্থিতি ছিল মাত্র ৩0%। বি এ. পরীক্ষার ফাইনালে শুধু প্রিন্সিপ্যাল আমার শ্রদ্ধেয় কুমুদবাবুর দয়ায় ও কৌশলেই বসতে পেরেছিলাম। ১৯৪৪ সালে বি. এ পাশ করার পর, চাকুরীর দরখাস্তের সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের একটা testimonial-এর প্রয়োজনে, কলকাতা থেকে তাঁকে একটা চিঠি লিখলে, উনি যে testimonial পাঠিয়ে ছিলেন তার একটা কপি নীচে দিলাম। আমার প্রতি ওঁর অসীম স্নেহ-ভালবাসা এতেই অনেকটা ফুটে উঠেছে।

Ananda Mohan College
Mymensingh
27 7 44

This is to certify that Barindra Nath Roy has been a student of the B. A. classes of this college for the last two years and has appeared at the B. A Examination this year.

His conduct and character are uniformly satisfactory. I am particularly impressed by his respectful and genial temperament and his capacity to adapt himself to a work he is entrusted with.

His abilities in games and sports are of a very high order and as a foot-ball full back he has been an outstanding success this year. He was the captain of the college football team for the last year.

I shall be very glad to see him get on.

sd /- Kumud Bandhu Chakroborty

পূর্বে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের ইন্সপেক্টরের চাকুরী নিয়ে ঢাকায় তিন মাস থেকে, আসামের কাছাড় জেলার হেড্‌কোয়ার্টার শিলচরে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত থাকতে হয়। প্রায় ৩৫ বছরের চাকুরী জীবনের এই দু'বছর তিন মাসকেই বলতে পারি আমার চাকুরী জীবনের

শ্রেষ্ঠ সময়। সুরম্য সুরম্য ভ্যালীর পূর্ব অংশটাই কাছাড় জেলা। চারদিকে সবুজ পাহাড় ঘেরা অতি সুন্দর ও মনোরম স্থান। এই জেলায় কাছাড়ি জাতি ছাড়াও বহু প্রাচীন আদিবাসী ও পাহাড়ী জাতির বাস। লক্ষ্মীপুর নামে একটি স্থানে বহু মনিপুরীও থাকে। সঠিক কতগুলো চা-বাগান ঐ জেলায় আছে তা আর আজ মনে না থাকলেও, আমার ধারণা একশটিরও বেশি। কাছাড় জেলার পূর্বদিকে মনিপুর, পশ্চিমে সিলেট (এখন বাংলাদেশ) উত্তরে আসামের লামডিং-শিলং আর দক্ষিণে ত্রিপুরা ও লুসাই হিলস্ বা বর্তমানের মিজোরাম রাজ্য। উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্থান ঘন সবুজ ও অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভিত। এই জেলার হিল্ স্টেশন হাফ্লংকে বলা হত মিনি শিলং। আসল নদী "বরাক" যার জন্য এর বর্তমান নাম হয়েছে "বরাক-ভ্যালী"। বরাক নদী ছাড়া চারদিকে পাহাড়ের উপর থেকে জমাট্ বৃষ্টির জল ঝরণার মত পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে, সমতল ভূমিতে পড়ে, কত যে ছোট ছোট নদী বা নালা সৃষ্টি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই জলস্রোতের সঙ্গে ছোটবড় নানা রং-এর পাথরের টুকরো ভেসে এসে ঐ ছোট ছোট নদী বা নালাগুলোকে অপরূপ সৌন্দর্যে শোভিত করেছে।

চা-বাগানগুলো, চা-এর উপর সঠিক শুল্ক দিচ্ছে কিনা বা শুল্ক না দিয়ে কোন বাগান থেকে চোরা পথে চা বার হয়ে যাচ্ছে কিনা, এটা লক্ষ্য রাখাও আমার কাজের একটা বড় অঙ্গ ছিল। শিলচর থেকে নিকটে বা দূরে চা বাগান পরিদর্শনের পথে, উপরোক্ত নদী-নালার নৈসর্গিক দৃশ্যে অভিভূত হয়ে আমি কখনো কখনো একেবারে নির্জন স্থানে বসে থাকতাম। মনে হত আমি যেন সমাজ-সংসার, লোকালয়, এমনকি, পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে এসেছি, এই সব ভাবনায়, অনেক সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। শেষে একসময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে অসময়ে চা-বাগানে পেঁছে কাজ সেরে আর শিলচরে ফিরে যেতে পারতাম না। চা-বাগানের আশ্রয়ে রাত কাটিয়ে পরের দিন ফিরে যেতাম শিলচরে। এই সব কারণে চা-বাগান পরিদর্শনে আমার বিলম্ব হয় বলে, উপরওয়ালাদের কথাও শুনতে হত আমাকে। প্রায় সর্বস্থানেই আমি সাইকেলে যাতায়াত করতাম। অনেক চা-বাগানে যেয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলে এবং শিলচরে ফিরে আসার তাগিদ থাকলে, বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের ট্রলি করে শিলচরের উপকণ্ঠে পেঁছুতে আমাকে সাহায্য করত। সন্ধ্যে বা রাতের এই ট্রলি যাত্রা পথে বহুবার বাঘ বা অন্য জানোয়ারের পাল্লায় পড়েছি কিন্তু কোন ক্ষতি

হয়নি। কয়েকবার হাতীর পাল্লায় পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে গভীর রাতে শিলচর ফিরে এসেছি। বহুবার এমনি চা-বাগানে পরিদর্শনের কাজে গিয়ে, সাহেব ম্যানেজারদের বাঘ বা হাতী শিকারেও সঙ্গী হয়েছি। একবার তো অনুমতিপ্রাপ্ত একটা পাগলা হাতীর শিকার স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্যও হয়েছিল। মাসের পনের-বিশ দিন আমি চা-বাগানের কাজেই কাটাতাম বলে, আমাদের কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের উপরওয়ালাদের কাছে আমার বদনাম হয়ে গেল, "চা-বাগান-পিয়াসী"। শিলচর ও চা-বাগানের দু'বছর ও তিন মাসের সব কাহিনী ও অভিজ্ঞতা লিখতে গেলে একটা মোটা বই হয়ে যাবে, তাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করছি।

…১৯৪৪ সালে শিলচর এবং কাছাড় জেলায় "ভুঁইয়া" কোম্পানীর ছিল সব চাইতে বড় ব্যবসা। ওদের কোন এক শরিকের সঙ্গে বাবার বিশেষ পরিচয় ছিল, ওদের দেশও ছিল আমাদের সোনারগাঁও-এর বাড়ির কাছেই। আমি তখন ব্যাচেলার। শিলচরের মতো অচেনা জায়গায় গিয়ে কোথায় উঠব, কোথায় থাকব, এই সব ভেবে, বাবা ঐ শরিকের লেখা একখানা চিঠি আমার সঙ্গে দিয়ে দেন। তখন শিলচরের ভুঁইয়া কোম্পানীর বয়োজ্যেষ্ঠ ও সর্বমান্য ছিলেন প্রয়াত গিরীশ চন্দ্র ভুঁইয়া। তাঁকে ঐ শরিকের চিঠি দেখালে, উনি বলেন যে তোমার তো আলাদা বাসার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের এখানেই একটা আলাদা ঘরে থাকবে ও খাবে। গিরীশবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলো, দাদু-নাতি, এটা হচ্ছে গ্রাম সম্পর্কে। প্রায় আট-নয় মাস ওখানে ছিলাম। ঐ পরিবারের এবং ব্যবসায় নিযুক্ত কর্মচারীদের আদর, যত্ন ও ব্যবহারে আমি সত্যি একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। অনেকের নাম এখন আর মনে না থাকলেও সকলের মুখই চোখে ভাসে। গিরীশ দাদুর ছেলে বিনোদকাকু, ভাইপো যশোদাকাকু, নিরঞ্জন কাকু, রঞ্জু ভুঁইয়া, ওদের আপিসের শ্রীধীরেন সাহা যার সঙ্গে আজও পত্রালাপ আছে, এদের আরও অনেকের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। এরা সকলেই আমার আত্মীয়ের চেয়েও বেশি ছিল। শিলচরের আরও কয়েকটা পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, সে সব পরিবারের অনেকেই তখন আসাম, বাংলা এমন কি ভারতেও পরিচিত। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য অনিল চন্দ ও রানী চন্দ, ভারত সরকারের প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ দেবের পিতা সতীন্দ্র মোহন দেব। সতীন্দ্রবাবু একসময়ে আসামের এম. এল. এ. ছিলেন। উনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, আমিও তাঁর তারাপুরের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম।

আরও একটি পরিবার, যারা শিলচরের "ওরিয়েন্ট সিনেমা"-র মালিক ছিলেন, তাদের কারও নামই আজ আর মনে পড়ছে না। সেই 'সিংহ' উপাধি পরিবারের একজন আসাম সরকারের এম. এল. এ. ছিলেন। আমি লুকিয়ে অন্যকে দিয়ে ওদের সিনেমা হলের টিকিট কিনিয়ে এনে, হলে প্রবেশ করলেও, কিছুক্ষণ পরই, ওদের পরিবারের কেউ বা ম্যানেজার ঠিক জানতে পারতো, আর আমার নিকট হতে টিকিটের কাউন্টার পার্ট সংগ্রহ করে, তার মূল্য জোর করে পকেটে ভরে দিত।

আমি তখন প্রায় খেলাধুলোয় অবসর নেবার মুখেও মাঝে মাঝে ফুটবল খেলি এবং গান গেয়ে বেড়াই। এতে ওখানে দু'তিন মাসের মধ্যেই সারা শহরে পরিচিত হয়ে যাই। গিরীশ দাদুর কথামতো আমি শিলচরের টাউন ক্লাবে খেললেও, ওখানে অন্য একটি টীম্, ইন্ডিয়া ক্লাব, আই. এফ্. এ শীল্ড খেলতে আমায় কলকাতা নিয়ে আসত। এই খেলার সাথীদের মধ্যে বটুবাবু ও উমেশবাবুর নাম আজও মনে আছে। ১৯৪৫ সালে আগের বছরের শীল্ড চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে টীমের বিরুদ্ধে খেলার একটা পেপার কাটিং ফাইলে পড়েছিল তার সংক্ষিপ্ত কপি নীচে দিলাম। আমার ছুটি ছিল না বলে এখানে এবং গ্রুপ ফটোতে safety-র জন্য আমার ডাকনাম 'মানিক' দিয়েছিলাম।

STATESMAN

I. F A Shield, 1945

EASY WIN FOR SHIELD HOLDERS

Silchar's Mediocre Display : B. & A. Rly. To Meet Mohun Bagan

B. & A Railway (4) : India Club (Silchar) (1)
(Alauddin 2, Nandy, Kar) (Chootia)

The India Club from Silchar played the first of the Shield tournament on Friday when playing against the holders, on the C F. C. ground to-day went down by four goals to one. The Railway are due to meet Mohun Bagan in the second round

The standard of football, at best, proved to be mediocre.

The visitors were assisted by H. Mozumdar of Mohun Bagan, but owing to lack of co-ordination the visiting forwards failed to make much headway against the dependable Railway defence The armen of the visiting team inspite of Railway's scoring four goals against them worked hard to a man specially the backs kicked and tackled well.……………….

TEAMS :

B. & A. Railway : P. Ghosh, Yusuf and N. Majumder, B. Kundu, M. Banerjee[১], and B. Mukherjee, N. Nandy[২], S. Bose, B. Kar, A. Majumder and Alauddin

India club (Silchar) : U. Kar, J. Das Gupta and Manik K. Mozumdar, A. Gupta and A. Goel, H. Bahadur, H. Mozumdar, R Chootia, A. Karim and B. Roy Chowdhury.

কাছাড়ের এতো সব চা-বাগানের মধ্যে কয়েকটা নাম এখনও মনে আছে, যথা কুঠাল, ধুয়ারবন্ধ, জিরিঘাট, ঢাকা, রামপুর, কাৎলিচারা। শিলচর থেকে প্রায় আঠার মাইল দূরে লক্ষ্মীপুরের পথে, তারাপুর টি কোম্পানী, দেওয়ান টি এষ্টেট নামে পর পর সাতটা চা-বাগান ছিল। দেখবার মতো সাজানো সব বাগান। এই বাগানগুলোর সব সাহেব ম্যানেজারের উপর একজন সুপারিনটেন্‌ডেন্‌ট ছিলেন মিঃ পিয়ারসন কি মিঃ এন্‌ডারসন। ওঁর সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর খুব সুনজরে পড়ে গিয়েছিলাম। এদিকটায় কাজে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যাবার উপায় ছিলনা, অথচ উনি তখন আসামের এবং বাংলার ইংরেজ গভর্নরদের বন্ধু স্থানীয় লোক ছিলেন। এই বাগানগুলোরই একটাতে ডাক্তার ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় বাসনা মাসীমার বড়দা ডাঃ শৈলেশ ঘোষ। ঐ বাগানের প্রথম পরিদর্শনেই ওঁনার সঙ্গে পরিচয় হয়। কতই না ভালবাসতেন আমায়। এক বা দুমাসের মধ্যে ওদিকে না গেলেই আমাকে যাবার জন্য খবর পাঠাতেন। গেলে দুএকদিন না থেকে আসতে পারতাম না। দুপুর বেলা বাগানের একটু কাজটাজ সেরে প্রায় সারাদিন আমাকে গান গাইতে হত। ঐ পরিবারের সকলেই খুব গান ভালবাসতেন। সেই আমার পরম সুহৃদ ও হিতাকাঙ্ক্ষী ডাক্তারবাবু আর নেই।

(১) মোহিনী ব্যানার্জী—ভারতের পক্ষে international game খেলতেন।

(২) N. Nandy—Olympian.

১৯৫৭ সালে ইম্ফল থেকে তিন দিনের জন্য শিলচর বেড়াতে গেলে শিলচর শহরের একটা ঔষধের ডিস্‌পেন্‌স্যারিতে ওঁনার দেখা পাই। আমি, আমার স্ত্রী বাণী ও ছোটছেলে টুস্‌নু ওঁনাকে প্রণাম করলে, উনি আমাদের জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। এটাই ওঁনার সঙ্গে শেষ দেখা।

এমনই আরও কিছু চা-বাগান ছিল, সেখানে কয়েক মাস যেতে বিলম্ব হলেই যাবার তাগাদা বা আমন্ত্রণ পেতাম। কোথাও গানের আসরের জন্য, কোথাও ব্যাড্‌মিন্‌টন খেলার জন্য, কোথাও শিকারে যাবার জন্য, কোথাও বা ফুটবল খেলার জন্য। শিলচর শহরে বড় একটা থাকতেই পারতাম না।

বর্তমান মিজোরাম, তখনকার লুসাই পাহাড় ছিল নন্‌-রেগুলেটেড্‌ এরিয়া। যার হেডকোয়ার্টার ছিল 'আইজল', অনুমান চারহাজার ফিট্‌ পাহাড়ের উপর। ওখানের পলিটিক্যাল এজেন্টের অনুমতি ছাড়া লুসাই পাহাড়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নৌকোপথে মাল নিয়ে শিলচরের কিছু ব্যবসায়ী আইজলের পারমিট নিয়ে যাতায়াত করতো। একবার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দশদিনে আইজল ঘুরে এলাম খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে। ওখান থেকে স্থানীয় এক রকম তামাক, নাম 'ভাইলো টোবাকো'-র নমুনা সংগ্রহ করে এলাম। আর দেখলাম পাহাড়ে-জঙ্গলে কফি হয়ে ঝড়ে পড়ে থাকে। শিলচর ফিরে এসে শুনলাম আমাদের সুপার সাহেব আমি মিসিং বলে থানায় রিপোর্ট করেছেন। বিনা শুল্কের চা একটা নৌকোয় আইজলের দিকে যাচ্ছে, এই সন্দেহে পেছনের আর একটা নৌকোয় ফলো করে আইজল পৌঁছেছিলাম। কিন্তু আগের নৌকো পূর্বেই আইজলে পৌঁছে যাওয়ায়, সেই নৌকো আর ধরতে পারা গেলনা এই রিপোর্ট ও তার সঙ্গে কফি ও স্যাম্পল সমেত "ভাইলো টোবাকো'-র রিপোর্টও দিলাম।* ছ'মাস পরে কলকাতার কাস্টম হাউস থেকে সুপারের কাছে অর্ডার এলো, আমাকে নিয়ে আইজল যেয়ে 'ভাইলো টোবাকো' ও কফির সার্ভে করে এসে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পাঠাতে। পূর্বের সুপার বদলী হয়ে তখন নতুন সুপার এসেছেন আমার পূর্ব পরিচিত শ্রী পি. সি. মুখার্জী। উনি তো কলকাতা হেড অপিসের চিঠি পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। আমায় ডেকে এনে বললেন, "এটা করেছেন কি? আইজলেতো কোন বাস্‌ বা অন্য কোন গাড়ি যাবার রাস্তা নেই। শুধু যুদ্ধের জন্য মিলিট্যারি জীপ ও ট্রাকে বার্মা যাবার জন্য সামান্য রাস্তা করা হয়েছে। নৌকোয় ১০ দিনের জন্য গেলে তো মারা পড়ব।" আমি বললাম, "আপনি

* উক্ত অননুমত (unauthorised) যাতায়াতকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য।

চিন্তা করবেন না, মিলিটারি জীপ বা ট্রাকেই আমি ব্যবস্থা করব।" ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজে থাকতেই উনি আমায় জানতেন, তাই বললেন, "আমি জানি না, যা করার আপনি করুন।" সে সময় অ্যালায়েড্ ফোর্সের শিলচর মিলিটারি সেণ্টারের ভীইকল্-ফ্লীটের তত্ত্বাবধানে ছিল 'ওয়েল্সের' এক ক্যাপ্টেন। লক্ষ্মীপুরের এক প্রান্তে লুসাই বসতির হেড্ম্যান ও তথাকার ওয়েল্স মিশন চার্চের ফাদার ছিলেন রেভারেণ্ট থিয়াঙ্গা। আমি ও ঐ ক্যাপ্টেন ছিলাম ঐ পরিবারের কমন ফ্রেন্ড। সেই ক্যাপটেনকে বলে, একদিন মিলিটারিদের গাড়ীতেই রওনা হয়ে গেলাম আইজল। বাস্তবিক কোন গাড়ীর রাস্তা তখনও তৈরী হয়নি। হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বহু পরে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অনেক জাঁকজমকের মধ্যে সে রাস্তা চালু করতে গিয়েছিলেন। আর আমি তখন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে খবরের কাগজে সেই খবর পড়ে খুব থ্রিল্ অনুভব করেছিলাম। আমাদের সুপার মুখার্জি সাহেব খুব ভীতু লোক ছিলেন। শিলচর থেকে দুদিনে আমরা আইজল পৌঁছুলাম। এব্‌রো-খেব্‌রো সরু রাস্তায় আমাদের গাড়ী চলছিল কখনো উদয়শঙ্কর কখনো অমলাশঙ্কর হয়ে। মুখার্জী সাহেব তাই বলছিলেন আর হরিনাম জপ করছিলেন। আশেপাশের খাদে বহু মিলিটারি গাড়ীর ভগ্নাবশেষ পড়ে থাকতে দেখেছি। দ্বিতীয় দিন দুপুরে আইজল পৌঁছে, দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে ছয় ফিট্, আধহাত লম্বা দাড়ি, এক লাল মুখো দৈত্যের মতো খাস ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাজের আলাপ-আলোচনা করে, আমরা সারকিট হাউসে যেয়ে উঠ্লাম। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল পাঁচ দিনের, কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেল দুদিনে। পাঁচদিনের পূর্বে গাড়ী পাওয়া যাবে না। পলিটিক্যাল এজেণ্ট দৈত্যের মতো দেখতে হলেও মনটা ছিল উদার। দুতিন দিন ওখানে অলসের মতো বসে না থেকে, আমি চল্লিশ মাইল দূরে বার্মার সীমান্ত 'লুংলে' নামক স্থানে যেতে চাইলে উনি দুটো পোনি (pony) ও একজন গাইডের ব্যবস্থা করে দিলেন। মুখার্জী-সাহেব কিছুতেই রাজি না হওয়ায়, আমি একলাই প্রায় বিনা খরচে 'লুংলে' উক্ত গাইড সহ ওখানের ডাকবাংলোতে রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন ছোট্ট কি একটা নদী পার হয়ে বর্মা রাজ্যের ভেতরে প্রবেশ করি। দূর থেকে চীন্ হিল্স-ও দেখে এলাম। আমার আইডেন্‌টিটি কার্ড (পরিচয় পত্র) দেখালে বর্মার পুলিশ আমার সঙ্গে যথেষ্ট সহৃদয় ব্যবহার করেছিল। এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, ঐ সুযোগে, আইজল এবং বিশেষ করে 'লুংলে' না ঘুরে এলে, এ জীবনে আর

পয়সা খরচ করেও ওদিকে যাওয়া হত না।

সারকিট হাউসের সামনে একটা মোটামুটি সমতল মাঠ ছিল। একদিন সকালে দেখছিলাম দুটো প্রায় নেংটি পরা মানুষ, হলুদ-ফর্সা গায়ের রং, মুখে মঙ্গোলিয়ান ছাপ, সারা শরীরে ও মুখে যেন ছোপ্ ছোপ্ মাটির দাগ যা দেখে মনে হতে পারে যে এরা কোন দিন স্নান করে না! তাদের একটা জীপ গাড়ীতে ঐ মাঠে ঘোরান হচ্ছে। আইজলের কিছু সরকারী কর্মচারী, যারা এই কাজে ব্যস্ত ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ইন্দোবার্মা বর্ডারের কোনও একটা পাহাড়ী গ্রাম থেকে এই দুজন লোককে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, সভ্যতার আলো দেখাতে। ঐ গ্রাম বা ঐ গ্রামের মানুষ তখনও ভারতীয় প্রশাসনের মধ্যে আসেনি। এই লোক দুটো সব দেখে বুঝে ফিরে যেয়ে যদি ওদের সম্প্রদায়ের মানুষজনকে সভ্যতার দিকে আকর্ষণ করাতে পারে, তবে ওদের হয়তো প্রশাসনের মধ্যে আনা হবে। এটা একটা উল্লেখ করবার বা বলার মতো জিনিষই দেখে এসেছিলাম। আইজলে বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু লুসাই পরিবারও আমাদের নজরে পড়ে। তখনকার লুসাই পাহাড়ের সর্বেসর্বা ছিলেন পলিটিক্যাল এজেন্ট। যতদূর জেনেছিলাম পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিল ভাইসরয়ের Representative. Postal Department বা অন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ থাকলেও, পলিটিক্যাল এজেন্টের কথাই ছিল শেষ কথা, অর্থাৎ ওখানে বা ঐ সব বিভাগে কে থাকবে আর কে থাকবে না এটা তার মর্জির উপর নির্ভর করত। পাঁচদিন পর আমরা আবার একদিন শিলচরে ফিরে এলাম। 'আইজল' সত্যিই ছবির মতো সুন্দর!

পূর্বে উল্লিখিত কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুরের একপ্রান্তে পাহাড়ী জঙ্গল-টিলার উপর ছিল বহু লুসাইদের বসতি। লক্ষ্মীপুর থেকে মণিপুর বর্ডার জিরিঘাট যেতে রাস্তার ধারেই এই বসতি। কয়েকশত ঘর লুসাই এখানে বসবাস করত। মোটামুটি কিছু শিক্ষিত পরিবারও ছিল তবে তারা প্রায় সকলেই ক্যাথলিক খৃস্টান। এখানে এক টিলার উপরেই ওয়েলস্ মিশনের একটা চার্চ ছিল। এই চার্চের ফাদার ছিলেন রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গা। তাঁর চার ছেলে ও তিন মেয়ে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গার চার ছেলেই Armyতে কাজ করত। বড় মেয়ে রোসিয়ামার স্বামী ডাক্তার, তিনি তখন সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হাতে যুদ্ধ বন্দী। মেজ মেয়ে ভীমুলি উইমেন অ্যাক্সিলারি কোরে শিলচরে চাকুরী করত। ছোটমেয়ে সোয়ামী তখন ব্রুক্

পরা সাত-আট বছরের মেয়ে। লক্ষ্মীপুর ডাক বাংলোতে একদিন রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভদ্রলোক প্রথম পরিচয়েই আমাকে এতো আপন করে নেন্ যে এরপর আর কোন দিন লক্ষ্মীপুর কাজে এসে, তার বাংলো ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারিনি। ঐ রেভারেণ্ড ও তাঁর স্ত্রী ক্রমে ক্রমে আমাকে একেবারে তাঁদের adopted Son এর মতো করে নেন্। আর রোসিয়ামা আমাকে করে নেন্ তাঁর বন্ধু। তাঁর কোলে তখন রয়েছে দু'বছরের এক ছেলে, শুনেছিলাম, পরে সেই ছেলে I. A. F.-এর পাইলট অফিসার হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে একদিন ডাঃ রোসিয়ামাও ফিরে এসেছিলেন, ১৯৫৭ সালে ঐ লক্ষ্মীপুরের বাড়িতে ডাঃ রোসিয়ামার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরে উনি, মিজোরাম রাজ্য সৃষ্টি হবার পূর্বে, লুসাই কাউনসিলের সদস্য হয়েছিলেন আইজলে। ১৯৪৫-৪৬ সালেই রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গার বাড়িতে, লুসাই বসতির মিঃ বস্চুকা নামে আমাদের সমবয়সী একটি শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে-ও ঐ লুসাই কাউনসিলের সদস্য হয়েছিল। তারপর মিজোরাম রাজ্য গঠিত হলে বান্ধবী রোসিয়ামাও বহুদিন ঐ রাজ্যের এম. এল. এ. ছিলেন। চিঠিতে বা খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পড়ে আমি কি যে আনন্দই পেতাম! আজ ডাঃ রোসিয়ামা ও মিঃ বস্চুকা আর বেঁচে নেই।

ইংরেজ আমলে X-mas এর ছুটি ছিল দশ বার দিনের। ফাদারের সব ছেলে-মেয়েরা তখন লক্ষ্মীপুরের ঐ বাড়িতে এসে জড়ো হতো। আমাকেও দুবার ঐ সময়ে ওদের সঙ্গে ঐ বাড়িতেই থাকতে হয়েছিল। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দের ফোয়ারা চলত। আমার সবচাইতে ভালো লাগতো এটাই, রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা ছেলে-মেয়েরা ওখানের প্রচণ্ড শীতে বেরিয়ে পড়তাম টিলার উপর এবাড়ি ওবাড়ি। শুকনো গাছের ডাল ইত্যাদির স্তূপ্ দাঁড় করিয়ে আমরা Scouting করার সময় যে ভাবে Camp-fire করতাম, ঠিক তেমনি এইসব পাহাড়ী বাড়িতে বাড়িতে ফাঁকা জায়গায় ঐ রকম আগুন জ্বালিয়ে বুড়ো থেকে বাচ্চা পর্যন্ত সব ছেলে-মেয়ে চারদিকে জড়ো হয়ে বসে কোরাসে লুসাই ও হিন্দী গান গাইতো। শীতের রাতের ঘন অন্ধকারে প্রায় বাড়িতে বাড়িতে ঐ অগ্নিকুণ্ড, পাহাড়ী গ্রামের একটা নতুন ও অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করত। এই রকম অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে ওদের অনুরোধে আমিও কত বাংলা এবং হিন্দী ভজন গেয়ে ওদের বাহবা পেয়েছি এবং নতুন নতুন বাড়িতে পরের রাত্রির জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এ দৃশ্য ও আনন্দ আমি আর

কোথাও পাই নি। এখনও মনে হয় যেন সব স্বপ্ন। ফাদারের স্ত্রী আমায় কাছে পেলেই মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে কি আদরই না করতেন, অন্যের কাছে পরিচয় দিতেন "my Bengali son." ঐ ভদ্রমহিলা ১৯৫৩ সালে মারা যান। ১৯৫৭ সালে আমি ঐ বাড়িতে যেয়ে ওঁনার সুন্দর কবরে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করে আসি। Dr. Rosiama ও Mrs. Rosiama আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। এ সময় আমার চোখের জল হয়তো ওঁদের চোখের জলকেও আকর্ষণ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ফাদার চার্চের কাজে চারদিনের জন্য পাহাড়ের অনেক ভেতরে চলে যাওয়ায় ওঁর সঙ্গে দেখা হয় না। ১৯৬৭ সালে ফাদার হাফ্‌লং এ মারা যান। আমাকে আর একবার তাঁর দেখার বড় সাধ ছিল। তা আর পূরণ হয় নি।

রেভারেন্ড থিয়াঙ্গা ও বান্ধবী রোসিয়ামার আন্তরিক ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাদের লেখা দুখানি চিঠির কপি এখানে দিলাম।

My Dear Son,

I have duly received your letter dated 2-10-65. As I was busy for some days with mission accounts I could not reply your letter immediately. I will never forget you in my life as I really felt that you are one of my sons. Your letter really reminded me all the time past especially the life and the complexion of late Maj. B. Hanner,* who passed away in a very awkward time. And after you left Cachar District Dr. Rosiama and my wife also have left the world. I sometime feel very lonely here in Haflong, as it is a place where all my children were born. But the Almighty God whom I served for a pretty long time comforted me unspeakably and gave me spiritual enjoyment in my heart. This is only the pride and the joy of my life at present.

I wish you to come back to Cachar District and meet me once more If that can be achieved I shall be very glad and happy indeed In case if you come to Silchar on official duty or for any other purpose please inform me, and I will arrange

* রেভারেন্ড থিয়াঙ্গার সেজ পুত্র।

myself to meet you there. I am very glad that you all are keeping well and also that your children are attending their school regularly. I do hope that in every thing God will bless you and guide you to achieve your life career in all things Lastly, I wish you to think about Christianity and read Holy Bible at your leisure, that will really give you clear understanding of true God who is the creator of all things and the source of all the human lives. If possible, I wish you to come and see our little town Haflong. Probably, you have never been in this town. Swami my last daughter is now in Imphal with her husband who is S D. C in Central Government, and she was blessed with a daughter in Imphal. I hope they are still a happy couple by the grace of God. She too whenever I met her used to talk lot about you. I hope this letter will find you in good condition.

I am closing with love and good wishes to you all.

Yours very sincerely,
Rev. Thianga I/C
Cachar Hill Tribes Syned, Haflong,
N. C. Hills.

Dated Haflong,
The 19th. Oct. '55.

Fulartal, 25th Feb. '57
(Cachar)

Dear Barin,

Thanks so much for your letter which reached me just the other day I wish to be prompt in replying this one as I have one great news to tell you, a news which I want to impart to my near & dear ones as quickly as possible It's a new addition to the family circle—a son was born to my eldest son on 18th Feb. at 4-20 A. M. Now, you owe me another congratulation, and I hope it will not be long in coming. Both the mother & child are doing fine. We expected the baby to come by the first week of March, so my

son has applied for leave to come though just at this time, and now he is going to be too late for the arrival of the baby, but he will be pleased to see then when he arrives which will be round about the 1st of March. Now, with two grandsons on my lap I feel quite proud and happy as well. I am sending the news to Swami and my father also. I think my father will try to come & see the newcomer as soon as possible Don't you think it is nice to talk about a new life than of death ? So, my college attendence is suspended for some time. I hope to resume by next week, all being well I think we are having one of the numerous tests sometime in March. At the present rate of study. I am rather doubtfull, but when I hear my wellwishers encouraging me, cheering me to go on, I find new courage and new confidence Thank you once again for your fervent encouragement and I know you have nothing but the best for me in heart. Sometimes I get to be absent minded—perhaps this is the reason why I have written your incorrect address. From now on I will not repeat the same error I'll tell you one very funny incident—I posted a letter for my brother-in-law once, who is at Lungleh. I gave his name and address alright but instead of writing P. O. Lungleh I wrote P. O. Fulartol and to my surprise the letter came back to me the next day. Not knowing the big mistake I made, I started cursing the Post master in particular and all the Indian Postal Services in general, and of course, when I saw the mistake I made, I restrained all my cursings and started blessing the 'wise' good Post-master for having the sense to return the letter to me, the very writer. So you see, when one is occupied in performing a hundred and one duties, it is too, too, easy to be careless every once in a while Last week and the week before that I was almost turned out of my own house by the election propagandists of all parties I grew so disgusted hearing them blowing their own trumpets so shamelessly that

I felt like driving away everyone of them with a big club. I called them shameless because most of them are of good and rich family, who, at normal times, do not care a piece for people like us, and then, just when they think we can be of use to them & their purpose, they shamelessly come pretending to be our best friends. I tell you, most of these men will treat us again just like dirt as soon as they get what they want, they will not come near us again even at a speaking range. So much for politics !

How's life treating you ? I hope you & yours are doing fine. When my eldest son arrives, I am thinking of taking a family group photo & if this is done & done well, I will send one to you. You see, in this God forsaken, out of the way place, there isn't even one professional photographer and so, the one we take have to be enlarged at Silchar studio. I got one letter from England last week. She[1] is doing fine with her two girls growing up, free to take up a part time job. I do hope God will be kind & gives us at least one more chance to have a family reunion, though quite a number of us are gone to the everlasting home, those who are still left behind ought to have at least one chance to get together. When I think of all the diverse ways that we have gone, I ask myself—Is there any other family like us ? whenever I think of them, I forget the thousands of miles that separate us, but when the real truth hits me, I simply quote Alas ! recollection at hand soon hurries me back to despair ! By all means call me Rose or Rosy - this is the name by which I am known to all my English speaking friends and I quite like it too—not discarding my husband's name altogether, yet having an agreeable sound and feminine too. I'll be looking forward to your letter and untill then let me wish you all the best at all time.

your very dear friend,
Rosy.

---

(1) Younger daughter Vimli who married a Walse Captain of the English Army.

যে দুর্লভ ঘটনার জন্য এই পরিবারের কথা উল্লেখ করেছি, সেটা এবার বলছি। অ্যালায়েড ফোর্সের শিলচরের মিলিটারি গাড়ীগুলোর চার্জে যিনি ছিলেন, সেই ওয়েলসের ক্যাপটেন ছেলেটি ও ফাদার থিয়াঙ্গার মেজ মেয়ে ভীমুলির মধ্যে ভালবাসা হয়। খৃষ্টান পরিবারে এটা একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপারই নয়। কিন্তু ঝামেলা বাধল, ওয়েলসের যুদ্ধকালীন আইন নিয়ে। ওদেরকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে ক্যাপটেন জানালো যে ওয়েলস্ সরকারের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করলে, সে তার স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবে না। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, সে ওয়েলসে গিয়ে, তার সরকারের অনুমতি নিয়ে, ভারতে ফিরে এসে ভীমুলিকে বিয়ে করে পরে তার দেশে নিয়ে যাবে। এই কথার উপর ফাদার বা তার পরিবারের কেউ ভরসা করতে না পারায় এবং অন্যদিকে ভীমলিও ঐ ছেলেকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না বলে জেদ করায় সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। সব চেষ্টা বিফল হয়ে গেলে, ফাদার শিলচর এসে আমাকে বলেন যে তার পরিবারের সকলেই আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তাই ভীমুলিকে আমি এটা যে একটা অসম্ভব ব্যাপার সেটা ভাল করে বুঝিয়ে বললে, সে বুঝবে। আমি নিজে তখন অবিবাহিত, তা ছাড়া এমন স্পর্শকাতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আমার মোটেই ভাল লাগেনি, কিন্তু ক্রন্দনরত পিতা আর বিশেষ করে ঐ ফাদারকে এ ব্যাপারে অসম্মত হবার মতো কঠোরতা আমি দেখাতে পারিনি। তাই একদিন লক্ষ্মীপুরে ওদের বাড়িতে যেয়ে বিকেলে ভীমুলিকে নিয়ে পাহাড়ীদের পাতা বাঘ ধরার ফাঁদ দেখতে যাই। একটা ফাঁদের কাছে পেঁাছেই ভীমুলি আমায় বলে কোন ফাঁদেই বাঘ পড়েনি, যে কথা বলার জন্য ডেকেছ তা বলে ফেল। আমি কিছুটা থতমত খেয়ে তাকে তাদের বিয়ের প্রস্তাবের অবাস্তবতার কথা বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু অসফল হয়ে ফিরে এসে ফাদার ও তাঁর স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়ে চলে আসি। ১৯৪৫-এর শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এশিয়াতেও শেষ হয়ে যায় এবং ওয়েলসের ক্যাপটেনও তার দেশে চলে যায়। মনে হয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি শিলচর থেকে বদলি হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের আশুগঞ্জ-ভৈরববাজারে আসি। সেই বছরেরই ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের আর ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীন পতাকা ওঠে। দেশভাগের পর, ১৯৪৮।৪৯ সালে আমি যখন কাটোয়াতে চাকুরীরত, তখন লক্ষ্মীপুরে ভীমুলি ও ঐ ওয়েলসের ক্যাপটেনের বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পাই ফাদারের নিকট থেকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে অতদূরে আমার যাওয়া সম্ভব না হলেও, বিয়ে করে ওয়েলসে

ফিরে যাবার পথে ফাদারের অনুরোধে দমদম বিমান বন্দরে আমি ভীমুলি ও তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে, তাদের দুজনকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভীমুলি এক ফাঁকে আমায় কানে কানে বলে "দেখলে তো সেই বাঘ ধরার ফাঁদের ধারে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে ওকে আমি সত্যি চিনেছি, তোমাদের ভয় আমার মনে নেই।"

ঘটনাটা খুবই ছোট করে লিখলাম। মনে হয় এমন ঘটনাকেই হয়তো বলা যায় "facts are stranger than fiction"

শিলচরের একটি বাঙ্গালী পরিবারের সংগে খুব বেশি মিশেছিলাম। ওখানের ডেপুটি পোস্ট মাস্টারের পরিবার। ঢাকার লোক। ভদ্রলোকের এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। বড় মেয়েকে দিদি বলে ডাকতাম আর অন্যদের নাম ধরে। আদরে ও যত্নে ওঁরা আমাকে নিজের পরিবারের একজন করে নিয়েছিলেন। সপ্তাহে দু এক দিন ওদের বাড়িতে আমাকে খেতেই হতো। ঐ বাড়ির তৃতীয় ও চতুর্থ মেয়ে আমাকে সত্যি-ই খুব ভালবাসত! শিলচরে বহুলোক ভাবত আমি ঐ বাড়িরই জামাই হব, যেমন লক্ষ্মীপুরের বাঙ্গালীরা ভাবত আমি লুসাই বিয়ে করে খৃষ্টান হয়ে যাব। যাহোক্ ডেপুটি পোস্ট-মাস্টারের চতুর্থ মেয়ে গীতা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল আমাদেরই বিভাগের এক সাব-ইনস্পেকটারকে। সেই সাব-ইনস্পেকটর ও গীতা একদিন খুব করে আমায় ধরে বসল তৃতীয় মেয়ে সীতাকে বিয়ে করতে এবং আমার প্রতি তার নীরব ভালবাসার অনেক উদাহরণ দিল ও ব্যাখ্যা করল। আমি তাদের দুজনকেই, এব্যাপারে আমার অসহায়তার কথা বুঝিয়ে বললাম, আমার ও বাণীর সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে বাণীর লেখা কয়েকখানা চিঠিও দেখালাম। এর পর তারা আর কোনও কথা না বলে চুপচাপ উঠে গেল। অন্যদিকে, এই ঘটনার পর আমার আর ঐ বাড়িতে যাওয়া আসা করা উচিত নয় মনে করে সেটা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু ডেপুটি পোস্টমাস্টার একদিন নিজে এসে আমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি পূর্বের মতো ওদের বাড়িতে যাতায়াত না করলে উনি এবং ওঁনার স্ত্রী খুবই দুঃখিত হবেন। এতে আমার যাতায়াত পুনরায় আরম্ভ হয়। সীতাকে আমি মাঝে মাঝেই নানা উপহার দিতাম, অনেকটা সান্ত্বনা দেওয়ার মতো। সীতা সত্যিই খুব ভাল মেয়ে ছিল। সাত-আট মাস 'ভূঁঈয়া বিল্ডিংসে' থেকে শিলচরের প্রেমতলায়, আমি বন্ধু ও সহকর্মী ধীরেন চন্দের সঙ্গে একটা দোতালা ভাড়া বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করি। দুজনই

ব্যাচেলার। চন্দ সত্যি খুব ভাল ছেলে ছিল। আমার সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও, অচিরেই আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলাম। ঐ বাড়িতে আমি প্রায় দেড় বছর ছিলাম। কিন্তু ডেপুটি পোস্টমাস্টারের বাড়ির সকলের বিশেষ করে সীতা ও গীতার আদর-যত্ন, আমি যে নিজের পরিবার থেকে অনেক দূরে আছি সেটা ভুলিয়ে দিত। এটা একটা অতি বড় সত্যি কথা যে সারা কাছাড় জেলায় যে ভাবে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, শহরে এবং শহরের বাইরে যে সব ভাল ভাল পরিবারের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতার সঙ্গে মিশেছি তাতে বাণীর সঙ্গে আমার সুগভীর সম্পর্ক, একটা বর্মের (shield) কাজ করেছে। দেশভাগের বহুদিন পরে কলকাতায় একদিন গীতার সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা হয়েছিল। সেখানে আর কেউ ছিলনা। গীতা খুব-ই সরল ছিল, আজও তাই আছে। সেদিন সে আমাকে মনপ্রাণ খুলে কতকগুলো কথা বলেছিল, যা আমার মনে এখনও দাগ কেটে আছে। বলেছিল, "শিলচরে আপনাকে দেখেই ভালবেসে ফেলেছিলাম, কিন্তু যখন বুঝলাম সীতাদিও আপনাকে প্রচণ্ড ভালবাসে তখন, মনের সঙ্গে লড়াই করে, ক্ষত-বিক্ষত মনে সীতাদির পথ থেকে আমি সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হত যে আপনার জীবনে এমন কিছু বা কোন ঘটনা আছে যার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আপনি খুব সহজেই মেশেন, কিন্তু কেউ আপনাকে ধরে রাখতে পারে না, "পাকাল" মাছের মতো আপনি পিছলে বার হয়ে যান। বাণীদির কথা আমি তখনও জানতাম না, আপনিও কোনদিন বলেননি। তাই সীতাদির পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েও তাঁর কোন উপকার করতে পারলাম না। বাণীদির কথা যদি পূর্বে জানতাম, তবে কি আমি, কি সীতাদি একথা বোঝার ক্ষমতা আমাদের ছিল যে বাণীদি ওঁনার ভালবাসা, প্রেম ও ত্যাগে আপনার মনে যে স্থান করে নিয়েছে সেখানে আমাদের বুকভাসানো চোখের জল বা মনের হায়-হুতাশ, মরুভূমিতে একফোঁটা জলের মত শুকিয়ে যাবে। তবে জানবেন, আজও আমরা আপনাকে একান্ত এবং অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মতো ভালবাসি, আপনাকে ভোলা যায়না।" গীতা আরও বলেছিল, "এসব কথা শুধু আপনাকেই বললাম, অন্য কাউকে যেন বলবেন না।" কিন্তু আজ প্রায় পঁচিশ বছর পরে, মনের আবেগে কথাগুলো লিখে ফেললাম, গীতা কি আমায় ক্ষমা করবে?

ধীরেন চন্দ ছিল ভীষণ 'পিউরিটান'। সে সীতা-গীতা বা রেভারেন্ড থিয়াঙ্গার পরিবার ইত্যাদির সঙ্গে আমার মেলামেশা একেবারেই পছন্দ করত না।

আমাদের ঐ ভাড়া করা দোতলা বাড়িটা ছিল বিরাট। তার পেছন দিকটা, সরকার থেকে, লুসাইদের ভারতের নানাপ্রান্তে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ট্র্যান্‌জিট-ক্যাম্প (Camp) করেছিল। লক্ষ্মীপুর ও আইজলের বহু লুসাই ছেলেমেয়ে দু-একদিন এখানে থেকে তারপর তাদের গন্তব্য স্থানে চলে যেত। লক্ষ্মীপুর থেকে যারা আসত, তাদের অনেকেই আমায় চিনতো। আমি প্রায়ই বিকেল-সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা-রাতে হারমনিয়াম নিয়ে গান গাইতে বসতাম। আমাদের সামনের ঘরটা, হল ঘরের মতো বড় ছিল। গান গাইতে আরম্ভ করলেই লুসাই মেয়েরা এসে ভীড় করত আর বাড়ির পেছনে অন্য একটা বাড়ির ফাঁকা জায়গায় পাঁচসাতজন বাঙ্গালী মেয়ে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়িয়ে গান শুনতো। তখনকার শিলচরের বাঙ্গালী সমাজে বয়স্থ মেয়েদের কোন ব্যাচেলারের বাড়ি যাতায়াত করা নিন্দনীয় ছিল। ধীরেন, এসব দেখে খুব রাগ করতো আর বলতো, "বাড়িটাকে তুই একেবারে বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলেছিস।" কিন্তু তবু সে এসব শুধু বলতই, আর কিছু করত না, আমাকে ভীষণ ভালবাসত। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে বাণীকে বিয়ে করে, ঐ বাড়িতে ধীরেনের সঙ্গে দেখা করতে এলে, সে ফুলটুল যোগাড় করে আমাদের মালা পরিয়ে রীতিমত একটা উৎসব করে ফেললো। আর বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও, জোর করে বাণীকে প্রণাম করে বলল, "বৌদি, খুব সময়মতো এসে পড়েছেন, নয়তো এখানে যা বৃন্দাবন লীলা আরম্ভ হয়েছিল, তাতে কি যে হত কে জানে।" বাণী জবাব দিয়েছিল, "ঠাকুরপো, বৃন্দাবন লীলার সব গল্পই আপনার বন্ধু হয় আমাকে লিখতো, নয়তো কিশোরগঞ্জে গেলে গল্প করতো। আমার মনে কিন্তু কোন ভয় ছিল না বা হতোও না, কারণ ওঁকে, ওঁর মনকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি।" সেদিন থেকেই ধীরেন আর বাণী অতি প্রিয় ভাই-বোন হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে ধীরেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাদের এই সম্পর্ক বজায় ছিল।

আমরা দুজনই মানে, আমি ও ধীরেন চন্দ খুব হুজুগে ছিলাম আর ছিল ঘুরে বেড়ানোর বাতিক। একদিন ঘুম থেকে উঠেই আমি ধীরেনকে বললাম, তোর তো "জিরিঘাট" দেখার খুব ইচ্ছে, আমি আজ জিরিঘাট চা বাগান পরিদর্শনে যাবো, তুই যাবিতো চল। সে এক কথায় রাজী হওয়াতে, শুধু চা ও জলখাবার খেয়ে দুজন যার যার সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম। শিলচর থেকে একুশ মাইল লক্ষ্মীপুর, সেখান থেকে পাহাড়ী পথে এগার মাইল, জিরিঘাট। ঐ পাহাড়ী পথের প্রথম ছয় মাইল শুধু চড়াই, সাইকেল ঠেলে

তুলতে হবে, পরের পাঁচ মাইল শুধু উত্রাই, এতো ঢালু যে সাইকেল ব্রেক চেপেও আটকে রাখা যায় না। দুপুরবেলা লক্ষ্মীপুরে আমাদের মুসলমান ইনসপেক্টরের বাড়িতে পোঁছে, তার নিজের ও পিয়নের রান্না করা খাবার, আমরা দুজনে খেয়ে নিয়ে জিরিঘাট রওনা হয়ে গেলাম এবং বেলা দুটো কি তিনটে নাগাদ ওখানে পোঁছে, বাগানের কাজ সেরে জিরি নদী পার হয়ে, মণিপুরের করদ রাজ্যে প্রবেশ করে দেখলাম কাছেই তাদের ফৌজদারের আপিস। আইনগত কোন অসুবিধেতে যাতে পড়তে না হয়, সেজন্য মণিপুরী ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাদের সীমান্ত গ্রাম বা জিরিবাম দেখার অনুমতি চাইলাম। আলাপ-আলোচনায় জানা গেলো, আমার ভগ্নীপতি প্রয়াত ফণীন্দ্রকুমার দাস আর ঐ ফৌজদার ইম্ফলে স্কুলের সহপাঠী ছিলেন। এতে আমাদের আদর বেড়ে গেল, ভাল জলযোগও হলো। তারপর জিরিবাম ঘুরে বেড়িয়ে বিকেলে জিরিঘাট পোঁছুলে, চা বাগানের কর্তৃপক্ষ আমাদের সেদিন ওখানেই থেকে যেতে অনুরোধ করলেন, বললেন অন্ধকার হলেই ঐ পাহাড়ী জংলী পথে বাঘ বা অন্য জানোয়ার বার হয়, সুতরাং যথেষ্ট ভয় আছে। আমরা ঠিক করলাম অন্ধকার গভীর হবার পূর্বেই আমরা লক্ষ্মীপুর পোঁছে যাব এবং রাত্রিটা ডাকবাংলোয় কাটিয়ে সকালে শিলচরে ফিরে যাব। (মণিপুর রাজ্যের ঐ জিরিবামে বেশ কিছুদিন হল আমার বড়দির এক ছেলে 'কালো' তার মার নামে "নীহার টকীজ" সিনেমা হল চালাচ্ছে। অন্যদিকে শিলচর থেকে জিরিঘাট পর্যন্ত নতুন রেল লাইন তৈরী হয়েছে।) লক্ষ্মীপুর রাত্রি সাড়ে সাতটায় পোঁছে দেখি, জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক আলোকিত। আশেপাশের পাহাড় ও জঙ্গলের সে এক অপরূপ শোভা। একুশ মাইল সুন্দর পীচের রাস্তা, কদাচিৎ এক-আধ্টা প্রাইভেট্ কার বা মোটর লরি যাতায়াত করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললাম এমন সুন্দর একটা এক্স্কারশন্ হাতছাড়া করা যায় না। লক্ষ্মীপুর বাজারে চা খেয়ে ঘণ্টায় পনের-বিশ মাইল বেগে সাইকেল চালিয়ে রাত্রি সাড়ে নটা কি দশটায় শিলচরের বাসায় পোঁছে গেলাম। সেদিন আমরা মোট ছেষট্টি (৬৬) মাইল সাইকেল করেছিলাম, যার মধ্যে বাইশ মাইল বেশ কঠিন পাহাড়ী পথ।

ধীরেন চন্দ ও আমি মাঝে মাঝেই এরকম বিপদজনক এক্স্কারশনে বার হয়ে পড়তাম। কাছাড় বা শিলচরের চাকুরীতে এসবই ছিল আমাদের আনন্দ। সব এক্স্কারশন লিখতে গেলে একটা বেশ বড় বই হয়ে যাবে। ইংরেজ আমলে নাগারাণী গুইদুল্লো স্বাধীনতা আন্দোলন করে খুব নামিদামী মানুষ বলে

পরিচিত হয়েছিলেন। আমি আর 'চন্দ' ঠিক করলাম হাফলং গিয়ে সেখান থেকে বাইশ মাইল পাহাড়ি হাঁটা পথে সাইকেলে করে তার বাড়িতে রাণী গুইদুল্লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি জানিয়ে আসব। কিন্তু হাফলং যেয়ে মনে হলো রাণীর সঠিক ঠিকানা আমরা পাইনি বা পেলেও উনি প্রায়ই বাড়ি থাকেন না, পাহাড়ে-জঙ্গলে তাঁর শিষ্য-সামন্তদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান। সাইকেলে ঐ রাস্তায় তাঁর বাড়ি পৌঁছান নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমরা পুনরায় শিলচরে ফিরে আসি।

১৯৫৭ সালে আমি, বাণী ও ছোটছেলে টুসুন কোচবিহার থেকে ইম্ফলে নীহারদির বাড়ি বেড়াতে যেয়ে খবর পেলাম যে বার্মার বর্ডার "মোরে"-তে ধীরেন চন্দ কাস্টমস্ স্টেশনের চার্জে আছে। তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে, সে অবশ্যই মোরে যেতে অনুরোধ করে এবং বাসে ভাল সিটের ব্যবস্থাও করে দেয়। মোরে রওনা হবার একদিন পূর্বে বেলা একটায় হঠাৎ পুলিশ ইনস্পেক্টার ভাগ্নে চাণু এসে খবর দেয় যে, ইম্ফল ট্রেজারিতে রাণী গুইদুল্লো তাঁর পলিটিকাল পেনশন নিতে এসেছেন, আমি চাইলে রাণু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারে। চাণুর সাহায্যে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত একটি ইচ্ছা সেদিন পূরণ হলো, স্বনামধন্যা স্বাধীনতা সংগ্রামী রাণী গুইদুল্লোকে দেখে ও তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানিয়ে।

ইম্ফল থেকে মোরে বেশ কয়েক ঘণ্টার বাস পথ। যাতায়াতের পথে পথে নেতাজী সুভাষ বোসের I. N. A.-র যুদ্ধের বহু নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম। ঐ পথে জাপানীদের বোমা বর্ষণে 'পেলেল্' নামক স্থানটি খবরের কাগজে খুব প্রচারিত হয়েছিল। বিকেলে মোরে পৌছুলে 'চন্দ'-র সে কি আনন্দ, বাণীরও। ওদের এই আনন্দে আমিও খুব আনন্দ পেতাম। এই সময়ে বার্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল। তাই বার্মার সীমানা শহর "টামু"-র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ, 'টামু' শহর দেখার জন্য তাদের জীপ গাড়ি পাঠিয়ে দিলে, আমরা সকলে ও চন্দ প্রায় সারাদিন টামু ঘুরে বেড়ালাম। একটি বৌদ্ধ বিহারে গেলে তার অধ্যক্ষ খুব আদর যত্ন করলেন আমাদের। বার্মা কাস্টমস অফিসাররাও আমাদের চা-টা খাইয়ে আদর আপ্যায়ন করেছিল। বার্মিজদের দোকান-বাজার ও সাধারণ লোকেরও কিছুটা পরিচয় পেলাম। সর্বশেষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা খালি বাড়িতে। জানলাম, ইম্ফল ও কোহিমার পথে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নাকি ঐ বাড়ির একটা ঘরে রাত্রি বাস

করেছিলেন। ঐ ঘরটি ফুলে ফুলে ভরপুর। স্থানীয় জনসাধারণ নাকি তখনও প্রত্যহ ঘরখানা ফুল দিয়ে ভরে রাখেন। আমাদের মতো বার্মিজদেরও নেতাজীর প্রতি কত শ্রদ্ধা ও ভক্তি! সন্ধ্যায় আমরা সকলে জীপ গাড়িতে 'মোরে'-র 'চন্দ'-র কোয়ার্টারে ফিরে আসি। সেবার আমাদের মণিপুর, মোরে ও টামু ভ্রমণ সত্যি বড় সুন্দর ও আনন্দের হয়েছিল। কোচবিহার থেকে সেবার ১৯৫৭ সালে ট্রেনে ও বাসে গিয়েছিলাম ইম্ফল, ডিমাপুর ও কোহিমা হয়ে। ডিমাপুর থেকে বাসে রওনা হলাম যেন যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে। অনেকেই বারণ করেছিল। একজন ভারতীয় মেজরকে পেয়ে, ডিমাপুরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেছিলেন, 'বাসে জানালার পাশে আপনি বসবেন, আপনার স্ত্রী বা ছেলেকে বসাবেন না, কারণ নাগারা পাহাড়ের উপর থেকে 'স্নাইপিং' করে।" আমাদের বাস রওনা হল মিলিটারি কনভয়ের মাঝে। পথেও দেখলাম স্থানে স্থানে পাথর সাজিয়ে ফরটিফাইড্ এরিয়া করে, জোয়ানরা পাহাড়ের উপরের দিকে মেশিনগান তাক্ করে দাঁড়িয়ে আছে। নাগাল্যাণ্ডের হেড্ কোয়ার্টার কোহিমাতে বাস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমরা মাটিতে নেমে, চারদিকে সুন্দর সাজানো শহরটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেখান থেকে রওনা হয়ে মণিপুর রাজ্যের সীমানায় পেঁছুবার পূর্বে, বাস খুব উঁচু একটা পাহাড়ে ওঠে। বেশ শীত শীত করছিল। জায়গাটার নাম জেনেছিলাম 'মাও', ছয়-হাজার ফিট্ উঁচু। ইম্ফলের লোক্‌তাক্ লেক্ সত্যিই অপূর্ব। চিল্‌কা লেকের পরেই নাকি এর স্থান। খুব কাছেই I. N. A. যেখানে স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করেছিল সেখানে একটা মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছিল। ইম্ফল সত্যিই বড় সুন্দর শহর। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা সমতল উপত্যকা। অনেকে বলে "Kashmir of the East." আমার এতোই ভাল লেগেছিল যে দিদি ও জামাইবাবুকে বলেছিলাম যে তোমাদের বাড়িতে তো অনেক ফাঁকা জায়গা। আমি চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে তোমাদের বাড়িতে একখানা বড় ঘর তৈরি করে থাকব। দিদি ও জামাইবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কথায় আছে না, Man proposes but God disposes. আজ আর দিদিও নেই জামাইবাবুও নেই, নেই বাণীও। রাজনৈতিক হাওয়ার পরিবর্তনে, আজ তাঁদের ছেলেরাই অমন বড় ও সুন্দর বাংলো বাড়ি ছেড়ে শিলচরে জায়গা কিনে নতুন করে বাড়ি করার চেষ্টায় আছে। সেবার আমরা ইম্ফলে পেঁছবার পরের দিনই 'মাও'-এর কাছে বাসের যাত্রীর উপর নাগারা স্নাইপিং করে। যাত্রী-বাস

চলাচল কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তাতে বাণী ও টুসুনকে নিয়ে আমি আমার প্রিয় শিলচরে আকাশ পথে চলে এসে, পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। লক্ষ্মীপুরে গিয়ে রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গার স্ত্রীর কবরে ফুল ছড়িয়ে প্রণাম জানাই। তারপর বদরপুর রেলওয়ে জংশন হয়ে, ওখান থেকে ভায়া হাফলং, লামডিং জংশন পর্যন্ত ভারতের বোধহয় সবচাইতে সুন্দর রেলপথ দিয়ে গৌহাটি হয়ে কোচবিহারে ফিরে আসি। একেই বোধ হয় বলে "শাপে বর"। নাগারা সেই স্নাইপিং না করলে আমার বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার আমার স্বপ্নের প্রিয় শিলচর দেখা হত না।

১৯৪৯ সালে, চাকুরি থেকে অবসর নেবার দশ-বার দিন পূর্বে, জামাইবাবুর বাৎসরিক কাজে বাণীকে নিয়ে পুনরায় ইম্ফলে গিয়েছিলাম চার-পাঁচদিনের জন্য। তখন আবার দমদম কাস্টমসে 'চন্দ' সুপার। জেট ফ্লাইট ছিল ভোর ছটায়। টেলিফোনে 'চন্দ'-র সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে বলল, টালিগঞ্জ থেকে এত ভোরে রওনা না হয়ে, আগের দিন সন্ধ্যায় দমদম এয়ারপোর্টে চলে যেতে। সেদিন সে নাইট ডিউটি নেবে। কাজেই আমাদের থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধে হবে না। তাই হলো। 'চন্দ'-র আদর যত্নে খুব আরাম করেই সময়মতো জেটে রওনা হলাম এবং দেড়ঘণ্টার মধ্যেই গৌহাটি হয়ে ইম্ফলে পৌঁছুলাম। রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গার সেই ফ্রক পরা ৭।৮ বছরের ছোট মেয়ে সোয়ামীর বর Ng. Woling (নাগা) তখন ইম্ফলে মণিপুর সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি (কমার্স)। ভাগ্নে চাণু তাঁকে আমাদের খবর দিলে, তিনি এক রবিবারে গাড়ি পাঠিয়ে আমাদেরকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে খুব আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন ও যীশুর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করলেন। রাজনৈতিক ডামাডোলের জন্য সেবার দিদি আমাদের কোথাও বেড়াতে যেতে দিলেন না। ৪।৫ দিন পরে এক ভোরে ইম্ফল থেকে চা জলখাবার খেয়ে জেটে রওনা হয়ে টালিগঞ্জের বাড়িতে এসে আমি ও বাণী লাঞ্চ খেলাম। সময়ের দিক দিয়ে খুবই মজার ব্যাপার কিন্তু আমার বারে বারেই যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'-এর সেই কথা মনে পড়ছিল, "বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।" ১৯৪৪-র আর ১৯৪৫-এর মণিপুর ভ্রমণে ছিল একেবারে আকাশ-পাতাল ফারাক।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৪৪-৪৫ সাল থেকে কাছাড়ে আমার দু'বছর তিন মাস থাকাকালীন, লক্ষ্মীপুরে রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গার লুসাই পরিবারের সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার গভীরতা এতই বেশী ছিল যে,

তখনকার তার সাত-আট বছরের ছোট মেয়ে সোয়ামী এখনও চিঠিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং কয়েক বছর পূর্বে তাঁর স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে আমার কলকাতার বাড়িতে বেড়িয়ে গেছে। Sincere tie of friendship বোধ হয় একেই বলে।

আসামে থাকতে ১৯৬৪ সাল থেকেই 'চন্দ' হার্টের অসুখে ভুগত। মনে হয় ১৯৮৪ সালে ঐ দমদম বিমানবন্দর থেকেই অবসর নেয়। তার পূর্বে সে আমার এ বাড়িতে কয়েকবার এসেছে। চন্দ ও বাণীর মধ্যে এমন একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল যে ওরা দেখা হলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। আমারও এটা খুব ভাল লাগত। দমদমের কাছে 'নবাদর্শ' নামকরণ করে এক বিশাল কমপ্লেক্সে সিলেটের বহু ভাল ভাল লোক ওখানে একসাথে সুন্দর সুন্দর বাড়ি করেছে। 'চন্দের স্ত্রী' সিলেটের মেয়ে বলেই হয়তো, সে-ও ওখানে একটু জায়গা পেয়ে একখানা সুন্দর বাড়ি করে। 'চন্দ' আমাকে ১৯৮৪ সালে লিখেছিল যে, ডাক্তারের অভিমতে তার চলাফেরা করা নিষেধ, আমরা যেন তার বাড়ি দেখে আসি। এদিকে বাণীও নানা রোগে ভুগতে ভুগতে বাসে-ট্রামে এতদূর যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যা হোক, ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭-র মধ্যে আমি তাকে 'নবাদর্শতে' দুবার দেখে আসি। শেষবার তাকে দেখে আমার বড়ই দুঃখ হয়েছিল। প্রায় ৬ ফুট লম্বা স্বাস্থ্যবান যে মানুষটা ১৯৪৫।৪৬ সালে, একদিনে আমার সঙ্গে ৬৬ মাইল সাইকেল করেছিল পাহাড়ি পথে, সে যেন একেবারে এতটুকু হয়ে শুয়ে আছে। ফিরে আসার সময় চন্দ-র স্ত্রীর বারণ সত্ত্বেও, সে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত উঠে এসে আমায় বিদায় জানালো। তার কয়েকমাস পরেই চন্দ-র ছেলের চিঠিতে তার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। এই সংবাদে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। চোখের উপর ভেসে উঠলো, শিলচর, লক্ষ্মীপুর, জিরিঘাট, জিরিবাম, হাফলং, ইম্ফল, মোরে এবং টামুর কথা। আমার স্ত্রীও অসুস্থ শরীরে আমার কাছেই বসেছিলেন। তার চোখে কয়েক ফোঁটা জল। বললেন, "একে একে নিভিছে দেউটি"। আমিও তো শীঘ্রই এমনি করেই একদিন চলে যাব, আর জানি তুমি তখন পাগলের মত হাউ হাউ করে কাঁদবে। তার একথা যে সত্যি হবে সেদিন কি একথা ভেবেছিলাম ?

আরও দু-একটা ঘটনার জন্য পুনরায় শিলচরে ফিরে যেতে হচ্ছে। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে আমি যে ঘরটায় একলা থাকতাম, সেই ঘরে একদিন এলেন গৈরিক বসন পরিহিত, দণ্ডধারী মাঝ বয়সের এক সাধুপুরুষ। বাড়ির কর্তা

আমায় খুব বিনয় করে বললেন, প্রতি বছর বা দু বছরে একবার এই সাধু-বাবাজী শিলচরে আসেন এবং আমার এখানেই থাকেন। এবার ওঁনাকে রাখার আর কোন জায়গা বা স্থান নেই বলে, এই ঘরেরই অন্য কোণে তাঁর জন্য একটা খাটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। উনি দুমাসের মতন থাকবেন। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। এখানে ওঁনার প্রচুর শিষ্য ও শিষ্যা আছে। সারাদিন শিষ্যদের বাড়ি-বাড়িই কাটাবেন। শুধু রাত্রিতে এসে এই ঘরে ঘুমুবেন। আমার আর এতে আপত্তি করার কি-ই বা ছিল। সাধুবাবাজীর সঙ্গে একঘরেই বাস করে, দিনে-দিনে কথায়-বার্তায় একে-অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলাম। জেনেছিলাম, উনি পশ্চিমবঙ্গের (তখনও বাংলা ভাগ হয়নি) কোনও একটি মঠের সঙ্গে যুক্ত। আমি তখন দিনে-রাতে প্রায় চার-পাঁচ প্যাকেট সিগারেট খাই। ওঁর সম্মানার্থে, আমি বাইরে গিয়ে সিগারেট খেতাম বলে, উনি একদিন প্রায় জোর করেই ওঁর সামনে আমায় সিগারেট খেতে দিলেন।

ঐ বাড়িতে আমার ও তাঁর জন্য একটি ভৃত্য ছিল, মোটামুটি আমাদের ফুট্-ফরমাশ খাটার জন্য। উনি প্রায়ই ঐ ভৃত্যের হাত দিয়ে মানিঅর্ডারে টাকা পাঠাতেন। জানলাম যে মাঝে মাঝেই নিয়মমতো ওঁনাকে তাঁর মঠ্ হেড কোয়ার্টারে টাকা পাঠাতে হয়। একদিন সকালে সাধুবাবা শিষ্য বাড়িতে বার হয়ে গেলে, ঐ ভৃত্যটি একটি মানিঅর্ডার ফরম দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এটাতো ওঁনার মঠের ঠিকানা নয়। তবে এই টাকা উনি কাকে পাঠাচ্ছেন? ঠিকানা ছিল, ঢাকা গ্রামের এক মহিলার নামে। ব্যাপারটা আমার কাছেও একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায়, ভৃত্যটিকে অন্য কাজে পাঠিয়ে আমি ঠিকানাটা আমার নোট বইয়ে টুকে রাখি। সে ফিরে এলে তাকে বলি, এসব নিয়ে তোমার আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? তোমার কর্তারা সাধুবাবাকে যেরকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তাতে এসব নিয়ে তুমি কোন কথা বলেছ শুনলে, হয়তো তোমার চাকুরিই থাকবে না। ভৃত্য ছেলেটি আমায় খুব ভালবাসতো। কেন জানিনা, সাধুবাবাকে সে একেবারেই পছন্দ করত না।

যখন আমি সাধুবাবার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গেছি, তখন একদিন নিরিবিলিতে তাঁকে বললাম যে বাবাজী, আপনি তো আপনার পূর্বাশ্রম বলবেন না, কিন্তু গত রাতে আমি স্বপ্নে আপনার পূর্বাশ্রম দেখেছি। উনি খুব আশ্চর্য হয়ে আমায় বলেন, যাঃ ঠাট্টা করছ! বলতো আমার পূর্বাশ্রম কোথায় ছিল? আমি তাঁর পূর্বাশ্রমের গ্রাম, পোষ্ট অফিস, জেলা ইত্যাদি বললে, উনি একটু

থতমত খেয়ে যান এবং বলেন, তোমাকে আমি অত্যন্ত আপন মনে করি ও ভালবাসি, তুমি যেন এসব কথা আর কারও কাছে বলো না। আমি তাঁকে অভয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাহলে বলুন আপনার পূর্বাশ্রমের ঐ মহিলাটি কে? উনি অকপটে স্বীকার করেন যে, সেই মহিলা ওঁনার স্ত্রী। দেশে যে সামান্য জমি-জায়গা আছে তার আয় ও ওঁনার নিজের পাঠানো টাকা দিয়ে তাঁর স্ত্রী দেশের সংসার চালান। এরপর থেকে আর কোনদিন ঐ ভৃত্যের হাতে উনি কোন মানি-অর্ডার করতে দেননি।

ঐ বাড়ির পরিবারের সকলেই, এমনকি মহিলারাও আমাকে খুবই ভালবাসতেন এবং আদরযত্ন করতেন। একদিন দুই বৌদি, আমাকে গোপনে ওঁদের অন্দরমহলে ডেকে নিয়ে গিয়ে, ঠাকুরের ফটো স্পর্শ করিয়ে, আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে, তাঁরা যা বলবেন, তা যেন কোন কারণেই বাইরে প্রকাশ না পায়। আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন যে, আমি যে ঘরে থাকি, তার দক্ষিণেই পাকা বাথরুমে সকালে তাঁরা ও বাড়ির কুমারী মেয়েরা স্নান করেন। বাথরুমের উপরে কোন ঢাকনা নেই। স্নানের সময় মানে ভোর পাঁচটা কি ছটায়, তাঁরা প্রায়ই দেখেন যে, আমার ঘরের টিনের বেড়ার ও টিনের ছাদের ফাঁক দিয়ে দুটো চোখ তাঁদের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এটা ঐ সাধুবাবার কাজ, তাঁদের অনুরোধ হল বিষয়টি গোপন রেখে আমায় এটা বন্ধ করে দিতে হবে। আমি খুব অসোয়াস্তি বোধ করি, জিজ্ঞাসা করি যে, ওটা যে আমি-ই করি না, সেটা বুঝলেন কি করে? তাঁরা বললেন, ওসব আপনি বুঝবেন না। মেয়েরা বেটাছেলের মুখ চোখ দেখলেই বুঝতে পারে সে কি রকম। তবুও আমি ওঁদের অনুরোধ করি যে আমার পক্ষে এটা নাড়াচাড়া করা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাঁরা এটা তাঁদের মূল অভিভাবককে বললেই ভাল হয়। কিন্তু বৌদিরাও একেবারে নাছোড়বান্দা। তাঁরা বললেন যে, তাঁরা যার যার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরাও ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিতে বলেছেন, কারণ মূল অভিভাবক ও তাঁর প্রিয়জনরা এই সাধুবাবার এতই ভক্ত যে, তাঁরা এটা বিশ্বাস করবেন না, উলটে বৌমাদের গালাগালি করবেন এবং ঐ বাথরুমে স্নান বন্ধ করে দেবেন। বৌদিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁদের দুই অবিবাহিতা ননদও আমাকে একই কথা বলতে লাগলেন। আমি এমন একটা স্পর্শকাতর ব্যাপারে হাত দিতে বড়ই দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেও, বৌদিদের স্নেহ-ভালবাসার অনুরোধ ফেলে দিতে পারলাম না। ওঁদের নিজস্ব

ঘরে কোন ভাল রান্নাবান্না হলে, আমায় না দিয়ে খেতেন না। ওঁরা যে আমায় কত ভালবাসতেন, তার আরও নিদর্শন পেয়েছিলাম, ১৯৫৭ সালে ইম্ফল থেকে শিলচরে এলে। সেবার বাণী ও টুসুনকে এই বৌদিরা আদর-যত্ন করে একেবারে অস্থির করে তুলেছিলেন। বাণী বলেছিলো, ওদের মতো এত ভাল লোক খুব কমই দেখেছি। শিলচর তোমার কাছে কেন এত প্রিয়, সেটা এবার নূতন করে বুঝলাম। কত দিন আগের কথা, সেই স্নেহময়ী সুন্দর মুখগুলো আজও জ্বলজ্বল্ করে চোখে ভাসে। জানি না, ওঁরা আজ কে কোথায় আছেন। শুনেছি শিলচরে ভুঁইয়াদের সে স্বর্ণযুগ আর নেই, পরিবারটা নানান দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে।

যাহোক, সাধুবাবার গল্পে আবার ফিরে আসি। মাঝে-মাঝেই শেষ রাতে বা ভোররাতে কখনো-সখনো ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতাম, সাধুবাবা তাঁর নিজের পোশাক বা দণ্ডের পোশাক ইত্যাদি ঠিক ঠাক করছেন বা চোখ বুঁজে ধ্যানে বসেছেন। বৌদিদের সঙ্গে কথাবার্তার রাতেই রাত্রি তিনটা কি সাড়ে তিনটায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে, আমি ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে রইলাম। দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ, সাধুবাবা আমার লেখার টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে টিনের বেড়া ও ছাদ বা চালের ফাঁক দিয়ে ঐ বাথরুমের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ যুবতী স্ত্রীলোকেদের নগ্নদেহ পরিদর্শন সেরে উনি টেবিল থেকে নেমেই দেখেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো ভাব করে নিজের খাটে এসে বসলে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওদিক দিয়ে কি দেখছিলেন ? উনি বললেন, আকাশ কতটা পরিষ্কার হলো, আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ও বার হবার সময় হলো কিনা ইত্যাদি দেখছিলাম। আমি মিটি মিটি হেসে বললাম যে আমাকে এখনও আপনি সত্যিকারের আপনজন করে নিতে পারেন নি, পারলে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে নগ্ন সৌন্দর্য আপনি উপভোগ করেন, তার কিছুটা ভাগ আমাকেও দিতেন। সাধুবাবা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুমি সম্বোধন থেকে একেবারে তুই সম্বোধনে চলে গেলেন, বললেন ভাই তোর যে এদিকে শখ আছে, তাতো কোনদিন বলিস নি। তাহলে তোকে আমার সঙ্গে আমার বিশেষ বিশেষ শিষ্য বাড়িতে নিয়ে যেতাম, দেখতিস কত মজার জিনিস আছে। ঐ সব ছেড়ে তখন আর চা, তামাক আর সুপারির ট্যাক্স চোরদের পেছনে তোর ছুটতে ইচ্ছে কবত না। যা হোক, আমি সাধুবাবাকে আমার কিছুটা প্রলোভনের কপটতা প্রকাশ করে বললুম মহাকবি কালিদাস নাকি

একদিন, গাছের একটা ডালে বসে, সেই ডালটাই বোকার মতো কাটতে যাচ্ছিলেন। এখন আমি আর আপনিও কি কালিদাস হব? বেড়া আর চালের ফাঁক দিয়ে নারীর নগ্নরূপ দেখা অচিরাৎ বন্ধ করুন। জল অনেক ঘোলা হয়ে গেছে। আমার কথাটা রাখুন। সাধুবাবা অনেকক্ষণ চিন্তা করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বলতো ভাইটি? বললাম, সে সব শুনে আর কি হবে? আমাকে যদি সত্যি আপন মনে করেন ও বিশ্বাস করেন, তবে ঐ ফাঁক দিয়ে আর নারীর নগ্নরূপ দেখবেন না। সাধুবাবা আমার কথা রেখেছিলেন। তিন-চার দিন পর ঐ বৌদিরা পুনরায় আমায় তাঁদের অন্দর মহলে ডেকে নিয়ে জানালেন যে আমার ঘরের সেই ফাঁক দিয়ে আর সাধুবাবার চোখ দেখা যায় না। কি করে আমি ম্যানেজ করলাম এটা তাঁরা জানতে চাইলে বলেছিলাম তা দিয়ে আপনাদের প্রয়োজন কি। যা চেয়েছিলেন, তাতো হয়েছে, আবার কখনো হলে জানাবেন। সেদিন পেটভরে তাঁরা আমায় খুব মিষ্টি খাওয়ালেন।

এই সময় থেকে সাধুবাবার সব খোলস আমার কাছে একেবারেই খুলে গেল। তারপরে, যে কদিন ছিলেন আমার ঘরে, অকপটে নিজের কথা, তাঁদের মঠ ও অন্যসব মঠের কথা আমাকে দিনে-রাতে যা বলেছেন, তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ সে সব কাহিনী রুচিহীন ও অশ্লীল। তবে বৌদিদের ধন্যবাদ যে তাঁরা আমাকে ঐ বাথরুমের কাজের ভারটা দেওয়ায়, ভারতবর্ষে সাধুর বেশে অসাধু একটা সমাজের দিক্‌দর্শন আমার চোখে উন্মুক্ত হল। বস্তুত এ ঘটনা সম্বন্ধে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ। সাধুবাবা যা যা বলেছিলেন, তার অর্ধেকও যদি সত্য হয়, তবুও আমায় বলতে হবে যে আমাদের সত্যিকারের এবং সৎ সাধু সমাজের সুযোগ নিয়ে, কত যে অসাধু সমাজ বা সঙ্ঘ, অবলীলায় কত গভীর অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে, হাজার হাজার সরল মানুষকে ঠকিয়ে টাকা রোজগার করছে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। ঐ সাধুবাবার সঙ্গে দুমাস এক ঘরে বাস করে আমার যেন পুনর্জন্ম হলো! অনুগ্রহ করে কেউ যেন না ভাবেন যে ভারতের সকল সাধু সন্তদের কথা বলছি। মুষ্টিমেয় কিছু সাধুর কথাই বলছি। আমি শ্রীশ্রী সন্তদাস বাবাজী ও ঐ রকম আরও বেশ কিছু ভারত বিখ্যাত সাধু-সন্তদের চিনি এবং তাদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে ভাগ্যবান-ই মনে করেছি।

আমাকে এর পরে মাঝে মাঝে উনি তাঁর শিষ্য বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইতেন। আমি নানা কাজের অজুহাতে তা এড়িয়ে যেতাম। আমি তখনও বিয়ে করিনি। এই বিয়ের জন্য আমার ও বাণীর তখন তিন-চার বছরের প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

ভুঁইয়া 'কনসার্নের' একজন অতি দায়িত্বশীল কর্মী ধীরেনদার (শ্রীধীরেন সাহা) আমি খুব প্রিয় ছিলাম। আমার মত না নিয়েই আমার ঘরে বসে, হঠাৎ ধীরেনদা একদিন সাধুবাবাকে বলে বসলেন যে মহারাজ, আমার এই বারীন ভাইটি তার বিয়ে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছে, ওর হাতটা ভাল করে দেখে একটু বলুন না, এ বিয়ে হবে কিনা! সাধুবাবা বললেন, ভোরবেলায় হাতটা খুব ভাল দেখা যায়, আগামী কাল ভোরে আমি ওর হাত দেখব, এই বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে, ধীরেনদা ঘর থেকে চলে যেতেই, সাধুবাবা আমায় বললেন, ঐ হাত দেখার ফাঁকি-জুকি তো আমি তোমার সঙ্গে করতে পারি না, তাই একথা বললাম। তোমাদের অসুবিধা কি, সব বিস্তারিতভাবে আজ রাতেই আমাকে বলো, আমি সব মুশকিল-আসান করে দেব। আমি জানালাম যে মুশকিল-আসান কিছুই হবে না। আমার বয়স্ক বন্ধু শিলচর কলেজের ইংরেজীর প্রফেসর শ্রীবিনোদ দেব, চিঠি লিখে তখনকার একজন ভারত-বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমার কুষ্ঠি, হাত, কপাল দেখে ও বাণীর চেহারার বর্ণনা ও হাতের লেখা ইত্যাদি দেখে, অনেক অঙ্ক কষে, আমায় বলে দিয়েছিলেন যে গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি আমাদের এতই বিপক্ষে যে এ বিয়ে কিছুতেই হবার নয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে পুরুষাকার দিয়ে ঐ গ্রহ-নক্ষত্রের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না? উনি বলেছিলেন, তুমি বিনোদের বন্ধু বলেই বলছি, এতটুকু আশা থাকলেও আমি তোমাকে উৎসাহিত করতাম। এ বিয়ে হতে পারে না। তুমি এর পেছনে ঘুরে চাকুরি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করো না।

সব শুনে সাধুবাবা বললেন, আমাদের হাতে এমন জিনিস আছে যা দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেয়া যায়। তুমি আজ রাতে পরিষ্কার করে সব খুলে বলবে। সেই রাতে অনেকক্ষণ জেগে থেকে সাধুবাবা আমাদের কাহিনী শুনলেন। আমি কোন কিছুর আশা নিয়ে তাঁকে কিছু বলিনি। উনি জোর করাতেই বলেছি। বলেছি বাণীর বাবা-মা এবং বাড়ির প্রায় সকলেই এই বিয়ের বিরোধী। কিশোরগঞ্জ শহরে ও তার বাইরে বাণীর বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু বা কংগ্রেসী বন্ধু কেউ তাঁকে রাজি করাতে পারেননি। হয়তো ওঁদের পরিবার আমাদের চাইতে বেশী ধনী ও সম্মানীয় বলেই, তাঁরা এ বিয়ের বিরোধী।

সাধুবাবা শুনে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই, সব ঠিক হো যায়গা।" আমি বললাম, আমি ওসব কথায় বিশ্বাসী নই, কি করে 'সব ঠিক হো যায়গা' আমাকে

খুলে বলতে হবে। উনি বলেন, তোমাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে। আমাদের মঠে আমার হাত দিয়ে একশত টাকা পাঠাতে হবে। আর আমার ফি একশত টাকা তোমার নিকট থেকে নেব না, কিন্তু মঠকে জানাব, আমি পেয়েছি। তোমাদের কিশোরগঞ্জে ও যশোদলে আমাদের বহু শিষ্য আছে। মঠের অনুমতি নিয়ে আমাকে সেখানে যেতে হবে। তুমি বাণীদের বাড়ির সকলের নাম, আনুমানিক বয়েস, তারা কে কি করে, অদূর অতীতে কেউ মারা গিয়ে থাকলে তার বা তাদের সকলের বিস্তারিত বর্ণনা, বাণীর কাকা ও জেঠা থাকলে সেই বাড়ির সকলের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আশেপাশের প্রতিবেশীদের সকলের বিবরণ ইত্যাদি নির্ভুলরূপে আমাকে একটি নোট বই-এ লিখে দেবে। তারপর দেখো, আমার দাওয়াই-এ তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবে। আমি সাধুবাবাকে বলেছিলাম, বাণীর বাবা অত্যন্ত শক্ত মানুষ, প্রায় নাস্তিক। তাঁকে ধর্মের ভুজুংভাজং দিয়ে ভয় পাওয়ানো এত সহজ নয়। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে হিস্টিরিয়ার রুগী বলেন। সাধুবাবা জবাব দিলেন, তুমি থামতো বাবা। এরকম কত কেস করলাম, কত নাস্তিককে ঘোর আস্তিক করে ছেড়ে দিলাম। তুমি আমার উপর একটু বিশ্বাস আর ভরসা রাখো। আমি কথা দিচ্ছি একাজ করবই করব, না পারলে মঠে পাঠানো তোমার একশত টাকা আমার নিজস্ব রোজগার থেকে তোমায় ফিরিয়ে দেব, নয়তো সাধুগিরি ছেড়ে দেব। আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি ও নিজের মায়ের পেটের ভাই-এর মতো দেখি বলেই, যেমন করে পারি, এটা আমি করবই করব। বাণীর মা, ঠাকুমা আর আত্মীয়স্বজনরা ভয়ে থরথর করে কেঁপে বাণীর বাবাকে জোর করে রাজি করাবে।

সাধুবাবার কথাগুলো যে আন্তরিক সেটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং ভাল করে চিন্তা করে এটাও আমার মনে হয়েছিল, আমাদের কুসংস্কারে ভরা সামাজিক —মানসিকতায় সাধুবাবা হয়তো সফল হতেও পারেন! কিন্তু ধর্ম ও কুসংস্কারে ছল-চাতুরী দিয়ে জীবনের সব চাইতে বড় ঘটনাকে মসীলিপ্ত করতে কিছুতেই আমার মন চাইল না। তাই ও পথে আর গেলাম না। আজ এতদিন পর সাধুবাবাজী হয়তো আর বেঁচে নেই। ১৯৪৫—৫৪ সালে, যেখানে সাধুবাবার মঠ, সেখানে সরকারি কাজে বহুবার আমাকে যেতে হয়েছে, কিন্তু তার মঠের নাম জানলেও সেখানে তিনি কি নামে পরিচিত ছিলেন সেটা আর আমার মনে ছিল না, তাই খোঁজ করতে পারিনি। দেশভাগের লঙ্কাকাণ্ডে, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা যখন ১৯৫১ সালে, কিশোরগঞ্জ ছেড়ে চিরদিনের মত আমার কাছে চলে আসেন,

তখন বহু আসবাব পত্র ও আমার বই-খাতা-নোটবই ইত্যাদি ওখানে ফেলে আসতে বাধ্য হন। হয়তো সেগুলোর কোনটার মধ্যে বাবাজীর বিবরণ লেখা ছিল। সাধুবাবার সঙ্গে যখন শিলচরে সাক্ষাৎ হয়, তখন তার বয়েস ছিল ৪০ থেকে ৪৫-এর মধ্যে। অনেক দোষ ত্রুটি থাকলেও সরলতার মহৎ গুণটি ছিল তাঁর মধ্যে। তাই সাধুবাবাকে সত্যি ভালবেসে ফেলেছিলাম!

শিলচরে থাকাকালীন মারক্সিস্ট বই ও রচনা পড়াশুনো করতাম এবং মাঝে মাঝে কম্যুনিস্ট পার্টি আপিসেও যেতাম। সেখানে অনেক নেতার মধ্যে অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের সঙ্গেও ভাল পরিচয় হয়েছিল। পরে তিনি আসাম স্টেট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছিলেন। কিন্তু যার জন্য এসব কথা লেখা তিনি হচ্ছেন কমরেড ইরাবত বা ঐরাবত সিং। শুনেছিলাম, তিনিই ছিলেন মণিপুরের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। শিলচর পার্টি আপিসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। ইম্ফলে আমার ভগ্নীপতি ফণীন্দ্র দাসের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। প্রায় এক মাস তিনি সে সময় শিলচরে ছিলেন। প্রত্যহই সকালে আমার বাসায় এসে চা খেতেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। 'এড্গার স্নো'-র বিখ্যাত "রেড স্টার ওভার চায়না" বইখানা আমায় পড়তে দিয়েছিলেন, আর ফেরৎ নেননি। ১৯৪৯ সালে চীনের কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় এলে তাদের এবং তাদের কাজ-কারবার বোঝার পক্ষে ঐ বইখানাই ছিল তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বই। ১৯৫৭ সালে ইম্ফলে বেড়াতে গিয়ে পুলিশ অফিসার ভাগ্নে চাণুর কাছে ইরাবত সিং-এর খোঁজ করে জানতে পারি যে ১৯৪৮/৪৯ সালে ভারত সরকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করলে, ইরাবত সিং বার্মায় পালিয়ে যান এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকা অবস্থায়ই অসুস্থ হয়ে মারা যান। এমন ধীর, স্থির, অমায়িক ও সুন্দর চরিত্রের কমরেড আমি খুব কমই দেখেছি।

১৯৪৬ সালে, আমাদের শিলচরের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফিস-কর্মীরা ঠিক করল সেবার সকলে মিলে ভাল করে সরস্বতী পুজো করবে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে ধীরেন চন্দই আসলে সকলকে উস্কে দিল। পুজোতে একটু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা উচিৎ, কিন্তু ভাল গান গাইতে পারে বা নাচতে পারে এমন কাউকে পাওয়া গেল না। এদিকে আমাদের হাতে এমন টাকা ছিল না যে, ঢাকা বা কলকাতা থেকে আর্টিস্ট নিয়ে যেতে পারি। অনেক ভেবে চিন্তে আমি কিশোরগঞ্জে এসে, আমার বোন হেনাকে গানের জন্য এবং খনা ও মঞ্জুকে নৃত্যের জন্য নিয়ে গেলাম। তিনজনই অনুষ্ঠানে, বিশেষভাবে হেনা বহু প্রাইজ নিয়ে

এলো। এই অনুষ্ঠান শিলচরে বেশ নাম করেছিল। আমি তিন বোনকেই উপহার স্বরূপ হাফলং বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। এর পূর্বে ওরা বাড়ি ছেড়ে এতো দূরে আর কোথাও যায়নি, পাহাড়-পর্বত দেখেনি। একটা কথা মনে পড়লে এখনও আমাদের সকলের খুব হাসি পায়। কিশোরগঞ্জ থেকে রাত্রিতে আমরা সুরমা মেলে শিলচর রওনা হয়েছিলাম। সকালের দিকে গাড়ি শিলচর পৌঁছুবার পূর্বে, চারদিকের পাহাড় দেখে মঞ্জু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "দাদা, আমরা কি ভারতবর্ষের বাইরে চলে এসেছি ?"

১৯৪৫-৪৬ সালে, ভারতে ইংরেজ আমলের শেষ নির্বাচনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সারাদেশে "হ্যারিকেন" ট্যুর করে বেড়িয়েছিলেন। উনি শিলচর পৌঁছুবার পূর্বে ভারত সরকারের একটি গোপন সার্কুলার আমাদের সুপারের আপিসে পৌঁছায়। তাতে যে কোন সরকারি কর্মচারিকে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। আমাদের সুপার ছিলেন খুব ভীতু প্রকৃতির লোক। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে আমি ও চন্দ নেহরুর সভায় যাবই এবং তাতে তাঁকেও বিপদে পড়তে হবে। সভার সময় ছিল বেলা দুটোয়। উনি বেলা ১২টা থেকে আমাকে ও চন্দকে তাঁর আপিসে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে, তাঁর টেবিলেই একটা বাজে কাজ দিয়ে আমাদের আটকে রাখলেন। ওদিকে, আমরা দুজনই বেলা ১টা থেকে ১।।টার মধ্যে, একটু আগে-পরে, প্রকৃতির ডাকের দোহাই দিয়ে, নিকটস্থ এক বাড়ি থেকে কাপড় নিয়ে মাথায় পট্‌কা বেঁধে, নেহরুজীর সভায় যোগ দিলাম। বিকাল পাঁচটায় উনি হাইলাকান্দি যাবেন শুনলাম। সেখানে মোটর গাড়িতে যেতে আমাদের 'প্রেমতলার' বাসার সামনের রাস্তা দিয়েই তাঁকে যেতে হবে। তাই আমরা দুজনই আগে ভাগে দোতালার সামনের বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে পড়লাম। ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশীদের ভয়ানক ভীড় হলো। ডেপুটি পোস্টমাস্টারের সমস্ত পরিবার তখন আমাদের ঐ বারান্দায় ! অন্যদিকে বিরক্তির চোখে চন্দ আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। আমি আর কি করি, আকাশের দিকে চিল-টিল দেখছি। কিছুক্ষণ পরে নেহরুজীর গাড়ির কনভয় আমাদের বাঁদিক থেকে এলো ডানদিকে যাবে। আমাদের বাড়ি পার হতেই, কয়েকটি বালক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে লাল পতাকা হাতে, স্লোগান তুলল, "কম্যুনিস্ট পার্টি—জিন্দাবাদ"। নেহরুজীকে দেখলাম তিনি গাড়ি থামিয়ে বাইরে নেমে গেলেন এবং তাঁর গাড়ির বনেটে যে কংগ্রেস পতাকা লাগানো ছিল সেটা খুলে নিলেন। উক্ত বালকেরা তখনও ঠিক বুঝতে পারেনি কি হচ্ছে।

নেহরুজী কংগ্রেস পতাকা নিয়ে তাদের দিকে যেতেই তারা দৌড়ে গিয়ে বাঁদিকের মাঠে নেমে গেল। পেছনে পেছনে নেহরুজীও ছুটছেন, ছুটছেন তাঁর পেছনে স্থানীয় কংগ্রেসীরা। নেহরুজী একটি বালককে ধরে, তার হাত থেকে লাল পতাকা কেড়ে নিয়ে, কংগ্রেস পতাকা দিয়ে বললেন, বলো, "বন্দে মাতরম্"। ছেলেটিও সুবোধ বালকের মতো সেই শ্লোগান দিল। নেহরুজী ও অন্য কংগ্রেসীরাও গাড়িতে ফিরে এসে হাইলাকান্দি রওনা হয়ে গেলেন।

পণ্ডিতজী একটু মেজাজী মানুষই ছিলেন। ঐ একই যাত্রায় আসাম থেকে ফেরার পথে তিনি সুরম্য মেলে কিশোরগঞ্জের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সুযোগে কিশোরগঞ্জের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ রেল স্টেশনেই তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেন। অন্যদিকে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে বাঙ্গালি শিল্পপতি ও হাওড়ার 'দাসনগরের' প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত আলামোহন দাস কিশোরগঞ্জে একটা সুগার মিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতবড় মহকুমায় সেটাই ছিল একমাত্র ইনডাস্ট্রি। তার ম্যানেজার একটু হামবাগ গোছের লোক ছিলেন। নিজেকে নিজেই 'কেউকেটা' মনে করতেন। লোকে হেসে বলতো B. N. G. S. (অর্থাৎ বিলেত না গিয়েও সাহেব। শিলচর কলেজেও এমনি একজন B. N. G. S. ছিলেন। সেখানে আমার সমসাময়িক যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা আশাকরি চিনতে পারবেন।) যাহোক, কিশোরগঞ্জের ঐ সুগার মিলের ম্যানেজার ভাবলেন, পণ্ডিতজীকে কংগ্রেস থেকে সম্বর্ধনা দেবে তো, তিনিই বা কম যান কিসে! তিনিও মিলের সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে কংগ্রেসীদের চাইতেও সুন্দর ও বড় ফুলের মালা নিয়ে রাত্রি বারোটা/সাড়ে বারোটায় কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনুমান রাত্রি একটা কি দেড়টায় সুরম্য মেল স্টেশনে পৌঁছুলে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অনেক কায়দা-কসরৎ করে কামরার দরজা খোলালে, কংগ্রেসীদের পেছনে ফেলে, উক্ত সুগার মিল ম্যানেজার 'আইয়ে পণ্ডিতজী আইয়ে' বলে মালা হাতে কামরায় উঠতে গেলে, পণ্ডিতজী রেগে গিয়ে, 'তুম্ কৌন হ্যায় বেতমিজ, নিকাল যাও" ওই রকম কিছু বলে, প্রায় ধাক্কা দিয়েই কামরা থেকে ম্যানেজার বাহাদুরকে নামিয়ে দেন। প্ল্যাটফরমের উপরে দাঁড়ানো হাজার লোকের চোখের উপর তার প্রেস্টিজ একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তারপরই তিনি খোঁজ করেন ওখানে স্থানীয় কংগ্রেসের কেউ আছেন কিনা। ডাঃ প্রফুল্ল বীর তখন এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন এবং কন্যা বাণী তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। তখনও পণ্ডিতজী উক্ত বেতমিজ কর্মের জন্য

রাগে গজগজ করতে করতে ডাঃ বীরকে দু'চার কথা বলে উপস্থিত জনতাকে আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে চার-পাঁচ মিনিট কামরার দরজায় দাঁড়িয়েই বক্তৃতা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। এই কাহিনী বাণীর নিকট থেকে শোনা। আর ৪৫ বছর পর বাণীর খুড়তুতো বোন রেখা, এই কাহিনী লেখার সময় এটা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও শুনেছিলাম নেহরুজীর কিছু আগে বা পরে কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নাও ঐ কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশনে গাড়ির কামরার দরজায় দাঁড়িয়েই আগামী নির্বাচনে হাজার হাজার জনতার কাছে, তাঁর বক্তব্যও রেখে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পূর্বে, ১৯৪৬-এ ঐ দুই মহান গ্রহ বা বিগ্রহের বা দেশ ভাগের দুই রূপকারের কিশোরগঞ্জে উপস্থিতি, এখনো আমার মনে যেন কাকতালীয় বলে মনে হয়।

জওহরলাল নেহরুর মেজাজ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কুমিল্লা রেল স্টেশনে দিনের বেলায় গাড়ি গিয়ে থামলে, উনি যে কামরায় বসেছিলেন, তার জানালা দিয়ে কিছু যুবক কালো পতাকা দেখালে, তিনি লাফ দিয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে ঐ কালো পতাকাবাহীদের দিকে ছুটে গেলে, ওরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। কাহিনীটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম।

১৯৩৮/৩৯ সালে যখন আশুতোষ কলেজে পড়ি, তখন রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের ছাত্র, কিশোরগঞ্জের প্রিয় বন্ধু 'কারঙ্কার বাড়ির' মণির আহ্বানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি স্বদেশী মেলা দেখতে গিয়েছিলাম দুপুরে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম নেহরুজী কিছু কংগ্রেসী কর্মী পরিবৃত হয়ে, খুব দ্রুতগতিতে সাজানো স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর এটা ওটা জিজ্ঞাসা করছেন। আমি আর মণিও তাঁর পিছু পিছু ঘুরছিলাম। সামান্য সময়ের মধ্যে যখন উনি সেই 'মেলা পরিদর্শন' শেষ করে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ির উল্টো দিকের পার্কের গেটের কাছে পৌঁচেছেন, তখন এক ভদ্রলোক নেহরুজীর গলায় ফুলের মালা পরাতে গেলে, তাকে এক ধাক্কায় প্রায় ফেলে দিয়ে তিনি গট্‌গট্‌ করে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে ডাঃ রায়ের বাড়িতে প্রবেশ করে গেলেন। ভদ্রলোক যখন জামা-কাপড়ের ধুলো ঝাড়ছেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে উনি একজন প্রেস-ফটোগ্রাফার। সেই পুরানো দিনের ক্যামেরা, একপাশে তিন-পায়া স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে, নেহরুজীকে মালা পরিয়ে দু'তিন সেকেণ্ড একটু দাঁড়াতে বলতে গিয়েছিলেন, ফটো তোলার সুযোগ দিতে। হায়, প্রেস! ভারতীয় প্রেসের এ দুর্গতি আজও ঘোচেনি।

১৯৪৫ কি ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে, আমাদের শিলচরের সুপার সাহেব, হঠাৎ আমাকে একদিন তাঁর আপিসে ডেকে খুব অনুরোধের সুরে বললেন, মিঃ রায় জানেন এখন পর্যন্ত কাৎলীচাড়া চা-বাগান আমাদের কোন অফিসার পরিদর্শন করেননি। এটা আমাদের খুবই ডিস্‌ক্রেডিট্। কাৎলীচাড়ায় একটা রেঞ্জ খোলা হয়েছে কিন্তু কলকাতা আপিস থেকে কোন অফিসারকে ওখানে পাঠাতে পারছে না। এ পর্যন্ত দুজনকে পোস্ট করা হয়েছিল, তারা কাজে যোগ দেয়নি। আপনি তো দুরগম্য জায়গায় যেতে খুব ভালবাসেন। একটু কষ্ট করে একবার গিয়ে দেখে আসুন, বাগানটা কি করছে, এক্‌সাইজের সব ফরম্যালিটিজ ওদের বুঝিয়ে শুনিয়ে আসুন।

শিলচরের সুপার ঠিক আমার ডাইরেকট বস্ ছিলেন না। আমি ছিলাম প্রিভেন্‌টিভ ইনস্‌পেক্টার। আমার বস্ থাকতেন ঢাকায় অ্যাসিস্‌টেণ্ট কালেকটার। তাই এই অনুরোধ করে বলা। আমাকে ওঁনার কোনভাবে ব্যবহার করা আমার বস্ পছন্দ করতেন না। তিনি ঢাকা থেকে কখনো-সখনো শিলচরে এলে শিলচরের সুপারকে আমার সামনেই একথা বলে যেতেন।

যাহোক, আমি কাৎলীচাড়া যেতে রাজী হয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে জায়গাটা (যতদূর মনে পড়ে) শিলচর থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে লুসাই পাহাড়ের পাদদেশে। কাটাখাল রেল জংশনে গাড়ি বদল করে হাইলাকান্দি হয়ে লালাঘাট টারমিনাস স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে অনেকটা বাসে গিয়ে কাৎলীচাড়া বাজার ও থানা। কিন্তু চা বাগান পাহাড়ি পথে আরও সাত-আট মাইল রাস্তা নদীপথে অথবা পায়দল বা সাইকেলে যেতে হয়। যাহোক এক সকালে, শিলচর থেকে সাইকেল ও অল্প জামা-কাপড় ইত্যাদি নিয়ে ট্রেনে রওনা হয়ে কাৎলীচাড়া ডাকবাংলোয় যখন পেঁছুলাম তখন বেলা প্রায় চার-পাঁচটা। ডাকবাংলোয় প্রবেশ করে দেখি বারান্দার ডেক্ চেয়ারে কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের ইন্সপেক্টরের পোশাক পরে এক 'রাম খোকা' বসে আছে। ভদ্রলোক লম্বায় পাঁচ ফুট কিনা সন্দেহ, বুকের ছাতি বোধ হয় তিরিশ ইঞ্চি। যে ক্রস্‌বেল্টটা পরেছেন তার শেষ ফুটোয় হুক ঢোকালেও সামনে টানলে আরও বোধ হয় তিন-চার ইঞ্চি লুজ হয়ে আসতো। আমার পরিচয় পেয়েতো ভদ্রলোক মহাখুশি। তিনি ছিলেন মুসলমান। সিলেটের কোথাও বাড়ি। কলকাতা থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ও পোস্টিং অর্ডার নিয়ে সোজা সেদিনই আমার একটু পূর্বেই ওখানে পেঁাচেছেন। তাঁর যে শিলচরের সুপারের সঙ্গে দেখা করে আসা প্রয়োজন

ছিল, এটা বোঝেন নি বা কলকাতার আপিস থেকে কেউ তা বলেও দেননি। বললেন, আপনার সঙ্গেই শিলচর গিয়ে সুপারের সঙ্গে দেখা করে আসব। ভদ্রলোকের নামটা আজ আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। তবে নামের শেষ শব্দ 'রহমান' এটুকু মনে পড়ছে। আমার সঙ্গে আমার পিয়ন না থাকায় এবং ডাকবাংলোর চৌকিদার রান্না করে দেবে কিনা সে সংশয় থাকায়, আমি রাতের ও পরের দিন সকালের জন্য হাটবাজারের একটা দোকান থেকে চিঁড়ে আর গুড় কিনে নিই। এরপর থানায় গিয়ে ও. সি -র সঙ্গে পরিচয় করে, স্থানীয় কিছু খবরাখবর নিয়ে ডাকবাংলোতে পৌছাই। ও সি. অবশ্যই আমাকে চা-বিস্কুট খাইয়েছিলেন।

রহমান সায়েব আমায় বললেন, পিয়ন-টিয়ন কবে পাব, এই ভয়ে তাঁর মা তাঁদের বাড়ির এক পুরানো বিশ্বস্ত ভৃত্যকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। এই বলে, 'বড় মিঞা' বলে হাঁক দিতেই, মাঝবয়সী একটি ভৃত্য রান্না ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে, আমার অনুমতি না নিয়েই রহমান সায়েব তাকে বললেন, এই ভদ্রলোক আমাদেরই একজন পুরানো অফিসার, উনিও আমার সঙ্গে খাবেন। 'জী হুজুর' বলে ভৃত্য চলে গেলে, রহমান সায়েব আমায় বললেন, বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় তাঁর মা তাঁকে একটা 'মোরগা'[১] দিয়ে দিয়েছেন। আমি ভাবলাম, একেই বলে ভাগ্য। কোথায় চিঁড়ে-গুড়ের ডিনার খেয়ে রাত কাটাব, সেখানে একেবারে মুরগির মাংস-ভাত। রহমান মনে হয় খুব দিলদরিয়া মানুষ ছিলেন। আমাকে বললেন, আমরা যখন সেণ্ট্রাল একসাইজ কমিউনিটির লোক, তবে দুজন দুঘরে থাকব কেন ? বলেই আমার সাহায্যে তাঁর ঘরের খাটটা আমার ঘরে নিয়ে এসে নিজের বিছানা ঠিক করে নিলেন। আমারটাও আমি করে নিলাম। শীতকাল, সূর্য ডুবে যেতেই প্রচণ্ড শীত লাগলো। চৌকিদারের নিকট থেকে আমরা দুটো করে কম্বল চেয়ে নিয়েছিলাম। সে আবার তার স্ত্রীর অসুস্থতার অজুহাতে সন্ধ্যের পূর্বেই তার গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। থানার ও. সি আমায় অবশ্য সাবধান করে দিয়েছিলেন রাতে কোথাও না বার হতে। কারণ মাঝে মাঝেই নাকি বাঘ বার হচ্ছে। ডাকবাংলোর তিন দিকেই পাহাড় ও জঙ্গল। দুতিন ফারলং-এর পরিধির মধ্যে কোন জনবসতি নেই। সুতরাং সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই আমি রহমান সায়েবকে নিয়ে ঘরে চলে গেলাম। তাঁর ভৃত্য

১। মোরগ।

'বড় মিঞা'-কেও ডেকে বলে দিলাম রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতে আর অন্ধকারে উঠোন পার হয়ে আমাদের ঘরে আসতে বড় মোমবাতি বা পাটকাঠির মশাল জ্বালিয়ে চলাফেরা করতে। রান্না শেষ হতে বিলম্ব জেনে রহমান সায়েব তাঁর সুটকেশ থেকে একটা 'আড় বাঁশি' বার করে বললেন, এটা শিখছি। আমি বললাম যেটুকু শিখেছেন তাই শোনান। দেখলাম একটু কাঁচা হলেও মোটামুটি শিখেছেন। আমাকে গানের কথা জিজ্ঞাসা করলে বললাম, প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবু দু-একখানা গাইতে হল। ঘরের কাঁচের জানালা দিয়ে দেখলাম বাইরে যেন জ্যোৎস্নার বন্যা বয়ে চলেছে। চারদিক নিরব নিস্তব্ধ। এক নাগাড়ে কত রকম ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে। মাঝে মাঝে রাত-জাগা কোন পাখির ডাকও কানে ভেসে আসছে। কম্বল শরীরে চাপিয়ে বারান্দার ডেক চেয়ারে বসতে পারলে, পাহাড় জঙ্গল ও জ্যোৎস্নার এই মিশ্রিত অপরূপ শোভা আরও বেশি করে উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু বাঘের ভয়ে তার উপায় নেই। শিলচর বা আসামের জ্যোৎস্নাস্নাত পাহাড়-জঙ্গলের এই সুন্দর রূপ আমাকে বড়ই আকর্ষণ করত। তাই বদলি হয়ে বাংলাদেশে চলে আসার সময় মনে বড়ই কষ্ট পেয়েছিলাম। ঘরে কাঁচের জানালায় কোন শিক ছিলনা বলে সেগুলোও খোলা রাখার উপায় ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই 'বড় মিঞা' ঘরে খাবার নিয়ে এলো। গরম গরম মাংস, ভাত, ডাল, ভাজি ইত্যাদি খেয়ে যার যার বিছানায় শুয়ে নানা গল্প করতে করতে মোমবাতি নিভিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

গভীর রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রচণ্ড শীতে ডবল কম্বল দিয়ে নাক মুখ ঢেকে শুয়েছিলাম। মনে হল আমার বুকের উপর একটা কিছু ভারী জিনিস চেপে আছে। স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটেনি, অবস্থাটা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করছি। ওদিকে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমাদের চারদিকের জনমানবহীন ডাকবাংলোর ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা কিছু কিছু আমার জানা ছিল। সে সব মনে হতেই শিউরে উঠলাম। কিন্তু পাশের খাটে রহমান সাহেব শুয়ে আছে মনে পড়তে সাহস ফিরে এলো। স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার বুকের উপর কিছু একটা চেপে পড়ে আছে। দুহাতে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে বুকের উপর চাপা ভারী জিনিসটাকে মেঝেতে ফেলে দিয়েই বালিশের পাশ থেকে টর্চলাইট টেনে নিয়ে জ্বালিয়ে দেখি, কম্বলে মোড়া রহমান সাহেব। "কি হলো আপনার ?" জিজ্ঞাসা করতে, কোনও রকমে রহমান সাহেব

বললেন "বাঘা" (মানে বাঘ)। বাঘ ? ভাবছি কোথায় বাঘ ? তার তো নাম-গন্ধও নেই। এমন সময় ডাকবাংলোর ঠিক বাইরেই বাঘের একটা প্রচন্ড গর্জনে মনে হল যেন আমাদের ঘরের সব দরজা জানালা কেঁপে উঠল। এদিকে রহমান সাহেব 'ইআল্লা-বিসমিল্লা' বলে বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে ভাবছি, এ অবস্থায় কি করব। এর মধ্যেই বাঘের আরও দু'তিন বার গর্জন শোনা গেল, তবে আওয়াজটা মনে হল সামান্য দূরে। সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। আমি টর্চ নিবিয়ে খাটে বসে আছি। জানালায় শিক্ নেই বলে জানালা খুলে টর্চের আলো বাইরে ফেলতেও সাহস পাচ্ছি না। ডাকবাংলোর বারান্দায় বাঘ উঠে, গোঁ গোঁ করে দরজা খামচে গেছে এমন কাহিনীও জানা ছিল। যাহোক কয়েক মিনিট পর পুনরায় বাঘের গর্জন বেশ দূর থেকেই এলো। মনে হলো বাঘ তার কোন গন্তব্যস্থানে যাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন আর কোন গর্জন শোনা গেল না, তখন সাহস করে টেবিলে রাখা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম। দেখলাম রহমান সাহেব একই অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন। ডাকতে সাড়া দিলেন। যাক তবু ভাগ্য যে জ্ঞান হারাননি। আমি ঘরের দরজা খুলে সামান্য ফাঁক করে চেঁচিয়ে 'বড় মিঞা'-কে ডেকে তার সাড়া পেয়ে বললুম, পাটকাঠির মশাল জ্বেলে একবার আমাদের ঘরে আসতে। সে এলে, আমরা দুজনে রহমান সাহেবকে উঠিয়ে খাটে বসিয়ে সাহস ও প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলুম। 'বড় মিঞা' আমাকে খাটে বসতে বলে রহমান সাহেবকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তাঁর লুঙ্গি গেঞ্জি ইত্যাদি বদলে দিল। তারপর তাঁকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আরও সাহস ও বুঝ-প্রবোধ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লুম। রহমান সাহেব চোখ বুজে আছেন দেখে কোন কথা না বলে মোমবাতি নিভিয়ে দিলাম। ঘুম আর এলো না। কিছুক্ষণ পরই কাঁচের জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখতে পেলাম।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে, বাথরুম সেরে, দাড়ি কামাতে বসলে রহমান সাহেব উঠেই আমায় প্রথম কথা বললেন, রায় সায়েব, এ চাকুরি আমার পোষাবেনা। আমি অনেক বোঝালাম যে চিরদিন তো আর আপনাকে এখানে থাকতে হবে না ! এক দেড় বছর পরেই বদলি হয়ে যাবেন। গতকাল তাঁর সঙ্গে কথা ছিল, আজ সকালে চা জল-খাবার খেয়ে আমরা কাৎলীচাড়া বাগানে যাব এবং ফিরে এসে ডাকবাংলোয় লাঞ্চ খাব। কিন্তু রহমান সাহেব আর চা-বাগানে যেতে রাজি হলেন না। চা-বাগানে যাবার পূর্বে তাঁকে বলে গেলাম যে আমি দুপুরে

ফিরে আসব এবং আগামীকাল সকালে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শিলচর যাব। সেখানে সুপার সাহেবের সঙ্গে দেখা ও কথা-বার্তা বলে, তারপর যেন উনি ঠিক করেন এ চাকুরি করবেন কিনা। কিন্তু বেলা প্রায় একটার সময় ডাকবাংলোতে ফিরে এসে চৌকিদারের কাছে জানলাম যে রহমান সাহেব তাঁর বাড়ি রওনা হয়ে গেছেন। আমাকে অনেক ধন্যবাদ ও আদাব জানিয়েছেন। আর 'বড় মিঞা' আমার খাবার রান্না করে চৌকিদারের হেফাজতে রেখে গেছে। খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওঁদের রান্না খাবার আর খেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু চৌকিদারের পীড়াপীড়িতে সামান্য কিছু খেতেই হলো। এক রাতের সরল ও সহৃদয় বন্ধু রহমান সাহেবের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হয় নি। কিন্তু চাকুরি-জীবনের আলোচনা হলেই তাঁর স্মৃতি উঁকি দেয়। মানুষের জীবনে কতই না বিচিত্র ঘটনা ঘটে।

এই সময়কার শিলচরে আমাদের সুপার সাহেব ছিলেন উৎকলবাসী অথবা বর্ণশংকর উড়িয়া, তাঁর স্ত্রী ছিলেন অসমীয়া। ভদ্রলোকের রংটা ছিল মাজা কিন্তু মনটা কুৎসিত। ওখানে আমাদের সহকর্মিরা মোটামুটি সকলেই ছিল পূর্ববঙ্গের। ওদের ভাষায় সুপারের মুখাবয়ব লক্ষ্য করে অনেকে ওঁকে ডাকতো "উচ্চুঙ্গা"। কেউ ডাকতো, "হসকন্দর"। আমি ডাকতাম "গোবর মাখা গরুর ইয়ে।" ভদ্রলোক নাকি ছিলেন এম. এস. সি. (কেমেস্ট্রিতে) ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড। মনটা তাঁর সর্বোতভাবে কুৎসিত ছিল বলেই রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'-য় লেখা—"কমল হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলোটা ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"—কথাটার দৃষ্টান্ত ঐ সুপার ভদ্রলোকের মধ্যে যেমন প্রকৃষ্টরূপে পেয়েছি, এমন আর কোথাও পাইনি। ওঁর স্ত্রী ছিলেন খুবই কালো কিন্তু মনটা তেমনি ভালো। উনি শিক্ষিতাও ছিলেন না সুন্দরীও নয়, কিন্তু তাঁর হৃদয় ও মনের একটা সুন্দর রূপের পরিচয় আমরা পেতাম। সুপার সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সুখী ছিলেন না তাঁর রূপের জন্য। অসতর্ক মুহূর্তে অনেক সময় উনি এসব কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করে ফেলতেন। ওঁদের ছোট একটি মেয়ে ছিল, নাম বাসন্তী। উনি নিজের স্ত্রীকে আমাদের কাছে বাসন্তীর মা বলে উল্লেখ করতেন। কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার কাছে বলেও ছিলেন যে ওঁদের পরিবারে ছেলে-মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পূর্বে ওঁর পিতা তাঁর এই বিয়ে দিয়ে দেন। সুপার সাহেবের পিতা ও এক

ভাই মাঝে মাঝে এসে শিলচরে তাঁর কোয়ার্টারে থাকতেন। ওঁদের চেহারা, কথা-বার্তা, চাল-চলন দেখলেই বোঝা যেত, 'very low breed'

সুপার সাহেবের আপিস ছিল একটা দোতলা সুন্দর বাড়ির একতলায়। দোতলায় ওঁনার বসতবাড়ি, কিন্তু রান্নাঘর একতলায়। ডেপুটি পোস্ট-মাস্টারের মেয়ে গীতা দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও লাবণ্যময়ী ছিল। তার বিয়েতে আমরা একটা পার্টি দিয়েছিলাম। সেই পার্টিতে সুপার সাহেব তাঁর স্ত্রী সহ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সুপার সাহেব আমার পাশে বসেই ইংরেজিতে বললেন, 'See how nice and lovely wife of a poor Central Excise Sub-Inspector.' পাশেই বসেছিলেন তাঁর স্ত্রী। ইংরেজি তিনি বুঝতে পারতেন না। কথাটা শুনে ভদ্রমহিলা একবার তাঁর স্বামীর দিকে আর একবার আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকালেন। সুপারের কথায় আমি খুব বিরক্ত বোধ করেছিলাম, তাই কোন জবাব দিই নি। সুপারের আপিসে আমি কোন প্রয়োজনে গেলেই, রান্নাঘরে ঐ ভদ্রমহিলাকে পেলে বলতাম, বৌদি, এক কাপ চা খাওয়াবেন? পরের দিন, ঐ রকম সেই রান্না ঘরে গিয়ে, চা চাইতেই উনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল পার্টিতে আপনাদের সাহেব ইংরেজিতে আপনাকে কি বলছিলেন? আমি স্মার্টলি বলে দিলাম যে, একজন সাধারণ সাব-ইন্সপেক্টারের বিয়েতে কি সুন্দর পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে বলে উনি বলছিলেন। বহুদিন পরে বুঝেছিলাম যে আমার কথাটা তিনি সেদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করেন নি।

সুপার সাহেবের বাড়ির ডান পাশে একটা একতলা বাড়ি ছিল চা-বাগানের কোনও একজন বাঙালি অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজারের। আর তারও ডান পাশে ছিল ঢাকা বা ঢাকাই চা-বাগানের হেডক্লার্কের বাড়ি। সুপার সাহেবের বাড়িতে ও তার চাইতেও বেশি ঐ হেডক্লার্কের বাড়িতে আমার খুব যাতায়াত ছিল। হেডক্লার্কের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা একেবারে পুরো ঢাকাই চরিত্রের হৈ চৈ-করা মানুষ ছিলেন। এ দুই বাড়িতেই মাঝে মাঝে একটি ফর্সা সুন্দরী মেয়েকে দেখতাম। সে ছিল মাঝের বাড়ির অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজারের মেয়ে। তবে আমার সঙ্গে এ মেয়েটির কোনদিনই কোন আলাপ পরিচয় হয়নি।

কয়েক মাস পরে, ঢাকা থেকে আমার বস এ. সি.[১] শিলচরে এলে, সারকিট

১ অ্যাসিসট্যাণ্ট কালেক্টর।

হাউসে সুপারের সামনেই আমাকে বলেন যে, এই সুপারের মতে anti-Smuggling-এর কাজ, বদরপুর ঘাটেই নাকি বেশি, তাই আমার ইচ্ছে তুমি তোমার হেড কোয়ার্টার বদরপুর ঘাটে নিয়ে যাও। (বদরপুর ঘাট হচ্ছে সিলেট-শিলচর বর্ডারে, বরাক নদীর একটি বিরাট ফেরিঘাট ও রেলওয়ে স্টেশান। শিলচর থেকে পনের/বিশ মাইল দূরে)। আমি Smuggling সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললে, অ্যাসিসট্যাণ্ট কালেক্টার একটা Compromise করে বললেন যে ঠিক আছে, তুমি তিনমাস বদরপুর ঘাটে থেকে কাজ করবে আবার তিনমাস শিলচর থেকে কাজ করবে। আমাকে এটা মেনে নিতেই হলো। কিন্তু সত্যিকারের কোন্ প্রয়োজনে ওড়িয়া সুপার আমাকে বদরপুর ঘাটে পাঠাতে চাইছেন সেই মতলবটা পরিষ্কার হল না। বদরপুর ঘাট বাস্তবিক একটা গ্রাম। আমার মতো ছেলের ওখানে তিন মাস করে থাকাটাই একটা শাস্তি বিশেষ। যাহোক শিলচরের প্রেমতলার বাসাটা রেখেও, 'ভুঁইয়াদের' বদরপুর ঘাটের গদি-বাড়িতে আমার একটা থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিলাম। কিন্তু "চন্দ"-র কাছ থেকে জানলাম যে এই তিন মাসের মধ্যে কখনো আমি শিলচর আসি কিনা সেটা জানার জন্য আমাদের বিভাগের কিছু কিছু লোককে সুপার সাহেব বলে রেখেছেন। আমার শিলচর থাকা বা ওখানে যাওয়াটা উনি পছন্দ করেন না, এটা বুঝলেও, কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো না। নিয়মমতো, approved tour programme ছাড়া বা অনুমতি ছাড়া আমরা হেড-কোয়ার্টারের বাইরে যেতে পারতাম না। তখনও চাকুরিতে Confirmed হইনি। সুতরাং এরকম কোন কেসে ধরা পড়লে আমি চাকুরি থেকে ডিসচারজড্ হয়ে যেতে পারি।

ঐ তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনে শিলচর গেলেও সন্ধ্যার অন্ধকারে গিয়েছি। আবার হয় খুব সকালে নয়তো সন্ধ্যার অন্ধকারেই বদরপুর ঘাটে ফিরে এসেছি। শুধু একটা ভাল ফুটবল গেম খেলতে একদিন দিনের বেলায় শিলচর যেয়ে খেলার শেষে প্রেমতলার বাড়ির দিকে যেতে ঐ সুপার সাহেবের নজরে পড়ে যাই। ব্যাপারটা কিছুই নয়। কিন্তু শুনেছি মানুষের অনেক বিপদে বা খুব প্রয়োজনে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (6th sense) কাজ করে। আমার মনে হলো যে সুপার সাহেব এটা নিয়ে আমায় অসুবিধায় ফেলতে পারেন। আমি সেদিন ক্লাব হাউস থেকে ইউনিফরম খুলে আমার সাধারণ পোশাকেই প্রেমতলার বাড়ি ফিরছিলাম। কিন্তু প্রেমতলায় না গিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারির বাড়ি গিয়ে তাঁকে

ব্যাপারটা বুঝিয়ে আমি যে সেদিন খেলেছি তার কোন রেকর্ড না রাখতে এবং ক্লাবের কেউ যেন আমার খেলার কথা স্বীকার না করে তার সব ব্যবস্থা করে রাখতে বলি। অন্যদিকে চন্দকে পথে পেয়ে তাকে ব্যাপারটা persue করতে এবং এর উপর নজর রাখতে বলে সন্ধ্যার পরই বদরপুর ঘাটে ফিরে এলাম। পরের দিন বেলা আটটার মধ্যে চন্দ বদরপুর ঘাটে এসে আমাকে না পেয়ে ভুঁইয়া গদির বিশেষ এক ব্যক্তির কাছে কিছু খবর দিয়ে যায়। আমি ভোর সাতটায় সাইকেল নিয়ে বরাক নদী পার হয়ে বাইশ মাইল দূরে একটা চা-বাগানে চলে গিয়েছিলাম যার নাম আজ আর মনে করতে পারছি না। সে বাগানের ম্যানেজার ছিল এক ইংরেজ Tea planter-এর ছেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন Conscripted but released army Major। ভীষণ ফটো তোলার বাতিক ছিল তাঁর। আমি এই বাগানে প্রথম বার যখন যাই, তখন আমার সঙ্গেও ক্যামেরা ছিল। ফটো তোলার কমন হবিতে আমাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ঐ ইংরেজ আমলে সাধারণত ইংরেজ ম্যানেজাররা আমাদের ভাল চোখে দেখত না। আমাদের উপস্থিতি এবং শুল্কের ব্যাপারে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করা, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করত। ওদের বাবুদের (ক্লার্কদের) নিকট থেকে শুনেছি যে অনেক বাগান থেকে আমরা চলে আসার পর, অনেক ম্যানেজার নাকি এই রকম মন্তব্য করত যে "It is high time for us to leave India. Indian boys of yesterday are now and then coming to our garden and office and asking explanation for this or that mater. This is really disgracefull" এও শুনেছি যে বহু চা-বাগানে ভারতীয়দের জুতো পায়ে বা ছাতা মাথায় দিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আমার ধারণা এবং আমার knowledge-এ ঐ (মেজর) ম্যানেজারই বোধ হয় প্রথম এবং অদ্বিতীয় যে আমার মতো একজন ভারতীয় শুল্ক পরিদর্শনকারীকে তাঁর বাংলোর গেস্ট হাউসে থাকতে দিতেন, একসঙ্গে লাঞ্চ-ডিনার খেতেন এবং বাগানের আশেপাশের জঙ্গলে ক্যামেরা নিয়ে নানারকমের ফটো তোলার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন।

ওই চা-বাগানে যাবার পথে পিচঢালা মসৃণ রাস্তা, কোন গাড়ি ঘোড়া চলাচলের উপদ্রব নেই বললেই চলে। সেদিন কিছুটা মনের রোষে এবং উদ্বেগে ভয়ানক জোরে সাইকেল চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি, রাস্তার মাঝখানে রোদে অন্ততঃ তিরিশ/পঁয়ত্রিশটা বাঁদর বসে আড্ডা মারছে, নয়তো রোদ

পোহাচ্ছে। আমি দুহাতে সাইকেলের ব্রেক কষেও ওদের উপর গিয়ে পড়াতে ওদের অনেকে আঘাত পেয়ে আমাকে একেবারে দাঁত বার করে আক্রমণ করতে আসে। আমি সেদিন বাঁচার আর কোন আশা নেই দেখে ডান হাতে সাইকেলের সীট ও বাঁহাতে হ্যাণ্ডেলের মাঝখানটা ধরে বন বন করে চরকি ঘুরিয়ে যাচ্ছি আর নিজেও ঘুরছি। আমাকে আক্রমণ করতে গিয়ে, কয়েকটা বাঁদর সাইকেলের আঘাত পেয়ে এদিক ওদিক সরে যেতে, এক ফাঁকে আমি সাইকেল নামিয়ে লাফ দিয়ে উঠেই প্রাণপণে সেটা চালিয়ে দিই। কয়েকটা পুরুষ বাঁদর কিছুদূর অবধি আমার পেছনে এসে, শেষে হাল ছেড়ে দেয়। আমি সকাল দশটা কি সাড়ে দশটার মধ্যে বাগানে পোঁছে, আপিসে খোঁজ করে ম্যানেজার সাহেব বাংলোতে আছেন জেনে সোজা সেখানে চলে যাই। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক হৈচৈ করে উঠলে, আমি বলি এবার কিন্তু ফটো তুলতে আসিনি। এসেছি খুব বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে। আমাকে ভদ্রলোক এতই ভালবাসতেন যে বললেন যদি আজ আমার গেস্ট-হাউসে থেকে যাও, তবে তোমাকে যে-কোন 'ব্লাডি' সাহায্য করতে রাজি আছি। ম্যানেজার তাঁর বাবুর্চিকে ডেকে আমার খাবারের বন্দোবস্ত করতে বলে, চা ও স্ন্যাক্সের অর্ডার দিয়ে বললেন, বলো এবার তোমার বিপদের কথা। তাঁকে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বলি। কিভাবে উনি সাহায্য করতে পারেন জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, তোমার আপিসের শুল্কের রেকর্ড আমি গতকালের তারিখে পরীক্ষা করব। মানে, গতকাল আমি তোমার বাগানে বেলা দশটা কি এগারোটায় কাজ শেষ করে, এখানে রাত্রিবাস করে আজকের তারিখে বদরপুর ঘাটে ফিরে যাব। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, এটা নিয়ে কোন অনুসন্ধান হতে পারে কিনা। হতে পারে জেনে আমায় বললেন, ঠিক হ্যায়, তোমার যে ভাবে খুশি সে ভাবে সব কিছু করে, শুধু কি কি করে গেলে, সেটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে, যে যে রেকর্ড প্রয়োজন তার একটা তালিকা করে বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিলেন সেগুলো আপিস থেকে তাঁর বাংলোতে নিয়ে আসতে। রেকর্ডগুলো নিয়ে এলে আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব কাজ শেষ করে ম্যানেজার সাহেবকে সব বুঝিয়ে দিই। বিকেল বেলায় তাঁর সঙ্গে তাঁরই ক্যামেরা নিয়ে নানান রকম experiment-এর ফটো তুলে রাত্রি আট-নটা পর্যন্ত আড্ডা মেরে পরের দিন বদরপুরে ফিরে এসে জানতে পারি যে, সুপার সাহেব চন্দের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট দিনে আমাকে শিলচরে সে দেখেছিল কিনা।

চন্দর না বলাটা নাকি উনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন নি।

পনের দিন পরই আমি ঢাকা আপিস থেকে চিঠি পাই যে অমুক দিন যে শিলচরে সুপার সাহেব আমাকে দেখেছিল সেদিন শিলচরে যাবার আমার কোন approved tour programme বা কোনওরকম permission ছিল কিনা। আমি ভদ্র ভাষায় জানিয়ে দিই যে, যে তারিখের কথা বলা হচ্ছে, আমার ডেইলি ডাইরি দেখে, বুঝতে পারছি যে সেদিন আমি অমুক চা-বাগানে আপিসের কাজে গিয়েছিলাম এবং ফিরে আসতে বিলম্ব হলে পথের আপদ-বিপদের ভয়ে বাগানের গেস্ট-হাউসে রাত্রি বাস করেছিলাম। সুতরাং ঐ একই দিনে আমাকে কেউ শিলচরে দেখে থাকলে হয় তিনি ভুল দেখেছেন, নয়তো আমার ভূত দেখেছেন। এক মাস পরে কলকাতা কাস্টম হাউজ্ থেকে কালেক্টারের অর্ডার অনুযায়ী ঢাকা থেকে অ্যাসিসট্যাণ্ট কালেকটার শিলচরে এই ব্যাপারের ইন্কোয়্যারি করতে আসেন। শিলচরে আমাদের কোন সরকারি গাড়ি তখন ছিল না। সারা শহরে দু-তিন জন বাঙ্গালির মাত্র প্রাইভেট গাড়ি ছিল। অ্যাসিসট্যাণ্ট কালেকটার ছিল হাড়িয়া পাঞ্জাবী। ইন্কোয়্যারি করতে তাঁকে, আমি সেদিন যে বাগানে গিয়েছিলাম বলে জানিয়েছিলাম, সেখানে যেতে হবে। সেই দুর্গম পথের বর্ণনা শুনে এ. সি. সুপারকে জিজ্ঞাসা করলেন একটা গাড়ি যোগাড় করতে পারবে কিনা। ঐ সুপারের মতো 'উচ্চুঙ্গা' গাড়ি জোগাড় করবে কোথা থেকে! সে আমতা আমতা করছে দেখে এ. সি. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাঁ করলে এ. সি. মন্তব্য করলেন, দেখছি এ শহরে সুপারের চাইতে আমার প্রিভেন্টিভ ইন্সপেক্টর অনেক বেশি প্রভাবশালী। ঐ এক থাপ্পর খেয়ে সুপারের উচ্চুঙ্গা মুখ একেবারে 'গোবর লেপা ইয়ে' হয়ে গেল।

ভুঁইয়াদের মোটর গাড়ি ম্যানেজ করে আমরা তিনজন যখন ঐ বাগানে পোঁছুলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। আমাকে দেখেই ম্যানেজার ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। তখন ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে, একটার পর একটা দল আসছে, ক্রীপ্স মিশন, কেবিনেট মিশন ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে আলোচনা হতো যে তখনকার নেতাদের মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নাই ছিল ভারতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ডিপ্লোম্যাট। আর ইংরেজরা হচ্ছে Born ডিপ্লোম্যাট। একজন সাধারণ ইংরেজও বুঝি মিঃ জিন্নার থেকে বড় ডিপ্লোম্যাট। কথাটা যে কত খাঁটি সেটা ঐ বাগানে গিয়ে সেদিন যেন আরও ভাল করে বুঝলাম। ম্যানেজার তো এ. সি. এবং সুপারের সঙ্গে চা-বাগান, শুল্ক বিভাগ, টি-বোর্ড ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে

দুঘণ্টা কথার তুবড়ি ছোটালেন। এই দুঘণ্টা, এ. সি. ওখানে কেন গেছেন, সেই কথা ওঠাবার সুযোগই পেলেন না। আমার প্রতি ম্যানেজারের ভাবখানা এমন যে আমাকে চেনেনই না। সুপার যখন এ. সি কে এবং নিজেকে introduce করে, আমাকে ম্যানেজার চেনে মনে করে চুপ করে গেলেন, তখন ম্যানেজার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, you are Mr ? আমি নিজের পরিচয় দিলাম। শেষে ঘড়ির দিকে বারবার তাকিয়ে যখন এ সি. তাঁর ওখানে যাবার উদ্দেশ্যটা বললেন, তখন ম্যানেজার সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, তোমাদের কোন্ অফিসার কবে কখন আসে সে খবর ঠিক আমি জানি না, আমার আপিসের বাবুরা বলতে পারে। তাছাড়া আপিসের কাজে এলে তো, এক্সাইজ রেকর্ডস তাঁরা সই করে যাবে। সেই রেকর্ড দেখলেই তো সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এই বলে উনি তাঁর আপিসে বসেই বেয়ারাকে বললেন, বড়বাবুকে বলো, সব একসাইজ (শুল্ক) রেকর্ড নিয়ে আসতে। এতো যে কথাবার্তা হচ্ছে, এর মধ্যে ম্যানেজার আমার সঙ্গে কোন কথা বলাতো দূরের কথা, একবার আমার দিকে তাকিয়েও দেখেন নি। বাগানের বড়বাবু সব একসাইজ রেকর্ড নিয়ে ম্যানেজারের আপিসে পৌঁছুলে, তিনি নির্দিষ্ট তারিখটি বলে বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন তো সেদিন একসাইজের কোন অফিসার এসব পরীক্ষা করেছিলো কিনা। বড়বাবু নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার তিন-চার খানা খাতা খুলে আমার সই দেখে সাহেবকে দেখিয়ে বললেন, এইতো ওঁদের কোন অফিসারের সই রয়েছে। এই বার ম্যানেজার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন Hallo Mr. ! are these your Signatures ? "Yes please" বলে আমি আরও বললাম যে সেদিন ফিরে যেতে বিলম্ব হয়ে গেলে, আমি তোমাদের গেস্ট হাউসেই রাতে থেকে গিয়েছিলাম। ম্যানেজার সাহেব, গেস্ট হাউসের রেকর্ড আনিয়ে সেখানে আমার নাম দেখে, পাকা অভিনেতার মতো, মুখে সামান্য অবহেলা ও বিরক্তির ভাব এনে এ সি ও সুপারের দিকে চেয়ে বললেন "I do'nt find any reason for this hotch-potch. For nothing you have taken the trouble to come all the way to this jungle spoiling a lot of rationed petrol."[১] এক ফাঁকে, কেউ না দেখতে পায় এমন একটা পজিশনে, আমায় আবার চোখ টিপে উৎসাহিত করলেন। হাড়িয়া বা মুণ্ডা

১ তখন যুদ্ধের জন্য পেট্রল ব্যবহারে rationing ছিল।

পাঞ্জাবী এ. সি. আর বর্ণ শঙ্কর উড়িয়া সুপারের থোঁতা মুখ তখন একেবারে ভোঁতা, ভাবখানা হচ্ছে, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' সব চাইতে ভাল ভূমিকা দেখলাম বড়বাবুর। সবই জানেন কিন্তু ভাবখানা হচ্ছে কিছুই জানেন না, স্ট্যাচিউর মতো কাজ করে যাচ্ছেন। অনেকটা নেপালিদের মতো, বিয়ে করতে যাচ্ছে না খুন করতে যাচ্ছে মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। এ সি তাড়াতাড়ি উঠে, সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তার সময় নষ্ট করার জন্য বারবার ক্ষমা চেয়ে গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে গাড়ি ছেড়ে দিতে বললেন। ভুঁইয়াদের ড্রাইভার 'কালু'-র নামটা আমার এখনও মনে আছে। ওর চালানো গাড়িতে চেপে আমি বহু জায়গায় যেতাম। বাগান ছেড়ে গাড়ি বার হয়েছে কি না হয়েছে, এ. সি. আমার সামনেই সুপারকে বললেন, "I do'nt know who has appointed you as superintendent! Had I been in the Interview Board, I would not have appointed you even as Inspector. You do not know the A.B.C. of administration. Before sending your report to my office at Dacca, did you give a chance to Mr. Ray to explain the matter? At that time, I was on leave and another fool officiating in my place, sent the same to the collector, in Calcutta without going deep into the matter and hence all these hotch-potch for nothing I am over-burdened with my work, I do not like to spoil my time by coming all the way from Dacca to Silchar for such fruitless job."

তারপর কিছুক্ষণ নীরবে গাড়ি চলতে লাগলো। এ. সি. কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে All India Postal Strike-এর কথা তুললেন। বললেন আগামী ২৫শে মার্চ (১৯৪৬) থেকে ওরা strike করবে। আমার পরিবারের সকলেই রয়েছে এখন পাঞ্জাবে। সেখানেও চলছে নানা রাজনৈতিক ডামাডোল। strike হলে তো পরিবারের কোন খবরই নিতে পারব না। কথাটা শুনেই মুণ্ডা পাঞ্জাবীকে এবং পরোক্ষে বর্ণশঙ্কর উড়িয়াকে আরও একটু দাওয়াই দেবার লোভ সামলাতে না পেরে বললাম, ২৫শে মার্চ থেকে Postal strike নাও হতে পারে। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার জামার বুক পকেটে, শ্রী ডি. কে. লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের দিল্লি থেকে ২৪।২।৪৬ ইং তারিখের লেখা চিঠিখানা ছিল। আমি বললাম যে এটা All India Postal Union-এর প্রেসিডেন্টের চিঠিতে জানতে পেরেছি।

অবিশ্বাসের চোখে, এ. সি. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমাকে জানাবেন কেন? বললাম আমি তাঁর একজন খুব প্রিয় লোক আর সেই সঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের চিঠিখানা পকেট থেকে বার করে খামশুদ্ধ এ. সির হাতে দিলাম।[১] তিনি চিঠিখানা খুলে, ইংরেজি লেখা কথাগুলো পড়ে, চিঠিখানা সুপারের হাতে দিয়ে বললেন, বাংলা লেখাগুলো পড়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে। সুপার বুঝিয়ে দিতে দিতে চিঠির শেষ দিকে "ধীরেনদা on tour" ইত্যাদি পড়ে বুঝতে না পেরে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ধীরেনদা কে? আমি এটাই চাইছিলাম। এই ধীরেনদা ছিলেন, তখন আমাদের Additional Collector of Central Excise এবং পাঞ্জাবী অফিসারদের একেবারে যম। আমার কথা শুনে উক্ত ধীরেনদার পরিচয় পেয়ে, এ. সি.র চোখ গোল হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এ. সি. সুপারকে বললেন, Mr. Roy appears to have come of a respectable family. যার যেটা due, তাকে সেটাতো দিতেই হবে। ভবিষ্যতে, তোমাদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিও। আমাকে বললেন, অফিসিয়াল চিঠিতে তোমার ভূত দেখেছে বলে লেখা তোমার ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে তোমার চিঠির ভাষায় অফিসিয়াল ডেকোরাম ও তোমার পারিবারিক মর্যাদার স্বাক্ষর রাখলে আমি সুখী হব। আমি বললাম, শিলচরের টাউন ক্লাবে রেগুলার ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি খেলি। প্রত্যেকটি গেমে পারমিশান নিয়ে খেলতে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে এই সব খেলার জন্য একটা পারমানেন্ট পারমিশান দিয়ে যান। এ. সি. সুপারকে বললেন, আমাদের একটি ছেলে এখানের একটা নামকরা টীমে খেলে ও ফুটবলে I. F. A. শীল্ডে খেলতে যায়, সেটাতো আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই গৌরব। আমাকে বললেন, তোমার হেড্-কোয়ার্টারস শিলচরেই নিয়ে যাও, তবে মাসে তুমি দশদিন বদরপুর ঘাটে থেকে প্রিভেন্টিভ কাজ করবে।

একটা প্রবাদ আছে "স্বভাব যায় না মলে ইজ্জত যায় না ধুলে।" এর কিছুদিন পর শিলচরে সুপার সাহেব একদিন সন্ধ্যে সাতটায় তাঁর অাপিস চেম্বারে বসে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে, দুম করে বললেন আচ্ছা মিঃ রায়, বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে? আপনি শিলচরের মেয়ে বিয়ে করতে চান কেন? ব্যাপারটার আমি কিছুই বুঝতে না পারলেও, সুপারের কথার

১ এই চিঠির কপি ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঢংএ সেদিন মেজাজ হারিয়ে ফেলি। উঠে দাঁড়িয়ে বেশ চেঁচিয়েই বলি, আপনি কেন একথা বলছেন আমি সঠিক কিছু বুঝতে না পারলেও জেনে রাখুন, আমি কোথাকার মেয়ে বিয়ে করব সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে আপনাকে কথা বলার অধিকার দিল কে? তারপরই বললাম, শুনুন মিঃ অমুক নিজের চরকায় তেল দিন, খামোখা আমার পেছনে লাগবেন না। আমাকে খোঁচালে "that will Recoil upon your head." এসব কথা চেঁচিয়ে বলেই, সুপারকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে যাই। দু-তিন দিন পর, সুপার টুরে চলে গেলে, তাঁর স্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠান। আমি যেতে পারব না জানালেও, উনি বারবার অনুনয় বিনয় করে লোক পাঠালে, তাঁর স্নেহময়ী মুখখানার কথা মনে করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে বাড়ির দোতলায় দেখা করি। তাঁকে খুবই উত্তেজিত দেখে আমি বলি, আপনিও আপনার স্বামীর মত আমার সঙ্গে ঝগড়া করবেন নাকি? উনি বললেন, এতোদিনে আমায় কি এই চিনলেন? আমি আপনাকে ছোট ভাই-এর মতো ভালবাসি। আপনি এলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু আপনাদের ঐ অমানুষ সাহেবটা এটা খুব পছন্দ করেনা বলে, আমার মন চাইলেও আপনাকে ডাকি না। সে যাক্‌, গত সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে আপিসে বসে কি নিয়ে আপনাদের এতো রাগারাগি-চেঁচামেচি হল বলুন। আপনাকে তো এত রেগে যেতে কোনদিন দেখিনি।

আমি সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললে তিনি বললেন, এবার সব বুঝেছি। আপনি অনেক কিছুই জানেন না। আমাদের বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। সেই বয়সে ওঁর বা আমার কোন মতামতের প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের পরিবার ওঁদের চাইতে অনেক উচ্চ স্তরের। কিন্তু উনি লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন বলে, ছাত্রাবস্থায়ই আমার বাবা ওঁনার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু আমি কালো-কুৎসিত বলে আমাকে উনি একেবারেই পছন্দ করেন না। আমাকে আর যেন সহ্যও করতে পারছেন না। কারও সুন্দর স্ত্রী দেখলেই আমার উপর আরও ক্ষেপে যান। সেদিন পার্টিতে ঐ সাব-ইন্সপেক্টরের স্ত্রী দেখে এসে আমাকে কত কথাই না শোনালেন। এখন ওর নজর পড়েছে ঐ পাশের বাড়ির অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারের ফর্সা মেয়েটার উপর। কিন্তু মেয়েটা ওকে পোঁছেও না। মেয়েটার নজর আপনার উপর। আপনার সম্বন্ধে আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। আপনি আমাদের বাড়িতে বা নিচে আপিসে এলে আপনাকে

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। আমাকে অনেকদিন বলেছে আপনাকে দিয়ে বা আপনাদের সাহেবকে দিয়ে ওদের পরিবারে আপনার সঙ্গে ঐ মেয়েটির বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে। বহুদিন এভাবে বলার পর, আমি আপনাদের সাহেবকে কয়েকদিন পূর্বে অনুরোধ করেছিলাম যে কথাটা আপনার সঙ্গে পরিষ্কার করে এবং আপনি রাজি হলে একটা বিয়ের প্রস্তাব ঐ মেয়েটির বাবার কাছে দিতে। তার পরিণাম যে এই হবে সেটা আমি ধারণাও করতে পারিনি। সেই দুঃখেই আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি বললাম, আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না, আপনি চেয়েছিলেন এক ঢিলে দুপাখি মারতে। কিন্তু আপনার স্বামীকে কথাটা বলার পূর্বে যদি আমাকে একটু বলতেন, তবে সাহেবের সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কোন সুযোগই থাকতো না। যাহোক, বৌদি, জেনে রাখুন, আমার বিয়ের প্রস্তাবের কোন প্রয়োজনই নেই। আর আমি যতদিন শিলচরে আছি, ঐ মেয়েটির জন্য যাতে আপনার স্বামী আপনার কপাল ভাঙ্গতে না পারে, আমি সেই ব্যবস্থা অচিরেই করছি।

সেদিন ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে বিনা-প্রয়োজনে বদরপুর ঘাটে পাঠানো থেকে সব ঘটনাই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার বয়েস আর তখন কত? তেইশ-চব্বিশ বছর। আমি তখনও অবিবাহিত। ঐ অনভিজ্ঞ বয়সেও সেদিন বাড়ি ফিরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই কথাই ভাবছিলাম যে একটা শিক্ষিত মানুষ, উচ্চপদস্থ ও বিবাহিত এবং এক মেয়ের বাবা হয়েও, কতটা লম্পট, স্বার্থপর এবং নীচ হতে পারে। খেলার দিনে আমাকে শিলচরে দেখেই, ঈর্ষান্বিত হয়ে যা করেছিলেন, তাতে আমি খুব সময়মতো সব ব্যবস্থা না নিলে, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকভাবে কাজ না করলে আমার চাকুরিটাই চলে যেত, অথবা কম-সে-কম ব্ল্যাক স্পটেড হয়ে, আমি যে অ্যাসিসট্যাণ্ট কালেকটার হয়ে রিটায়ার করেছিলাম, তা আর এ জীবনে সম্ভব হত না!

ব্যাপার কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। ১৯৪৬-এর ১লা আগস্ট আমার ও বাণীর বিয়ের পর্ব শেষ করে ৩রা কি ৪ঠা আগস্ট শিলচরে পেঁছাই। তার দু-তিন দিনের মধ্যেই ঢাকা চা-বাগানের হেড্ ক্লার্কের বাড়িতে দুপুরে ও রাতে দুবেলাই নিমন্ত্রণ খেতে গেলে ঐ বাড়ির মেয়েরা আনন্দ করে আশেপাশের প্রতিবেশিদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাণীকে পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ চা-বাগানের অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজারের বাড়িতে বাণীকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলে সে বাড়ির সেই ফর্সা সুন্দর মেয়েটি নাকি "ওমা! বারীনদার বৌ" বলে এমন পেইল হয়ে

যায় যে উপস্থিত সকলেই একটু অস্বস্তিতে পড়ে। শিলচরের বাসায় রাত্রিতে ফিরে এসে বাণী এই ঘটনা আমাকে বলে, নানান রকম ঠাট্টা করতে থাকে। বাধ্য হয়ে পূর্বের সকল ঘটনা তাকে বিস্তারিতভাবে বললে সে শান্ত হয়।

অন্যদিকে আমি শিলচরে থাকা পর্যন্ত সুপার সাহেব, সেই মেয়েটি বা অন্য কাউকে নিয়ে তাঁর স্ত্রীর কপাল ভাঙ্গতে পারেন নি। তবে ১৯৬০-৬২ সালে, কলকাতা বসেই শুনেছিলাম, তিনি কিছুদিন পূর্বেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন, অবশ্য শিলচরের সেই মেয়েটিকে নয়। বাসন্তীর মা তখনও বেঁচে।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে আমি বদরপুর ঘাটের আপিসে বসে দুপুর-বেলা কাজ করছি, (বাণী তখন পেটের ব্যথার চিকিৎসার জন্য ও পড়াশোনার জন্য কিশোরগঞ্জে আছে) হঠাৎ একটা সুন্দর প্রাইভেট মোটরকার এসে. আপিসের সম্মুখে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে একজন প্রৌঢ় ও দুজন যুবক দিশী সাহেব নেমে এসে আমার খোঁজ করে পরিচয় পেয়ে প্রৌঢ় বয়স্কের সাহেব বললেন, আমার নাম জে. সি. দাশ, আর তুমি হচ্ছ আমার নাতীন জামাই। আমি তোমার শাশুড়ি নিরুর (নিরুপমা) কাকা। তাদের সকলকে নিয়ে আপিসের ভেতরে বসিয়ে অনেক অনুরোধের পর শুধু এককাপ করে চা খেতে রাজি হলেন। আর প্রণাম করতে গেলে বললেন, এখানে নয়, শিলং গেলে আমার বাড়িতে আমি ও তোমার দিদিশাশুড়ি একসঙ্গে তোমার প্রণাম নেব। আরও বললেন, আমি তোমাদের বিয়ের খবর সিলেটে আমার দাদা মানে নিরুর বাবার নিকট থেকে পেয়েছিলাম। আজ শিলচরে টুরে এসেছিলাম, খোঁজ করে জানলাম তুমি বদরপুর ঘাটে আছ। তাই শিলং ফেরার পথে তোমাকে দেখে গেলাম। তুমি অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিলং-এর লাবাংএ আমার বাড়িতে যাবে। শিলং-এ পৌঁছে আমার নাম করলেই সবাই আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লাগল। ফেরার পথে দাদাকে সব বলে যাব। তাঁরাও সকলেই তোমাকে দেখতে উদ্‌গ্রীব। শিলং যাবার পথে একদিন সিলেটে থেকে আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচয় করে গেলে, সকলেই খুব সুখী হবে। ওঁনার দুজন সাথীর পরিচয় পেলাম। একজন সিলেটের আর অন্যজন শিলচরের Executive Engineer. আর তিনি ছিলেন, রায়সাহেব জে. সি. দাশ, আসাম সরকারের P. W. D.-এর একমাত্র Superintending Engineer. সরল একেবারে দিলখোলা ভাল মানুষটির সঙ্গে পরিচয়ে খুব আনন্দ পেলাম। ফিরে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে বলে তাঁরা তাড়াতাড়ি করে

চলে গেলেন। আমি গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। বাণীর কাছে তার এই দাদুর গল্প আমি পূর্বেই শুনেছিলাম। সে সময়ের সুন্দর ও বেশ নাম করা ৮৪ মাইল লম্বা "সিলেট—শিলং" পাকা রাস্তাটি ওঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে বাণীরা পুজোর ছুটিতে সিলেটের মামাবাড়িতে বেড়াতে গেলে, এই দাদু সেখান থেকে বাণীকে নিজের গাড়িতে করে শিলং নিয়ে যান এবং সেই সুন্দর ও মনোরম পাহাড়ি পথে, কোথায় কোন্ কালভার্ট এবং পুল বা ব্রীজ ইত্যাদি কত কষ্ট করে, কত কায়দা-কৌশল করে তৈরি করতে হয়েছিল, তা জায়গায় জায়গায় থেমে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। বাণী বলেছিল, সেই পথে যেতে যেতে দেখেছিলাম, ওখানে দাদার কি সম্মান! শিলং-এর লাবাং এ (ওটাকে তখন বলা হত শিলং-এর বালীগঞ্জ) দাদুর সেই সুন্দর বাংলোবাড়ি বাণীর খুব ভাল লেগেছিল। দাদু নিজে গাড়ি চালিয়ে শিলং-এর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়েছিলেন। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Beadon-Bishop আর Elephant falls. এই রকমের আরও কত গল্প। তাই সেদিন রায় সাহেব দাদুর নিমন্ত্রণে শিলং যেতে খুব আগ্রহ বোধ করলাম। আমি তখনও কোন ভাল Hill station দেখিনি। আমার পাহাড়ের অভিজ্ঞতা ময়মনসিংহের দিকের গারো পাহাড়, চট্টগ্রামের টিলা আর বরাক ভ্যালির পাহাড় আর হাফলং। তাই ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শিলং-এর পথে বেলা এগারোটায় সিলেটের "নয়া সড়ক"-এ দাদাশ্বশুর শ্রীরাধিকা রঞ্জন পাল মহাশয়ের বাড়ি গিয়ে আমার পরিচয় দিলে সেখানে একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেল। পাশাপাশি তিন দাদাশ্বশুর মহাশয়দের বাড়ি। পরিবারবর্গের সংখ্যাও অনেক। সিলেট শহরে তাঁদের বহু আত্মীয়-স্বজন ছিল। ঐ বছরেরই ১লা আগস্টে আমার ও বাণীর বিয়ে নিয়ে সেখানে অনেক আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এবং তখনও একেবারে থেমে যায়নি। এর মধ্যে বিনা খবরে আচমকা সেখানে আমার উপস্থিতি। যা হোক ওখানে পাশাপাশি তিন দাদাশ্বশুরই ছিলেন সিলেট শহরের খুব নামজাদা উকিল, শহরের সব গণ্যমান্য পরিবার। শ্রীরাধিকা রঞ্জন পাল মহাশয়ের বড় পুত্র ভারতের বিখ্যাত ফিজিওলজিস্ট ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মাত্র কয়েক মাস পূর্বে পরলোক গমন করেছেন, আমার স্ত্রী বাণীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে। বাণী তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ভাগ্নী ছিল বলে, বাণীর মৃত্যু ওঁর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। ডাঃ পালের ছোট ভাই ছিলেন ফিজিক্সে এডিন্‌বরার ডক্টরেট্ (ডঃ হীরেন্দ্র কুমার পাল)।

আমি শিলচরে বহুদিন "ভুঁইয়া"-দের পরিবারে ছিলাম বলে, শিলচরের অনেকেই আমাকে 'সাহা' সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করত। আর ঠিক এই ভুল খবরটাই সিলেটের দাদাশ্বশুর মহাশয়দের নিকট পেঁছুলে, সে সময়ের সামাজিক মানসিকতায় তাদের মনে খুব আঘাত লাগে। কিন্তু দাদাশ্বশুর শ্রীরাধিকা পাল মহাশয়, আমি কায়স্থ সম্প্রদায়ের এবং আমাদের গোত্র ভরদ্বাজ জেনে একেবারে খুশিতে আটখানা হয়ে, পাশাপাশি তিন বাড়ির সকলকে সেটা বেশ বড় গলায় জানিয়ে, আমাকে একটা রিকশায় বসিয়ে গীর্জার পশ্চিম এবং আরও অন্যান্য পাড়ার সকল আত্মীয়দের সঙ্গে একদিনেই আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। খেতে খেতে তো আমার অসুস্থ হয়ে পড়ার অবস্থা !

পরের দিন বেলা দশটার বাসে আমি রওনা হলাম শিলং। আমার দিদি-শাশুড়ির কবিতা লেখার হাত ছিল। রওনা হবার পূর্বে ওঁকে প্রণাম করলে উনি একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, শিলং-এর বাস ছেড়ে দিলে তবেই এটি খুলে পড়ো। আমি তাঁর কথা রেখে বাসের রাস্তায় ভাঁজ করা কাগজটা খুলে দেখি, সেটা আমাকে ও বাণীকে নিয়ে সুন্দর একটি ছড়া-কবিতা। আমি সেটা আমার চিঠির ফাইলে যত্ন করেই রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না। দেশভাগের টানা-পোড়েনে এমন অনেক প্রিয় ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবে কবিতার শেষ লাইনটি মনে হয় এখনও সঠিক মনে আছে : "আমার নাতনীরে ভাগিয়ে নিল, ঢাকাইয়া ফাক্কর" (ফক্কর)[১]। দাদাশ্বশুর মহাশয় ও এই দিদি-শাশুড়িকে দেশভাগের পর বালীগঞ্জ প্লেসে, ওঁদের বড় ছেলে ডাঃ আর কে. পালের বাড়িতে বহুদিন পেয়েছি। এমন সাত্ত্বিক, সজ্জন ও ভাল মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। যদি দেখেও থাকি তবে সেই জমানার মানুষদের মধ্যেই দেখেছি। বর্তমান জমানায় মানুষের সে সব গুণ হারিয়ে গেছে। বাল্যে, কৈশোরে, এমন কি যৌবনেও, আমাদের সমাজে যে আদর্শ, মূল্যবোধ, নিঃস্বার্থপরতা, মায়া-মমতা ইত্যাদি দেখেছি ও পেয়েছি, তার সব কিছুই যেন বড় দ্রুত উবে যাচ্ছে।

বাস এসে ডাউকিতে থামল। সিলেট থেকে পঁচিশ-ত্রিশ-মাইল দূরে। এখান থেকেই উঁচু পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। দেশভাগের পর এখানে ইণ্ডিয়ান কাস্টমস্

---

১ সিলেটে ফক্করকে ফাক্কর বলে।

স্টেশন হয়েছিল। শিলচরের বন্ধু ধীরেন চন্দ কিছুদিন ডাউকিতে পোস্টেড ছিলো। শুনেছি, কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত 'ছাতক' নামক স্থানটি খুব কাছেই। ডাউকিতে খাসিয়া মেয়েরা পিঠে কমলালেবুর ঝুড়ি নিয়ে বাসের আশেপাশে ঘুরছে। আমি এক টাকা দিয়ে বারটা কমলালেবু কিনে খেতে আরম্ভ করলাম। এই খাসিয়া মেয়েরা ছিল পাহাড়ি মেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত আর খুব lustful. শিলচরে থাকতে আমেরিকান সৈন্যদের দেখতাম, একটু মাতাল হলেই মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলত, "Any time Shillong" যুদ্ধের সময় আমাদের ভারতীয় সৈন্যরাও শিলং বদলি হলে খুব খুশি হত। দেশভাগের পূর্বে, প্রথমে ঢাকায় ও পরে সমস্ত বাংলাদেশে একটা 'বাণী' ছড়িয়ে পড়েছিল, "মার কৈলাস, লাল লেংগট।" সাধারণত বাঙালি যুবকেরা কোন জয়ে বা আনন্দে চীৎকার করে ঐ কথাগুলো উচ্চারণ করত। আশা করি, আমাদের সময়ের সকলেরই এ কথা মনে আছে। আমেরিকান সৈন্যদের উক্ত আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গীও ছিল অনেকটা একই রকমের, তবে ইঙ্গিতটা lustful. চট্টগ্রামের বন্ধু জিনাপদ বড়ুয়া এসে একবার ময়মনসিংহ থেকে আমায় চট্টগ্রাম নিয়ে গেল, তাদের সদরঘাট ক্লাবের হয়ে, ওখানের একটা ব্রিটিশ সৈন্যদের ফুটবল টীমের বিরুদ্ধে শীল্ড ফাইনালে খেলতে। অবাক হয়ে সেখানেও লক্ষ্য করেছিলাম যে ঐ সৈনিক টীম গোল দিলেই কয়েক শত সৈনিক দর্শক চীৎকার করে উঠছে "মাক্ কেলাস, মাক্ কেলাস।" যুদ্ধের শেষে ঐ ব্রিটিশ সৈন্যরা দেশে ফিরে গিয়ে তাদের ভাইদের ও বন্ধুদের ঐরকম দুএকটা ইণ্ডিয়ান আনন্দের চীৎকার যে না শুনিয়েছে, তাতো মনে হয় না। বাণী যখন লাবাং-এর ঐ দাদুর বাংলোয় গিয়ে কয়েকদিন ছিল, তখন সে কিশোরী। ঐ বাড়িতে তার প্রায় সমবয়েসী তিন মাসী (রায়সাহেবের কন্যা) ছিল খেলার সাথী। একটা বেশ বড় পাহাড়ি টিলার চূড়ো কেটে সমতল করে ঐ বাংলো আর তার চারদিকে বাগান করা হয়েছিল। এক বিকেলে তারা ঐ বাগানের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে একপাশে গিয়ে অনেকটা নিচের রাস্তায় এক আমেরিকান সৈন্য ও একটি খাসিয়া মহিলাকে অসভ্যতা করতে দেখে, বাগানের রাস্তার উপর ফেলা গ্রাভেলের পাথর কুচি দিয়ে বাণীরা ঢিল ছোঁড়ে। ঐ ঢিল সেই সৈন্যের শরীরে গিয়ে পড়াতে, সে রাগতভাবে চারদিকে তাকাতে থাকলে, বাণীরা বাংলোর ভেতরে চলে যায়।

যাক, "ডাউকি" থেকে এবার আমাদের বাস রওনা হলো আরও উপরে

'পেনিনসুলার' লক্ গেটের দিকে। সিলেট-শিলং রোড ছিল one way. বেলা দেড়টার সময় লক্ গেট খোলা হত। তখন শিলং-এর দিকে আসা সব গাড়ি সিলেটের দিকে রওনা হত আর সিলেটের দিকের সব গাড়ি শিলং বা চেরাপুঞ্জীর দিকে। বেলা দেড়টার পূর্বে যে সব গাড়ি পেনিনসুলায় পেঁছুত, তাদের দেড়টা পর্যন্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এই সময়ের মধ্যে পেনিনসুলায় অনেকে মধ্যাহ্নকালীন আহার সেরে নিত। বাস যতই উপরে উঠছিল ততই চারদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। পরের জীবনে অবশ্য ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব Hill Station-ই দেখেছি। কয়েকটা তো অনেকবার। কিন্তু আমার সেবারের শিলং দর্শন জীবনের প্রথম নাম করা Hill Station বলেই হয়তো মুগ্ধ হবার পরিধি ও গভীরতা ছিল বেশী। পেনিনসুলায় যখন পেঁছুলাম তখন বেলা সাড়ে বারোটা। অপূর্ব সুন্দর জায়গা। তখন পর্যন্ত এত সুন্দর পাহাড়ি জায়গা আমি দেখিনি। একটা ইউরোপিয়ান স্টাইলের রেস্তোরাঁ দেখে, বাস থেকে নামি। একটু এদিক ওদিকের দৃশ্য দেখে, ঐ রেস্তোরাঁর দোতলায় উঠে খাবারের অর্ডার দিলাম। রেস্তোরাঁটা একেবারে ফাঁকা দেখে বিস্মিত হলেও পাহাড়ের একপাশে একটা খোলা বারান্দা দেখে সেখানেই বসে, আর উঠে আসতে ইচ্ছে করল না। সেখানে বসে আমি দূর-দিগন্ত দেখতে পাচ্ছি। আমার নিকট থেকে অনেকটা দূরে একটা বড় জলাশয়। তার একদিকে সবুজ গাছের সমারোহ, অন্যদিকে বেশ উঁচু নেড়া পাহাড়। সেই নেড়া পাহাড়ের গায়ে ঠেকে আছে ঝাঁক ঝাঁক মেঘ। সূর্যের কিরণে সেই মেঘ আর নেড়া পাহাড়ে কত রকমের রং ফুটে উঠছে। আমি চোখ ফেরাতে পারছি না। টেবিলের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে আর আমি ঐদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। বেয়ারা কয়েকবার এসে একথা আমাকে স্মরণও করিয়ে দিয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাবারের দিকে মন দিলাম। তারপর এক সময় আমাদের বাসেব হর্ন শুনে বাধ্য হয়ে এসে বাসে বসলাম। কিছুটা এগিয়ে যেয়ে একটা রাস্তার মোড়ে এসে দেখলাম, চেরাপুঞ্জীর পথের "এরো" মার্ক। ঐ মোড় থেকে চেরাপুঞ্জী মাত্র চার মাইল দূরে। আমাদের বাস এগিয়ে চলেছে শিলং-এর দিকে। ক্রমেই উপর থেকে উপরে। দূরের পাহাড় থেকে কত ঝরনা শুভ্র সুতোর মতো উপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে, নিকটের গুলোর অবশ্য জল দেখা যাচ্ছে। চার হাজার ফিট পাহাড়ের উপরেও গাঢ় সবুজের মেলা আসামের সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য। পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকেলে এক সময় যেয়ে শিলং বাস স্ট্যাণ্ডে

পোঁছুলাম। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে লাবাং-এ দাদাশ্বশুর মহাশয়ের বাড়ি। ওখানে পরিবারের সকলে আমাকে আদর করে নিয়ে বাড়ির ভেতরে বসিয়ে নানারকম কুশলবার্তা বিনিময় করতে আরম্ভ করলেন। রায়সাহেবও বাড়িতে ছিলেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সেদিন বোধহয় ১লা জানুয়ারি (১৯৪৭)। সন্ধ্যা নেমে আসতেই প্রচণ্ড শীতে আমরা ফায়ার-প্লেসের সুমুখে যেয়ে বসলাম।

পরের দিন ভোর সাড়ে ছটায় ঘুম ভাঙতেই দেখি, রায়সাহেবের একমাত্র ছেলে আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট, সে ছাড়া ঘুম থেকে আর কেউ ওঠেনি। ছেলেটি বলল, সবাই অনেক পরে উঠবে, চলুন আপনাকে শিলং পীক দেখিয়ে আনি। তখনও ঐ পীকে ওঠার কোন রাস্তা বা পীকে উঠে বসার জায়গা ইত্যাদি কিছুই তৈরি হয়নি। পীকের কাছে যেয়ে ছেলেটি আমায় বলল, ইচ্ছে করলে উপরেও উঠতে পারেন, সেখান থেকে চারদিকের অতি মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। সুটেড্-বুটেড্ অবস্থায়ই ছোট-বড় গাছ ধরে ঐ ছেলেটিকে অনুসরণ করে এক সময় পীকে উঠে চারদিকের মনোরম দৃশ্য দেখে সত্যিই বড় ভাল লাগলো। আর যেন নেমে আসতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু একসময় নেমে আসতেই হলো। নামার সময় দেখলাম, কোন কোন জায়গায় আমার শরীরের ভারসাম্য থাকছে না, হিঁচড়ে পড়ে যাচ্ছি, যা থেকে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ভারসাম্য না রাখতে পারাতে নিজেকে খুব হেয় মনে হ'ল। মনে পড়ল এককালে, এই আমাকেই স্কুলের মাস্টার মহাশয়রা 'without tail' ডাকত! আর আজ আমার এই পরিণতি! ছেলেটি তখন আমার জন্য helper আনতে নিচে যেতে চাইছে। আমি তাকে বাধা দিয়ে, মাথা পীকের দিকে আর পা নিচের দিকে রেখে এবং বুক পাহাড়ের জমিতে রেখে, ছোট ছোট গাছের সাহায্যে উল্টো দিকে ক্রল্ করে নেমে এলুম। তাতে অবশ্য আমার সুটের কিছুটা ক্ষতি হল। বেলা ৯টা নাগাদ, রায়-সাহেব তাঁর গাড়িতে আমাকে উপরিউক্ত falls, Lake, Race-Course ইত্যাদি দেখিয়ে আনলেন। সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে বাজারেও গিয়েছিলাম। দেখলাম মেয়েরাই সব বিক্রেতা। যেটা দেখে খুব বিস্মিত হয়েছিলাম সেটা হলো ঐ নারী বিক্রেতাদের অধিকাংশের পিঠে বা পাশে একটি করে শিশু। দেখলেই মনে হয় আমেরিকান বাচ্চা। কৌতূহল হলেও রায়সাহেবের সঙ্গে এটা আমার আলোচনা করা চলে না, তাই চুপ করেই রইলাম।

ওখানে বোধ হয় তিন চার দিন ছিলাম। পেনিনসুলা থেকেই বাণীর

অনুপস্থিতির জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল। শিলচরে ভাল ডাক্তার থাকলে, তাকে এত তাড়াতাড়ি কিশোরগঞ্জে ফিরে যেতে হত না, এই শিলং ভ্রমণে সে-ও আমার সঙ্গে থাকতে পারত। বাণী সঙ্গে থাকলে বিশেষ করে সিলেটে এবং শিলং-এ আমাদের দ্বিগুণ আনন্দের ব্যাপার হতো। যাতায়াতের পথে, কি সিলেট আর কি শিলং, সদা-সর্বদাই আমার বাণীর কথা মনে হয়েছে। সে সঙ্গে না থাকায় সিলেট এবং শিলং-এর সকলেই খুব অনুযোগ করেন। একবার বাণীকে নিয়ে বেড়িয়ে যেতে আন্তরিক নিমন্ত্রণও করেন। লাবাং-এ রায়সাহেব দাদাশ্বশুর মশাই-এর বাংলোতে একদিন কি দুদিন দোতলার একটাই মাত্র ছোট ঘরে আমি ছিলাম। ঐ ঘরের সামনের দিকে একটা ক্যান্টিলিভার করা ছোট বারান্দা ছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে শিলং-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। একদিন ভোর ছটায় উঠে ওখানে দাঁড়িয়ে বাণীর অনুপস্থিতি মনের গভীরে বড় আঘাত করেছিল। তাই একটা পিন্ জাতীয় কিছু খুঁজে নিয়ে ঐ ঘরের কাঠের দরজার আড়ালে, যাতে হঠাৎ কারুর নজরে না পড়ে এমন জায়গায় তারিখ দিয়ে লিখে রেখেছিলাম, "প্রিয় লাইট, কোনদিন যদি এখানে আসো, তবে এই ঘরের দরজার কাঠে দেখবে তোমার অনুপস্থিতি যে আমার মনে আজ কতটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে, সেটা উল্লেখ করে গেলাম, ইতি তোমার জুয়েল।" কিন্তু এ বাড়িতে যাবার সুযোগ বাণীর আর কোনদিনই হয়নি। বাড়িটা থাকলেও চুয়াল্লিশ বছরের ব্যবধানে সেই লেখাটুকুর চিহ্ন নিশ্চয়ই আজ আর নেই। কালের নির্মম যাত্রাপথে ঐ "লেখা"-র সাথে বাণীও আজ হারিয়ে গেছে!

শিলচর ফেরার পথে একবেলা সিলেটের দাদাশ্বশুর মশাই-এর বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। একটা সময়ে তিন বাড়ির তিন দিদিশাশুড়ি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-ফুর্তি ইত্যাদি করছেন, 'চোর জামাই, চোর জামাই' বলে, তখন ছোট দিদিশাশুড়ি একবার বলেই বসলেন যে, ওরা বিয়ে যেমন করেই করে থাকুক, স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের নাতনীর পছন্দ আছে। তাছাড়া নাতজামাই যখন আমাদের একই সম্প্রদায়ের এবং ভাল চাকুরিও করছে, তখন এ বিয়েতে নিরু ও জামাই (বাণীর মা ও বাবা) আপত্তি করল কেন বুঝতে পারছি না। নাতজামাই তার বাবার বড় সন্তান, আমাদের নাতনীও নিরুর বড় কন্যা, সুতরাং এ বিয়েতো কত ধুমধাম করেই করা যেতো।

যাহোক, ওখানের সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করে শিলচরে ফিরে আসি। আর তার মাত্র কয়েক মাস পরেই, শিলচর থেকেও

বিদায় নিয়ে কিশোরগঞ্জে চলে যাই।

কিন্তু শিলং থেকে বাসে সিলেট ফেরার পথে একটা বড় অদ্ভুত ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি। যার বাস্তব রূপ বুঝি কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দেখি, বাসে জানলার পাশে কোন সিট নেই। অথচ শিলং, যাকে বলা হত Hill Queen Station, তার পথের গাঢ় সবুজ দৃশ্য দেখার জন্য আমার মন তখনও উদগ্রীব। যাহোক বাসে উঠে দেখি ষাট ঊর্ধ্ব বয়সের এক বৃদ্ধা খাসিয়া মহিলা একটা জানলার পাশের সিটে বসে আছেন। তাঁর পাশের খালি সিটে বসে, আমার মনের কথা তাঁকে ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দি ও ইংরেজিতে বুঝিয়ে বলতেই, তিনি খুব আদর করে জানলার পাশের সিটটা আমায় ছেড়ে দিয়ে, আমার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে নানা আলাপ জুড়ে দিলেন। শিলং বাজারের আমেরিকান Baby-দের কৌতূহল তখনও আমার মনকে পীড়ন করছিল বলে, ভদ্রমহিলার কাছে পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে এবং অনুমতি নিয়ে, আমি প্রশ্নটা তুললাম এবং সেই সঙ্গে venereal disease-এর আশঙ্কার কথাও বললাম। ভদ্রমহিলা জবাবে বললেন—"আমাদের খাসিয়া উপজাতি বর্তমান জগতে ও সমাজে অত্যন্ত backward and neglected। অন্যদিকে আমেরিকান সৈন্যরা good pay-master. আমরা আমাদের মেয়েদের বুঝিয়েছি যে বর্তমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সুযোগে তারা একটু আত্মত্যাগ করলে, আমাদের পরের প্রজন্ম বহুদিকেই উন্নতি করতে পারে। যথা, আমেরিকানদের টাকা দিয়ে আমাদের দারিদ্র্য দূর হতে পারে। আমরা নানারকম ব্যবসা বাণিজ্য করে সচ্ছল হতে পারি, আমাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে পারি ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই করা যেতে পারে। তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে আমেরিকান সংমিশ্রণে আমাদের মেয়েদের কোলে যে শিশুদের দেখেছ, তাদের চোখ ও নাক আমাদের চাইতে অনেক সুন্দর। এভাবে আমাদের আকৃতিতে যেটুকু অসুন্দর জিনিস আছে তাও আমরা দূরীভূত করতে পারি। আর venereal disease সম্বন্ধে বর্তমানে যা যা protection আছে, তার সব কিছুই ব্যবহার করতে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছি।" এসব শুনে আমার প্রায় বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে কথাগুলো শুনেছিলাম। আজ ১৯৯১ সালের মে মাসের শেষ তারিখ। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি আর শিলং বা মেঘালয়ে যাবার সুযোগ পাইনি, সুতরাং খাসিয়া উপজাতির কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কোনদিকে,

কতটুকু তা আমি আজও জানতে পারিনি।

শিলচরের কথা এখানেই শেষ করলাম। অনেক কাহিনী লিখে গেলাম, অনেক রয়ে গেল। আপশোষ হয় এই কথা ভেবে যে আমার জানা কাহিনী তো অন্য কেউ লিখতে পারবে না, সুতরাং সেগুলো অলিখিতই থেকে যাবে, আর যাবে আমার মৃত্যুর সঙ্গে হারিয়ে। অবশ্য, এরকমতো কতই হয়। যারা নিজের কথা বা কাহিনী গুছিয়ে লিখতে পারে না, তাদের কারুর আপশোষ থাকলেও উপায় নেই। আমি ভুল করেছি, এগার বছর পূর্বে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে লিখতে আরম্ভ না করে। 'নাগরিক কমিটি' আর অমুক-তমুক কমিটি করেই প্রায় এই এগারোটা অবসরের বছর কেটে গেল। আবার এও ভাবি, কেন এই সব কমিটি-টমিটি করতে গেলাম! আমাদের জীবনের ও সমাজের যেভাবে পচন ধরেছে, সেটা একলার লড়াইয়ে আটকে রাখা যাবে না। সমষ্টিগতভাবেই এর বিরুদ্ধে লড়াই করে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের বংশধরদের কাছে এটাও আমাদের একটা কর্তব্য। অনেকে বলেন, 'আমরা আর কদিন আছি, চলে তো গেলাম বলে, তারপর যা হবার হোকগে।' আমার তো মনে হয় এটা স্বার্থপরের কথা। এভাবে চিন্তা করার শিক্ষাতো পাইনি। আমার এই লেখা নিয়ে কোন কোনও বন্ধু বলেছেন, আপনি তো রাত দিন খেটে এত লিখে যাচ্ছেন, আপনার বংশধররা কি এটা আগ্রহ নিয়ে পড়বে? হয়তো পড়বে না, হয়তো কেউ কেউ পড়বে। একজন আগ্রহ নিয়ে পড়লেও আমি মনে করব আমার লেখা সার্থক হয়েছে। আমি নিজে তো অনুভব করি যে আমার বাবা, জেঠু বা কাকারা কেউ যদি আমাদের দেশের বাড়ির কথা বা তাঁদের স্মৃতিকথা লিখে যেতেন, আমি তা পড়ে কত কিছুই জানতে পারতাম, কত আনন্দ পেতাম!

আমার জীবন-নাটকের প্রধান অঙ্কে এখনো পেঁছুতে পারিনি, অথচ একশ দুই পাতা লেখা হয়ে গেল। এদিকে আমার সত্তর বছর পূর্ণ হবে আর চার পাঁচ মাস পরেই। শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। তাই ভয় পাচ্ছি জীবনের প্রধান অঙ্কটা সঠিকভাবে লিখে যেতে পারব তো? না পারলে তো শান্তিতে মরতেও পারব না! যে সরল, উদার ও মহিয়সী এক নারীকে, আজ বলব নিজের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য, নিজের কাছে টেনে এনে, তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারলাম না, তাঁর কথা, তাঁর ছেলেদের, বৌমাদের ও নাতি-নাতনীদের যদি না জানিয়ে চলে যাই তবে সেও হবে আমার এক মহা অকর্তব্যের উদাহরণ।

যাহোক ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিলচর থেকে বদলির আদেশ পেয়ে প্রায় সাতদিন এ-বাড়ি সে-বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে, চোখের জলে বিদায় নিয়ে, একদিন বিকেলে শিলচর রেল স্টেশনে, অনেক বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত পরিজনের সামনে সুরমা মেলে চেপে বসলাম, কিশোরগঞ্জের পথে। শিলচরের সুন্দর ও নানা-রঙের দিনগুলোও আমার শেষ হয়ে গেল। সেই দিন ও সেই ক্ষণটির কথা আজও আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ভাসে। যারা আমার সঙ্গে স্টেশনে এসেছিল, তাদের অনেকেই আজ আর এ পৃথিবীতে নেই, অনেকে দেশবিভাগের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে, মাত্র দু-এক জনের সঙ্গে এখনও বছরে দু-একখানা পত্র বিনিময়ের চেষ্টা করি।

আমাদের সেই বিখ্যাত সুপার কয়েকমাস পূর্বেই আসামের অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। শিলচরের পানীয় জল বাণীর সহ্য হচ্ছিল না বলে, কয়েক মাস পূর্বেই তাকেও কিশোরগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এক সময় সুরমা মেল ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা যায় কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে শিলচর স্টেশন এবং বন্ধু ও প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের জল তখন গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে। এক সময় গাড়ি এসে পেঁছুলো বদরপুর ঘাটে। বরাক নদীর উপর দিয়ে চলে গেছে সেই সুন্দর রেলব্রীজ। এই পুলের উপর দিয়ে যেতাম হাফলং। বদরপুর চা বাগানের টিলার উপরে ম্যানেজারের বাংলোখানাও দৃষ্টিপথে এলো। বিয়ের পরে, বাণীকে নিয়ে কিছুদিন বদরপুর ঘাটেও ছিলাম। ওখানে থাকতে প্রত্যহ বিকেলে বাণীকে নিয়ে ঐ টিলার উপর চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সামনের বাগানে আমরা দুজনে বসতাম। ওখান থেকে নিচে বরাক নদী, রেলব্রীজ ও ওপারে নর্থ-কাছাড় হিল্‌সের অপূর্ব সবুজ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যেত। উঠে আসতে ইচ্ছে করত না। আজ টালিগঞ্জের বাড়ির লেখার টেবিলে বসে এই সব কথা লিখছি কিন্তু মন চলে গেছে সেই শিলচরে ও বদরপুর ঘাটে। টেবিলে আমার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফটো স্ট্যান্ডে বাণীর একখানা খুব জীবন্ত বাস্‌ট ফটো। মনে হয় আমার দিকে কিসের অনুযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাকে এবার হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না বলে কি?

১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে ম্যাট্রিক পাশ করে পড়াশুনোর জন্য কলকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ চলে গেলেও, এবং পরে চাকুরির জন্য শিলচর যেয়েও বাবা, মা ও সব ভাইবোনরা কিশোরগঞ্জে থাকতেন বলে, কিশোরগঞ্জের সঙ্গে সর্বদাই

আমার একটা যোগাযোগ থাকত। কলেজের ছুটি-ছাটায়, কিশোরগঞ্জেই আসতাম এবং সাধারণত ওখানেই ছুটি কাটিয়ে আবার কলেজে ফিরে যেতাম। তা ছাড়া, মা এবং কিশোরগঞ্জের অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমার পত্রালাপও ছিল। প্রতি সপ্তাহেই আমি কিশোরগঞ্জের কারো না কারো চিঠি পেতাম।

বাল্য ও কৈশোরে যথেষ্ট মেলামেশা থাকলেও ১৯৪২ সালের ভারতের শেষ স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই, আমার ও বাণীর মধ্যে একটা অনুরাগের সৃষ্টি হয়। সেটা এমন যে, একজন অন্যকে দেখলে ভাল লাগে, দেখতে মন চায়। একের অন্যের দেওয়া কাজ করে দিতে ভাল লাগে এই রকম আর কি! আমি সে সময় বাইরে কলেজ-হোস্টেলেই থাকতাম, শুধু ছুটি-ছাটার মাঝে মধ্যে কিশোরগঞ্জের বাসায় আসতাম আর ফুটবল জীবনে যেখানেই থাকি না কেন, ক্লাবের বা কোন প্রদর্শনী খেলার জন্য আমাকে কিশোরগঞ্জে আসতেই হতো। এজন্যে বাণীর সঙ্গে মোটামুটি একটা দেখাশোনা ও যোগাযোগ থাকতই। আর মাঝে মাঝে, সন্ধ্যার পর ওদের বাড়ির সম্মুখের মিউনিসিপ্যাল পুকুরের ইট-বাঁধানো ঘাসে বসে মাসীমার (বাণীর মা) অনুরোধে বা আদেশে গানও গাইতাম। যে গানটা উনি প্রায়ই গাইতে বলতেন, সেটার একটা লাইন এখনও মনে আছে, যেটা বিখ্যাত ৺শচীনদেব বর্মনের প্রথম জীবনের গান, "ওরে সুজন নাইয়া, কোন বা কন্যার দেশে যাওরে সাঁজের ডিঙ্গা বাইয়া।" গানটা আমারও খুব প্রিয় ছিল বলে, খুব ভাল করে তুলেছিলাম আর দরদ দিয়ে গাইতেও চেষ্টা করতাম। এই গানটা আমি শিখেছিলাম ১৯৩৬ সালে। তখন ঐ ঘাটে বসে মাসীমাকে অন্য গানের সঙ্গে এই গানটাও শুনিয়েছি, বেশীর ভাগই ওঁর অনুরোধে, আর ১৯৪২-৪৩ সালেও ঐ ঘাটে বসে যখন আরও অনেক নতুন নতুন গান গাইতাম, তখনও উনি গান শুনে ওঁর বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দার সোপানে বসে আমায় বলতেন, "তোমার সেই ভাটিয়ালি গানটা গাওতো।"

ঐ গানের "সুজন নাইয়া" কবি ও গায়কের কল্পনায় নদী বা বড় খালের উপর দিয়েই তার সাঁজের ডিঙ্গা বেয়ে যেত। আমি যখন মাসীমাকে ঐ গান শোনাতাম, তখন চোখ বুজে, আমিও নদী দিয়ে সেই ডিঙ্গা বয়ে চলেছে বলে কল্পনা করতাম, কিন্তু তখন কি মাসীমা, কি আমি, আমরা কেউ কি কল্পনাও করেছিলাম যে সম্মুখের ঐ বড় পুকুর বা দীঘির জলে, একটা ছোট কল্পনার ডিঙ্গা, অল্পদিনের মধ্যেই, দীঘির দক্ষিণ দিক থেকে আমার মত এক অবাঞ্ছিত নাইয়াকে ভাসিয়ে,

উত্তরের দিকে, মাসীমাদের বাড়ির সামনের ঘাটে এসে থামবে তাঁর কন্যার জন্যে! আর সেই ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হবে, এমন এক কাহিনী, যা কিশোরগঞ্জে এর পূর্বে আর ঘটেনি। সে কাহিনীকে শুধু বলা যায়, "Facts are stranger than fiction !"

বাণীর বাবার খুব ভাল চা খাবার শৌখিনতা ছিল। শৌখিনতা ছিল কাপ-ডিশ ইত্যাদিরও। কোন দোকানে ভাল কাপ-ডিশের সেট্ দেখলেই উনি কিনে নিয়ে আসতেন। তখন ভাল ভাল স্বচ্ছ (transparent) জাপানি কাপ পাওয়া যেত। বাণীদের বাড়িতে বহুদিন ঐ কাপের ব্যবহার দেখেছি। বাণীর বাবা বাড়িতে থাকলে চা টা অবশ্যই বাণীকে করতে বলতেন, তার ছোটবেলা থেকেই। তাই ১৯৪২-৪৩ সালে, চা তৈরিতে বাণীর হাত একেবারে পাকা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে চা-এর মান এত সুন্দর ছিলনা, তাই ঠাট্টা করে বাণীকে একদিন বলেছিলাম, তুমি যখন চা তৈরি কর, তখন আমি বাড়ি থাকলে এক কাপ চা পাঠিয়ে দেবেতো। এর পর থেকে কিশোরগঞ্জের বাসায় এলেই, অন্ততঃ বিকেলে বাণীর হাতের এক কাপ চা আমি পেতাম-ই। নিজেই দিয়ে যেত বা কোন অসুবিধে থাকলে ছোটবোন হিমানী বা অন্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিত। বাণীর মনের সততা ও আন্তরিকতার প্রথম নিদর্শন পাই, এই চা খাওয়াতে। কারণ আমি থাকতাম কিশোরগঞ্জের বাইরে। হঠাৎ কিশোরগঞ্জের বাসায় এলেই তো আর আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে জানান দিতাম না যে আমি এসেছি। কিন্তু বিকেলে এক কাপ চা পেঁছে গেলে আশ্চর্যই হতাম যে বাণী জানলো কি করে যে আমি বাড়ি এসেছি! সেই ছোটবেলা থেকেই তার এই অদ্ভুত সততা ও আন্তরিকতা এবং সত্যিকথা বলতে কি. তার এই সুন্দর রূপটি তার প্রতি আমাকে যথেষ্টই আকর্ষণ করেছিল। এমনি করেই ধীরে ধীরে, অনুরাগের অঙ্কুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসায় পরিণত হলো ছোটখাটো বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে। যার সবকিছু আজ আর এতদিন পরে স্পষ্ট মনে নেই। কিন্তু কেন আজ জানি মনে হয়, এই ভালবাসার অঙ্কুরেই যেন ছিল একটা অভিশাপ, যে অভিশাপের আগুনে একেবারে গোড়া থেকেই আমরা পদে পদে বাধা পেয়েছি, অত্যাচারে হয়েছি জর্জরিত। আমি মোটামুটি সাহসী-ই ছিলাম, বাণীও তাই। তবুতো সে মেয়ে আর তখন তো খুবই অল্প বয়সের। মেয়ে হয়েও যে বাধা, বিপত্তি, মানসিক এবং কিছুটা শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেও সে যে নিজের লক্ষ্য ও সংকল্পে অবিচল রয়েছে তার দৃষ্টান্ত হয়তো গল্প বা উপন্যাসে

পড়লেও পড়ে থাকতে পারি, কিন্তু আজও বাস্তবে দেখিনি। আজ এই সত্তর বৎসর বয়েসে, মাত্র তিন মাস পূর্বে তাকে হারিয়ে বারে বারেই কেন জানি মনে হয় যে বাণীর সততা, আন্তরিকতা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার উপযুক্ত মর্যাদা আমি কি দিতে পেরেছি? হয়তো সবটা পারিনি। আর আমার পরিবার তো নয়ই। সেই সময়ের কিশোরগঞ্জের রক্ষণশীল সমাজে বাণীর অবস্থায় পড়লে, যে কোন মেয়ে নিজের পরিবারের কাছে আত্মসমর্পণ করত। এটা শুধু আমার কথাই নয়, গত ফেব্রুয়ারি মাসে, বাণীর পারলৌকিক কাজের দিনে, তার দাদা অমল, বাড়িভরা তাঁদের ও আমাদের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতেই বেশ জোর দিয়েই এটা ঘোষণা করেছিলেন।

বাণী যেমন তার ভাই বোনদের মধ্যে তার পিতার সব চাইতে প্রিয় ছিল, তেমনি পিতার প্রতি তার নিজের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা। তার কোন কাজের জন্য তার পিতা আঘাত পাবেন, তার পিতার মুখ ছোট হবে বা মুখে কালি পড়বে, এটা সে মনে প্রাণে চায়নি বলেই, ভাবতো এবং বিশ্বাস করতো যে তার পিতা তার ও আমার ভালবাসার যতই বিরোধিতা করুন না কেন, একদিন তাঁর এই বিরোধিতা দূর হবেই এবং স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মিলন হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, তার এই গভীর বিশ্বাসের জন্যই বাণীকে বড় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। বড়ই কঠিন মূল্য এবং দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে তা দিতে হয়েছিল। যার কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত শুধু আমি কেন, তাদের এবং আমাদের পরিবারের কেউ কোথাও দেখেনি, এটা আমি জোর করেই বলতে পারি। অন্যদিকে, এই কারণে বা এর পরিণতিতে আমাকেও প্রবল বাধা-বিপত্তি বছরের পর বছর যেমন কাটাতে হয়েছে নিজের সাহস ও মনের বলে, তেমনই আবার বহু প্রলোভন থেকেও ঐ মনের বলেই নিজেকে মুক্ত রেখেছি। অকপটেই বলছি, বাণীর সরলতা, সততা ও অসহ্য যাতনার মধ্যেও আদর্শের প্রতি তার অটুট নিষ্ঠা আমার মনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করেছে এই জন্য যে আমার কোন দুর্বলতার ভুলে যেন বাণীর লড়াই কোন ঘা খেয়ে বা আঘাত পেয়ে নিষ্ফল না হয়ে যায়, যার জন্য আমার জীবন দিতেও আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে বসে বসে যখন আমাদের প্রথম যৌবনের সেই প্রবল ঝড়-ঝাপটার কথা মনে মনে ভাবি তখন নিজেই বিস্মিত হই এই ভেবে যে সেই অল্প অনভিজ্ঞ বয়সে, সেই সব প্রবল-পরাক্রান্ত শক্তির বিরুদ্ধে, সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে পড়েও, লড়াই করে আমরা মিলিত হতে পেরেছিলাম কি করে? বাণী জীবিত থাকতে কখনো-সখনো

এই আলোচনা আমরা করেছি। বাণী বলতো, আমাদের সুগভীর ভালবাসা ও একের প্রতি অন্যের অবিচল বিশ্বাস ও নির্ভরতাই, আমাদের লক্ষ্য ও সংকল্পে অবিচল থাকতে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছে এবং সকল পরাক্রান্ত শক্তি ও প্রবল বাধা-বিপত্তি আমাদের কাছে হার মেনেছে।

আমাদের কাছে যখন পরিষ্কার হলো যে আমরা একে অন্যকে সত্যি ভালবাসি, তখন একথা আমি ভেবেছিলাম যে বাণীদের পরিবার, অর্থে, শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রতিষ্ঠায়, নাম-ডাকে প্রায় সব দিক দিয়েই আমাদের পরিবারের চাইতে উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, আমি বারে বারে এবং ছোট ছোট চিঠিতেও বাণীকে জানিয়েছিলাম যে, "তোমাদের পরিবার আমাদের বাড়িতে তোমাকে বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজি হবে না। একথা মনে রেখে, তোমার নিজের মনকে দমন করো। এর থেকে যে সব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট আসবে, সে সব তুমি সহ্য করতে পারবে না। তোমার পরিবার জোর করে তোমাকে হয়তো অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেবে, তখন তুমি কি করবে?" কেন আমি তাকে এসব বোঝাতাম বা লিখতাম? কারণ বাণীর সরলতা বা আন্তরিকতার কথা ভেবে এবং তার প্রতিও আমার একান্ত আন্তরিক ভালবাসা ছিল বলেই, আমার দুঃখ হত যে কেন এমন একটা সরল সুন্দর মেয়ে, সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের ফাঁদে পড়ে কষ্ট পাবে! এসব কথা তাকে বোঝাতে বা লিখতে আমার কষ্ট হতো, কিন্তু আবার মনে হতো যাকে সেই আট বছরের ছোট্ট বয়েস থেকে দেখেছি, কত স্নেহ করেছি, কত কিছু শিখিয়েছি, আমার উপর যার এত ভালবাসা ও ভরসা, সে হয়তো এ ভালবাসার জন্য তাকে যে খেসারত দিতে হবে, যে ঝড়-ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে, সেটা বুঝতে বা কল্পনা করতেই পারছে না। এসব কথা ভেবেই বাণীর সরল, সুন্দর ও নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত, তাকে ভবিষ্যতের দুঃখ, কষ্ট, অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোই আমার উচিত, আমার কর্তব্য। কিন্তু বাণীর সেই এক কথা, "আমার ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট আমার কাছেই ছেড়ে দাও, আর জোর করে বিয়ে—? আমাকে জোর করে কেউ বিয়ে দিতে পারবে না।" শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি।

বাণী যে কতটা সাহসী ও নির্ভীক, একেবারে যে 'Fire brand', আদর্শের প্রতি তার যে লৌহময় নিষ্ঠা, সে যে অপরাজিতা, ১৯৪৬-এর ১লা আগষ্টের সেই ঝড়-বাদলের রাতে, আমাদের উভয়ের মহা-যাত্রার পূর্বে সত্যি সত্যি বুঝতে

পারিনি। আমাদের জীবনের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দিনে, একটা কুঁড়েঘরে গভীর রাতে ঘুমন্ত বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বহু পুরানো কথা বার বার আমার মনে পড়ছিল যে বাণীর বাল্যের চলাফেরা ও হাব-ভাব দেখে, তাদের বাড়িতে বসেই সেদিনকার কোনও এক নামজাদা বিপ্লবী নেতা, তার বাবাকে বলেছিলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার এই মেয়ে বড় হয়ে বিপ্লবী শান্তি-সুনীতি হবে।"

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৪৩ সালের কোন একদিন, আমি কিশোরগঞ্জের বাসা থেকে, ময়মনসিংহের কলেজ হোস্টেলে যাবার পূর্বে, একটা ছোট্ট আধপৃষ্ঠার চিঠিতে বাণীকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে আমার ছোট ভাই পল্টুকে সেটা গোপনে বাণীর হাতে পৌঁছে দিতে বলে, বাসা থেকে রওনা হয়ে যাই।

কয়েকদিন পর কিশোরগঞ্জে ফিরে এসে শুনি, আমার ওই চিঠি নিয়ে বাণীদের বাড়িতে ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার ভাই আমার ছোট্ট চিঠিটা বাণীর হাতে দেবার সময় তার কাকিমা সেটা লক্ষ্য করে, গোপনে বাণীর মাকে বললে, তিনি, কাকিমা ও আরও কয়েকজনার সাহায্যে বাণীর দু'হাত জোর করে ধরে রেখে, ব্লাউজ ঢাকা বুক থেকে চিঠিটা বার করে নেন। তারপরই গাল, মার ইত্যাদি চলে। অথচ ওই চিঠিটার মধ্যে ভালবাসা বা প্রেমের কোন কথাই ছিল না, ছিল কিছু প্রচ্ছন্ন ভাল উপদেশ। কিন্তু তখন আমাদের সমাজে ওটাই ছিল মহা অপরাধ। যে ব্যাপারটা আমাকে ডেকে নিয়ে বাণীর মা ও কাকিমা আমাকে ও বাণীকে দুটো ভাল মিষ্টি কথায় উপদেশ দিলেই মিটে যেতো, কোন জানাজানি হত না, এমন কি হয়তো ঘটনা অন্য দিকেও মোড় নিতে পারত, সেটাই বুদ্ধির দোষে হয়ে গেল একটা প্রায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

আমার সঙ্গে বাণীর দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দুই পরিবারের মধ্যেও যাতায়াত প্রায় বন্ধ। যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষের নীরবতা। তবু এরই মধ্যে উপায় করে বাণীকে একটা চিঠিতে জানালাম যে "এই ভয়টাই আমি করছিলাম। তোমার উপর এই অর্থহীন অত্যাচার আমার কাছেও অসহনীয়। এখনও আমার কথা শোন, মনকে প্রবোধ দাও, মনকে শক্ত করো। এ পথ ছাড়। আমাদের বন্ধুত্ব তবুও সারাজীবন বেঁচে থাকবে। কিন্তু বর্তমান পথের জন্য তোমার উপর আরও যে অবিচার হবে, সেটা আমি সহ্য করতে পারব না।" কিন্তু ফল হল উল্টো। ঐ একদিনের অত্যাচারেই বাণীর জেদ গেল আরও বেড়ে।

আমাকে চিঠিতে জানালো, "পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যা আমাকে এ পথ থেকে ফেরাতে পারে, তাতে যদি আমার জীবন যায় যাক। শুধু তোমাকে আমার অনুরোধ, তুমি এসব কথা লিখে আমার মনটাকে দুর্বল করে দিওনা। আর তুমি নিজে ঠিক থেকো, আমার জন্যে ভেবনা।" আমার মনে হয়েছিল এমন মেয়েকে শ্রদ্ধা না করে, ভাল না বেসে থাকার মতো অমানুষ কি পৃথিবীতে আছে ?

তখন থেকেই নেমে এলো আমাদের জীবনে অন্ধকার আর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের ঘনঘটা। আমাদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদানেও সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ছদ্মনাম ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। বাণীকে বলতাম আমার জীবনের 'আলো' তাই তখন থেকে তাকে 'লাইট' বলে সম্বোধন করতাম। আমার নাম ছিল মানিক। বাণী ঠাট্টা করে বলতো, আমার সাত রাজার ধন এক 'মানিক'। তখন থেকে বাণী আমাকে চিঠিতে সম্বোধন করতো 'জুয়েল'। এখনও আমার পুরানো ফাইলে বহু চিঠি ঐ সম্বোধনে পড়ে আছে। আমি কিশোরগঞ্জে এলেই বাণীর স্কুল ছাড়া আর অন্য কোথাও যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। তাদের বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াতের দুটো পথ ছিল, একটা, দক্ষিণ দিকে আমাদের বাসার পাশ দিয়ে, অন্যটি উত্তর দিকে বাণীর কাকার বাড়ির পাশ দিয়ে। আমি কিশোরগঞ্জে এলে, উত্তরের পথ দিয়েই তার যাতায়াতের আদেশ থাকত। কিন্তু স্কুলে যাবার এবং ফেরার সময় দু'দিকেই বাণীর মা পাহারা রাখতেন। উনি এমনিতে ছিলেন ভাল মানুষ ও সরল, কিন্তু সঠিক বুদ্ধি করে কিছু করতে পারতেন না। এমন কড়াকড়ির মধ্যেও নানা কৌশলে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হত। আমাদের সাহায্য করতো বাণীর ছোট বোন হিমানী, আমার ছোট বোন হেনা, খনা ও আমাদের বাড়ির দু'টি ভৃত্য। আমার মা কোন বিরুদ্ধাচরণ করতেন না, কিন্তু বাবা কিছু বুঝতে পারলেই ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন। অল্পকাল পরে বাণীর কাকিমাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। ছোট্ট শহরের পোস্টাল পিয়নটিও ছিল বড়ই ভাল। আমি বাইরে থেকে বাণীকে যে চিঠি দিতাম, সেটা সে ডেলিভারি দিত আমার বোন হেনার কাছে। শুধু এইটুকুই নয়, হেনা যে আমাদের কতভাবে সাহায্য করত তার শেষ নেই! কিন্তু সব সময় চিঠি দিয়েতো সব কিছু সব কথা পরিষ্কার করা যায় না! এজন্য বাণী প্রয়োজনে কোন কোনদিন, স্কুল থেকে এক পিরিয়ড আগে বার হয়ে বাড়িতে পৌঁছুবার কিছুটা পূর্বে রাস্তা ছেড়ে প্রতিবেশীদের বাড়ির ভেতর দিয়ে (ওখানে

সব বাড়ীতে প্রাচীর ছিল না) আমাদের বাড়িতে এসে খুব গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলে, পুনরায় সেই সব বাড়ির ভেতর দিয়ে রাস্তায় ফিরে যেয়ে স্কুল ছুটির সময়, সুবোধ বালিকার মতো অন্য মেয়েদের সঙ্গে, তার নির্দিষ্ট উত্তর দিকের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরে আসত। পাহারাদাররা দেখতো, সব ঠিক হ্যায়। মাসীমা (বাণীর মা)-ও মাঝে মাঝে ওঁর বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দার সিঁড়িতে বসে লক্ষ্য রেখে দেখতেন মেয়ে সঠিক রাস্তায়ই বাড়ি ফিরছে। সব সময় কার্যসাধন প্রণালী (Modus Operandi) একই রকম করা বা রাখা বিপজ্জনক বলে, বাণীকে এ ব্যাপারে রেহাই দিতে মাঝে মাঝে আমি নিজেই একটু কষ্ট করতাম। বাইরে থেকে দিনের বেলায় কিশোরগঞ্জে না যেয়ে, সুরমা মেলে রাত্রি একটা কি দেড়টার সময় কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশানে পেঁাছে, বাবার অজান্তে, যে বৈঠকখানা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে একটা বড় খাটে আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে শুয়ে পড়তাম। আমাদের বাসার উঠোনের পশ্চিম দিকে একটা দরমা-বেড়ার ও টিনের চালের (ছাদের) কাঁচা ঘর ছিল নিশা আর কুমুদ নামে আমাদের দুই ভৃত্যের। আমি একেবারে শেষ রাতে বা উষা-ভোরে উঠে, ঐ "নিশা-কুমুদের" ঘরে যেয়ে জায়গা নিতাম এবং দু-এক দিন সে ঘর থেকে একদম বার হতাম না। ঐ ঘরে বসেই চা-জলখাবার, দুপুর ও রাতের খাবার খেতাম। এক বালতি জলে মাথা ধুয়ে শরীর ভিজে গামছা দিয়ে ধুয়ে মুছে নিতাম। একটা বেড়পেনকে ইউরিন্যালের মতো ব্যবহার করতাম। রাতের অন্ধকারে বাইরের পায়খানায় যেতাম। কিশোরগঞ্জে তখনও ইলেকট্রিসিটি আসে নি। তাই রাতে লুকিয়ে চলাফেরা করার সুবিধে ছিল। আমি যে কদিন ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকতাম, সেই কদিন বাণীর চলাফেরায় কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না বলে, আমার সঙ্গে অনায়াসে ঐ "নিশা-কুমুদের" ঘরে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার সুযোগ পেত। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে যেই আমি দিনের বেলায় বার হতাম, মানে যেন সেদিনই কিশোরগঞ্জে পেঁাছেছি, সঙ্গে সঙ্গেই বাণীর চলাফেরায় পূর্বোক্ত বাধ্যবাধকতা নেমে আসত।

বাণীদের বাড়ি ও আমাদের ভাড়াটে বাড়ির মাঝামাঝি আরও একটা ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ি ছিল। সেটা মাঝে মাঝে খালি থাকত। ঐ ভাড়া-বাড়ির রান্না-ঘরের পাশে, উঁচু ইঁটের দেয়াল দেওয়া একটা সুন্দর বাথরুম ছিল, তার উপরে অবশ্য কোন ঢাকনা বা ছাদ ছিল না। ঐ বাথরুমটা ছিল বাণীদের বাড়ির পেছনে টিউবওয়েলের ও তাদের একটা বাথরুম ও পায়খানার খুব কাছে। প্রয়োজনে,

ঐ ভাড়াটে বাড়িটা খালি থাকলে, আমি, কেউ দেখতে না পায় এ ভাবে কোনও এক ফাঁকে ঐ বাথরুমে যেয়ে একটা মোড়া অথবা পিঁড়ির ওপর বসে থাকতাম। আমাদের সহযোগিরা কেউ বাণীকে ইশারায় সেটা জানালে, সে আবার বাড়ির পরিস্থিতি ও সুযোগ বুঝে, তাদের নিজেদের বাথরুম বা পায়খানায় যাবার ভান করে আমার সঙ্গে ঐ ভাড়াটে বাড়ির বাথরুমে দেখা করত। আমাদের সহযোগিদের কেউ কেউ ঐ বাথরুমের কাছেই পাহারায় থাকতো বাণীদের বাড়ির পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট আওয়াজ করে আমাদের সাবধান করে দিতে, যাতে তেমন কিছু হলে বাণী ঐ বাথরুম থেকে বার হয়ে, ঐ ভাড়াটে বাড়ির সামনের দিকের খোলা জায়গা দিয়ে তাদের বাড়ি চলে যেতে পারে। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে বাণীর আশায় আমি দুঘণ্টারও বেশি ঐ বাথরুমে বসে অপেক্ষা করেছি। একঘেয়েমির থেকে আমাকে বাঁচাতে, অনেক সময় আমার বোন হেনা এক কাপ চা করে, তা আবার একটা খালি বালতিতে বসিয়ে বাণীদের টিউবওয়েল থেকে জল আনতে যাবার ভান করে, ঐ বাথরুমে আমাকে চা-বিস্কুট দিতে আসত। এই রকম কত কৌশল যে করতে হত তার বুঝি সীমা সংখ্যা নেই। যখন যেমন, তখন তেমন, এই ভাবে আমাদের চলতে হয়েছে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। অন্যদিকে এই বাধা-বিঘ্ন বৃদ্ধি পেতে পেতে অনেক সময় খুনোখুনির পর্যায়ে চলে যেত।

১৯৪৪ সালে, আমি B A. পাশ করলাম। Indian Air Trading Corp-এ selected হয়ে, পাইলট হবার জন্য প্রায় দেড় মাস ট্রেনিং নেবার পর ময়মনসিংহের কালীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ডি. কে. লাহিড়ী চৌধুরী, এম. এল. এ. (সেণ্ট্রাল) তার প্রভাব খাটিয়ে, আমাকে Aviation ট্রেনিং থেকে মুক্ত (dis-charged) করে এনে আমার চাকুরির জন্য ভি. আই. পি.-দের কাছে লেখালেখি করছিলেন (৩২/৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। আমার পরীক্ষা পাশের খবর টেলিগ্রামে কিশোরগঞ্জের বাসায় পেঁছুলে হেনা ছুটে যেয়ে বাণীকে তাদের বাড়ির পূর্বোক্ত টিউবওয়েলের কাছে ইশারায় ডেকে খবরটা দিলে, সে নাকি আনন্দে নাচতে নাচতে কাদায় আছাড় খেয়ে একটা দামি শাড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিল। আর ঐ পড়ে যাবার শব্দ শুনে তার মা সেখানে অন্যদের সঙ্গে ছুটে এলে, পিছল খেয়ে পড়ে গেছে বলে ভান করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে চলে যায় বলে হেনা আমায় চিঠিতে জানিয়েছিল। অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক দলের কিশোরগঞ্জের সভ্যেরা, যারা তখন কলকাতায় তাদের একটা কনফারেন্সে যোগ

দিতে কলকাতা এসেছিল, তারা আমাকে তাদের স্টেট (State) লেভেলের নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দলের একটি 'Nucleus' তৈরি করে দেবার দায়িত্ব নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম. এ. ও হারডিন্‌জ হোস্টেলে থেকে একই সঙ্গে আইন পড়তে, এবং পড়া ও থাকা-খাওয়ার সমস্ত খরচ তাদের পার্টি বহন করবে বলে আমায় প্রলোভিত করেছিল! আর কিছু না হোক, তখন কলকাতায় থাকতে পারলে, আমি ১৯৪৫ সাল থেকে I. F. A.-তে অনায়াসেই প্রথম ডিভিশানে ফুটবল খেলতে পারতাম এই প্রলোভন আমার হচ্ছিল (৩৭·৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। আর ঐ রাজনৈতিক পার্টি যে আমার খরচ বহন করতে পারত সেটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম এই জন্য যে, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে ঐ পার্টি বিনাশর্তে সমর্থন জানিয়েছিল এবং লেবার ফ্রন্টে যাতে কোন Strike ইত্যাদি হয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র উৎপাদনে বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্য ভারত সরকার ঐ পার্টিকে আর্থিক সাহায্য করত। ঐ আর্থিক সাহায্য থেকে পার্টি সমস্ত সময়ের জন্য কর্মরত (whole timer) কর্মীদের মাসোহারা দিত। দেশ স্বাধীন হবার সামান্য পূর্বে বা পরে তো লোকসভায় ঐ অর্থসাহায্য নিয়ে একদিন খুব গরম গরম আলোচনা হয়ে গেল। তারপর, ঐ পার্টিকে অনেকে ঠাট্টা করে 'তের-হাজারী পার্টি' বলতো। ১৯৪৪ সালে একদিন ১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের একটা ঘরে বসে, বিশ্ববিখ্যাত কমরেড এম্. এন. রায়, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি এল. এন. রায়, প্রয়াত বিপ্লবী হরি চক্রবর্তী এবং এমন আরও অনেকে বসে একটা ঘরোয়া সভা করেছিলেন। জাঁদরেল বিপ্লবী হরি চক্রবর্তী ছিলেন, ভারত বিখ্যাত বিপ্লবী বাঘা যতীনের দলের। কমরেড রায় যে তিন জাহাজ জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার একটি জাহাজ আসার কথা ছিল সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায়। বাঘা যতীনের আদেশ অনুযায়ী উক্ত হরি চক্রবর্তী কয়েকজন সহযোগী ও চিড়ে গুড় সঙ্গে নিয়ে, লোকালয়হীন, বাঘ-কুমীরে ভরা সুন্দরবনের রায়মঙ্গলের পারে, সাত দিন গাছে বসে বঙ্গোপসাগরের দিকে নিরীক্ষণ করেছিলেন জাহাজ আসার আশায়। সেই ঘরোয়া সভায় আমাকে উক্ত সভ্যেরা প্রবেশের ব্যবস্থা করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আমি এজন্য সেই কমরেডদের এখনও কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা এতবড় একটা বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবীর এতোটা সান্নিধ্যে যেতে, আমায় সাহায্য করেছিলেন। কমরেড এম্. এন. রায়ের জীবনী যারা জানেন, তাঁরাই শুধু আমার সেদিনের মনের আনন্দের শিহরণ অনুভব করতে

পারবেন। ঐ সভার আলোচনার বিষয়, এ লেখার বিষয় নয় বলে, তার অবতারণা করলাম না, তবু একটা কথা না বলে পারছি না যে, একজন বাঙালি, বহুদিন পৃথিবীর নানা জায়গায় থেকে, নানা ভাষায় কথা বলে বাংলা ভাষা ভুলে গিয়েছিলেন। কমরেড রায় অনেকবারই হরি চক্রবর্তীকে, "হ্যারিদা, হ্যারিদা" বলে সম্বোধন করেছিলেন।

যাহোক, উপরিউক্ত বহু প্রলোভন থাকলেও, দুটো ভাবনা আমাকে সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করতে সাহায্য করেছিল, প্রথমতঃ বাণীর সরলতা, সততা ও আন্তরিকতায় ভরা মুখখানির কথা ও তার উপর মানসিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা মনে হলেই তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনার জন্য আমার মন উন্মত্ত হয়ে উঠতো। দ্বিতীয়, ভাইবোনরা সকলেই বড় হয়ে ওঠায়, তাদের পড়াশুনো ও সংসার-খরচা, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের মূল্য, এতো বেড়ে গিয়েছিল যে বাবার একার পক্ষে সব খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ভেবে, বিনা খরচে এম. এ. ও ল' পড়া আর তার চাইতেও বেশি আই. এফ. এ-তে প্রথম বিভাগে ফুটবল খেলার লোভ সম্বরণ করে, চাকুরিতে যোগ দিয়ে ঢাকা হয়ে শিলচরে চলে গেলাম। চাকরি নিয়ে ঢাকা চলে যাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেও, উক্ত রাজনৈতিক দলের স্টেট্ লেভেলের কোনও একজন বিখ্যাত নেতা, আমাকে আটকাবার শেষ অস্ত্র ছেড়ে বলেছিলেন—"তাহলে বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যেই তুমি নিজের একটু সুবিধে করে নিয়ে থাকতে চাও, সমাজতন্ত্রবাদের জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নও।" জবাবে খুব নম্রভাবেই তাঁকে আমি বলেছিলাম, "আগে ঘর, তবে পর (charity begins at home)। চাকুরি করেও সমাজতন্ত্রবাদের জন্য কিছু কাজ আমি করে যেতে পারব বলেই বিশ্বাস করি।" বস্তুতঃ সারাজীবনই তো সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সমাজতন্ত্রবাদীদের কাজের জন্য অর্থ সাহায্য, এমনকি কয়েকবার বৃহৎ কাজের জন্য পুরো মাসের মাইনেও ওঁদের হাতে তুলে দিয়েছি। সুযোগ পেলে, ছোট-বড় কাজও করে দিয়েছি, কি ইংরেজ আমলে, কি স্বাধীনতার পরেও। যেমন, ১৯৪৯/৫০ সালে, যখন আমি কাটোয়াতে চাকুরিরত, তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনখ্যাত বিপ্লবী প্রয়াত সুবোধ চৌধুরীকে, তাঁর তখনকার পলাতক (underground) জীবনে দুদিন আমার সরকারি বাস-ভবনে লুকিয়ে রেখেছি। ধরা পড়লে, আমার চাকুরিতো যেতোই, জেলও হতে পারতো, আর বৌ-ছেলে নিয়ে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা আমার স্থান হ'ত

হয়তো, 'Care of footpath'। উক্ত রাজনৈতিক নেতা যে ছোটখাটো একটা চাকুরি করতেন, তা আমি জানতাম, সেটা উল্লেখ করে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটিকে লজ্জা দিতে রুচিতে বেঁধেছিল। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, ১৯৫৮/৫৯ সালে, আমি যখন কলকাতার কাস্টম হাউসে চাকুরিরত, তখন একদিন, ঐ ভদ্রলোক কাস্টমস্ Clearing agent এর কাজে আমারই টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন ময়লা পোশাকে, সামান্য আনুকূল্যের প্রার্থী হয়ে। ভবিষ্যতে এমনই আরও আনুকূল্যের বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে জেনেও, তাঁকে পূর্ব পরিচয়ের সুড়সুড়ি দিতেই, তিনি আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে গেলেন। পরে, আরও বহুবার সাক্ষাৎ হলেও, ১৯৪৪ সালের তাঁর সেই রাজনৈতিক হিতোপদেশের কথা বারবার আমার মনে এলেও, তার 'কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে' দিতে আমার রুচিতে বেঁধেছে।

শিলচর, কিশোরগঞ্জ থেকে ছিল বহু দূরে। তিনটে জেলা পার হয়ে যেতে হত। তবু রক্ষা, রেলগাড়ি বদলাতে হত না। রাত্রি একটায় কিশোরগঞ্জ থেকে সুরমা মেলে চেপে পরের দিন বেলা ন'টায় কি দশটায় শিলচর। আবার অন্যদিকে বিকেল পাঁচটায় শিলচর স্টেশন থেকে সুরমা মেলে চেপে রাত্রি একটায় কিশোরগঞ্জ স্টেশনে পেঁৗছে, হেঁটে বা সাইকেল রিকশায় শোলাকিয়া আমাদের বাসায় পেঁৗছান যেত। কিশোরগঞ্জ স্টেশন থেকে আমাদের বাসা এক মাইলের মতো দূরে বা তারও কম ছিল।

আমার ও বাণীর দেখা সাক্ষাতের সুযোগ কম ছিল বলেই চিঠি ছিল আমাদের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। আমার চিঠিতো বাণী ধরা পড়ার ভয়ে রক্ষা করতে পারতনা, পড়েই নষ্ট করে ফেলত। কিন্তু আমি বাণীর চিঠি যথাসম্ভব রেখে দিতাম। আমাদের বিয়ের সাত-আট বছর পরে আমি যখন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে চাকুরিরত, তখন কয়েকদিনের ছুটির সুযোগে বাণীর যে চিঠিগুলো রক্ষা করতে পেরেছিলাম সেইগুলো ফাইল করতে গিয়ে আমাকে চারটে ফাইল কভার ব্যবহার করতে হয়। একেকটা ফাইলে মোটামুটি একশ পৃষ্ঠা চিঠি। এই হিসেবে বাণীর কাছে লেখা আমার চিঠি মোটামুটি ছয়শ পৃষ্ঠা হবে। চিঠিগুলো আবার ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজে একেকটা এক পৃষ্ঠা থেকে চার পৃষ্ঠা হবে। সেদিন আবার নতুন করে মনে হল, হ্যাঁ আমরা সত্যি চিঠিও লিখতে পারতাম বটে!

শিলচরে আমার চাকুরির একটা সুবিধে ছিল যে শিলচর আমার হেডকোয়ার্টার হলেও, সারা কাছাড় জেলা ও সংলগ্ন সিলেটের বদরপুর ঘাট ছিল আমার

কর্মস্থল, আর আমার কাজের ধারা ছিল বিনা শুল্কে চালানি মাল ধরা বা বন্ধ করা। এজন্য প্রত্যহ জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোন বাধ্যবাধকতা আমার ছিল না। আর আমার উপরওয়ালা অ্যাসিস্টেণ্ট কালেক্টার থাকতেন ঢাকায়। ভাগ্যের জোরেই হোক বা আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জোরেই হোক, প্রায়ই বড় বড় কেস্ আমার হাতে ধরা পড়ত বলে, ঢাকার আপিসে প্রিভেন্‌টিভ অফিসার হিসাবে আমার একটু সুনামও হয়ে গিয়েছিল। এই সুবাদে, শনি-রবিবার বা অন্য সব ছুটির সঙ্গে কাজের দিনকে ছুটির দিন করে মাসে একবার, এমন কি দু'বারও শিলচর থেকে কিশোরগঞ্জে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত। আর সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে আমাদের চাকুরির পোশাকটা অনেকটা মিলিটারি অফিসারদের মতো হওয়াতে, কয়েক মাসের মধ্যেই রেলওয়ে কর্মচারি ও জি. আর. পি. দের সঙ্গে এতই পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল যে পরে আমার যাতায়াতে রেলের কোন টিকিট তো লাগতোই না, আমি ইন্টার ক্লাসে ভ্রমণ করছি দেখলে, ওরা আমায় জোর করেই আপার ক্লাসে বসিয়ে দিত। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে তখন দ্বিতীয় শ্রেণী বলে কিছু ছিল না। পরের দিকেতো ঐ আপার ক্লাসে বিনা টিকিটে, এমন কি বিনা বুকিংএ আমার সাইকেল নিয়েও আমি ভ্রমণ করতাম।

যাহোক, মাসে একবার কি দুবার কিশোরগঞ্জে আসার সুযোগ থাকলেও বা হলেও, রাত্রি দুটো নাগাদ বাসায় পেঁাছে, বৈঠকখানা ঘরে বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে, শেষ রাত বা ঊষা ভোরে আমাদের সেই দুই ভৃত্য "নিশা-কুমুদ-এর" ঘরে যেয়ে দুদিনের সেই অজ্ঞাতবাস, ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত আমার জীবনের প্রায় একটা বাঁধাধরা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে আবার আরও একটা সুন্দর নিয়মের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। বাণীদের বাড়ির সুমুখের পুকুর ঘাটে বসে তার মাকে যে গান শোনাতাম, তাদের সেই সামনের ঘরের ভেতর লুকিয়ে বসে বা কাজের অজুহাতে সেই ঘর থেকে বাণীও যে ঐ গানের শ্রোতা ছিল, সেটা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। কিশোরগঞ্জে এসে শিলচর ফিরে যেতে আমাকে তো পুনরায় সেই সুরমা মেলেই চাপতে হত রাত্রি একটা বা দেড়টায়। সুতরাং কিশোরগঞ্জের বাসায় রাতের খাবার খেয়ে অন্ততঃ রাত্রি বারটা পর্যন্ত আমাকে জেগে থাকতেই হতো। রিক্‌শা ঠিক করাই থাকতো। রাত্রি বারটায় এসে তার বেল বাজালেই আমি গিয়ে রিক্‌শায় বসে সোজা কিশোরগঞ্জ স্টেশনে চলে যেতাম। কিন্তু ঐ রাত্রি দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত জেগে থাকার উপায় বার করলাম এই ভাবে যে আমাদের বাসার

উঠোনে বসে ঐ সময়টা আমি গান গেয়ে কাটিয়ে দেব। আমি কবে ফিরে যাব, বাণীর সেটা জানাই থাকত। সে দিনের কোনও এক ফাঁকে আমাদের কোনও সহযোগীর হাত দিয়ে, সে তার পছন্দের কয়েকটা গানের লিস্ট আমার কাছে পৌঁছে দিত।

তখনকার দিনে, বর্তমানের মতো মাইক, লাউডস্পীকার ইত্যাদি ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলো সুন্দর সুন্দর টিনের চোঙ্গ ফুঁকিয়ে তাদের বক্তৃতা বা প্রচারাভিযান চালাতো। ঐ রকম একটা সুন্দর চোঙ্গ আমারও ছিল। আমি আমাদের উঠোনে একটা ইজিচেয়ারে বসে চোঙ্গে মুখ দিয়ে, একটার পর একটা গান গেয়ে সময় কাটাতাম। বাণী সেদিন আমার গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘুমোতো না। আমার গান আরম্ভ হলেই বাণীর মা, বাণীর কাকিমাকে ডেকে বলতেন, ঔযা ঐ শোন, "এলাবাদি" (এলাহাবাদি) সুর আরম্ভ হয়েছে। কাকিমা বলতেন, ওর গান শুনতে তো ভালই লাগে, শুনুন না। উনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলতেন, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি শোন, আমার ভাল লাগে না। কোনও কোনওদিন, "ওরে সুজন নাইয়া" আমি ইচ্ছে করেই গাইলে, কাকিমা বাণীর মাকে বলতেন, ঐ শুনুন, এই গানটাতো তো আপনাকে শোনাবার জন্যই গাইছে। বাণীর মা বলতেন, গাকৃ এখন আর ঐ গান আমার ভাল লাগে না। ঐ কাকিমা ছিলেন বিধবা। কোনও কোনও বার উনিও ওঁনার একটা প্রিয় গান গাইতে আমাকে অনুরোধ করে পাঠাতেন। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত; 'সেদিন বলে ছিলে/এই সেই ফুলবনে/আবার হবে দেখা/ফাগুনে তব সনে।" তখন বাণীর ও আমার পছন্দ মতো যে গানগুলো গাইতাম, তার কিছু কিছু এখনও মনে আছে, যথা ঃ—

১) 'আধোরাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, মনে পড়ে মোরে প্রিয়,
চাঁদ হয়ে রব আকাশের গায়, বাতায়ন খুলে দিও।' (তালাক মামুদ)

২) 'চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়, আমার সমাধি পরে।'

৩) 'ভুলি নাই ভুলি নাই, নয়নে তোমারে হারায়েছি প্রিয়া, স্বপনে তোমারে পাই।' (জগন্ময়)

৪) 'প্রেমের আসন পেতেছি আমরা, মর্তের ধূলি পথে, তুমি মমতাজ সাজাহান আমি, বাঁধা মোরা এক সাথে।'

৫) 'রাতের ময়ূর ছড়াল যে পাখা, আকাশের নীল গায়, তুমি কোথায়, আমার এ গান স্বপনে ভাসিয়া যায়।'

('পরশমণি' ছবিতে হিমাংশু সুরসাগরের সুর দেয়া)

৬) 'শ্রাবণ রজনী বিফলে বহিয়া যায়, মনের কপোতী সাথী খুঁজে ফিরে হায়।'

৭) 'চেতনার কি যে ব্যথা, অচেতনে নিয়া, বুঝিবেনা প্রিয়া, ঘুমাও তুমি প্রিয়া।'

৮) 'চাঁদের আলোর দেশে গো, রামধনুকের দেশে, স্বপ্ন দিয়ে একখানা ঘর, বাঁধবো ভালবেসে।'

৯) 'মরণের মুখে রেখে, দূরে যাও চলে।' (পঙ্কজ)

১০) 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না!' (রবীন্দ্র)

১১) 'পথের শেষ কোথায়, কি আছে শেষে।' (রবীন্দ্র)

১২) 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে।' (রবীন্দ্র)

১৩) 'মলয় চল ধীরে ধীরে।' (শচীনদেব বর্মণ)

১৪) 'বাঁধিনু মিছে ঘর ভুলের বালুচরে।' (সাইগল)

১৫) 'রজনী গো যেওনা চলে, এখনো হয়নি লগন।' (সুধীরলাল)

১৬) 'চেয়েছিনু জোছনা কিষিণা রাতে।' (সুধীরলাল)

১৭) 'এমনি শারদ রাতে সাতটি বছর আগে।' (জগন্ময়)

১৮) 'এমনি শারদ রাতে সাতটি বছর পরে।' (জগন্ময়)

১৯) 'স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে, তুলব আমি বাড়ি।' (সাইগল)

২০ 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুল হার, দিল সে দহন জ্বালা।' (সাইগল)

২১) 'প্রেমের পূজায় এইতো লভিলি ফল, ঊষর মরুতে কেন দিলি আঁখি জল।' (সাইগল)

২২) 'শেষ হলো তোর অভিযান।' (পঙ্কজ)

২৩) 'তোমারে ভুলিয়া আপনারে ছিনু ভুলে',—ইত্যাদি আরও অনেক গান, যা আজ আর মনে আসছে না। আর সে গানের খাতা হারিয়ে গেছে, নয়তো কিশোরগঞ্জেই পড়ে আছে। সেই সময় থেকে প'য়তাল্লিশ বছর পরে, আজ এসব লিখতে বসে, মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করে সুর টেনে গানের কথাগুলো মনে করার প্রয়াসে, মাঝে মাঝে যেন একেকবার সেই দিনে ফিরে যাই। মনে হয় কিশোরগঞ্জের বাসার সেই ছোট্ট উঠোনে রাত দশটায় কি এগারটায় সেই পুরোনো ইজিচেয়ারটায় চোঙ্গ হাতে বসে আছি, প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, চাঁদের আলোয় চারদিক আবছা দেখা যাচ্ছে, আমার ডানদিকে বাসার সদর পথ দিয়ে সেই বড় পুকুরটায় হাওয়া লেগে জল নড়ছে, চাঁদের আলোও জলের সঙ্গে নাচছে, পাশের সেই অন্য

ছোট ভাড়াটে বাড়িটার প্রায় সংলগ্ন বাণীদের বড় ঘরের পাশের একটা কোঠা ঘরে বাণী একলা শুয়ে শুয়ে আমার গান শুনছে। মাত্র চোদ্দ মাস পূর্বেও তো বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে যেয়ে সেই পুকুর, সেই ঘাট, বাণীর শোবার কোঠা ঘর, আমাদের সেই সামান্য পরিবর্তন করা ভাড়াটে বাসাটা দেখে এসেছি। প্রায় সব তেমনই আছে, শুধু আমরাই সেখানে নেই। আবার এও মনে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে যে গানগুলো বাণীকে গেয়ে শোনাতাম, তখন বা এমনকি, মাত্র চোদ্দ-মাস পূর্বে, সেই সুন্দর ও মধুময় স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে দাঁড়িয়ে যখন চারিদিকে তাকিয়ে সব দেখলাম, তখনও তো ভাবতে পারিনি যে মাত্র আজ থেকে তিন মাস দশদিন পূর্বে সেই অভিশপ্ত তেসরা ফেব্রুয়ারি থেকে উপরে উল্লিখিত ১, ২, ৩, ১০, ১৪ ও ১৮ নম্বরের গানগুলো আমার জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। এই বৃদ্ধ বয়সেও মাঝে মাঝে পূর্ব স্মৃতি স্মরণে এলে, ভাঙ্গা গলায় ঐ গানগুলো গুন্‌গুনিয়ে টানলে, বাণী মন দিয়ে শুনতো, দু এক বৎসর পূর্বে হঠাৎ একদিন আমায় বলল, বেছে বেছে কয়েকটা গান ক্যাসেট করে রাখনা কেন। এমনও তো হতে পারে যে তুমি আমার পূর্বেই চলে গেছ, তাহলে ঐ গানগুলো শুনলেও তো তোমার কিছুটা সান্নিধ্য পাবো। আমি তার কথামতো কয়েকটা গান ক্যাসেট করেওছিলাম। কিন্তু কার জন্যে ? তিনি এখন কোথায় ? আমি কি করে তাঁকে এ গানগুলো শোনাব ?

লেমিনেটেড করা বাণীর একটা বাস্ট্ ফটো আমার লেখার টেবিলের বাঁ দিকে দাঁড় করানো আছে। আর আছে আরও একটা বড় ফটো ঐ ঘরের উত্তর দিকের দেয়ালে। দক্ষিণ দিকের একটা সোফায় বসে আমি প্রত্যহ সকালে তিন কাপ চা খাই। ওখান থেকে দুটো ফটোই আমার নজরে আসে। সেখানে বসে গুন্‌-গুনিয়ে আমি এখনো বাণীকে সেই পুরানো গানগুলো শুনিয়ে চলেছি আর তার সঙ্গে নতুন করে সংগ্রহ করা জগন্ময়ের 'চিঠি' বলে খ্যাত গানটাও গাই ঃ—"তুমি আজ কত দূরে / আঁখির আড়ালে চলে গেছ তবু / রয়েছ হৃদয় জুড়ে / ……আমার ভুবনে সকলি যে আছে / তুমি নাই শুধু তুমি নাই কাছে / মোর গান হারা স্মৃতির পাপিয়া / একা একা মরে ঝুরে / তুমি আজ কত দূরে।" ……গাইতে কি পারি ? পারিনা, একটু গাইলেই গাল গড়িয়ে চোখের জল পড়ে গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।

ঘুমতো এখন আর ভাল হয়না। রাত্রি এগারটা বারটায় শুয়েও তিন চার বার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কত রকমের স্বপ্ন দেখি। কখনো কখনো স্বপ্ন বা তন্দ্রার

ঘোরে, এমন কি কোনদিন দুপুরেও দেখি, আধো আলো, আধো অন্ধকারে বাণী দাঁড়িয়ে বলছে, শ্যামল মিত্রের যে গানটা তুমি আজকাল খুব গাইছো "যখন তুমি দেখবে আমি নাই / আমায় তুমি ভুল বুঝনা যেন / তোমার আগে আমি যদি যাই / ফেরেনা আর সেথায় গেলে হায় / সাধ করে আর কে-ই বা বল / সেথায় যেতে চায় / তবু যদি তোমায় ছেড়ে / হয়গো যেতে কভু / দূরে থেকেও তোমায় যেন / তেমনি করেই পাই / তোমার কাছে আমার যত ঋণ / পারবো নাকো জানিয়ে যেতে / তোমায় কোনদিন / ফিরব ভেবে আশায় থেকে / হওগো নিরাশ যদি / সেই কথাটি তোমায় আমি / জানিয়ে গেলাম তাই।"

বাণী বলে, ওটাতো এখন আমার গান, তুমি শুধু শুধু গেয়ে কাঁদ কেন ? আমি বলি তুমি গাওনা বলেই আমি গেয়ে যাই। অন্ধকারে সজল চোখে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে পড়ি। অসহায় বালকের মতো মা মা করে চীৎকার করে মার কোলে মাথা রেখে কেঁদে মন শান্তি পেতে চায়। পাশের ঘরের বিছানায় যদি কেউ থাকে, তবে জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হলো, কি হলো। চুপ করে বসে থাকি। কি বলব, কি বলার আছে ?

কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে, আর বোধ হয় বেশী দিন বাঁচবনা। দুই ছেলেকেই বলেছিলাম, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলে, কলকাতার আশেপাশের আপন ও প্রিয়জনদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে আসি। গতকাল (১২/৫/৯১-এ) ছোট ছেলে টুসুন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলে, পূর্ব কথা মত গলফ্ গ্রীন থেকে বাসনা মাসিকে তুলে নিই। এই মাসিমার একটা বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁর স্বামী প্রয়াত নিখিল চন্দ্র গুহ মহাশয়ও ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় মেসোমশাই আর শ্রীমতি বাসনা গুহ আমাদের সকলের প্রিয় মাসিমা। এই সন্তানহীন দম্পতি, কি আমাদের আর কি বাণীদের আত্মীয় না হয়েও ছিলেন তারও বেশি। পূর্বে লিখিত, কিশোরগঞ্জে আমাদের আর বাণীদের মাঝখানের ছোট ভাড়াটে বাড়িটায় তাঁরা বহুদিন ছিলেন। বাণী ও হেনা ছিল ঐ মাসিমার প্রায় বন্ধুর মতো। ওদের কোথাও বেড়াতে বা কোন অনুষ্ঠানে, বা সিনেমায় ইত্যাদিতে যাবার ব্যাপারে এই বাসনা মাসিমাই ছিলেন এসকর্ট কাম গার্জেন। একটু বড় হয়ে হেনা ও বাণী তাঁরই ভাল ভাল শাড়ি পরে নানা অনুষ্ঠানে যেত। ১৯৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই মেসোমশাই-ই সরকারি গোপন খবর ফাঁস করে আমাকে পালিয়ে যেতে বলেন,

একথা মনে হয় আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। ওঁরা আমাদের আত্মীয় না হলেও, দেশভাগের পর, আমাদের মধ্যে কখনো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। ১৯৮৯-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি তাঁদের উত্তরপাড়ার বাড়িতে মেসোমশাই মারা যান। বাণী তার অসুস্থ শরীরেই আমার সঙ্গে উত্তরপাড়া যেয়ে মেসোমশাই-এর পারলৌকিক কাজে যোগ দিয়ে আবার টালিগঞ্জে ফিরে আসে।

সেদিন গল্‌ফ গ্রীন থেকে আমরা যাই দশবছর পরে কিশোরগঞ্জের কারক্কার বিনয় চক্রবর্তীর (মণি) শ্রীরামপুরের বাড়িতে। বাল্য থেকেই আমরা আজীবনের বন্ধু। সেখানে পৌঁছুলে বহুদিন পর সাক্ষাতের আনন্দের পরই সজল চোখে শুধু বাণীর আলোচনা আর ঐ পরিবারের সকলের মুখেই এক কথা, এটা কি হলো, বাণী এত তাড়াতাড়ি চলে গেল ?

মণি ও আমি ১৯৩৮ সালে কিশোরগঞ্জের আজিমুদ্দিন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আই এ. পড়তে আসি। মণি রিপন (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে আর আমি আশুতোষে। মণি থাকতো ওয়েলিংটন স্ট্রীটের একটা ময়মনসিংহের মেসে তার বাবার সঙ্গে, আর আমি ভবানীপুরের বড় মামার বাসায়। বাড়ি ও আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে আসার দুঃখ আর তৎকালীন কলকাতায় আমাদের সমাজের প্রাণহীন লোকাচারের বেদনা দূরীভূত করার প্রয়াসে, আমরা উভয়ে কলেজ ছুটির দিনে, পর্যায়ক্রমে ভবানীপুরের গাঁজা পার্ক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উদ্যান ও কার্জন পার্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে, কিশোরগঞ্জের স্মৃতিচারণ করতাম। মণিদের মেসে আমার আর আমার মামা-বাড়িতে মণিরও খুব যাতায়াত ছিল।

১৯৩৯ সালে কোনও একদিন, কি একটা বিশেষ কারণে আমাদের কলেজ বেলা একটায় ছুটি হয়ে গেলে, মণিদের রিপন কলেজেও ছুটি হয়ে গেছে মনে করে, আমি আশুতোষ কলেজ থেকে একেবারে সোজা মণিদের ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মেসে যেয়ে দেখি, মণি তখনও ফেরেনি, ওদের সব ঘরেই তালা লাগানো। বারান্দায় বিশ্রামরত একটি ঠাকুর ও ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা করেও তাই জানলাম। তবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, আমি ভবানীপুরের বাসায় ফিরে আসি। পরের দিন সব স্কুল-কলেজই কি কারণে ছুটি ছিল। সেদিন ভোর আটটায় মণি আমাদের ভবানীপুরের বাসায় এসে আমাকে গোপনে বলল, গতকাল তাদের মেসে একটা ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছে, তাই সে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে এসেছে। কি গণ্ডগোল জানতে চাইলে, সে বলল, "রাস্তায় যেতে যেতে বলব, তুই বাড়িতে বলে

নে, যে আজ আমাদের মেসেই দুপুরে খাবি।" আমি সে ভাবেই বলে, মণির সঙ্গে রওনা হলে, সে বাসে ট্রামে বসে আমায় জানাল, "গতকাল দুপুরে আমাদের মেসের প্রথম ঘরের তালা খুলে অনেক জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে। তুই দুপুরে মেসে গিয়েছিলি বলে ঠাকুর চাকররা তোকে সন্দেহ করছে। এতে আমি তো বটেই, বাবাও খুব রেগে গেছেন এবং ঐ ঘরের বাসিন্দাদের বলেছেন যে মণিকে পাঠিয়ে মানিককে এখানে আনাচ্ছি। তার সঙ্গে কথা বললেই বুঝবেন যে সে তেমন ছেলেই নয় আর তেমন ঘর থেকেও সে আসেনি।"

মণি আর আমি, ওদের মেসে পৌঁছুলে, মণি আমাকে উক্ত প্রথম ঘরে বসিয়ে সেখানে পাঁচ ছয় জন লোককে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলে একেবারে শেষের ঘরে তার বাবাকে খবর দিতে গেল। এদিকে ঐ ঘরের তিন চার জন আমাকে নানা প্রশ্ন করে জেরা করতে আরম্ভ করলে আমি খুব চটে যাই এবং পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার প্রায় হাতাহাতি লেগে যায়। মণির বাবা আহ্নিকে বসেছিলেন বলে আসতে একটু বিলম্ব হচ্ছিল, কিন্তু চীৎকার-চেঁচামেচি শুনে উনি আহ্নিক ফেলেই মণিকে নিয়ে ঐ ঘরে ছুটে এসে, সব জেনেশুনে আমায় বলেন, "তুমি আমার ছেলের মতো, তাই তোমায় ডেকে আনার ভুলের জন্য আমি দুঃখিত।" আর যার সঙ্গে আমার প্রায় হাতাহাতি লেগে গিয়েছিল, তাকে বললেন, "সুধাংশুবাবু, এটা আপনার উচিত হয়নি, আমি খুবই বিরক্ত বোধ করছি এবং নিজেকে অপমানিত মনে করছি।" এই বলে উনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। আমিও খুব বিরক্ত বোধ করে চলে আসতে চাইলে, মণি বাধা দিয়ে বলল, "কেন, আমরা কি ভয় পেয়েছি যে তুই চলে যাবি, তুই এখানেই খাবি আর সন্ধ্যে পর্যন্ত বুক ফুলিয়ে থাকবি।" যাহোক, সন্ধ্যের পর আমি ফেরার পথে, মেসবাড়ি থেকে ফুটপাথে নেমে এলে সেই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়েসের সুধাংশুবাবু প্রায় তাঁর সমবয়েসী এক ভদ্রলোককে "এই যে, এরই নাম মাণিক" বলে, আমায় দেখিয়ে দিয়ে মেসে উঠে গেলেন। নতুন ভদ্রলোক আমায় বললেন---"আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। যে ভদ্রলোক আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, উনি এবং মেসের আরও কিছু বাসিন্দা আপনার নামে থানায় একটা ডাইরি করেছে। আমি আই. বি.-র লোক, থানা থেকে আমাকে ব্যাপারটা ইনকোয়্যারি করতে বলা হয়েছে।" আই. বি. বলাতেই আমার সন্দেহ হয়, কারণ আমার বয়েস কম হলেও, স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ ছিল বলে, আই. বি.দের কি কাজ তা আমার জানা ছিল। তবুও আরও একটু

বাজিয়ে নেবার জন্য, ভদ্রলোকের সঙ্গে ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু করলাম এবং অচিরেই বুঝতে পারলাম যে তিনি একজন সাজানো আই বি.। গণেশ এভেন্যু তৈরির কাজ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ থেকে ফুটপাথ ধরে সামান্য দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই ডান দিকে একটা সরু প্রায় অন্ধকার গলি দিয়ে যেয়ে গণেশ এভেন্যুতে পড়া যায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে আর কথা বলতে বলতে প্রায় তিনবার ঐ গলির মুখে এসে আরও একটু গলির মধ্যে যেয়েই ভদ্রলোককে কিছু উত্তম-মধ্যম দেবার তালে ছিলাম! কিন্তু উনিও খুব সাবধান ছিলেন, ঐ গলির মুখে এসেই আর না এগিয়ে আবার about turn করছিলেন। কাজেই তিন বারের বার ঐ গলির মধ্যে একলাই কিছুটা এগিয়ে যেয়ে বললাম, "এই যে আই বি. সাহেব! তোমার সাত-পুরুষের ভাগ্য ভাল যে, এই গলিতে ঢুকলে না, ঢুকলে আজ তোমাকে 'ঘুঘু আর ফাঁদ' দুটোই দেখিয়ে দিতাম।"--এই বলে, গলি থেকে একটা ঢিল তোলার ভান করলে আই. বি. সাহেব প্রায় ডবল মার্চ করে ফুটপাথের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন।

কয়েক দিন পর পূর্বোক্ত গাঁজা পার্কে বসে মণিকে ঘটনাটা বললে, সেও খুব চটে যায়। আমি তাকে বলি, "চটে গেলেই হবে না, সুধাংশুবাবুর উপর প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমার যা যা information প্রয়োজন, সেটা যোগাড় করে দেবার দায়িত্ব তোর, বাকি যা করার আমি-ই করব।" দিন কয়েক পরে, মণি আমাকে জানিয়ে গেল যে ভদ্রলোকের নাম সুধাংশু ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকা আপিসের একজন কেরানি। কিশোরগঞ্জের 'খরমপট্টির' অমুক বাড়ির জামাই। তৎকালীন হ্যারিসন রোড আর কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে শিয়ালদহের দিকে যেতে কিছুটা এগিয়েই ডান হাতে যতদূর মনে পড়ে একটা হোটেল ছিল, নাম—'জেনিথ্'। ঐ হোটেলের রাস্তার ধারের ঘরগুলো ছিল সব দোকান ঘর। তার মধ্যে একটায় ছিল শুধু 'sports goods'। সে দোকানের কর্মচারী-কাম-ম্যানেজার আমার চাইতে বয়সে অনেক বড় আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে, সুখময় রায়। বয়েসে বড় বলে আমি-ই তাকে 'সুখমামা' বলে ডাকতাম। তিনি পূর্বে ময়মনসিংহে আমাদের বাসায় থেকে সিটি স্কুলে পড়াশুনো করতেন আর মারপিট ও স্বদেশী করতেন। সুখমামাকে সব ঘটনা বলে সুধাংশু ভট্টাচার্যকে, কৌশলে তাঁর দোকানের ভেতরে এনে পেটাবো বলে প্রস্তাব দিলে, উনি আমার প্ল্যান শুনে বললেন, মারপিট-চেঁচামেচি হলে,

দোকানের মালিক অসন্তুষ্ট হবে, পেটাবি না আমায় কথা দিয়ে, ব্যাপারটা আমার কাছে ছেড়ে দে, দেখবি আমি কেমন শাস্তি দিই। বাধ্য হয়ে সুখমামার প্রস্তাবে রাজি হলাম।

কিশোরগঞ্জের 'খরমপট্টির' সুধাংশু ভট্টাচার্যের শ্বশুর বাড়ির খুব নিকটেই ছিল, আমাদের চাইতে বয়সে বড় বকুল দত্তের বাড়ি। মারপিট করত বলে তাকে সকলেই চিনত। এক দুপুরে হোটেল জেনিথের নিকট থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা আপিসে টেলিফোন করে সুধাংশুবাবুকে পেয়ে গেলাম। বললাম—"আমি কিশোরগঞ্জের বকুল দত্ত। কলকাতা আসার সময় মাসিমা, মানে আপনার শাশুড়ি আপনার জন্য একখানা ফিনলের ধুতি ও বড় এক ডিবে নারকেলের নাড়ু আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আর সময় করে আপনাদের ওয়েলিংটনের মেসে যেতে পারিনি। কিন্তু আজ সন্ধ্যায়ই আমাকে সিরাজগঞ্জ মেলে কিশোরগঞ্জে ফিরে যেতে হবে। আপনি একটু কষ্ট করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার হোটেল থেকে জিনিসগুলো নিয়ে গেলে ভাল হয়। আমি হ্যারিসন রোডের হোটেল জেনিথের ১২ নম্বর ঘরে আছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।" তিনি আসছেন জানালে, আমি পুনরায় সুখমামাকে সুধাংশু ভট্টাচার্যের চেহারার বর্ণনা দিয়ে, ঠিক উলটো দিকের ফুটপাথ সংলগ্ন একটা রেষ্টুরেণ্টে এক কাপ চা-এর অর্ডার দিয়ে, হোটেল জেনিথের গেট ও ফুটপাথের উপর নজর রাখলাম। ভদ্রলোক বোধ হয় ধুতি আর নাড়ুর লোভে, আপিস থেকে ছুটি নিয়ে বেলা তিনটের মধ্যে যখন ফুটপাথ ধরে হোটেল জেনিথের গেটের দিকে যাচ্ছেন, আমি ছুটে যেয়ে সুখমামাকে তাঁর দোকানের বাইরে ডেকে এনে সুধাংশুবাবুকে চিনিয়ে দিলে, সুখমামা তাঁকে পূর্বের ব্যবস্থা মত গেটের ভেতরেই বলেন যে আপনি কি সুধাংশুবাবু? উনি সম্মতি জানালে, সুখমামা তাঁকে বলেন যে আপনি তো বকুল দত্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? তারপর, কয়েক পা দূরেই তাঁর দোকান দেখিয়ে বললেন যে বকুল দত্ত তাঁর দোকানে বসে অপেক্ষা করছেন। সুধাংশুবাবু মনে হয়, ধুতি আর নাড়ুর লোভে, তাঁকে হোটেলে আসতে বলে, দোকানে অপেক্ষা করার অস্বাভাবিকতাও ধরতে পারলেন না। উনি সুখমামার সঙ্গে দোকানে যেয়ে বসলে, আমি একটু আড়াল থেকে দোকানে প্রবেশ করেই তাঁর মাথা আর কানের কাছে একখানা বিরাশি ওজনের ঘুষি মেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে! তোর আই. বি. বাবাকে নিয়ে আসতে পারলি না?" দোকানে আমরা তিনজন ছাড়া তখন আর কেউ নেই। সুখমামা

চোখের ইশারায় আমাকে মারপিট করতে বারণ করলেন। করবেন যে সেটা আমি জানতাম বলেই, আগেই ঘুষিটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। সুধাংশুবাবু তখন থরথর করে কাঁপছেন। সুখমামা যাই জিজ্ঞাসা করছেন, তার কোন জবাব দিতে পারছেন না, তোতলামো করছেন। তখন সুখমামা ভদ্র-অভদ্র ভাষায় যা তা বলে চলেছেন। এ-ও বললেন, যাকে চোর বলে সন্দেহ করেছেন, সে তার মামাবাড়িতে থেকে আশুতোষ কলেজে পড়ে। তার মামা আপনার মতো দশ বারজন কেরানি আর তিনজন চাকর পোষে। এমনি আরও নানা ভাবে অপমান করে, কাঁচি দিয়ে খাবলা-খাবলা করে মাথার কতগুলো চুল কেটে দিলেন। তারপর বললেন, যান ভবিষ্যতে সাবধানে চলবেন। ভদ্রলোক উঠে গেলে দেখলাম, যে চেয়ারটায় উনি বসেছিলেন, সেটা ভিজে, প্রস্রাবের গন্ধ আসছে। সুখমামা আমায় বললেন, তোকে বারণ করেছিলাম যে মারিস না। তোর ঘুসি খেয়েই লোকটা প্রস্রাব করে দিয়েছে। এখন আবার কাকে দিয়ে ওটা আমি পরিস্কার করাই। সুধাংশুবাবু চলে গেলে, সুখমামা আমাকে চা-বিস্কুট খাওয়ালেন, তারপর, ময়মনসিংহের কিছু মারপিটের পুরোনো গল্পটল্প করে, বিকেলের দিকে ভবানীপুরে ফিরে এলাম। পরে মণির কাছে শুনলাম যে সুধাংশুবাবু মেসে ফিরে যেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন! তার পরের দিন মাথা নেড়া করে একটা গান্ধী টুপি পরে বাইরে যাতায়াত আরম্ভ করেন। এই ঘটনার প্রথম দিনে 'বরফ' ও অন্য নামের একটি ছেলে সুধাংশুবাবুকে সমর্থন করেছিল বলে, মণির দেয়া খবর মতো কিছুদিন পরেই তাদের দুজনকে একেবারে আমাদের এলাকায় 'স্কুল রো'-তে এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এলে, দুচারটে থাপ্পড় ও গালাগালি দিলে নেমন্তন্ন-বাড়িতে না খেয়েই ফিরে যায়। আর অন্যদিকে পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়, ভিক্টোরিয়া কলেজের হেড ক্লার্ক শ্রীনগেন চক্রবর্তী, সুধাংশুবাবু মেসে অজ্ঞান হয়ে গেলে আমাকে খুব অশ্রাব্য গালাগালি করেছিলেন বলে, তাঁকেও সামান্য আক্কেল দিতে পেরেছিলাম। ১৯৪২ সালে, ময়মনসিংহ থেকে কলেজ টীম নিয়ে ফুটবল খেলতে যাচ্ছি গৌরীপুরে। ট্রেনের কামরায় উঠেই দেখি ওই চক্কোত্তি মশাই, নেত্রকোনার 'ন-পাড়া'-র দেশের পথে ঐ কামরায় বসে। আমাকে দেখেই নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। আমি একেবারে তাঁর সামনে উল্টো দিকের বেঞ্চে বসে, গৌরীপুর স্টেশন পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর তখনকার সেই অসোয়াস্তি আমারই করুণার উদ্রেক করেছিল। প্রায়-পিতৃসম বয়স্ক ভদ্রলোককে এর চাইতে বেশি আর কিছু করা

আমার শালীনতা বোধে আটকায়।

কথায় বলে 'ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে'। ওই 'বরফ' ও তার মেসের আর এক সাথীকে ভবানীপুরে হেনস্থা করার কয়েকদিন পরেই ওদের মেসবাড়ির ঐ ঠাকুর ও চাকর এক দুপুরে অন্য এক ঘরের তালা, ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খোলার সময় একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। তাদের পূর্বের চুরির দিনে, কিশোরগঞ্জ ও মণির ভালবাসার আকর্ষণ আমাকে সেই দুপুরে ঐ মেসবাড়িতে টেনে নিয়ে গেলে, আমি তাদের Scapegoat হয়ে যাই।

কাকতালীয় হলেও, একথা না লিখে পারছি না যে, ১৯৪৬-এর ১লা আগস্ট, আমার ও বাণীর জীবনের সেই চরম (Fateful) দিনে, আমাদের 'মহাযাত্রার' সেই ঝড়-বাদলের ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাতে যখন আমরা বিনা বাধায় 'খরমপট্টি' প্রায় পার হয়ে যেয়ে, বাঁ হাতের রাস্তায় মুসলমান পল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখন ঐ সুধাংশু ভট্টাচার্যের শ্বশুরালয়ের, কোন অনুষ্ঠানের পেট্রোম্যাক্সবাতির আলো রাস্তায় এসে পড়ায়, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হলেও আমাদের পথে একমাত্র বিঘ্ন ঘটিয়েছিল।

যাহোক, শ্রীরামপুরের উক্ত মণির বাসা থেকে বেলা একটায় গেলাম ভদ্রেশ্বরে, কিশোরগঞ্জের বহু প্রাচীন অধিবাসী আর নিখিল মেসোমশাই-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীবিনোদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ি। সেখানেও সেই একই কথা, বাণীর অকাল মৃত্যুর জন্য সকলের আপশোস আর কারো কারো চোখে জল। দুপুরের খাওয়া ওখানেই খেয়ে, বাসনা মাসিমাকে ঐ বাড়িতেই বিশ্রাম করতে বলে, আমি গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম রেল লাইনের অপর পারে "সারদাপল্লী"-তে, আজিমুদ্দিন হাইস্কুলের প্রয়াত কিন্তু অতি প্রিয় হেড্ মাস্টার মহেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে, প্রায় পনের বছর পরে। আশা করেছিলাম হয়তো মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী, বড়ই প্রিয় মাসিমাকে পাব। কিন্তু জানলাম তিনিও আর নেই। এই মাসিমা কি ভালই না বাসতেন! আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম, এই দম্পতির কে আমাকে বেশি ভালবাসেন। বড় ছেলে রাখাল আমাকে দেখে আনন্দে কেঁদে দিল। বাণী নেই শুনে, 'হায় হায়' করে ঘরের বিছানায় বসে পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। স্তব্ধ আমাকেও হতে হল যখন জানলাম আমার খুব প্রিয় রাখালের ছোট ভাই দুলুও আর বেঁচে নেই। রাখালের স্ত্রী, দুলুর স্ত্রী সকলেই আমায় প্রণাম করল। আর অন্ততঃ একদিন থেকে যেতে অনুরোধ করল। তাদের ভাল করে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে, রাখালের ঘরের টেবিলে পাশাপাশি রাখা মাস্টারমশাই আর

মাসিমার ফটোকে প্রণাম করে এসে গাড়িতে বসে চুঁচুড়ার দিকে রওনা হলাম। যেতে যেতে ভাবলাম, ঐ ছোট্ট দুলু আমার কি নেওটাই না ছিল! আমি কিশোরগঞ্জে গেলে, সে সারাদিনই আমার কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করত। মনে হলো, আমাদের প্রিয় কিশোরগঞ্জের একটা সুন্দর যুগ ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে, আর কয়েক বছর পরে কোন চিহ্নই থাকবে না। দুপুর গড়িয়ে, প্রায় বিকেলে চুঁচুড়ার "ঠাকুর গলিতে" শান্তি দত্তরায়ের বাড়িতে পেঁছুলাম। কিশোরগঞ্জের "বামনকচুরের" এই দত্তরায় বংশ খুব নামজাদা জমিদার ছিল। আমি ওদের প্রাচীন বৈভব ঐ গ্রামে যেয়ে দেখেছি। বাণীর আপন পিসতুত ভাই শান্তি বাল্যকাল থেকেই আমার আজীবনের বন্ধু এবং আমার ও বাণীর বিয়ের ব্যাপারে একজন সাহায্যকারী ও সমর্থক। একটা সময় ছিল যখন, মাণিক, মনু, শান্তি আর সুনীল, আমরা কুখ্যাত ছিলাম শোলাকিয়ার ঐ বড় পুকুর পাড়ের 'ফোর ম্যাস্‌কেটীয়ারস' নামে। সে এক অন্য ইতিহাস। আমাদের সেই সময়ের 'সু' আর 'কু' কাহিনী মিলিয়ে একটা মোটামুটি বড় বই হতে পারে। এই মনু ও বাণীর এক কাকার শ্যালক বর্তমানে পাটনায় বাড়ি করে আছে, আর সুনীল ছিল দমদমে, কিন্তু গত বার বছর সে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

শান্তি আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বললো, যেখানে তোর কাছে আমার ছুটে যাবার কথা, সেখানে তুই এলি আমার সঙ্গে দেখা করতে! আমার এই অপরাধের ক্ষমা হয়না জানি, তবু তুই তো আমাদের 'The Manik', আমাদের মাথার মণি, তুই নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করবি। বললাম, ওসব কথা ছাড়। আট-নয় ব'ছর পূর্বে, এই বাড়িতেই তোকে আর পিসিমাকে (শান্তির মা) আমি আর বাণী এসে দেখে গিয়েছিলাম! আজ পিসিমাও নেই, নেই বাণীও। আমিও আর বেশি দিন নেই, তাই তোকে শেষবারের মতো দেখে গেলাম।* পাটনায় মনু তোর ও সুনীলের খবরের জন্য প্রত্যেক চিঠিতে তাগাদা দেয়। এবার তোর খবরটা অন্তত দিতে পারব। শান্তি বার বার নিজের অপরাধ কবুল করে, ক্ষমা চেয়ে বাণী ও আমার জন্যও সজল চোখে সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং দুএকটা পুরানো স্মৃতির কথা ওঠালে, আমি বলি, হাতে একদম সময় নেই, প্রায় পাঁচটা বাজে, চল আমার সঙ্গে হুগলীতে বিলাসদাদের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করে যাই। বেলা পাঁচটার একটু পরেই বিলাসদাদের

* এই সাক্ষাতের দুসপ্তাহ পরেই এই শান্তির মৃত্যু সংবাদ পাই।

বাড়ি পৌঁছে গেলাম। কিশোরগঞ্জের 'শোলাকিয়া'-য় এই বিলাসদারা[১] ছিল চার ভাই। অনাথ, বিলাস, শৈলেশ ও গণেশ। মধ্যবিত্ত বেশ বড় পরিবার। ওরা অনেকটা বাণীদের পরিবারের ছত্রছায়ায় ছিল। অনাথদা ও বিলাসদা পর পর বাণীর বাবার কম্পাউন্ডার ছিলেন। ডাঃ বীরকে ওঁরা ডাকতেন ধনদা বলে। দুই পরিবারের মধ্যে ছিল একটা অদ্ভুত আন্তরিকতা। অনাথদা ও বিলাসদা দুই ভাই-ই ছিল হৈ-চৈ করা দিলখোলা মানুষ। প্রতি বছর কিশোরগঞ্জে দোল উৎসবের দুদিন এই অনাথদাই বিরাট হোলি গানের দল নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেয়ে হোলি গানে সকলকে মাতিয়ে তুলতেন। আমাদের পেলে একেবারে জোর করেই সঙ্গে ধরে নিয়ে যেতেন। অনাথদার নিজের রচিত হোলি গানের কিছু কিছু কথা এখনও মনে পড়ে, যথাঃ—"ওগো হরি তোমার সনে আর তো খেলবনা হোরি। অমন করে দিতে কি হয় ভিজায়ে নীলাম্বরী" ইত্যাদি। অন্য একটা—"রাউক্ষাইন রাউক্ষাইন আর কত বিজাইবাইন। সারা গাওতো বিজাইয়া দিলাইন কিছু বাকি রাখলাইন না।"[২] ইত্যাদি।

দেশ ভাগের পর, এপার বাংলায় এসেও যখনই আমি কলকাতা বা তার আশেপাশে পোস্টিং পেয়েছি, অনাথদা ও বিলাসদা আমাদের দেখতে এসেছেন বার বার। দুভাই-ই বাণীকে খুব ভালবাসতেন। আজ অনাথদা, শৈলেশদা আর গণেশ ইহজগতে নেই। ৮৪ বছরের বৃদ্ধ বিলাসদা বর্তমানে দৃষ্টিহীন। হুগলিতে বেশ সুন্দর বাড়ি করেছেন। সকলেই একসঙ্গে আছেন। কিশোরগঞ্জের সেই একান্নবর্তী পরিবারের ঐ দৃষ্টান্ত দেখে আমার শোকাতুর মনেও বেশ শান্তি পেলাম। আমি এসেছি শুনে বিলাসদা ও অনাথদার বিধবা স্ত্রীর সে কি উল্লাস আর অন্যদিকে বাণীর জন্য কি হা-হুতাশ! যেন ওঁদের নিজেদের মেয়ে মারা গেছে। ১৯৯০ সালে আমি কিশোরগঞ্জে গিয়েছিলাম শুনে কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, তাঁদের সোনার কিশোরগঞ্জের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসের খবর জানতে সে কি অদম্য আগ্রহ! এঁরা দুজনেই আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়, কিশোরগঞ্জ ওঁদের দেশ, সেখানে থেকেছেনও অনেক ব'ছর। এপার বাংলায়ও এসেছেন বহু বছর আগে। কিশোরগঞ্জের বাড়ির থেকে অনেক বড় ও সুন্দর

(১) বিলাসদার কথা পূর্বে উল্লেখ আছে।

(২) রাখুন রাখুন আর কত ভেজাবেন, সারা শরীর তো ভিজিয়ে দিলেন, কিছু বাকি রাখলেন না।

বাড়ি করেছেন হুগলিতে। তবু মনে হয় তাঁদের মন-প্রাণ পড়ে আছে সেই সোনার কিশোরগঞ্জে। একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যাবেন এঁরা সেই কিশোরগঞ্জের জন্যই হা-হুতাশ করতে করতে। এই যে মনের দুঃখ-কষ্ট, হা-হুতাশ, সব কিছু পেয়েও, কিছুই না পাওয়ার জ্বালা, এটাতো আমাদের মতো, নিজের দেশ থেকে তাড়িত যারা, তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। ফিরে আসার পথে, তাই মহামান্য যীশুর মৃত্যুর পূর্বের কথাগুলোর মতো কিছু কথা আমারও মনে হলো, 'হে মহান মহম্মদ আলি জিন্না, হে মহান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তোমরাতো জান না, তোমরা আমাদের কি করে গেছ !'

বিলাসদারা কিছুতেই সেদিন আমায় ফিরতে দেবেন না। দুজনই বললেন সেই সাত আট বছর পূর্বে বাণীকে নিয়ে এসেছিলে। আবার যদি কোনদিন আস-ও, তখন তো আর আমরা বেঁচে থাকবনা। দুতিন দিন না থাকলে সব কথাবার্তা বলা হয় ? মন ভরে ? ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে, আবার শীঘ্রই এসে কয়েকদিন থেকে যাব এই সব কথা বলে, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে চোখের জল মুছতে মুছতে শান্তিকে নিয়ে এসে গাড়িতে বসলাম। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখি চোখের জল সবাই মুছছেন !

এবার ফেরার পালা। আজ যত বাড়িতে গিয়েছি তারা সকলেই কিশোর-গঞ্জের, সকলেই অতি প্রিয় এবং আপনজন। সকলকে কথা দিতে হয়েছে, এমন কি শান্তিকেও যে আবার হাতে সময় নিয়ে এসে ২/১ দিন করে থেকে যাব। কিন্তু নিজের মন বলছিল, সে কি আর সম্ভব হবে ? শ্রীরামপুর থেকে হুগলি পর্যন্ত ঐ পাঁচটি বাড়িতে হয়তো এটাই আমার শেষ যাওয়া। এই বাড়িগুলোর ঐসব প্রিয়জনদের সঙ্গে হয়তো এটাই আমার শেষ সাক্ষাৎ। সুন্দর, মিষ্টি ও সোনার সেই কিশোরগঞ্জের ঐ আত্মীয় বা অনাত্মীয়, সুন্দর ও আন্তরিক আবেগে ভরা মানুষগুলির সঙ্গে আমার বন্ধনের হয়তো এটাই শেষ আলিঙ্গন। হে আমার স্বপ্নের কিশোরগঞ্জ তুমি ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছ, হারিয়ে যাচ্ছ ! দেশ হারিয়ে এপারে এসে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেশের যে মানুষগুলি ছিল, চিঠিপত্রে বা সাক্ষাৎ করে, দেশের যে ছিটেফোঁটা আনন্দটুকু মাঝে মাঝে পেতাম, মৃত্যু তো নির্দয়ের মতো একে একে তাও ছিনিয়ে নিচ্ছে। এরপরে আমার মতো পাপী দু-একজন যদি বেঁচে থাকি, তবে ঐ সামান্য আনন্দটুকু থেকেও তো বঞ্চিত হব ! তখন যাব কোথায় ? করব কি !

আজকের এই যাতায়াতের সঙ্গে আরও একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার জড়িয়ে ছিল। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের চাকুরি জীবনের বিশটা বছরই কেটেছে উত্তরপাড়া থেকে 'ব্যাণ্ডেল' পর্যন্ত যত কারখানা আর যত জিনিস কেন্দ্রীয় শুল্কের আওতায় ছিল, সে সব পরিদর্শন করা, বা অডিট করা বা এ সবার ওপর প্রিভেনটিভ কাজ করা। জি. টি. রোডের দুধারে অসংখ্য এই সব কারখানায় কতবার যে এসেছি তার সীমা সংখ্যা নেই। কতবার রেলে আর কতবার মোটর কারে বা জীপ গাড়িতে এসেছি তারও ইয়ত্তা নেই। এই বিশ বছরের মধ্যে শ্রীরামপুরে ছিলাম তিন বছর আর বাকি সতের বছর কলকাতা থেকে যাতায়াত করেছি। রেলে যাই আর মোটর গাড়িতে যাই, পথে শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে আমাদের তিনবছর বসবাস করা বহু স্মৃতি বিজড়িত সেই দোতলা সুন্দর বাড়িটা চোখে পড়বেই, গতকালও পড়েছিল। সদ্য দেশ ভাগের পরে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে কিশোরগঞ্জ এবং আমাদের হামছাদি গ্রামের কত লোক এই বাড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। গতকাল যাওয়ার ও ফেরার পথে এই সব কথাই মনে হয়ে কেমন জানি একটা আবেগ ও বিষাদের মিশ্রণ অনুভব করছিলাম। বাণীর জীবিতকালে সে-ও কয়েকবার আমার সঙ্গে এই পথে রেলে বা মোটর কারে যাতায়াত করেছে বা না করলেও আমি বাড়ি ফিরে গেলেই, অন্ততঃ শ্রীরামপুরের বাড়িটার কথা বাণী জিজ্ঞাসা করতই। এমন কি উত্তর ভারতের শেষ প্রান্ত থেকে কলকাতা ফিরে আসার পথে মেন লাইন দিয়ে ফিরতে হলেই শ্রীরামপুরে রেলের বগির দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা সেই দোতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আজ ফেরার পথে তাই বারবারই মনে হচ্ছিল যে টালিগঞ্জে ফিরে গেলেতো সেই দোতলা বাড়িটার কথা কেউ আজ আর জিজ্ঞাসা করবে না। রাত্রি প্রায় ৯টায় সত্যি সত্যি বাড়ি ফিরে এসে বাণীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে মনে মনে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কোন জবাব পেলাম না। আজ যাতায়াতের সারাটা পথ বাসনা মাসিমার সঙ্গে আর যে পাঁচটা বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁদের সকলের সঙ্গে শুধু 'বাণী বাণী, বাণী' করেই এলাম, আর বাণী ফটো হয়েই রইল।

আবার কিশোরগঞ্জের পুরানো কাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি। বাণী তখন বোধ হয় ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ে। কোনও কাজে বা ছুটিতে কিশোরগঞ্জে এসে জানতে পারি যে ওখানের মোটামুটি খ্যাত "বিবেকানন্দ পাঠাগার", খবরের কাগজে প্রচার করে সারা বাংলার স্কুলের ছাত্রীদের নিকট থেকে 'স্বামী

বিবেকানন্দের চোখে ভারতীয় নারী' বিষয়ের উপর একটি রচনা আহ্বান করেছে এবং এ বাবদ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেবার ঘোষণাও করেছে। উক্ত রচনা ঐ পাঠাগারে জমা দেবার তখনও দু'তিন দিন হাতে ছিল। বাণীকে হতবুদ্ধি বা Surprise দেবার জন্য, আমি তাড়াতাড়ি উক্ত বিষয়ে একটি রচনা লিখে বোন হেনাকে দিয়ে ভাল কাগজে কপি করিয়ে, বাণীর নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস ইত্যাদি সহ, হেনাকে দিয়েই সই করিয়ে একটি বন্ধ খামে আমার ছোট ভাইকে দিয়ে 'বিবেকানন্দ পাঠাগারে' দিই। বাণীর কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখি। আমি কিশোরগঞ্জে উপস্থিত থাকলে ও সময় পেলে ঐ পাঠাগারে এক আধ বার যেতাম, কারণ ওখানে আমার কয়েকজন বন্ধু এবং ফুটবলার সাথী ছিল। আমি তখন কিশোরগঞ্জেই আছি জেনে, ঐ রচনা পাঠ, বিচার-বিবেচনা ও পুরস্কার ঘোষণার অনুষ্ঠানে, পাঠাগারের ছেলেরা আমায় আমন্ত্রণ করলে, যথাদিনে বিকেল পাঁচটায় ওখানে পৌঁছে দেখি, কিশোরগঞ্জ কলেজের প্রিনসিপাল ডঃ ডি এল. দাস মহাশয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন। যে তিনটে রচনা বিবেচনার পর পুরস্কৃত হয়, ডঃ দাস মহাশয় বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে, পুরস্কৃত ছাত্রীদের নাম ও তাদের স্কুলের নাম ঠিকানা ঘোষণা করেন এবং অনুষ্ঠানে সেই তিনটি রচনা পঠিত হয়। প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল হুগলীর চুঁচুড়ার কোনও একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। দ্বিতীয় পুরস্কার কিশোরগঞ্জ গারলস্ স্কুলের অষ্টম কি নবম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী প্রতিমা বীর (বাণী), তৃতীয় পুরস্কারের কথা আজ আমার আর মনে নেই তবে বাইরের কোন স্কুলের ছাত্রী। আমাকে উপস্থিত দেখে বিবেকানন্দ-পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ, আমার উপর দায়িত্ব দেন যে দ্বিতীয় পুরস্কৃত ছাত্রীটি যখন আমার পরিচিতা এবং পাশেই থাকে, তখন আমি যেন এই খবরটা তাকে বা তার বাড়িতে জানাই যে আগামী কাল সকাল ৯টার মধ্যে পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ পুরস্কার নিয়ে বাণীকে অভিনন্দন জানাতে তাদের বাড়ি যাবেন। আমি প্রায় রাত দশটায় বাড়ি ফিরে, হেনাকে সব বলে শিখিয়ে রাখি যে, পরের দিন ভোর সাতটার মধ্যে হেনা যেন বাণীকে আমার নাম করে জানিয়ে রাখে যে বিবেকানন্দ পাঠাগারের লোকেরা একটা বিশেষ প্রয়োজনে ওদের বাড়িতে, বিশেষ করে বাণীর কাছে আসবে, সে যেন অবশ্যই ১০টা পর্যন্ত বাড়ি থাকে। 'সারপ্রাইজ' দেবার লোভে আসল ব্যাপারটা আমি তখনও প্রকাশ করিনি। এদিকে ঐ রচনা প্রতিযোগিতার কথা হয় বাণী জানতো না বা জানলেও ভুলে গিয়েছিল। পরের দিন সকাল ৯টার মধ্যেই

পাঠাগারের লোকেরা ওদের বাইরের দিকে দালানের বারান্দায় উঠে, বাণীর খোঁজ করলে, তার মা, কাকিমা ও বাণী নিজে এক সঙ্গে বার হয়ে এলো। পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ একটি বড় রুপোর মেডেল ও অভিনন্দন পত্র বার করে, পুরস্কৃত ছাত্রীদের বিবরণ দিয়ে, ঐ মেডেল ও অভিনন্দন পত্র বাণীর হাতে তুলে দেন। বাণীর মা ও কাকিমা বাণীকে জিজ্ঞাসা করেন—তুই যে রচনা পাঠিয়েছিস, আমরাতো কই কিছুই জানিনা। বাণী এর মধ্যেই ব্যাপারটা আঁচ বা অনুমান করে নিয়ে জবাব দেয়, তাড়াতাড়ি একটা রচনা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, পুরস্কার পাব আশা করিনি, তাই কাউকে কিছু বলিনি। কিশোরগঞ্জ একটা ছোট শহর, প্রায় সবাই সবাইকে মোটামুটি চেনে। বাণীদের সামনের পুকুর পাড়ের চারদিকের বাড়ির প্রায় সকলেই বিবেকানন্দ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষের লোকেদের দল বেঁধে বাণীদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখেছে। কি ব্যাপার এ কৌতূহল সবারই মনে। কাজেই সেদিন ঐ সকালে ওদের বাড়িতে ভীড় বাড়তে বাড়তে উৎসবের রূপ নিল। বাণীদের কাছাকাছি থাকে এমন আত্মীয়েরা, পারিবারিক বন্ধুরা ও তার নিজের বন্ধুরাও এলো। একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। মাসিমা (বাণীর মা) স্বাভাবিক ভাবেই খুব উল্লসিত। উনি এক ফাঁকে আমাদের বাড়িতে এসে আমার মাকেও খবরটা দিয়ে গেলেন। আমি, আমাদের বৈঠকখানার জানলা দরজা বন্ধ করে চা খাচ্ছি। বাসার সকলকেই বলা আছে, কেউ ডাকলে বলে দেবে আমি বাড়ি নেই। পাঠাগারের লোকেরা বাণীদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে আমার খোঁজ করেছিল। তারাও জেনে গেছে আমি বাড়ি নেই। ইতিমধ্যে হেনা মাকে সব বলে দিয়েছে। মা একবার নিজের নাম বলে বৈঠকখানার দরজা খুলিয়ে মৃদু হেসে আমাকে বলে গেছেন, তুই একটা ছেলে বটে, পারিসনা হেন কাজ নেই। বাণীর পুরস্কার পাবার খবরটা তার স্কুলেও রটে গেলে, সেখানেও শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষক ও স্কুলের ছাত্রীদের নিকট আন্তরিক উৎসাহ ও অভিনন্দন পেল। আমার উপস্থিতি বাণীদের বাড়ির লোক জানত। সুতরাং আমার সঙ্গে তার সাক্ষাতের কোন আশাই ছিল না। হয়তো তার মা'র আনন্দের জন্য কোন সুযোগ ঘটে গিয়েছিল বলে, এক মিনিটের জন্য বাণী আমার ঘরে এসে ঝুপ করে আমায় একটা প্রণাম করে, এবং হুট করে, 'আমি এমন মিথ্যে নাম করতে চাইনে' বলে, ছুটে চলে গেল। আমি একটা কথা বলারও সুযোগ পেলাম না। বুঝলাম খুব ঝুঁকি নিয়ে এসেছে। এরপরে একদিন একটু হাতে সময় নিয়ে দেখা করতে এসে নিজের থেকেই বলল, "সেদিন

আমি মিথ্যে নাম করা নিয়ে যা বলেছিলাম, সে কথা উঠিয়ে নিচ্ছি, তুমি কিছু মনে করো না।" মনে হলো পাগল আর কাকে বলে!

এই ঘটনার দু বছরের মধ্যে, আমি হঠাৎ শিলচর থেকে বা অন্য কোথাও থেকে কিশোরগঞ্জে এসে, "নিশা-কুমুদ"-এর ঘরে স্থান নিয়েছি। বাণী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রথমেই বলল, "তোমাকে একটু কষ্ট দেব। আমাদের স্কুলে এবার পঁচিশে বৈশাখে খুব বড় করে রবীন্দ্র জয়ন্তী করা হবে। বড়দিদিমণি (Head-Teacher) আমাকে রবীন্দ্রনাথের উপরে একটা রচনা লিখতে দিয়েছেন, আমার ওজর-আপত্তি কিছুতেই মানলেন না। বললেন, তুমি তো আরও ছোট থাকতেই স্বামী বিবেকানন্দের উপরে রচনা লিখে, ছাত্রীদের মধ্যে সারা বাংলার প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছিলে, তবে রবি ঠাকুরের উপর লিখতে পারবে না কেন? আমি নিজেই যা পারি লিখে দিতাম, কিন্তু কোন কোনও শিক্ষয়িত্রীরাও লিখবেন। তাছাড়া শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য আনা হচ্ছে। এদিকে সময়ও খুব কম, তুমি লিখে দিলে, সেটা আবার আমার হাতে লিখে কাল বাদ পরশু বড়দিদিমণির কাছে জমা দিতে হবে। স্কুল কমিটি সবার লেখা পড়ে, তিনটে উপযুক্ত রচনা মাত্র অনুষ্ঠানে পড়তে দেবে।" রচনার আয়তনও কত পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া চাই তাও স্থির করে দেয়া হয়েছিল। বাণী চলে গেলে, আমি ঠিক করলাম, রচনা আজ রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে। কিন্তু কিসের উপর লিখব! অনেকেই রবি ঠাকুরের উপর মামুলী বিষয় নিয়ে লিখতো। ওগুলো আমার কাছে বড় বেশি একঘেয়ে লাগতো। আমি ভাবছিলাম নূতন কিছু লেখা চাই, কিন্তু বিষয়টা কি হবে! বেশ কিছুক্ষণ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কিছুদিন পূর্বে মিসেস রাথবোন নামে একজন ব্রিটিশ এম্. পি. তৎকালীন কংগ্রেস রাজনীতিকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতিকে আক্রমণ করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে উপলক্ষ করে, প্রেসে বিরাট একখানা চিঠি লিখেছিলেন। জওহরলাল নেহরু তখন ভারতের কোন জেলে আবদ্ধ। সেই চিঠি পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে না পেরে, তার উপযুক্ত জবাব তিনিও এই কথা বলে প্রেসে দিয়েছিলেন যে "যাকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি (রাথবোনের) লেখা হয়েছে, তিনি এখন জেলে আছেন বলে, তাঁর হয়ে ঐ চিঠির উত্তর দেয়া আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।" আজ এই ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছর পরে সেই চিঠির বিষয় এখন আর সঠিকভাবে মনে পড়ছে না যদিও, তবু এইটুকু মনে আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

সম্বন্ধে মিত্র শক্তির নিন্দনীয় কাজ-কারবারের কঠিন সমালোচনা ছিল কবিগুরুর ঐ চিঠির জবাবে। ঐ সময়ে মিত্র শক্তি এবং পাশ্চাত্য দেশগুলো সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর ঐ জবাবী চিঠিতে। তখন রাজনীতি নিয়ে খুব পড়াশুনো এবং আলাপ-আলোচনা করতাম বলে, মিসেস রাথবোনের চিঠি ও কবিগুরুর জবাব খুব ভালভাবেই মনে ছিল। ওটাই বাণীর রচনার বিষয় হবে বলে ঠিক করলাম। খেয়ে দেয়ে বাসার লোকেদের অবসর করে দিয়ে রাত্রি সাড়ে দশটায় দুটো হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে, মশারি টাঙ্গিয়ে, খাটের উপর লিখতে বসে রচনাটি যখন শেষ করলাম, তখন রাত তিনটে। মশারির বাইরে এসে, এক গ্লাস জল খেয়ে আর কিছুটা জল চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে, মিনিট দশ-পনের একটু বিশ্রাম করে, রচনাটা পুনঃ পরীক্ষা ও স্থানে স্থানে সংশোধন করে যখন কাজটা শেষ করলাম, তখন ঊষার আলো জানলা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে। লণ্ঠন নিভিয়ে, মশারি তুলে ফেলে, অন্য ঘর থেকে বোন হেনাকে ডেকে তুলে একটা বড় খামে রচনাটি ভরে যত শীঘ্র সম্ভব গোপনে বাণীর হাতে পৌঁছে দিতে বললাম। আর অন্যদিকে একটি ভৃত্যকে বড় কাপে ভাল এক কাপ চা করে দিতে এবং বেলা দশটার পূর্বে, আমাকে ডাকাডাকি না করতে বলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

দুদিন পরে খবর পেলাম যে বাণী তার রচনা জমা দিয়েছে। দুজন শিক্ষয়িত্রী ও বাণীর রচনা পঠিত হবে বলে স্কুল কমিটি মনোনীত করেছেন। সেদিনই আমার কিশোরগঞ্জ থেকে চলে যাবার কথা। কিন্তু বাণী অনুরোধ করল সেদিন বেলা পাঁচটায় তাদের স্কুলের রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান দেখে পরের দিন যেতে। আমার আত্মসম্মান জ্ঞান ছোটবেলা থেকেই খুব টনটনে ছিল বলে, মেয়েদের স্কুলে বিনা নিমন্ত্রণে আমি যেতে রাজি না হওয়ায়, বেলা একটার মধ্যে তার সহপাঠিদের সই করা একটা হাতে লেখা নিমন্ত্রণ চিঠি বাণী আমার হাতে দিয়ে, খুব অনুনয়-বিনয় করে তাদের অনুষ্ঠানে যেতে বলে গেল।

একটু সঙ্কুচিত মনেই বেলা পাঁচটায় বাণীদের স্কুলে গেলাম। সঙ্কোচ এই জন্যে যে শহরের সবাই আমাকে চেনে আর সাধারণ ভাবে ওখানে আমার নিমন্ত্রিত হবার কারণ নেই। অনুষ্ঠানের হল ঘরে যেয়ে দেখি ডায়াসে বা মঞ্চে সব ভি. আই. পি.রা বসে আছেন, তার মধ্যে বাণীর বাবাও আছেন। উনি যাতে আমায় দেখতে না পান, সেজন্য হলের পেছন দিকে, সুমুখে কোন একজন দীর্ঘ শরীরের মানুষকে আড়াল করে, তার পেছনের একটা চেয়ারে আমি বসলাম।

এত বছর পরে, আমার স্মরণ শক্তি সঠিক কাজ না-ও করতে পারে, তবে মনে হয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতীমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়কেই একটু পরে স্কুল কমিটি মঞ্চে এনে, সভাপতির আসনে বসিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে. আমার নিমন্ত্রণকারী ছাত্রীরা আমাকে ঠিক দেখে নিয়েছে এবং বাণীর কানেও কথাটা পেঁছে দিয়েছে। কিন্তু একবারের জন্যও বাণী পেছনে তাকায়নি বা কোনও রকমের চঞ্চলতা প্রকাশ করেনি। বাণীর বাবাও আমায় দেখতে পাননি।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। কয়েকজন গায়ক-গায়িকা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। আমার বোন হেনাও গাইল। তারপর আরম্ভ হল রচনা পাঠ। প্রথম দুজন শিক্ষয়িত্রী তাঁদের রচনা পাঠ করলেন। সর্বশেষে বাণীর ডাক পড়ল। বাণী বেশ স্মারটলি তার রচনা গলগল করে পড়ে গেল এবং হল ভর্তি করতালিও পেল। এবার সভাপতি মহাশয় ভাষণ দিতে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। তারপরই বললেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজ তিনটে বেশ সুন্দর রচনা শুনলাম। কিন্তু ছোট্ট একটি মেয়ে. রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে একটা নূতন দিক্দর্শন তুলে ধরেছে, যেটা শুধু আমার ভালই লাগেনি, খুব সময়োচিত হয়েছে বলে বিস্মিত হয়েছি এই ভেবে যে সুদূর এই মফঃস্বল শহরে থেকেও মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে শুধু লক্ষ্যই করেনি. হৃদয়ঙ্গমও করেছে। এই বলে উনি স্কুল কমিটিকে অনুরোধ করে বাণীকে মঞ্চে তুলে নিয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "মা তুমি আজ আমাকে সত্যি বড় আনন্দ দিলে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী আরও প্রসার লাভ করুক।" বাণী শাস্ত্রী মশাইকে প্রণাম করে নিজের স্থানে ফিরে গেল। উক্ত কথাগুলো আমার ভাষায় লিখলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিটি কথাতো আমার আজ আর মনে নেই, তবে ভাব ও বিষয়টা মনে আছে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। সকলের আগেই একেবারে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছি। কিন্তু বাড়ি পেঁছুবার সামান্য পূর্বে, লোন (Loan) আপিস নামে একটি দালান বাড়ির নিকটে বাণী এসে আমায় ধরে ফেলল এবং আলোহীন রাস্তার অন্ধকারে আমাকে টুক্ করে একটা প্রণাম করে বলল, "তোমার আজকের অবদান আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না।" তারপরই আমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে উল্টোদিকে রাস্তার অন্ধকারে নিজের বাড়ির দিকে বা সঙ্গী-সহপাঠীদের কাছে বোধ হয় চলে গেল।

যাক্ আবার মূল কাহিনীতে ফিরে এসে এটাই বলতে চাই যে এই রকম কষ্টসাধ্য লুকোচুরির মধ্য দিয়েই আমাদের দিন কাটছিল, কিন্তু এই লুকোচুরিও মাঝে মাঝে বাণীর মা বা ঐ বাড়ির, আমাদের সহযোগী নয়, এমন কারুর নজরে পড়লেই, বাণীকে অত্যাচারিত হতে হত আর দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি দেখা দিত। ১৯৪৪ সালে, আমি চাকুরি পাবার পর থেকেই বাণীকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে তোমার পরিবার যখন কিছুতেই আমাদের বিয়েতে রাজি হবে না, তখন আর পড়ে থেকে, এতো অত্যাচারিত হচ্ছ কেন, চল এবার আমাদের পথ দেখি। বাণী শুধু বলত, এতো অধৈর্য হয়ো না, আরও কিছুদিন আমাকে দেখতে দাও। বুঝতাম, তার তখনও বিশ্বাস ছিল যে শেষ পর্যন্ত তার বাবা তার এ বিয়েতে রাজি হবেন। সেটাই তার এই বিলম্ব করার কারণ। একটা মানুষের প্রকৃতি তো বিভিন্ন মানুষের প্রতি বিভিন্ন রকমের হয় না। আমার প্রতি বাণীর যেমন অকৃত্রিম এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল, ছিল তার সততা ও সরলতা, তার পিতার প্রতিও তার মনোভাব ছিল একই প্রকার। তাই একেবারে শেষ পর্যন্ত না দেখে, বাণী এমন কিছু করতে চায়নি, যাতে তার পিতা তার জন্য মনে কোন আঘাত পান বা সমাজে তাঁর মুখ ছোট হয়। অথচ এর জন্য নিজে কি কষ্টটাই না করেছে, যে দুঃখ কষ্টের বর্ণনায় বুঝি পাথরও গলে যাবে। আমার তো মনে হয়, এটাও পিতার প্রতি কন্যার একটা মহত্ত্বের পরিচয়। জানি না, বাণীর মনের এই মহান গুণগুলি, তাদের বা আমাদের পরিবারের ক'জন উপলব্ধি করতে পেরেছে বা মূল্য দিয়েছে!

যা হোক, শিলচর থেকে সুরমা মেলে কিশোরগঞ্জে রাত্রি দেড়টা বা দুটোয় আমাদের বাসায় পৌঁছে, নিশা-কুমুদের ঘরে দু' একদিন লুকিয়ে থেকে বাণীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাটাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। পূর্বেই লিখেছি যে একটা রাজনৈতিক দল চেয়েছিল যে আমি যেন বি এ. পাশ করে তখুনি চাকুরি না নিয়ে, তাদের খরচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ. এবং আইন পড়তে পড়তে, ওখানে ওদের দলের জন্য একটা Nucleus তৈরি করার দায়িত্ব নিই। কিন্তু আমি তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চাকুরি নিয়ে শিলচরে চলে যাওয়ায়, তারা আমার উপর ভয়ানক চটে যায়। অন্যদিকে আবার কিশোরগঞ্জে তারা বাণী এবং তার দুই ভাইকে তাদের দলের সভ্য করে নেয়। তারপর এক ঢিলে দুই পাখি মারার একটা ছক তৈরি করে। যে কোন উপায়ে, আমার ও বাণীর মেলামেশা বন্ধ করে আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া, আর ওদের দলের

কিশোরগঞ্জের কলেজের প্রফেসরকে বিনা খরচে বাণীকে পড়ানোর সুযোগ নিয়ে, তাদের মধ্যে একটা প্রেম-ভালবাসা উদ্রেক করে, দলের মেয়েকে দলের সভ্যের সঙ্গেই বিয়ে করিয়ে দেয়া। ঐ দলে, তখন কিশোরগঞ্জের আমার খুব অন্তরঙ্গ কয়েকজন ছিল যারা খুব গোপনে, তাদের এইসব সলাপরামর্শ আমাকে সবই জানিয়ে দিত। অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও, একথা না বলে পারছি না যে, ঐ দলে সারা ভারতে কিছু কিছু উচ্চস্তরের নেতা থাকলেও, কিশোরগঞ্জের গ্রুপটা যারা চালাতো, তাদের মধ্যে চার পাঁচজন বাদ দিলে আর সবাই ছিল, বাপের হোটেলে ভাত খেয়ে শখের রাজনীতি করার ছেলে। তখন ঐ দলের রাজনীতিতে জেলখাটা বা পুলিশের মার খাবার কোন ভয় ছিল না। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির মতো কাজের দায়িত্ব বা নিয়মানুবর্তিতা ছিল না। যার যখন খুশি সভ্যদের এর তার বাড়িতে বসে শখের রাজনীতির বড় বড় কথা বলা, সর্ব সময়ের কর্মী সেজে মাসোহারা নেয়া আর সুযোগ সুবিধে মতো মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা। দু' একজন এমন লম্পটও ছিল যে বাপকে দড়ি দিয়ে তক্তপোশের সঙ্গে বেঁধে কোমর থেকে জোর করে চাবি কেড়ে নিয়ে সিন্দুক খুলে, পেতলের থালা বাসন বার করে বাজারে বিক্রী করে সেই টাকা স্থানীয় কুপাড়ায় গিয়ে খরচ করা। এরা এতই অলস ছিল যে কোনও রকমের ব্যবসা বা চাকুরি করতে রাজি ছিল না। ভাগ্যের জোরে প্রায় প্রত্যেকেরই বাপের হোটেলে খাবার মত অবস্থা ছিল, ব্যস্ তাতেই খুশি। বার চোদ্দ ঘণ্টা আড্ডা মারো আর শখের রাজনীতির বড় বড় বুলি কপচাও। আর কপচাবার সুযোগও ছিল কমরেড্ এম এন. রায়ের পাক্ষিক পত্রিকা Independent India. মাসে দুবার এই কাগজটা বার হত। কমরেড রায় নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম অভিজ্ঞতা দিয়ে ঐ কাগজে এমন সব article লিখতেন যে C. P. I.-এর স্থানীয় নেতাদের ঐ সব article থেকে প্রশ্ন করলে সব সময় সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যেত না। কিশোরগঞ্জের ঐ দলের 'পি, পু,-ফি, শু'* সভ্যদের ওগুলোই ছিল Capital. ঐগুলো নিজেদের জুনিয়ার মেম্বারদের কাছে কপচিয়ে বাজিমাত করতো। আর

* পি, পু, ফি, শু ঃ—দুজন চরম অলস মানুষের গল্প। এক বিছানায় দুজন শুয়ে আছে। বিছানায় আগুন লেগে একজনের পিঠ পুড়ছে। সে পিঠ পুড়ছে না বলে বলছে 'পি, পু'। অন্যজন, ফিরে শো না বলে বলছে 'ফি, শু'।

এরমধ্যে যারা মাসোহারা পাবার সুযোগ করে নিয়েছিল, তাদের আর পায় কে? বাপের হোটেলে বিনা পয়সায় খাওয়া আর দলের মাসোহারায় পান, সিগারেট, রেষ্টুরেন্ট আর সিনেমাটাও চলে যেত। আমি মোটামুটি পড়াশুনো করেছি, এই সত্তর বছর বয়সেও অল্প-অল্প পড়ি, কিন্তু সারা ভারতে বা পৃথিবীতে, কিশোরগঞ্জের ঐ গ্রুপের মতো রাজনৈতিক দল দেখিনি, কোথাও আছে বা ছিল বলেও শুনিনি। এই দলের অনেকে "Independent India" পাক্ষিক পত্রিকার বাৎসরিক টাকা নিয়ে, দলের ছাপানো পাকা রসিদ দিয়ে, 'Independent India' না দিয়ে ঐ টাকা আত্মসাৎ করে ফেলতো। কিন্তু ঐ রসিদের নকল দিয়ে Registered A/D ডাকে State Party HQS. কলকাতা এবং দেরাদুনে কমরেড রায়ের কাছে নালিশ পাঠালেও কোন জবাব পাওয়া যেত না, অনুসন্ধান তো দূরের কথা। এসব কথা আজ আবার এত বছর পরে মনে করে, এখনো আমার British-India Govt. এর সেই 'তের হাজার টাকাকে' নমস্কার জানাতে ইচ্ছা করে। সত্যি-ই একটা জাত বটে।

যাহোক, ওদের প্রফেসরের বিনা পয়সার টিউয়িশান বাণীর অভিভাবকরা গ্রহণ করলেন না। কিন্তু যেদিনই রাত একটা বা দুটোয় কিশোরগঞ্জ স্টেশনে নেমে, রাতের অন্ধকারে রিকশায় আমি বাসায় যেয়ে সকলের অলক্ষ্যে নিশা-কুমুদের ঘরে আশ্রয় নিতাম, তার কয়েক ঘণ্টা পর-ই বেলা আটটা-নটার মধ্যে ঐ দলের কিছু সভ্য বাণীদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেশ জোরে বা প্রায় চীৎকার করে, ঐ বাড়ির লোকেদের শুনিয়ে, একজন অন্যজনকে বলতো, "এই শোন্, কাল রাতের সুরমা মেলে তো মানিক এসেছে, কাজেই তার সঙ্গে ঐ কাজটা সেরে নে, নয়তো আবার কবে আসবে কে জানে," ইত্যাদি উপায়ে, কিশোরগঞ্জে আমার উপস্থিতিটা যেমন করেই হোক বাণীদের বাড়িতে প্রচার করে দিত, আর সঙ্গে সঙ্গে-ই বাণী স্কুল যাতায়াত ছাড়া, তৎকালীন বিপ্লবীদের মতো 'Home-interned' হয়ে যেত। সি. পি. আই-এর কিশোরগঞ্জের নেতা পূর্বে উল্লিখিত কমরেড ওয়ালিনোয়াজের কাছে আমার ও বাণীর সকল কথা বলে, আমি সুরমা মেলে গভীর রাতে কিশোরগঞ্জে নামলেই, সেই রাজনৈতিক দলের লোকেরা সেটা কি করে জেনে ফেলতো ইত্যাদি ব্যাপারটা তাঁকে নিজের ছেলেদের

দিয়ে অনুসন্ধান করতে বলে দু একদিন পরই জানতে পারি যে কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশানের চা-এর স্টলওয়ালাকে হাত করে, ঐ দলের লোকেরা সুরমা মেলে আমার যাতায়াতের খবরটা পায়। ঐ স্টলওয়ালাকে খুব সাবধান করে দিয়ে. তার সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেও, ওয়ালিনোয়াজ কিশোরগঞ্জে আমার রাতের চলাফেরা কমিয়ে দিতে বলেন এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি ফলার সুন্দর একটা ছুরি খাপশুদ্ধ আমার হাতে দিয়ে বলেন এটা সব সময় সঙ্গে রাখবি। চা-স্টলওয়ালা ঐ ব্যাপারে সরে গেলেও, আবার কোন কুলি-মজুরকে ঐ দল টাকা দিয়ে হাত করে আমার যাতায়াতের খবর নেয়, এই অবস্থায় এরপর থেকে ঐ গভীর রাতে সুরমা মেলে আমি গাড়ি থেকে প্ল্যাটফরমের উল্টোদিকের অন্ধকারে নেমে, মাথায় একটা মুসলমানি টুপি পরে, রেল লাইন বরাবর অনেকটা এগিয়ে যেয়ে বাঁ হাতে গ্রামের পথ এবং কিছুটা চাষের জমির "আল" ধরে, বাঁ হাতে টর্চ লাইট ও ডান হাতে ওয়ালিনোয়াজের দেয়া সেই খোলা ছুরি হাতে কিশোরগঞ্জের বাড়িতে এসে পেঁছুতাম সকলের অলক্ষ্যে, আর তারপর আবার সেই 'নিশা-কুমুদের ঘর।'

ঐ তথাকথিত রাজনৈতিক দলটা সব পথ হারিয়ে এবার ক্ষেপে গেল। তারপর যে কাজটা করল, সেটা করার মতো সাহস তাদের কারুরই ছিল না, কিন্তু কার নিকট থেকে সাহস পেয়ে তারা এটা করেছিল, সেটা আজও আমি জানতে পারিনি। তখন শীতকাল। কিশোরগঞ্জে এসে, নিশা-কুমুদের ঘরে দু এক দিন থেকে, আমি শহরে বার হয়েছি। বিকেলে, একটি নিরীহ মতন ছেলে আমায় খবর দিল যে, ওমুকের বাড়িতে রাত আটটার সময় ওমুক ওমুক লোকেরা আপনাকে অনুরোধ করে যেতে বলেছে এই জন্যে যে তাদের সঙ্গে নাকি আপনার অনেক কিছুর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে. এজন্য তারা খুবই অনুতপ্ত। তাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা এটা একান্তই মিটিয়ে ফেলতে চায়। যদিও ওটা একটা ভূঁইফোঁড় রাজনৈতিক দল ছিল, তবুও ওভাবে ঐ নির্দিষ্ট বাড়িতে আমার পক্ষে যাবার একটা ঝুঁকিতো ছিলই, তবুও আমি সেখানে যেয়ে একটা এস্পার-ওস্পার করা মনস্থ করলাম। ওভারকোট গায়ে দিয়ে, তার ডান দিকের পকেটে খোলা সেই ছুরিখানা হাতে ধরে, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ পরে ঠিক রাত্রি আট্টার সময় সেই বাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঐ বাড়িতে তখন ঐ দলের একজন লম্পট যুবক একলাই থাকতো. পরিবারের আর সকলেই থাকতো কলকাতায়। তার নাম ধরে ডাকলে, মাথায় একটা পট্‌কা বাঁধা অবস্থায় দরজা

খুলে এসে বেশ সুন্দর ভদ্র ও হাসি মুখে 'এসো', বলে আমায় নিয়ে সে ঘরে ঢুকে ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে দিল এবং অন্য একজন প্রজ্বলিত হ্যারিকেন লণ্ঠনটার আলো কমিয়ে দিল। আমি দেখলাম জোড়া তক্তপোশের ফরাশে সাত-আটজন মানুষ শীতের পোশাকে আর মাথায় পট্‌কা বেঁধে এমন করে বসে আছে যে কাউকেই চিনবার উপায় নেই। আমি ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই গলার আওয়াজ বিকৃত করে একজন আমায় বলল, "আজ রাতের সুরমা মেলেই তুমি শিলচর ফিরে যাও। আর কোনদিন কিশোরগঞ্জে আসবে না, আসলে তোমার বাবা-মা তোমার লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখবে।" ঐ ঘরে আমার প্রবেশের বোধহয় এক মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে কি হয়নি, ঐ লম্পট যুবকটি দরজায় খিল দিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। আমি ডান হাতে ছুরিটা বার করে ঐ লম্পটটার দিকে এগিয়ে যেতেই সে এক লাফে অন্য দিকে সরে গেল। আমি দরজার খিলটা খুলে ফেলে একপা দরজার বাইরে ও একপা ভেতরে রেখে হাতে ছুরি উঁচিয়ে ধরে বললাম, "আমি কোন শালার হুকুম মানিনা, আয়! আমার সঙ্গে কে লড়বি আয়।" ঐ সাত-আট জনই তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, কেউ এগুচ্ছেও না, কথাও বলছে না। আমি মিনিট খানেক অপেক্ষা করে, 'সব মেয়েছেলের দল', ইত্যাদি আরও গালাগালি করে ঐ ঘর থেকে বার হয়ে সোজা বাড়ি চলে এলাম।

বাড়ি এসেই মাকে বললাম, "আমি একটু 'বয়লা' গ্রামে যাচ্ছি, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমার শোবার ঘরের টেবিলে রাতের খাবার রেখে দিও।" শীতের রাত্রির সাড়ে নটায় ঐ পোশাকে একটা সাইকেলে চেপে শহর সংলগ্ন ওয়ালিনোয়াজের বাড়ি 'বয়লা' গ্রামে যেয়ে জানলাম, বিশেষ কাজে তিনি মাইল তিন দূরে 'দিঘীর-পাড়' গ্রামে গেছেন, সেদিন না-ও ফিরতে পারেন। স্কুল জীবনে একসময় দিঘীর-পাড় বেড়াতে কি ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম, পথটা আমার জানা ছিল। অপেক্ষা না করে ঐ গ্রামের দিকেই সাইকেলে রওনা হলাম। কাঁচা মাটির রাস্তা, সাধারণত গরুর গাড়ি চলে। দুদিকে শুধু চাষের জমি, মাঝে মাঝে একটি কি দুটি কৃষকের কুঁড়ে ঘর। মাঝ পথে একটা ছোট খালের উপর রেলিংহীন একটা কাঠের পুল ছিল মনে আছে। উত্তেজনায় সাইকেল খুব জোরেই চালিয়েছি। পথ জন-মানবহীন অন্ধকার। আকাশের তারার ক্ষীণ আলোতে অনুমান করে পথ চলেছি। পথের ঐ পুলটার উপরে উঠেই মনে হল নিচের খালে পড়ে যাচ্ছি। একটা হেঁচ্‌কা টানে সাইকেল থেকে নিজেকে আলাদা করে নিচের কাদামাটিতে

যেয়ে পড়লাম, সাইকেলটাও পাশেই পড়ল। সেই অবস্থায় ভাবছি, কি করে পড়লাম, আমার হাত-পা কিছু ভেঙ্গেছে কিনা। খালে জল ছিল না কিন্তু কাদা ছিল। অনুমান সাত কি আট ফিট্ নিচে আমি পড়েছি। অথচ হাত-পা কিছু ভাঙ্গেনি। জুতো, ট্রাউজার, ওভারকোট কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। ওভারকোটের পকেটে খাপে ভরা সেই বড় ছুরিটা তেমনি আছে, আমার পেটে বা শরীরের কোথাও ঢোকেনি। পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে চারদিকের অবস্থাটা দেখে নিয়ে নিচে দিয়েই খালটা, সাইকেল উঁচু করে হাতে নিয়ে, হেঁটে যেয়ে ওপারে উঠলাম। তারপর রুমাল ও আশেপাশে পাওয়া শুকনো গাছের পাতা দিয়ে জামাকাপড় ও সাইকেলটাও মুছে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম সেটাও চালু আছে। জানিনা, মৃত্যু বা বড় রকমের একটা দুর্ঘটনা থেকে সেদিন কে আমাকে রক্ষা করেছিল। ফেরার পথে সঙ্গে টর্চলাইট ছিল। সেটা জ্বালিয়ে দেখেছিলাম ঐ পুলটা মাঝখানে ভেঙ্গে অনেকটা 'হাঁ' হয়ে আছে। আর সামান্য রাস্তা সাইকেলে যেয়ে দীঘিরপাড়ের নির্দিষ্ট বাড়িতে যখন পেঁছিলাম তখন প্রায় রাত্রি বারটা বাজে। ওয়ালিনোয়াজ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঐ বাড়ির লোক বিনোদ দে তাকে ডেকে তুলে আমার খবর দিলো। ঘুম থেকে উঠে আমার কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে, তাঁর মুখের অবস্থা এমন হয়েছিল যে ঐ অবস্থায় তিনি খুন করতে পারেন। বিনোদ দে আমার পরিচিত। অত্যন্ত সাহসী, ছোটখাটো একটি ভদ্র গোছের ডাকাত বলা চলে। তাঁরা দুজনেই আমায় বললেন রাত্রিটা ঐ বাড়িতে থেকে যেতে, সকালে তিনজন-ই কিশোরগঞ্জে ফিরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করা হবে। মা আমার জন্য সারারাত বসে থাকবেন, অথবা রাতেই হয়তো বাসার কোনও ভৃত্যকে আমার খোঁজে বয়লা গ্রামে পাঠাবেন জেনে, ওয়ালিনোয়াজ আমাকে একা না ছেড়ে, আমার সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে বসেই কিশোরগঞ্জে ফিরে আসতে রাজি হলেন আর বিনোদ দেকে ভোরবেলায় তার বাড়িতে যেয়ে চা খেতে বললেন। ঐ বাড়ি থেকে একটা টর্চলাইট নিয়ে ওয়ালিনোয়াজকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে, তাঁকে বয়লার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত্রি প্রায় তিনটে। মা তাঁর ঘর থেকেই আমার ঘর খোলার আওয়াজ পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন, আমি ফিরে এসেছি কিনা। তখন আর রাতের খাবার খেতে ইচ্ছে করছিল না, তাই এক গেলাস জল খেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন পূর্ব ব্যবস্থামত সকাল ৯টায় ওয়ালিনোয়াজের প্রেসে গেলাম,

নিউটাউনের স্টেশন রোডে। তাঁর দীঘিরপাড়ের বন্ধু বিনোদ দে ও অন্য কিছু ছেলে ওখানে উপস্থিত ছিল। দুজন করে একেক দলে পাঠানো হলো, ঐ দলের সেই সাত-আটজনকে ধরে আনতে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত খোঁজ খবর করে দেখা গেল, তারা হয় শহর ছেড়ে পালিয়েছে নয়তো গা ঢাকা দিয়েছে। আরও দুদিন অপেক্ষা করেও তাদের কারুর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। ওয়ালিনোয়াজ আমায় বললেন, তোর ছুটি ফুরিয়ে যেয়ে থাকলে তুই শিলচর চলে যা, আমিতো রইলাম, যা ব্যবস্থা করার আমি করব, ওরা পালিয়ে থাকবে আর কদিন! ছুটি সত্যি-ই আমার ছিল না, স্টেশন লিভ্ করার অনুমতিও ছিল না। সেদিন ঐ পুলের দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যু হলে তো হতোই, কিন্তু হাত-পা ভেঙ্গে হাসপাতালে গেলে বা ঐ লম্পটের বাড়িতে সেই রাতে ছুরি চালিয়ে কোনও ফৌজদারি মামলায় ফেঁসে গেলে আমার চাকুরিই চলে যেত, হয়তো আমার জীবনের গতি অন্য খাতে বইতো। শুধু এবারই নয়, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ এর ১লা আগষ্ট পর্যন্ত এই রকম ঝুঁকি নিয়ে কতবার যে কিশোরগঞ্জে এসেছি এবং কতবার যে ফৌজদারি মামলায় ফেঁসে যেতে যেতে বেঁচে গেছি, আজ তার হিসাব দিতে পারব না। আমি শিলচর চলে যাবার কিছু দিন পর, ঐ তথাকথিত রাজনৈতিক দলের কয়েকজন ভুইফোঁড় নেতাকে শহরে পেয়ে, তাদের ডাকিয়ে তাঁর প্রেসে নিয়ে, তাঁর ঐ আগুনের গোলার মতো খুনে মুখে, ওয়ালিনোয়াজ বলেছিলেন, রাজনীতি করতে চাও করো, কোনও বাধা পাবে না, আর যদি গুণ্ডামি করো, তবে মনে রেখো গুণ্ডার বাবা এখানে বসে আছে। মানিকের ব্যাপার দেখনেন তার বাবা আর বাণীর ব্যাপার দেখবেন প্রফুল্লদা, তোমরা এর মধ্যে নাক গলাতে যেও না, নাক ভোঁতা হয়ে যাবে। কেউ নাকি, নাঁকি নাঁকি সুরে বলেছিলো, বাণীর বাবার যদি এ বিয়েতে অমত থাকে? ওয়ালিনোয়াজ চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে ঐ বক্তার সার্টের কলার টেনে ধরে বলেছিলেন, সেকথা বলার তুমি কে? মানিক এবং বাণী যদি সাবালক এবং সাবালিকা হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বিয়ে হবেই এবং এই শহরেই হবে। তারপর সার্টের কলার ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, যাও ভাগো, আর একটি কথাও নয়। অন্য ভেরুয়ারা তখন ঐ বক্তাকে টেনে নিয়ে প্রেস থেকে বার হয়ে আসে।

বাণী ও তার দুই ভাই ছিল সৎ, সরল ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবতী ও নিষ্ঠাবান। যে সব মানুষগুলোর কথা উপরে লিখেছি, তাদের ভেতরটা ওরা জানত না, বুঝত না। না হলে, ঐ দলের যে লম্পট সভ্যের প্রায় খালি বাড়িতে

আমাকে ডেকে নিয়ে সেই রাতে থেট করেছিল, সে বয়সে ছিল আমাদের চাইতেও অনেক বড়। কিন্তু লোকটা যে কত বড় লম্পট সেটা বাণীও জানতো না, জানতো না তার দাদা অমলও! তাই একদিন তার কথায় বিশ্বাস করে, ওদের দলের "মেয়েদের" রেনেসাঁস (Renaissance—নবজাগরণ ; ১৪শ হতে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়) শাখার কতকগুলো কাগজপত্র এসে তার বাড়িতে পড়ে আছে, বাণী যেন সেগুলো তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসে, সেই মতো অমল বাণীকে এক দুপুরে পাঠিয়ে দিলে, ঐ লম্পট বাণীকে ঐ সব কাগজপত্র দেবার অজুহাতে তার ঘরে ডেকে নিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে, 'তোমার সঙ্গে কতকগুলো প্রয়োজনীয় কথা আছে' বলে, বাণীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রেম নিবেদন করে। বাণী ছিঃ ছিঃ করার পরেও বলে, কেন আমি মানিকের চেয়ে কম কিসে। বাণী তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বার হয়ে এসে অমলের কাছে সেই ঘটনা বললে, অমলের চোখ তো কপালে উঠে যায়। অন্যদিকে ঐ লম্পটকে সাজা দিতে গেলে, সে গুণ্ডা ছিল বলে, ব্যাপারটা তার বাবাকে বলতে হবে। আবার বাবাকে বললে, অমল কেন বাণীকে ওভাবে ঐ খালি বাড়িতে পাঠিয়েছিল তার কৈফিয়ৎ তাকেই দিতে হবে এবং ঐ দলের সঙ্গে তাদের দুই ভাই ও বোনের মেলামেশা এবং ঐ দলের সভ্যদের বাণীদের বাড়িতে যাতায়াতও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে, এইসব নানান সমস্যায়, অমল যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন বাণী আমাকে টেলিগ্রাম করে কিশোরগঞ্জে ডেকে এনে, ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানাল, তুমি ঐ লম্পটের মাথা না ফাটানো পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না। তখনকার, বিজলীবাতি হীন কিশোরগঞ্জের রাতের অন্ধকারে ঐ লম্পট গুণ্ডার মাথা ফাটানো আমার পক্ষে একটা খুব কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু 'ফ্রেশ' লিভে এসে কোনও ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে গেলে আমার চাকুরিটা যে নট্ (Not) হয়ে যাবে, সেটা বাণীকে ভাল করে বুঝিয়ে ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিতে বললাম। এবং সেদিন সন্ধ্যার পর সেই লম্পটের বাড়ি যেয়ে, তারই গামছা তার গলায় দিয়ে টেনে আনতে চাইলে, আমার প্রায় হাতে-পায়ে ধরে, অন্ততঃ রাস্তার লোকের সামনে স্বাভাবিক ভাবে তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে, আমার ঘরে এনে, তাকে বাণীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়।

১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট পর্যন্ত, এরকম যে কত ঘটনা, কত ঝামেলা আমাদের ওপর দিয়ে গেছে তার সকল কথা তো এতো বছর পরে

আর মনে নেই বা যা আছে তা-ও সব লিখতে গেলে কবে শেষ হবে জানি না। মাসে একবার কি দুবার বিনা-অনুমোদনে (Unauthorised) কিশোরগঞ্জে আসা আর ওই সব ঝামেলার মোকাবিলায়, ঐ ক'বছর আমার চাকুরিটা ছিল অনেকটা "কচুপাতার ওপরে জলের মত।" অর্থাৎ যেকোন সময় চাকুরিটা চলে যেতে পারত, যায়নি যে সেটা হয়তো আমার পরম সৌভাগ্য। একদিকে বাণীদের বাড়ির আর ঐ ভূইফোঁড় দলের ঝামেলা, আর অন্যদিকে শিলচরে সেই "উচ্চুঙ্গা" সুপারের ঝামেলা, শুধু কি তাই, মাঝখানে, কিশোরগঞ্জ থেকে শিলচরের পথে, কায়স্থবেড়িয়ার, তখনকার একজন বাংলার বিখ্যাত গায়কের বোন রাণীর ঝামেলা। সেটা আবার এক অন্য ইতিহাস, এবং খুবই করুণ, যা কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে আর লিখতে চাই না। শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। কায়স্থবেড়িয়ার 'মেড্ডার' কালী নাকি খুব জাগ্রত। বাণীর মা, কাকিমা ও বাণী কায়স্থবেড়িয়ার এক আত্মীয়ের বিয়েতে কয়েক দিনের জন্য ওখানে গিয়েছিলেন। কাজ বা অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে, বাণীর মা কাকিমাকে নিয়ে মেড্ডার কালী-বাড়িতে পুজো দিতে যান। আকস্মিক ভাবে (Incidentally) কায়স্থবেড়িয়ার রাণীর মা-ও সেদিন সেই কালীবাড়িতে গেছেন, পুজো দিয়ে মেয়ের জন্য তাবিজ নিতে। রাণীর বৌদি ও রাণী নিজে তার মা'র সঙ্গে ছিল। পুজো দেবার পর বাণীর কাকীমা, বাণীর মাকে জিজ্ঞাসা করেন, দিদি পুজো দিয়ে মাকালীর কাছে কি নিবেদন করলেন। উনি সরল ভাবেই বললেন, মাকে মনেপ্রাণে ডেকে বললাম মাগো আমার মেয়ের মন থেকে মানিককে সরিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও, মানিকের প্রতি তার মনে ঘৃণা জন্মাও, তোমাকে আমি আরও বড় করে পুজো দেব। পরে কাকিমার সঙ্গে দেখা হলে, উনি ওটা আমাকে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন। ওদিকে রাণী ও তার বৌদি বাণীর মা ও কাকিমাকে চিনতেন। রাণীর মা পুজো দিয়ে রাণীকে তাবিজ পরিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। পরে ঐ বৌদির চিঠিতে এবং আরও পরে রাণীর মুখেও শুনেছিলাম যে আমার মনে যাতে রাণীর প্রতি টান থাকে তার জন্যই এই তাবিজ পরা। বৌদি চিঠিতে লিখেছিলেন বাণীর মা ও কাকিমাকে কালীবাড়িতে পুজো দিতে দেখলাম। তাঁরা আমাদের চিনতে পারেননি। কিন্তু তাঁরাও কি আপনার জন্য পুজো দিতে গিয়েছিলেন? চিঠির উত্তরে আমি বৌদিকে জানিয়ে ছিলাম যে উঁনার অনুমান আংশিক সত্য, পুজো তাঁরা দিয়েছিলেন ঠিকই তবে সেটা তাঁদের মেয়ের মন আমার দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে। আপনার শাশুড়ীকে খবরটা দিলে, উনি নিশ্চয়ই শান্তি পাবেন।

কায়স্থবেড়িয়ার এক পাড়াতেই রাণীদের নিজের বাড়ি ও বাণীদের আত্মীয় বাড়ি ছিল। বাণীর মা ও কাকিমাকে কালীবাড়িতে দেখে, রাণী অনুমান করে নেয় যে হয়তো বাণীও তাদের সাথে কায়স্থবেড়িয়ায় এসেছে কিন্তু কালীবাড়িতে যায়নি। সে তার নিজের বাড়ির এবং বাণীদের আত্মীয় বাড়ির একজন উভয় পরিবারের পরিচিত মেয়ের সাহায্যে, বাণীদের ঐ আত্মীয় বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে বাণীকে নিজেদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় এবং গল্পচ্ছলে বলে যে কিশোরগঞ্জের মানিক রায়ের সঙ্গে তার (রাণীর) প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে এবং বিয়েও প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, একটা সোনার নেকলেশ ও কানের দুল দেখিয়ে বলে যে ঐ মানিকবাবু এদুটো তাকে উপহার দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বাণী মানিক রায়কে চেনে বলে স্বীকার করে। রাণী, আমার ও বাণীর ব্যাপারটা জানতো, আমি তাকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম, আমার প্রতি রাণীর মনের দুর্বলতাকে ফেরাতে। কিন্তু বাণী যে রাণীর দুর্বলতার কথা এবং তাকে ফেরাবার জন্য আমার প্রচেষ্টার কথা জানতো, সেটা রাণী জানত না। কাজেই রাণীর চালাকি বাণী বুঝে ফেলেছিল এবং পরে বাণীর নিকট থেকে আমিও তার ঐ সব মিথ্যা কথাগুলোর জন্য রাণীকে ভর্ৎসনা করেছিলাম। এর পরেও, রাণী কিশোরগঞ্জে তার দাদার বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসে একদিন আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসে কাউকে না বলে কয়ে, এক ফাঁকে আমার একটা সুন্দর বাষ্ট্ (বাঁধানো) ফটো নিয়ে একেবারে কায়স্থবেড়িয়া চলে যায়। আমি এজন্য রাণীকে খুব একটা দোষ বা নিন্দা মন্দ করছি না। কারণ শুনেছি, যুদ্ধে, রাজনীতিতে আর প্রেমে নাকি পথ বা উপায়ের বা নীতির কোন বলাই নেই, ফলটাই আসল! উল্লেখযোগ্য এই যে রাণীর উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাণীর বয়েসের অনেক মেয়ে আমার সঙ্গে রাগারাগি ও ফাটাফাটি করে ছাড়তো। কিন্তু বাণী আমার কাছে ওসব ব্যাপার রিপোর্ট করে আমার বক্তব্য শুনে নিত, তার বেশি কিছু করত না। আমার প্রতি এতই অনন্ত ছিল তার ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের গভীরতা, আর তার এই দুর্লভ ও বিরল গুণাবলী বাণীর প্রতিও আমার শ্রদ্ধা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিত। পূর্বে লিখেছি যে এই রাণীর ব্যাপারটাও একটা করুণ ইতিহাস বা কাহিনী এবং বেশ বড় কাহিনী, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সব কথা লিখলাম না। শুধু উল্লেখ করলাম এটাই বোঝাতে যে সেই একই সময়ে আমাকে ও বাণীকে কত ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল, কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, আমাদের চরম লক্ষ্যের,

দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। ঐ চার পাঁচ বছরের আরও এমনি বহু ছোটখাটো ঘটনা, যা আমার এখনও কিছু কিছু মনে আছে সেসব বাদ দিয়ে এবার মূল ঘটনার দিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

শ্রীহেম ভট্টাচার্য ছিলেন কিশোরগঞ্জের কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং ডাঃ বীরের বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাজনৈতিক বা অন্য প্রায় সব ব্যাপারেই ওরা দুজনে পরামর্শ না করে কিছু করতেন না। উনি আমাকেও খুব স্নেহ করতেন।

ডাঃ সুনীল বিশ্বাস আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় তবে ডাঃ বীরের চেয়ে অনেক ছোট এবং তার স্নেহ ধন্য ছিলেন। ওঁদের মধ্যে ছিল বহু পুরানো পারিবারিক বন্ধুত্ব। ডাঃ বিশ্বাস ছিলেন আর. এস পির একজন নেতা কিন্তু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

এই দুজনকে শুধু মুখে নয়, শিলচর থেকে, ফুলস্কেপ কাগজের চার থেকে আট পৃষ্ঠার কত চিঠি লিখেছি তার বোধ করি সীমাসংখ্যা নেই। প্রত্যেকটা চিঠিতে অকাট্য যুক্তি দিয়ে, আমাদের দুজনার ভালবাসা, প্রেম ও সম্পর্কের গভীরতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে, এবং ভয়ানক পরিণতির কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছি, বাণীর বাবাকে বুঝিয়ে আমাদের বিয়ের সম্মতি আদায় করে নিতে। পরে ওদের দুজনার নিকট থেকেই জেনেছি যে, বলে বলে হয়রান হয়ে, আমার লেখা চিঠিগুলো পর্যন্ত তাঁরা বাণীর বাবার ডাক্তারখানায় ওনার হাতে তুলে দিয়ে সেগুলো ভাল করে পড়ার জন্য ওনাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। এই বই-এর ছত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, তখনকার বাংলার সেণ্ট্রাল এসেম্বলির এম. এল এ. ও বিখ্যাত জমিদার কংগ্রেসী শ্রী ডি. কে. লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্য চেয়েও কোন ফল হয়নি।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপর যেমন শ্রদ্ধা ছিল বাণীর বাবার, তেমনি তার নিজেরও। নেহরুজীর কাছে রেজিস্টারড্ এ. ডি ডাকে বাণীর একটি আবেদন পাঠান হলো, কিন্তু কোন জবাব এলো না। আমি মহাত্মা গান্ধীজীর কাছে বোধহয় সেবা গ্রামের ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠালে, তাঁর তৎকালীন প্রাইভেট সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই আমাকে চিঠিতে জানালেন যে বাপুজী এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চান না। বাণীর ইচ্ছে মত ঐ চিঠিখানা তার বাবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁর শোবার ঘরের টেবিলে রেখে দিলে, বাণীর বাবা তা পড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে শুধু বলেছিলেন, আমার নামে আবার গান্ধীজীর

কাছে নালিশ করা হয়েছে !

বাণীর বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ও কংগ্রেসের সর্বোচ্চ মহলেও চেষ্টা করে যখন কিছু হল না, তখন বাণীর মাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে, এবং এ বিয়ে না হলে. আমাদের দুজনেরই পরিণতি কতটা খারাপ এবং করুণ হতে পারে সেটা বিস্তারিত লিখে একটা চিঠি পাঠালাম, কিশোরগঞ্জের বাসায় বসে। তিনি চিঠিখানা মনযোগ দিয়ে পড়ে, হিমানীকে (বাণীর ছোট বোন) দিয়ে আমাকে বলে পাঠালেন যে, আমি যেন শিলচর চলে যাই, তিনি ভেবে চিন্তে এ ব্যাপারে কতদূর কি করা যায় সেটা আমায় পরে জানাবেন। আমি শিলচর যেয়ে এক মাস অপেক্ষা করেও, বাণীর মার নিকট থেকে কোন খবরাখবর পেলাম না। আবার কিশোরগঞ্জে আমার ধরাবাঁধা পথে এক রাতে ফিরে এসে, সেই "নিশা-কুমুদ"-এর ঘরে আশ্রয় নিলে. পরের দিন সকালেই এসে বাণী আমায় জানাল যে আমার সঙ্গে চলে যেয়ে, বাইরে কোথাও আমার ব্যবস্থা মত, বিয়ের কাজ সেরে নেবে। হঠাৎ তার এই মত পরিবর্তনের কারণ হিসাবে আমায় জানাল যে বেশ কয়েক দিন পূর্বে তাদের বড় ঘরের কোঠায় রাতের খাওয়া সেরে সে শুয়ে আছে। রাত তখন প্রায় এগারটা, সে তখনও ঘুমোয়নি। ঐ ঘরেরই মাঝের হলে বসে নিত্যকার মত, বাণীর বাবা রাতের খাবার খাচ্ছেন। নিকটেই বসে আছেন বাণীর ঠাকুমা। সকলেই জানত যে ডাঃ বীর খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। এক সময়ে বাণীর ঠাকুমা ছেলেকে বলেন, "প্রফুল্ল, বাণীকে মানিকের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দে। আর এ নিয়ে ঝামেলা ভাল লাগে না।" বাণীর বাবা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে তাঁর মাকে বলেন, "মেয়েকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেব, তবু ওখানে বিয়ে দেব না।" এসব কাহিনী আমায় শুনিয়ে বাণী বলে যে "বাবার ঐ কথা শুনে, তাঁর উপর আমার এতদিনের বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি। বাবা আমার আর তোমার সব কিছুই জানেন, কিন্তু উনি একবারও ভাবলেন না যে আমার অন্য কোথাও বিয়ে হলে, আমি দ্বিচারিণী হব। আমি তো অনেক দেখলাম, অনেক দিন অপেক্ষা করলাম, সবাইকে সুযোগ দিলাম, কিন্তু আমার এখন নিজের পথ নিজে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কয়েক মাস পূর্বে, আমার মন ভোলাতে বাবা আমায় নিয়ে গেলেন সোদপুর গান্ধী আশ্রমে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কনফারেন্সে। সেখানে কয়েকদিন একনাগাড়ে বাবার সঙ্গে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। গান্ধীজী ছাড়াও কংগ্রেসের প্রায় সকল নেতারাই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। পণ্ডিত নেহরু, ইন্দিরা নেহরু, ভুলাভাই দেশাই, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ,

সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খান, আচার্য কৃপালনী ও তাঁর স্ত্রী, ৺যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা, প্রফুল্ল ঘোষ এবং আরও সব কত পৃথিবী বিখ্যাত এবং ভারত বিখ্যাত নেতা। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বাবার বহুপরিচিত নেতা ও স্ত্রীদের প্রণাম করতে করতে আমার কোমরের এমন ব্যথা হয়েছিল যে সাতদিন আমি ভাল করে হাঁটতে পারিনি। বাঙ্গালি বহু নেতা ও তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে আমি বহু প্রশংসাও পেয়েছি। মেমসায়েব নেলী সেনগুপ্তা অধিবেশনে আমাকে দেখলেই, গান্ধীজীর মঞ্চের কাছে তাঁর পাশে নিয়ে আমায় বসাতেন।

ফেরার পথে, বালিগঞ্জ প্লেসে বড় মামার বাড়িতে, দিল্লী প্রবাসী 'উকিল' উপাধি এক বাঙ্গালি পরিবারের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাবে, সেই পরিবারের কয়েকজনকে চা-জলখাবার দেবার অজুহাতে আমাকে দেখানো হয়। কিন্তু ব্যাপারটা আমি পরে বুঝতে পেরে, ঐ বাড়িতেই ছোট মামাকে আমি যা যা বলে এসেছিলাম, তাও নিশ্চয়ই বাবা শুনেছেন। তিনি আমার কোন কথার বা সেণ্টিমেণ্টের কোন মূল্যই দিলেন না।"

সেদিন এমনি আরও বহু কথা বলতে বলতে, পিতার উপর অভিমানে, তার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে হয় তার পিতার উপর বহুদিনের আশা-ভরসা ভেঙ্গে যাবার বেদনাকে কিছুটা সহনীয় করে নিয়ে, শেষ কথাটি বলে উঠে গেল, "আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। যা করার তুমি তাড়াতাড়ি কর। আর এক মুহূর্তও আমার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

বাণী চলে গেলে আমি বেশ কিছুক্ষণ স্থবির হয়ে বসে রইলাম। এত বড় একটা ব্যাপার। সেই মুহূর্তে আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। হাতে আছে মাত্র সামান্য কিছু টাকা। মার হাতে টাকা-পয়সা থাকতো না। বাবার কাছে তো চাওয়াই অসম্ভব। কিশোরগঞ্জে এমন কোন রোজগেরে বিশ্বাসী বন্ধু-বান্ধব কাউকেই মনে করতে পারলাম না যার নিকট থেকে অন্তত পাঁচশত টাকা ধার নিতে পারি। শিলচরে যেয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসা শুধু চাকুরির দিক থেকেই কঠিন নয়, সন্দেহজনকও হতে পারে। এদিকে আবার ফ্রেশ লিভে আছি, ধরা পড়লেই চাকুরি নট্ (Not), মানে চলে যাবে। ওদিকে আবার লড়াইটা হচ্ছে শহরের "নাম্বার ওয়ান সিটিজেনের" সঙ্গে, মানে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, শহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, মহকুমা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট, বড়লোক এবং নানান-

ভাবে প্রতিপত্তিশালী মানুষ, বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের সভ্য, তৎকালীন বেঙ্গল প্রিমিয়ার হাসান শহীদ সুরাবর্দীর ভাগনে, কিশোরগঞ্জের S. D O বা সাব্-ডিভিস্যানেল অফিসারের (মিঃ রিজভী) অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটা কথা খুব চালু আছে যে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।" মাস ছয় পূর্বে আমার বোন হেনার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, বাণীদের সেই নয়া ঘরে বসে ১৯৪২-এর আন্দোলনের পোস্টার লেখার সাহায্যকারী শ্রীরবীন্দ্রনাথ করের সঙ্গে। রবি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আমার সহপাঠীও বটে। যাহোক নিরুপায় হয়ে, বন্ধক দিয়ে পাঁচশত টাকা পাওয়া যাবে, সেই পরিমাণ সোনার গহনা হেনার নিকট থেকে চেয়ে নিলাম। সেই রাতেই নিউটাউনের একটা বাড়িতে দরজা জানালা বন্ধ করে, ওয়ালিনোয়াজ, আমি ও একজন ভাল মোক্তার গোপন পরামর্শে বসলাম। মোক্তার প্রথমেই ওয়ালিনোয়াজকে বললেন, যে পথেই যাও আর যাই করনা কেন, মনে রেখো ডাঃ বীর অত্যন্ত প্রভাবশালী, রাগী এবং জেদি মানুষ। বাণীর বয়েস আঠার বছরের বেশী হলেও, প্রয়োজনে মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে তাঁর পক্ষে বাণীকে আঠার বছরের কম বয়েস প্রমাণ করা অসম্ভব নয়। আর সেটা করতে পারলে বাণীর উক্তি বা বিবৃতি আদালতে গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর তাহলেই নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাবার অপরাধে একেবারে নির্ঘাত সাত বছর জেল। সুতরাং তুমি যখন মিউনিসিপ্যালিটির একজন কাউনসেলর, তখন গোপনে তুমি বাণীর বার্থ রেজিস্ট্রেশন খাতা বা রেজিষ্ট্রার সরিয়ে এনে তোমার বা আমার হেফাজতে রাখো। ওয়ালিনোয়াজ রাজি হয়ে বললেন, সেটার ব্যবস্থা আমি আগামী কালই করব, কিন্তু তার পরে সব চাইতে নিরাপদ ব্যবস্থা কি হবে ? মোক্তার বললেন, মানিক যদি কলকাতা পেঁৗছেই, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমতে বা রেজিষ্ট্রি করে বিয়েটা সেরে ফেলতে পারে, তবেই সব লেঠা চুকে যাবে। আমি বললাম সেটা আমি করতে পারব, কিন্তু কলকাতা যাবার আমাদের মাত্র একটাই গাড়ি— 'সুরমা মেল'। কোন কোনও দিন পথের বা অন্য গোলমালের জন্য সে গাড়ি চলে না। আমরা স্টেশনে পেঁৗছে যদি দেখি সেদিন গাড়ি এল না তাহলে শহরেই বা কাছাকাছি কোন গ্রামের বাড়িতে আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে, কিন্তু পরের দিন আর কিশোরগঞ্জ স্টেশন থেকে ঐ গাড়িতে ওঠা যাবে না, কারণ স্টেশনের সবাই আমাদের দুজনকে-ই চেনে। এমনকি প্রথম দিনে গাড়ি, মানে সুরমা মেল এলেও, সেটা স্টেশনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা স্টেশনে প্রবেশ করতে পারব না। তাছাড়া আমরা গাড়িতে উঠে গেলেও, ময়মনসিংহ স্টেশনে,

বা জগন্নাথ ঘাট বা বাহাদুরাবাদ ঘাটে পুলিসের কাছে টেলিগ্রাম গেলে, তারা তন্ন তন্ন করে আমাদের খুঁজবে। ওয়ালিনোয়াজ বললেন, গাড়ি স্টেশনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত, স্টেশনের নিকটবর্তী কোন বাড়িতে ওদের আমি লুকিয়ে রাখতে পারব। আর পথে পুলিশের ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য আমি এই ব্যবস্থা করতে পারি যে আমার বিশ্বস্ত কোন লোকের সঙ্গে বাণী মুসলমান মেয়েদের মত বোরখা পরে গাড়ির যে কোন কামরায় উঠে বসবে আর মানিক থাকবে পাশের কামরায়। আমার সেই লোক তাদের একেবারে কলকাতার আশ্রয়ে পেঁাছে দিয়ে কিশোরগঞ্জে ফিরে আসবে। মোক্তারবাবু একটু ভাবনা চিন্তা করে বললেন, ওয়ালিনোয়াজ! সব চেয়ে নিরাপদ হয়, মানিক ও বাণীর যার যার বাড়ি থেকে বার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমতে মন্ত্র পড়ে তাদের সাতপাক ঘুরিয়ে দেয়া, মানে আইনত বিয়ে শেষ। তারপর যদি পুলিস, দারোগা বা (S. D. O.) 'রিজভী' সাহেবও আসেন তবে বার্থ রেজিস্ট্রেশনের রেকর্ড নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে, আমি আইনত তাদের চ্যালেঞ্জ করব। তারা কিছুই করতে পারবেন না। দুদিন অনেক ভাবনা, চিন্তা ও আলোচনা-গবেষণা করে ঠিক হলো, শেষের রাস্তাই সব চাইতে নিরাপদ। ওয়ালিনোয়াজ আমাদের বিয়েটা তাঁর বন্ধু মোক্তারের বাড়িতে করতে চাইলে, মোক্তারবাবু বলেন, ওয়ালিনোয়াজ তুমি তো জান, একটু শক্ত অসুখ-বিসুখ হলেই ডাঃ বীরকে দেখানো ছাড়া কোন উপায় থাকে না। উনি যা ভয়ানক লোক, তখন আমার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি ছাড়বেন না।

তৃতীয় দিনে 'বয়লা' গ্রামের একটু ভেতরের দিকে একটি হিন্দুবাড়ি ঠিক হল আমাদের বিয়ের জন্য। ঐ বাড়ির যুবক-মালিক ওয়ালিনোয়াজের দ্বারা এতই উপকৃত ছিল যে ওয়ালিনোয়াজের প্রস্তাব তার পক্ষে বাণীর বাবার ভয়েও প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। ঠিক হলো বিয়ে বাড়ির এবং হিন্দু বিয়েতে যা কিছু লাগে তার জোগাড় করে রাখা ইত্যাদি সকল দায়-দায়িত্বই ওয়ালিনোয়াজ পালন বা ব্যবস্থা করবেন। আমার দায়িত্ব শুধু বাণীকে নিয়ে বিয়ের রাতে সময়মতো সেখানে উপস্থিত হওয়া। চতুর্থ দিনেই মনে হয়, বিয়ের তারিখ ও রাত দশটার পর লগ্ন ছিল। আমি ও বাণী সেই দিনই ধার্য করলে, ওয়ালিনোয়াজের সঙ্গে যাত্রাপথের নির্দেশ ঠিক করে নিলাম। আমাদের সেই "মহামিলনের" তারিখ ঠিক হলো ১লা আগষ্ট, ১৯৪৬ সাল, রাত্রি ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে, বাণী আমাদের বাড়িতে আসবে আর সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট পথে আমরা "বয়লা"-র সেই বাড়িতে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হব।

আমার মা এবং বোন হেনাকে সব বললাম। ওদিকে বাণীও তার কাকিমাকে এবং বোন হিমানীকে শুধু মহাযাত্রার কথাই বলল, কিন্তু কোথায় যাবে, কোথায় কবে বিয়ে হবে, তা সে নিজেই জানত না। বাণীর বাবা সাধারণত তাঁর ডাক্তারখানা থেকে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে, পূর্বদিকের দালান ঘরে যেয়ে ঘুমোতেন। সেদিন ১লা আগষ্ট, ১৯৪৬ সালে সকাল থেকেই দিনটা মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। দুপুর ও বিকেলে কয়েক পশলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গেলেও আকাশ পরিষ্কার হলো না। আমি মোটামুটি তৈরি হয়ে রাত্রি দশটায় আমাদের বৈঠকখানা ঘরের একটা চেয়ারে বসে বাণীর অপেক্ষায় রইলাম। খাটে ছোটভাই পল্টু আগেই শুয়ে পড়েছিল, তাকে আমি কিছু না বললেও, সে আজ কিছু একটা ঘটতে পারে বলে না ঘুমিয়ে, জেগেই ছিল বলে পরে জানতে পেরেছিলাম। আমি ঘর একেবারে অন্ধকার করে, উত্তর দিকের একটা ছোট্ট জানালা খুলে লক্ষ্য রাখছিলাম বাণীর বাবা কখন বাড়ি ফিরে আসছেন। ওটাই তাঁর বাড়ি ফেরার রাস্তা। আমার হাতে একটা ছোট টর্চ-লাইট আর কোমরে চামড়ার খাপে ভরা ওয়ালিনোয়াজের দেওয়া সেই বড় ছুরিখানা। আকাশ মেঘে থমথম করছে, মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। পাড়া একেবারে নীরব, নিঝুম। শহরে তো কোন বিজলি বাতি ছিলই না। আমার ঘরের সেই ছোট্ট জানালা দিয়ে যে কটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল, তার কোনটারই জানালা, দরজা বা ঘরের কোন ফাঁক-ফোঁকর দিয়েও হেরিকেন লণ্ঠনের আলোর ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। উত্তর দিকের 'গুজাদিয়ার বাড়ি' নামে পরিচিত বাড়ির সুমুখের মাঠে বৃষ্টির জল জমেছিল। সেখান থেকে প্রচুর ব্যাঙ ডেকে চলেছে একটানা। আমি বাণীর জন্য অপেক্ষা করছি আর হাত ঘড়িতে সময় দেখছি। আমার উপদেশ মতো বাণীর বাবা ফিরে এসে তাঁর নিজের ঘরে ঘুমুতে না যাওয়া পর্যন্ত তার আসা নিষেধ। সাড়ে দশটার একটু পূর্বে, আমার ঘরের সুমুখের তেরাস্তার মোড়ে এসে বাণীর বাবা ও পূর্বে উল্লিখিত তাঁর বন্ধু হেমবাবু দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক কথা বলে, যে যার বাড়ির দিকে চলে গেলেন। ঐ ঘুট্-ঘুটে অন্ধকারে গলার আওয়াজেই তাঁদের চিনতে পারলাম। আমার ঘরের রাস্তার দিকের বন্ধ দরজাটার খিল খুলে শুধু ভেজিয়ে রাখলাম। তারপর দুরুদুরু বক্ষে শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। সেই মুহূর্তটা আমার জীবনের কতবড় মুহূর্ত তাই মনে হচ্ছিল বারবার করে এই কারণে যে ঐ রাতের সফলতা

বা বিফলতার উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন যে কোন খাতে বইবে, আলোয় না অন্ধকারে তা আজ ঠিক হয়ে যাবে। গুজাদিয়ার বাড়ির মাঠের ব্যাঙ এর একঘেয়ে ডাক চলেছে তো চলেইছে। আমিও নানা ভাবনার মধ্যে প্রহর গুনে চলেছি। রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ আমার ঘরের রাস্তার দিকের ভেজান দরজা ঠেলে বাণী ঘরে ঢুকল। এক সেকেণ্ড সময়ও নষ্ট না করে, সেই দরজা বাইরের থেকে পূর্বের কৌশল মত বন্ধ করে, আমরা দুজন শুভযাত্রায় বার হয়ে পড়লাম। আমাদের পাড়ার সামান্য রাস্তা পার হয়েই, বাঁদিকে "খরমপট্টির" (পাশের পাড়া) রাস্তায় পড়লাম। আধ ফারলং যেয়েই পুনরায় বাঁহাতে আধ ফারলং যেতে পারলেই, গ্রাম্য মুসলমান পাড়া। তখন পর্যন্ত রাস্তায় একটি মানুষের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু উপরিউক্ত বাঁহাতের রাস্তায় প্রবেশ করেই দেখলাম, ঐ রাস্তার বাঁদিকের একটা বাড়িতে পেট্রোম্যাক্স জেবলে কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। পেট্রোম্যাক্সের আলো আমাদের যাবার রাস্তায় এসে পড়েছে। ঐ বাড়িটার নিকটে যেয়ে আমরা একদুই সেকেণ্ড দাঁড়ালাম। ঐ পাড়া কেন, শহরের সকলেই আমাদের দুজনকে খুব ভাল করে চেনে। ঐ পাড়ার প্রায় সকলেই বাণীর বাবার রুগী। তাছাড়া ওখানে ওনার বহু চেলা-চামুণ্ডাও আছে। এতো রাতে ঐ রাস্তায় আমাদের দুজনকে দেখলে, ওদের অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে বাণীর বাবাকে, ঘুমিয়ে থাকলে, জাগিয়েও খবরটা দিতে পারে। এবং তাহলেই সর্বনাশ! আমার উপদেশ মতো বাণী মাথায় বড় করে ঘোমটা টেনে দিল। আমি আমার মাথার চুল হাতেই এলোমেলো করে দিয়ে, বাঁহাতে একটা রুমাল নিয়ে, বাঁদিকের গাল মুছতে মুছতে সেই সামান্য আলোকিত রাস্তাটুকু নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম। রাস্তার কাদায় আমাদের উভয়ের পায়ের চটি-ই একেবারে ভরে গিয়েছিল, দ্রুত হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। তাই আমরা উভয়েই চটিগুলো রাস্তার পাশের নর্দমায় ফেলে দিলাম। কিন্তু ইটের ও ঝামার তৈরি রাস্তায় হাঁটতে যেয়ে পায়ে খুব ব্যথা পাচ্ছিলাম। দুতিন মিনিটের মধ্যেই, শহর ছেড়ে গ্রামে পড়তেই একটা বিরাট বাঁশঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে টর্চলাইট হাতে ওয়ালিনোয়াজ ও তার একটি বিশ্বস্ত হিন্দু ছেলে খুব নিম্নস্বরে আমাদের অভিনন্দন জানালো। ছেলেটির সঙ্গে আমার ভালই পরিচয় ছিল কিন্তু আজ আর তার নাম মনে করতে পারছি না। ওয়ালিনোয়াজ খান আমাকে বললেন, "এই ছেলেটি একটু আগে আগে হেঁটে, তোদের পথ দেখিয়ে বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবে, নয়তো রাতের বেলায় তোদের পথ চিনতে অসুবিধে হবে। বাণীকে

বললেন, বোন নির্ভয়ে ওদের দুজনার সঙ্গে চলে যাও। রাজনৈতিক ভাবে তুমি আমাদের বিপক্ষ দলের হলেও আজ কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু।” ওয়ালিনোয়াজ অন্য রাস্তায় চলে গেলেন। আর আমরা তিনজন, ঐ ছেলেটি আমাদের অনেকটা সামনে, আর পেছনে আমরা দুজন একসঙ্গে ঐ মুসলমান পাড়ার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেয়ে একেবারে আমার সেই প্রিয় আজিমুদ্দিন হাইস্কুলের পাশের রেল লাইনে উঠে, রেল লাইন বরাবর উত্তর দিকে যেয়ে ‘নরসুন্দা’ নদীর উপর রেলিংহীন রেলব্রীজের ফাঁকা ফাঁকা রেলের স্লিপারের উপর পা রেখে, বাণীকেও অতি সাবধানে আমি তার হাত ধরে ঐ পুল বা ব্রীজ পার করে, “বয়লা” গ্রামের রাস্তায় যেতে রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং-এ পোঁছে দেখলাম, এত রাতেও আশেপাশে, মাথায় পট্‌কা বাঁধা কিছু যুবক দাঁড়িয়ে আছে। বয়লার রাস্তায় যেতে যেতে সঙ্গের ছেলেটি আমায় বলল, এরা সব আমাদেরই ছেলে। যদি পুলিশ পার্টি এদিকে আসে, তবে ওরা নিজেদের মধ্যে একটা মিথ্যে (mock) লড়াই-এর ভান্ করে, ওখানে পুলিশ পার্টিকে যথাসম্ভব বিলম্ব করিয়ে দেবে। আরও একটু সামনে রাস্তার পাশের জঙ্গলেও কিছু ছেলে লুকিয়ে আছে, তারাও বড় বড় পট্‌কা আর ইটের আধলা নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রয়োজনে পুলিশ দলকে ওখানেও কিছুক্ষণ আট্‌কে রাখতে, যাতে পুলিশ পোঁছুবার পূর্বেই বিয়েটা শেষ হয়ে যায়। কিশোরগঞ্জেই বিয়ের আয়োজন করাটা বাণীর খুব পছন্দ না হওয়ায়, রাস্তায় যেতে যেতে বাণী আমায় বলল যে বিয়ের ব্যাপারটা দূরে কোথাও করলেই তো ভাল ছিল। এখানে আমার ভাল লাগছে না। আমি তাকে বললাম, আইনগত অনেক অসুবিধে ছিল বলেই বাধ্য হয়ে এখানেই সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আমি পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বললেই তুমিও সেটা বুঝবে।

সঙ্গী ছেলেটির প্রদর্শিত পথে একটু পরেই একটি অন্ধকার বাড়িতে এসে প্রবেশ করলাম। খালি পায়ে হেঁটে, বহু জায়গায় পায়ের তলায় ছোট ছোট ইট-পাথরের টুকরাতে খোঁচা খেয়ে, আমার ও বাণীর উভয়ের পায়ের তলা কেটে গিয়েছিল। সেই অন্ধকার বাড়িতে ওয়ালিনোয়াজ ও মোক্তার বাবুর সাক্ষাৎ পেলাম। বিশেষ কারণেই অবশ্য ওরা দুজনেই একটু আড়ালে আড়ালে থাক-ছিলেন। মোক্তারবাবু ডাঃ বীরের ভয়ে আর ওয়ালিনোয়াজ তার সি. পি. আই. দলের নিয়মানুবর্তিতার কারণে। আমাদের পা কেটে গেছে জেনে বাড়ির মালিক তাড়াতাড়ি পা ধোবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং কাটা জায়গায় ডেটল লাগিয়ে দিলেন। আমরা প্রস্তুত হতেই দুটো পেট্রোম্যাক্‌সের আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম বাড়ির প্রশস্ত উঠানে, একটা হিন্দু বিয়ের যা কিছু প্রয়োজন তার সবই প্রস্তুত বা মজুত আছে। মোক্তারবাবু ও ওয়ালিনোয়াজ বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের পিঁড়িতে বা আসনে বসে পড়ো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম। একটা ঘর থেকে প্রৌঢ় এক পুরোহিত মশাইও এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেই তাঁর কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ধীরে ধীরে প্রতিবেশী বাড়িগুলো থেকে কৌতূহলবশতঃ বেশ কিছু আবালবৃদ্ধবনিতা এসে বিয়ে বাড়িতে জড় হলো। তার মধ্যে কেউ কেউ আবার বাড়ির মালিককে, কার বিয়ে, আপনার কি হয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করছে এরমধ্যে ওয়ালিনোয়াজ কঠিন স্বরে ঘোষণা করল, "কেউ কোন প্রশ্ন করবেন না, একটু পরেই সব জানতে পারবেন। আর আমাকে না জানিয়ে এই রাতে কেউ শহরের দিকে যাবেন না, গেলে রাস্তায় বিপদ হতে পারে।" সত্যি সত্যি ঐ গ্রাম থেকে শহরে যাবার রাস্তায়, আমাদের পাহারার ব্যবস্থা ছিল।

হঠাৎ, একজন বলে উঠল, বর-কনের ফুলের মালা কই। কার উপর এটার ভার ছিল? "এই যে আমার কাছে মালা" বলে যে যুবকটি এগিয়ে এল. আমার কাছেতো সেটা পৃথিবীর এক অষ্টম আশ্চর্য। তার নাম কুখ্যাত আলি হোসেন। আমাদেরই সমবয়েসি আজিমুদ্দিন হাই স্কুলেরই আমাদের নিচের ক্লাসের ছাত্র ছিল। হেন কুকাজ নেই যা সে করত না। আমার সঙ্গে ছিল আদা-কাঁচকলার সম্পর্ক। এই ছেলেটি ও তার দলবলের সঙ্গে আমাদের গোলমাল মারপিট লেগেই থাকত। আমাদের ভয়ে দিনের বেলায় সে বড় একটা শহরে আসতোই না। রাতের অন্ধকারে মাথা ও মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে আসতো খুব বিশেষ প্রয়োজনে। আমরাও কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশনে কখনো একলা বা খালি হাতে যেতাম না, সেটা ছিল তার এলাকা। এটা আমাদের স্কুল জীবনের কথা লিখছি। ওয়ালিনোয়াজ এসব জানতেন না, কারণ তখন তিনি জেলে ছিলেন। আলি হোসেন ছিল তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আলি হোসেন ক্লাস সেভেন কি এইট্ পর্যন্ত পড়ে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। তারপর থেকে আর তার সঙ্গে কোন দেখা সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ ছিল না। সেই আলি হোসেন যখন আমাদের বিয়ের মালা আমার হাতে দিচ্ছে, এটা আমার কাছে অষ্টম আশ্চর্য ছাড়া আর কি হতে পারে! আজ সে কথা লিখতে যেয়েও বার বার মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে কতই না আশ্চর্য জিনিস ঘটে। সেদিন বিয়ে করে উঠেই আলি হোসেনকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম, সেও আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আপ্যায়িত

করেছিল। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের আমার এক প্রবল শত্রু আবার আমারই বিয়ের মালার যোগানদার সেই আলি হোসেনের মুখখানা এখনও মনে পড়ে। আজতো আর তার সঙ্গে শত্রুতাও নেই, প্রগাঢ় বন্ধুত্বও নেই। শুধু অতীত স্মৃতির টান, তাই বুঝি মন চায়, 'যদি আবার তার দেখা পেতাম!' জানি না আজ সে কোথায়, বেঁচে আছে না মাটি নিয়েছে। মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের ছেলে মেয়েদের খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়। কিন্তু আমাদের বিয়ে ছিল তার ব্যতিক্রম। অবশ্য এ নিয়ে আমাদের কোন আপশোষ তো ছিলই না, বরঞ্চ আমাদের বিয়ে বাড়িটা যে কার্য কারণে হিন্দু-মুসলমানের ও শত্রু-মিত্রের একটা মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল, সেটাই ছিল আমার ও বাণীর আনন্দ ও গর্বের বিষয়!

ওদিকে পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পড়াতে পড়াতে আমাদের উভয়েরই পিতার নাম জিজ্ঞাসা করে, বাণীর পিতার নাম শুনেই থমকে যান। সামান্য দূরে দাঁড়ানো ওয়ালিনোয়াজকে ভয়ে ভয়ে বলেন, "কনের পিতার পরিচয় পূর্বে জানলে তো সাহেব, আমি এ বিয়ে করাতে আসতাম না। ডাক্তারবাবুর দয়ায় আমি ওদের কালীবাড়ির পুরোহিত, কালীবাড়িতেই পরিবার নিয়ে বাস করি। ডাক্তারবাবুতো কালই আমাকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন!" ওয়ালিনোয়াজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমাকে তো আপনি জানেন, ডাক্তারবাবু যাতে আপনাকে কোনও শাস্তি না দেয় তার ব্যবস্থার ভার আমি নিচ্ছি। আমার উপর ভরসা রাখুন। আপনিতো কোন অসৎ কাজ করছেন না। তাঁর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, আপনি না দিলেও, অন্য কেউ দিত। এখন আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারুন"। পুরোহিত মহাশয় আবার তাঁর কাজ আরম্ভ করে বললেন, "ওয়ালিনোয়াজ সায়েব, দয়া করে দেখবেন, আমার যেন কোন বিপদ না হয়।" এর পরেই আমাদের সাতপাক ঘোরা হয়ে গেল। প্রতিবেশী যারা তখনও কৌতূহল বশতঃ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখছিল, তাদের পুরুষ ও মেয়েছেলেদের খুব নিম্নস্বরের কিছু কথা আমার কানে আসে। যেমন, "ও মাইয়া মাইয়া গো, প্রফুল্ল ডাক্তারের মাইয়ার এইবার বিয়া অইল, এইডা কি রহম অইলো।" একজন প্রতিবেশী জবাব দিল, "হোন্‌লাম ছেঁড়া আর ছেঁড়ীর আগেই খুব বাব্—বালাবাসা আছিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু বিয়া দিতে রাজি অইন্নাই দেইখ্যা, হেঁরা বাইগ্যা আইয়া এইবায় বিয়া করতাছে। ছেঁড়াও তো দেখতে সোন্দরই, হোনলাম খুব বালা সরখারী চাপরী করে, আর জিল্লার খুব

নামকরা খেউল্লার।[১]

যাহোক, পুরোহিত মশাই আমাদের অনুষ্ঠান ও আচার পর্ব ইত্যাদি বেশ দ্রুতই করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গেই পেট্রোম্যাক্সের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাড়িটাকে পুনরায় অন্ধকার করে ফেলা হল। তখন পর্যন্তও আমরা বিপদের কোন লক্ষণ দেখিনি। ঐ বাড়িতে বিয়ের পর যে ঘরে আমরা রাত্রিবাস করব, সেখানে আমরা যেয়ে বসলে, ওয়ালিনোয়াজ আমার হাতে ইশারা করে বাড়ির বাইরে একটা নিরিবিলি অন্ধকার জায়গায় ডেকে নিয়ে উক্ত মোক্তারবাবুর উপস্থিতিতেই বললেন যে "বিয়ের আইন ও নিয়ম মতো, যে বাড়িতে বিয়ে হয়, সে বাড়িতেই রাত্রি বাস করতে হয়। কিন্তু যেহেতু আমি আর মোক্তারবাবু এখন বাড়ি চলে যাবো, তাই প্রতিবেশীরা সব চলে গেলেই, তোমাদের অতি নিকটেই একটি খালি বাড়িতে রাত্রিবাস করতে নিয়ে যাবে আমারই খুব বিশ্বস্ত কয়েকজন লোক এবং তারা সারারাত ঐ বাড়ি পাহারা দেবে। তোমাদের আবার তারাই শেষ রাতের অন্ধকারে এবাড়িতে নিয়ে আসবে, যেন তোমরা রাতে এই বাড়িতেই ছিলে।" বিয়ে বাড়ির যুবক-মালিক, "বিয়ে শেষ হয়ে গেছে, আর দেখার কিছু নেই," এই সব বলে প্রতিবেশীদের তাড়িয়ে দিল। তারা চলে গেলে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে একটি ছেলের সাথে মিনিট পাঁচ হেঁটে এক অতি জীর্ণ বাড়ির আরও জীর্ণ ঘরে যেয়ে উঠলাম। ঐ বাড়িতে মাত্র ঐ একখানাই সনের বা ছনের ক্ষুদ্র একচালা ঘর। ছয়খানা মোটা বাঁশের খুঁটির উপর লম্বালম্বি বাঁশ পেতে পেরেক মেরে তক্তপোসের মত বানানো আছে। তার উপর ছয় ইঞ্চি ডানলপের গদি দিয়ে শুয়েও পিঠে লাগবে। অথচ তাতে পাতা আছে একটি সতরঞ্চি, তার উপর একটা চাদর, দুটো মাথার বালিশ এবং মশারি টাঙানো। এর চাইতে আরও সুবন্দোবস্ত করা নিরপত্তার দিক দিয়েও অসুবিধে ছিল বইকি। ঐ ঘরে প্রবেশ করে, টর্চের আলোয়, মশার ভয়ে মশারির ভেতরে যেয়ে আমি ও বাণী বালিশে কনুই দিয়ে কাত হয়ে বসলাম। শেষ রাতের তখন আর অল্প সময়ই বাকি।

---

১ "ওরে মা-রে মা-রে! প্রফুল্ল ডাক্তারের মেয়ের এভাবে বিয়ে হ'ল? এটা কেমন হলো!" "শুনলাম, ছেলে এবং মেয়ের পূর্বেই ভাব-ভালবাসা ছিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু বিয়ে দিতে রাজি হয়নি বলে, তারা ভেগে (পালিয়ে) এসে এইভাবে বিয়ে করছে। ছেলেতো দেখতে সুন্দরই, শুনলাম খুব ভাল সরকারি চাকুরিও করে, আর জেলার খুব নাম করা খেলোয়াড়।"

বাণীকে বললাম, এবিছানায় ঘুমানো যাবে না, এসো শুয়ে, বসে সময়টা কাটিয়ে দিই। নিরাপত্তার জন্য ওখানে আমাদের কথা বলাও নিষেধ। এবাড়ির ব্যবস্থা এই নিরাপত্তার জন্যই করা হয়েছিল এই জন্য যে, যে কোন সূত্রে, বাণীর বাবা যদি ঐ বিয়ে বাড়ির খবর পেয়ে, নিজের লোকজন সহ বা পুলিস সহ সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে আমাদের খোঁজ পাবেন না। আর পরের দিন সকাল বেলায়, উক্ত মোক্তারবাবু, বাণীর জন্মের মিউনিসিপ্যাল রেজিস্ট্রার নিয়ে ঐ বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন।

যাহোক, বাণী খুব ঘুম কাতুরে ছিল বলে, একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি একলাই জেগে বসে আছি আর একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছি। পাহারার লোকেরা মাঝে মাঝেই জানান দিচ্ছে, কোন ভয় নেই আমরা আশে-পাশেই আছি। মাঝে মাঝে তাদের পদশব্দ ও মাটিতে লাঠির আঘাতের শব্দ শুনছি। আমিও খুব নিম্নস্বরে সাড়া দিচ্ছি। ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে এলে পাহারাদারদের কথা মতো বাণীকে জাগিয়ে বিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে নির্দিষ্ট ঘরে বসে চা ও বিস্কুট খেলাম। তখন পর্যন্তও বিপদের কোনও কিছু নজরে পড়েনি। কিশোরগঞ্জের বাসায় মা ও বোন হেনার কাছে পরে শুনেছিলাম যে আগের দিন সেই বৃষ্টি ভেজা ও মেঘলা রাতে, আমি ও বাণী যখন আমার ঘর থেকে 'শুভযাত্রার' পথে রওনা হয়ে রাস্তায় পরেই আমাদের বাসার বড় ঘরটার পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি, তখন মা ও হেনা সবই বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ আশঙ্কা ও উদ্বেগে তাঁরাও ঘুমুতে পারেন নি। মা পূর্বেই বলে রেখেছিলেন, সে পরের দিন সকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাদের অবস্থা ও অবস্থান যে কোন উপায়ে জানিয়ে দিতে। মার মনের অবস্থা বিবেচনা করে, উপেন নামে পঁচিশ কি তিরিশ ব'ছরের এক যুবক, যে পূর্বে আমাদের বাসায় অনেকদিন ভৃত্যের কাজ করেছিল, তাকে আমাদের বিয়ের রাতে 'বয়লা' গ্রামে পেয়ে, পরের দিন সকালে একটা বিশেষ কাজের জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলে রেখেছিলাম। সে ভৃত্যের কাজ করলেও সামান্য লেখা পড়া জানত আর শহরে থেকে থেকে কিছুটা এন্‌লাইটেন্‌ড হয়েছিল। আমার খেলাধুলো, গান বাজনা ইত্যাদির জন্য আমার একজন উৎসাহী সমর্থকও ছিল। সেই উপেন খুব ভোরে বিয়ে বাড়িতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে, তাকে বললাম, ঐ গ্রাম থেকেই কয়েকটা 'লাউ' কিনে একটা ঝুড়িতে ভরে নিয়ে, মাথায় পটকা বেঁধে আমাদের বাসায় তাড়াতাড়ি চলে যেতে এবং লাউ বিক্রয়ের অজুহাতে, মার কানে

কানে এই খবরটা দিয়ে আসতে যে আমরা 'বয়লা' গ্রামে অমুকের বাড়িতে ভালই আছি, বিয়ে হয়ে গেছে, আইনের দিক দিয়ে আর কোন ভয় নেই। উপেন খুব সুষ্ঠুরূপে তার কাজটি সম্পন্ন করে দুঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে বিয়ে বাড়িতে আমাকে খবরটা পেঁাছে দেয়।

অন্যদিকে, বাণীদের বাড়ির লোক সকালে উঠে, বাণীকে তার ঘরে না দেখে সারা বাড়ি খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না পেয়ে কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়ে। কাকিমা ও হিমানী তার প্রস্থানের কথা জানলেও তো কিছু বলার উপায় ছিল না। খোঁজাখুঁজিতে তাঁরাও যোগ দেন। বাণীর বাবা শেষ পর্যন্ত তার মাকে (বাণীর ঠাকুমা) বলেন, একবার আমাদের বাসায় যেয়ে, আমি বাসায় রয়েছি কিনা সেটা জেনে আসতে। উনি এসে আমার মাকে আমাদের বড় ঘরে ডেকে তুলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে মা বলেন যে মাণিক আর পল্টুতো বাইরের ঘরে ঘুমুচ্ছে। বাণীর ঠাকুমা, মাকে নিয়ে বাইরের ঘরের দরজায় শব্দ করে পল্টুকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসা করে, দেখতো, মানিক বিছানায় আছে কিনা। পল্টু চোখ মুছতে মুছতে অভিনয় করে, বিছানার মশারি উঠিয়ে বলে, কই দাদাতো বিছানায় নেই। একথা শুনে বাণীর ঠাকুমা সেখানেই বসে পড়ে বললেন কি হবে গো হেনার মা, বাণীওতো বাড়িতে নেই। ঐ বড় ঘরের-ই অন্য খাটে বাবা শুয়েছিলেন। ওদের সব কথা বার্তায় বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে মোটামুটি সব শুনতে পান। বাণীর ঠাকুমা চলে গেলে তিনি মাকে ডেকে সব জেনে বিছানায় বসেই চোখের জল ফেলতে থাকেন। ওদিকে আমিও বাড়িতে নেই খবর পেয়ে. বাণীর বাবা একটা সাইকেল চেপে কিশোরগঞ্জের রেলওয়ে স্টেশনে যেয়ে জানতে পারেন যে কলকাতার দিকে যাবার সুরমা মেল, যা ঐ স্টেশনে রাত একটায় আসার কথা সেটা তখনও পেঁাছায়নি, কিন্তু আপ সুরমা মেল সেটা শিলচরের দিকে যাবার কথা সেটা সময় মতোই চলে গেছে। পরে একথা জেনে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম যে ঠিক ওই আশঙ্কাতেই আমরা সুরমা মেল ছেড়ে 'বয়লা' গ্রামেই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। বাণীর বাবা স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে এসে, কোনও রকম হৈ চৈ না করে সকলকেই স্বাভাবিক থাকতে বলেন। অন্যদিকে আমার ছোট ভাই পল্টুকে তাঁর বাড়িতে ডেকে এনে বলেন, "তোর তো আজ 'ঢাকা' রওনা হয়ে যেয়ে আসানুল্লা এন্‌জিনিয়্যারীং স্কুলে ভর্তি হবার কথা। তা, এ ব্যাপার নিয়ে তোর এখানে বসে থাকার প্রয়োজন কি ? তুই ঢাকা চলে যা। মানিক ও বাণী ওদের সুবিধে মতো কোথায় হয়তো গেছে।

বিয়েটিয়ে সেরে হয়তো সে খবর আমাদের দেবে। তখন আমরা যা ব্যবস্থা করার তাই করব। তুই ঢাকা না গেলে তোর ক্ষতি হতে পারে।" ওঁনাকে তখন খুব উত্তেজিত দেখা যায়নি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর কাছে যখন খবর এলো যে 'বয়লা' গ্রামে আমরা বিয়ে করে বসে আছি বা অপেক্ষা করছি, তখন উনি উত্তেজিত হয়ে বলেন যে শেষে যেয়ে আমার শত্রুপুরীতে তারা এই কাজটা করল! উনি নাকি ভিজে চোখে জামা কাপড় পরে ধীরে ধীরে ওঁনার ডাক্তারখানায় চলে যান। অন্যদিকে আমার বাবা আপিসে না যেয়ে বাড়িতেই বসে থাকেন। পাড়ায় ধীরে ধীরে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, পড়তে থাকে শহরে, স্কুলে, কলেজে, আপিসে, কাছারিতে। আমাদের দুই বাড়িতেই লোক সমাগম হতে থাকে।

ওদিকে 'বয়লা' গ্রামেও শহর থেকে আমাদের পরিচিত অনেকেই এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে যায়। বাণীদের কলেজের কিছু ছেলে এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলে যে বাণীর সহপাঠী কলেজের ছাত্রীরা 'বয়লা' গ্রামে দলবেঁধে রওনা হলে, প্রিনসিপ্যাল ডঃ ডি. এল. দাস অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের নিবৃত্ত করেন। বাণীর বাবা ছিলেন কলেজের গভারনিং বডির একজন মেম্বার এবং প্রিনসিপ্যালের বন্ধু। কিশোরগঞ্জের "বার" লাইব্র্যারিতে, আমার ও বাণীর বাবার বহু বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেখানে আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়। সেখানে বাণীর বাবার খুব অন্তরঙ্গ ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমার বাবারও বিশেষ পরিচিত এক উকিল ভদ্রলোক অন্য আরও কিছু উকিল বাবুদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন, এবং বাবাকে জোর দিয়ে বলেন যে তিনি যেন আর বিলম্ব না করে আমাদেরকে বাড়িতে নিয়ে এসে (বাণীকে) বৌ-বরন করার ব্যবস্থা করেন। উনি আরও বলেন যে আমার বাবা যদি এতে অমত করেন তবে উনি যেয়ে আমাদের দুজনকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে যা করার সব করবেন।

ঐ উকিলবাবুরা বাবাকে ও আমাদের এক পাশের বাড়ির পোষ্টমাস্টার মহাশয়কে সব বুঝিয়ে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে 'বয়লা' গ্রামে আমাদের বিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন' অন্যদিকে আমরা তখন সেই রাতেই সুরমা মেলে শিলচর রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। মনে হয় বেলা চারটের সময় বাবা ও পোষ্টমাস্টার মশাই বিয়ে বাড়িতে পেঁাছে, আমাদের নিয়ে যেতে চাইলে, আমি কতকগুলো কারণ দেখিয়ে অমত করি। আমরা দুজনেই বাবা ও পোষ্ট-

মাস্টার মশাইকে প্রণাম করে, সেই রাতেই শিলচর চলে যাবার বাসনা প্রকাশ করি। তখন বাবা ও তার সঙ্গের ভদ্রলোক "বার" লাইব্র্যারির আলোচনা ও উকিল-বাবুদের, বিশেষ করে বাণীর বাবার উকিল বন্ধুর কথা আমাদের বললে আমরা আমাদের বাড়ি যেতে রাজি হই। উক্ত উকিল মশাই আমাকেও খুব স্নেহ করতেন। ঐ ঘোড়ার গাড়িতেই বাবা ও পোষ্টমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আমরা বাড়ি রওনা হই। পথে ওয়ালিনোয়াজদের বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি শহরের দিকে যাবার সময় বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ওয়ালিনোয়াজ হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানান। বিকেল পাঁচটায় ঘোড়ার গাড়ি আমাদের বাড়ি পেঁছায়। উঠানে দাঁড়িয়ে মা আমাদের বরন করে নেন। বাড়ির সুমুখের বিরাট পুকুরের চারপাশে ভর্তি বাড়ি। আমি ও বাণী ঐ পুকুর পাড়ের দু বাড়ির ছেলে মেয়ে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামার সময় লক্ষ্য করেছিলাম যে প্রত্যেকটা বাড়ির সুমুখেই মেয়ে ছেলেদের ভিড়। আমাদের দেখছে কিন্তু সঙ্কোচে কেউ আমাদের বাড়ি আসেনি। কেউ বোধ হয় একটা ঢুলি ঠিক করে রেখেছিল, সে তার ঢোল বাজিয়ে যাচ্ছে। আমার হঠাৎ খেয়াল হতে সে বাজনা বন্ধ করে দিলাম। নিয়মিত অনুষ্ঠান শেষ হলে আমরা দুজন সকলের সঙ্গে আমাদের বড় ঘরে যেয়ে বসলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ বসা গেল না। আমার বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত অনেকেই একে একে আসতে লাগল। বৈঠকখানা ঘরে বাণীকে নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিনন্দন গ্রহণ করতে হলো। অন্যদিকে বাণীর কলেজের সহপাঠীরাও অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত হলো। একটা কথা সবাই বলাবলি করছিল যে বিয়েটা এতে হৈ-হাঙ্গামা না করে, স্বাভাবিক ভাবেই তো হতে পারত!

সেদিন ছিল বিয়ের 'কাল' রাত্রি। সুতরাং সেই রাতে আর বাণীর সঙ্গে আমার দেখা হল না। বিয়ের রাতে তো আমরা ঘুমুতে পারিনি, তাই সেদিন সন্ধ্যা রাতের একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি বৈঠকখানা ঘরে, বাণী মার ঘরে। কিন্তু মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন কোন ঝড়-বৃষ্টি ছিল না। ঘরের দরজা খুলে বাড়ির ভেতরের উঠোনের অন্ধকার এসে দাঁড়ালাম। মন চাইলেও বাণীকে ডাকতে পারলাম না। সেখান থেকে এসে বাড়ির সুমুখেই সেই বিখ্যাত পুকুর পাড়ের রাস্তায় দাঁড়ালাম। চারদিকে ঘুটঘুট অন্ধকার, জন-মানবের কোন সাড়া নেই। কোথাও একটু আলোর রশ্মিও চোখে পড়ল না। সুনাসান নীরব নিঝুম রাত্রি আর শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। পুকুরপাড়ের চারদিকের বাড়িগুলো নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে আবছা আবছা দেখা যায়। প্রয়াত

শরৎ চাটুজ্যের আঁধারের রূপের সেই বিখ্যাত বর্ণনা মনে করিয়ে দেয়। রাস্তার উপরেই আমাদের বৈঠকখানার খোলা বারান্দায় একটু বসলাম। বিগত পাঁচ-ছ বছরের কত ঘটনাই একে একে কল্পনায় ভেসে উঠল। ওখান থেকে বাড়ির দক্ষিণ দিকের রাস্তায় আমাদের বড় ঘরটার পাশে এসেই মনে হল, একদিন পূর্বে আমাদের 'শুভযাত্রার' পথে, বৈঠকখানা ঘর থেকে আমরা বার হয়ে এই ঘরের পাশ দিয়ে তো অগ্রসর হয়েছিলাম। মার সঙ্গে বাণী এখন ঐ ঘরেই ঘুমুচ্ছে। কারো কারোর নাক ডাকার শব্দ পাচ্ছি। আবার ফিরে এসে বাড়ির ভেতরের উঠোনে, যেখানে ইজিচেয়ারে বসে সুরমা মেলে শিলচর রওনা হবার পূর্বে চোঙ্গ ফুঁকিয়ে গান শোনাতাম, সেইখানে দাঁড়ালাম। মনে হলো আরতো বাণীকে এভাবে গান শোনাবার প্রয়োজন হবে না। ওখান থেকে বাসনা মাসিমাদের বাসার পাশ দিয়ে আমাদের বাসার একেবারে পশ্চিম সীমানায় এসে, বাণী তাদের বাড়ির যে কোঠা ঘরটায় থাকত, নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোতে সেই দিকে তাকিয়ে মনে হলো, গত রাতেও তো রাত্রি এগারটা অবধি ঐ ঘরে সে শুয়েছিল। আর আজ ঘুমুচ্ছে আমাদের বাসার বড় ঘরে। চব্বিশ ঘণ্টায় কতই না পরিবর্তন! ঠিক আমার বা পাশেই আমাদের সীমানায়, সেই নিশা কুমুদের ঘর, আমার বিগত চার-পাঁচ বছরের সাময়িক গোপন আশ্রয়। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনে হল, গত চার-পাঁচ বছরের, আমার ও বাণীর প্রায় মধ্যযুগীয় লড়াই এর কি আজ অবসান হলো! লড়াই এর আনন্দ আছে, জয়ের তো আরও। কিন্তু ঐ আনন্দের পরে, 'লড়াই শেষ' এর একটা বিষাদও বোধ হয় মনকে আচ্ছন্ন করে। এই সব ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে এসে এক সময় বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে কিছু বয়স্ক ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এলেন। পূর্বে উল্লিখিত বাণীর বাবার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ বীরের স্নেহধন্য ডঃ সুনীল বিশ্বাসও এলেন। আমরা তাঁদের প্রণাম করলে, তাঁরাও আমাদের জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমাদের তো কোনও দোষ দিতে পারিনে। বিয়েটা ভালভাবে সম্পন্ন করার সবরকম প্রচেষ্টাই তোমরা করেছ। আমরাই কিছু করতে পারিনি। হেমবাবু আমাদেরও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বাবাকে তিনি বললেন, "মানিক আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান আর বাণী ডাক্তারের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ডাক্তার জেদাজেদি না করলে, এ বিয়ে তো কত ধুমধাম করেই করা যেতো। এই সব নানা কথাবার্তার মধ্যে, এক সময় ডঃ সুনীল বিশ্বাস আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, যে যতক্ষণ তোমরা এখানে থাকবে, ততক্ষণই

দুই বাড়িতে লোকের ভিড় হবে, হবে নানা রকমের কথাবার্তা। এতে ধনদার (ডাঃ বীর) মনের উপর খুব চাপ পড়ছে। তাই তিনি বলেছেন যে দুএক দিনের মধ্যে তোমরা এক মাসের জন্য শিলচর চলে যাও। এর মধ্যে সব হৈ-হট্টগোল কমে যাবে। তোমরা তখন এসে আবার এখানে একমাস থেকে যেও। আমার পরামর্শে, সুনীলদা বাবা ও মাকে বুঝিয়ে বললে, তাঁরাও এই ব্যবস্থায় রাজি হলেন।

কিশোরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম শহরতলিতে, 'হয়বৎ নগরে' বাস করতেন প্রাচীন ও অভিজাত এক মুসলমান জমিদার পরিবার। এঁরা ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। এই পরিবারে সকলের চেহারা ও শরীরের রং দেখে এঁদের 'খানদান' অনুমান করা যেতো। ঐ বাড়ির নাম ছিল 'দেওয়ান সায়েবের বাড়ি'। লোকমুখে শুনেছি, তাঁদের পূর্ব পুরুষের কেউ বাংলার এক ভুঁইয়া প্রয়াত ঈশা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে ঈশা খাঁর এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল। বাণীর দাদু প্রয়াত জ্ঞান চন্দ্র বীর মহাশয়ের মুখে শুনেছি, বর্ধমানের রাজ-পরিবারের সঙ্গে, ওঁদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ চিঠির আদান-প্রদান ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাণীর উক্ত দাদু কিছুদিন ঐ দেওয়ান সায়েবের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এই কারণে ঐ দুই পরিবারের মধ্যেও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। স্থানীয় অফিসারস্ ক্লাবে তৎকালীন দেওয়ান সায়েব টেনিস খেলতেন। বাণীর বিয়ের খবর জেনে উনি আমাদের বাড়িতে এসে, বাণীকে একটা গিনি দিয়ে আশীর্বাদ করেন এবং আমার সঙ্গেও কিছুক্ষণ আলাপ করে যান। অন্যদিকে আবার দেওয়ান সায়েবের উপস্থিতির খবরে, আমাদের বাড়ির সুমুখেও তাঁকে দেখতে লোকের ভিড় হয়।

আমাদের বিয়ের পর, বহুস্থান থেকেই অনেকের অভিনন্দন পত্র আসে। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে সবই হারিয়ে গেছে। শুধু একখানার প্রথম পৃষ্ঠা খুঁজে পেয়ে, সেখানাই এখানে দিলাম।

R. S. A. FILM CORPORATION

Calcutta, 1. 10. 1946.

প্রিয় মাণিক ও বাণী,

তোমরা আমার স্নেহাশীর্বাদ ও ভালবাসা গ্রহণ করো। আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কুশলে আছ। মামার পত্রে বিস্তারিত অবগত হয়েছি। আজ তোমাদের দুর্দশাকেই যে কি ভাবে অভিনন্দিত করব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করুন এই আমার আন্তরিক একমাত্র প্রার্থনা।

পৌরুষোচিত নির্ভীক কর্তব্যসম্পাদন তোমাদের সদশিক্ষার ও মনুষ্যত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই। নানা বাধাবিঘ্ন ও অত্যাচারে ভেঙ্গে না পড়ে একান্ত লক্ষ্যে যে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সেটার বুনিয়াদ এমন মজবুত করে গড়ে তুলবে যাতে বিংশ শতাব্দীর (!) দৃষ্টিভঙ্গী হীন পঙ্গু হিন্দুসমাজের প্রত্যেক বাপকেই তাঁদের দৃষ্টি ভঙ্গিমাকে নূতন ছাঁচে ঢেলে তোমাদের হাতে হাত মিলিয়ে পঙ্গু সমাজকে পুনর্জীবিত করে তুলতে সমর্থ হয়। যদি তোমাদের আদর্শে একজন বাপকেও অনুপ্রাণিত করে তোমাদের পাশে এনে দাঁড় করাতে পার, তবেই হবে তোমাদের সত্যিকারের সিদ্ধিলাভ, জয় ও পুরস্কার।

আমি আগে থেকেই তোমাদের এই ব্যাপার কতকটা জানতাম। আমি সর্বান্তকরণে তোমাদের এই মধুর মিলন সমর্থন করি।

বিঃদ্রঃ—চিঠিখানার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা বা শেষ পাইনি। প্রায় ৫০ বছরের পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রথম পাতাটি নজরে পড়ে। চিঠির লেখক আমার চাইতে দশ বছরের বড় আমার মাসতুত ভাই শ্রী অনিল দত্ত। উনি এখনও জীবিত এবং আমার বাড়ির নিকটেই ওঁনার বাড়ি।

আমাদের বিয়ের পূর্বে ও পরে, অনেক বিচিত্র ঘটনাই ঘটেছে, বই-এর কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে যার অনেক কিছুই লেখা সম্ভব হয়নি। শুধু সদ্য ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বলছি। আমাদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১লা আগস্ট। আর গত ১৯৯১ সালের ৩রা নভেম্বরে, প্রয়াত বাণীর ছোট বোন হিমানী, বাণীর সমবয়েসী খুড়তুত বোন রেখা ও তাঁর বর দেবব্রতবাবুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম, রেখারই ছোট বোন কৃষ্ণার আমন্ত্রণে, হাওড়া-শিবপুরে বি. ই. কলেজের অধ্যাপকদের কোয়ার্টারে। কৃষ্ণার বর ঐ কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুজিত কুমার রায়। কৃষ্ণাও খুব উচ্চ শিক্ষিত—কলকাতার 'ডন্ বস্কো' স্কুলের শিক্ষিকা। রেখাও মুর্শিদাবাদ-জঙ্গীপুরে মেয়েদের হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্তা শিক্ষিকা আর দেবব্রতবাবু জঙ্গীপুর কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক।

কৃষ্ণা ও তার ছোট বোন বাচ্চুর মতো এতো সামাজিক, হৈ চৈ এ, দিলদরিয়া ও মিশুকে মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। বাণী জীবিত থাকতে, কোনও অনুষ্ঠানে তাঁর ঐ এই দুই বোনকে দেখলেই আমি বলতাম, ঐ দেখো তোমার অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর, 'ক' ও 'খ' দুই বোন আসছে! যে সব মানুষ কাতুকুতু দিলেও হাসে না বা চিমটি কাটলেও কাঁদে না, তারাও ওদের সংস্পর্শে গেলে হাসবে, ও কাঁদবেও, এটা আমি বাজি রেখেই বলতে পারি।

যাহোক, আমরা কৃষ্ণাদের কোয়ার্টারে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই, সে আমায় বললো, "মানিকদা! এখানে আমাদের একজন প্রতিবেশী অধ্যাপক আছেন, নাম শ্রীযাদব ভট্টাচার্য (Head of the Deptt. of Mining Engineering)। তিনিও কিশোরগঞ্জের লোক। তিনি আপনাকে ও বাণীদিকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাণীদিতো আর নেই। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, আপনি আমাদের এখানে এলেই ভদ্রলোককে খবর দেব।" অধ্যাপক ভট্টাচার্য মশাই-এর এই উৎসুকের কারণ জানতে চাইলে, কৃষ্ণা জানালো যে একদিন ভদ্রলোক গল্পচ্ছলে বলছিলেন যে কিশোরগঞ্জের গ্রামে তাঁদের বাড়ি হলেও, শহরে তাঁদের মামাবাড়ি ছিল প্রয়াত প্রকাশ নন্দীর বাড়ির পাশেই। তাঁর দাদুও ছিলেন উকিল, প্রয়াত যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মাঝে মাঝেই ঐ মামাবাড়ি যেতেন। আর অতি নিকটেই মিউনিসিপ্যালিটির বড় পুকুরে, ঠিক ডাঃ প্রফুল্ল বীরের বাড়ির সুমুখের পাকা বাঁধানো ঘাটে স্নান করতেন। ডাঃ বীরের বাড়ির উত্তর দিকেই ছিল, কৃষ্ণাদের কোঠা বাড়ির পিত্রালয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন যে ১৯৪৬ সালে, একদিন ঐ পুকুরে স্নান করতে গিয়ে শোনেন যে, ডাঃ বীরের বাড়িতে উচ্চস্বরে খুব রাগারাগি হচ্ছে, তার মধ্যেই কেউ বললো যে, 'মাইন্কারে এখন পাইলে, কাইট্টা ফালাইতাম,' ইত্যাদি। (মানে, মানিককে এখন পেলে কেটে ফেলতাম)। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মামাবাড়িতে ফিরে এসে ঘটনাটা বললে, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা জানতে পারেন। তাঁর দাদু নাকি বলেন "মানিক ছেলেটিতো খারাপ নয়, আমরা সকলেই তাকে চিনি। ডাক্তার বীর এত রাগারাগি করছেন কেন" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণা তখন অধ্যাপক ভট্টাচার্য মশাইকে বলে যে ঐ মাইন্কা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী মানিকদা আর মেয়েটি আমাদের জেঠতুত দিদি বাণী। এতেই হয়তো ভট্টাচার্য মশাই আমাদের দেখার জন্য উৎসুক হন।

খবর পেয়ে ভট্টাচার্য মশাই কৃষ্ণাদের কোয়ার্টারে এলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয় হয়। অতি সুন্দর ভদ্রলোক আলাপ ও পরিচয়ে খুব আনন্দ পাই। ৪৫ বছর পূর্বের ঘটনার পর এই পরিচয়। ভদ্রলোকের মামাবাড়ির কিছু কিছু লোককে মনে করতে পারি। আমার ছোট বোন হেনার মনে হয় ঐ বাড়িতে খুব যাতায়াত ছিল।

সন্ধ্যের পর, একটা প্রাইভেট কারে, টালিগঞ্জে ফিরে আসার পথে, প্রায় সারাক্ষণই সেই ৪৫ বছর পূর্বের সুখস্মৃতিগুলো, একটার পর একটা মনে

পড়াছিল। তখন আমার বয়েস পঁচিশ কি ছাব্বিশ, আর এখন একাত্তর! জীবনের কত পরিবর্তন! কি করে, কোথায়, কেন, হারিয়ে গেল, 'সেই সোনার মোড়া দিনগুলি!' বারে বারে নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কোন সদুত্তর পাইনি!

ফেরার পথে, হিমানী বলেছিল, মানিকদা! আজকের ঘটনাটা আপনার বই-এ দেবেন না? কোন উত্তর দিতে পারিনি। মনে মনে ভাবছিলাম, বই-এর অনেকটাই ছাপা হয়ে গেছে। এখন কি আর কিছু যোগ করা যাবে?

যাক আবার পুরানো ঘটনায় ফিরে আসি। পরের দিন ছিল ফুলশয্যার রাত্রি। আমার কথা মত আমাদের বৈঠকখানা ঘরের বিছানায় হেনা কয়েকটা গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি রাত্রির খাওয়া সেরে, আমি ও বাণী ঐ বিছানায় শুয়ে রাত্রি বারটা পর্যন্ত গল্প করলাম। তারপর রাত সাড়ে বারটায় বাড়ির সকলকে প্রণাম করে আমি ও বাণী ঘোড়ার গাড়ি চেপে শিলচরের উদ্দেশে রওনা হলাম কিশোরগঞ্জ স্টেশনে। ব্যবস্থা হয়েছিল যে যেহেতু শিলচরে আমার আলাদা কোন বাসার বন্দোবস্ত ছিল না, সে জন্য ডাঃ সুনীল বিশ্বাসের আপন ভগ্নিপতির বাড়িতে যেয়ে উঠব। এজন্য সুনীলদা তার ভগ্নীপতি ও দিদিকে চিঠি দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে (সুনীলদার) আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতেই শিলচরে পাঠিয়ে দিলেন। সুনীলদাও আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতেই স্টেশনে এলেন আমাদের তুলে দিতে। কিশোরগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে দেখি, সেই পূর্বে উল্লিখিত কয়েকজন কিশোরগঞ্জের পি, পু, ফি, শু রাজনৈতিক পার্টির কমরেড আমাদের বিদায় জানাতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এরা কয়েক জনই ঐ দলের সরল ও নিষ্পাপ সভ্য ছিল। তাদের দেখে আমরা আনন্দিতই হয়েছিলাম। তারা আমাদের হাতে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' বইখানা উপহার হিসেবে তুলে দিল।

যাহোক, সুরমা মেল কিশোরগঞ্জ স্টেশনে সময় মতই এসে দাঁড়ালো। ঐ গাড়ি থেকে আমার ভগ্নীপতি রবি প্ল্যাটফরমে নেমেই আমাকে ও সিঁথিতে সিঁদুর মাখা বাণীকে আমার সঙ্গে দেখে তো অবাক! হাতে সময় ছিল না। গাড়িতে উঠতে উঠতেই তাকে বললাম, বাসায় গেলেই সব জানতে পারবি! পরে শুনেছিলাম ময়মনসিংহ শহরের আমার শিলচরের বন্ধু ধীরেন চন্দের এক খুড়তুত বোনের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে রবি সেদিন কিশোরগঞ্জে আমাদের বাসায় এসেছিল।

পরের দিন বেলা ন'টা নাগাদ, আমি বাণী ও বৌদি (সুনীলদার স্ত্রী) শিলচরে সুনীলদার বোনের বাড়িতে পেঁছুলাম। সুনীলদার ভগ্নীপতি ছিলেন শিলচরের উকিল। আমাকে চিনতেন, কিন্তু আলাপ ছিল না। ঐ রকম হঠাৎ বিয়ে করে শিলচরে পেঁছুলে, অফিস ও পরিচিত মহলে একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেল। পাঁচ সাত দিনতো এ বাড়ি সে বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়েই কেটে গেল। সেই উচ্চুঙ্গা সুপার সাহেবও একবেলা আমাদের নেমন্তন্ন খাওয়ালেন। তার-পর আবার কাছাড় জেলার দুয়ারবন্ধ চা বাগানের অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার শ্রী গৌরব মিত্রের আমন্ত্রণে, দুদিন ছুটি নিয়ে শিলচর থেকে তাঁর বাংলোতে আমি ও আমার স্ত্রী বাণী বেড়াতে গেলাম। বন্ধু ধীরেন চন্দ ও অভীক চাকলাদারও শিলচর থেকে আমাদের সঙ্গী হলো। এরা দুজনই গৌরবের বন্ধু স্থানীয়। গৌরব ও তার স্ত্রী আমার পূর্ব পরিচিত। আর ঐ বাগানেই কর্মরত ছিল আমাদের সহকর্মী অরুণ বসু। শিলচর থেকে বেশ অনেকটা দূরে আইজলের রাস্তায়, একটা মনোরম টিলার উপর গৌরবের ঐ বাংলো বাড়ি। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। সেখান থেকে একটু সবুজ জমি নেমে গেছে নিচে পিচ ঢালা রাস্তার পাশে। এই রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে মিলিটারি ট্রাক ছুটে চলে যায় তৎকালীন লুসাই পাহাড়ের (বর্তমানে মিজোরাম) হেডকোয়ার্টার আইজল বা অন্য কোন গন্তব্যস্থানে। প্রয়াত জওহরলাল নেহরুর আইজল রোড সর্ব সাধারণের যাতায়াতের জন্য উদ্বোধন করার অনেক পূর্বের কথা এটা।

শুক্লপক্ষের প্রায় পূর্ণ চাঁদের এক সন্ধ্যায় ঐ বাংলোর সামনের বারান্দায় আমরা ৬ ৭ জন বসেছিলাম চায়ের আড্ডায়। চারদিক প্রায় একেবারে নিস্তব্ধ। কিছুদূরে সমান করে ছাঁটা দিগন্তবিস্তৃত চা গাছের উপর চাঁদের আলোর ছটায় একটা কেমন enchanting বা মোহময় আবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যে পরিবেশে ভূতের গল্প বেশ জমে ওঠে, যে পরিবেশ প্রয়াত ইংরাজ কবি কলরীজের, 'দ রাইম অব্ দি অ্যানসিয়েণ্ট ম্যারিনারের' কথা মনে করিয়ে দেয়, অনেকটা তেমনি। দূরের টিলার উপরের কয়েকটা বাংলো থেকে বিজলি বাতির সামান্য আলোর ছটা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। বিস্তৃত চা বাগানের মাঝে মাঝে কিছু বড় বড় গাছ যেন চাঁদের আলো-আঁধারিতে বিরাটকায় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে। ফুরফুর করে হাওয়া বয়ে চলেছে, চারদিকে ঝিঁঝি পোকার ডাক। আমার একটু ভাবালুতার বদনাম আছে বলেই হয়তো সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তাতে একেবারে জল ঢেলে দিল বন্ধুবর ধীরেন চন্দ। 'যাযাবর-এর' বিখ্যাত

লেখা 'দৃষ্টিপাত' তখন কোন সাপ্তাহিক কি মাসিকপত্রে বার হচ্ছিল। 'চন্দ' ওটা পড়ে বোধ হয় খুব ইমপ্রেস্ট্ হয়েছিল, তাই নীরবতা ভেঙে সে বলে উঠলো যে 'পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণের পর বাংলা সাহিত্যে মনে হয় যাযাবরের ছদ্মনামে উঠে আসছে আর এক উজ্জ্বল তারকা। 'দৃষ্টিপাত' পড়া না থাকায় সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করে, ঐ লেখক সম্বন্ধে আরও জানতে চাইলে, চন্দ লেখাটার বিষয়বস্তু নিয়ে সামান্য আলোচনা করে বলে যে ভদ্রলোকের প্রকাশভঙ্গি সত্যি অসাধারণ। গোড়ার দিকেই লিখেছেন, "আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ।" অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, "দুজন ইংরেজ একত্র হলে গড়ে একটা ক্লাব, দুজন স্কচ্ একত্র হলে খোলে একটা ব্যাঙ্ক, দুজন জাপানি একত্র হলে করে একটা সিক্রেট সোসাইটি, আর দুজন বাঙালি একত্র হলে করে একটা কালীবাড়ী।" লেখার মধ্যে বেশ মুনশীয়ানা আছে। উপস্থিত সকলেই বাংলা সাহিত্যের এই নবতারকার আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে লেখাটা পড়বার জন্য মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রের নামটা জেনে নিলে, আমার স্ত্রী বাণী 'চন্দকে' বললেন, "জানিনা ঠাকুরপো, আপনি রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' পড়েছেন কিনা, ওতে কিন্তু এমন বহু প্রকাশভঙ্গি আছে যেগুলো সুন্দর তো বটেই, অত্যন্ত গভীরও।" সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালে উনি বললেন, "যেমন ধরুন 'ফ্যাশান আর স্টাইল' নিয়ে রবিঠাকুর অমিতর মুখ দিয়ে বলছেন, ফ্যাশানটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নিচে ব্যবসাদার নাচওয়ালীর দর্শন মেলে কিন্তু শুভ দৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হলো ফ্যাশানের, বেনারসি হলো স্টাইলের-বিশেষ মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্য।"

একটু থেমে তিনি বললেন, "আরও মনে পড়ছে, অমিতের বোন লিসি, বিমি বোসের সঙ্গে অমিতর বিয়ের ওকালতি করে বলে বিমিতো বটানিতে এম এ.। ফারস্ট ক্লাস ফারস্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।" অমিত জবাব দেয়, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে, তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে। আলোর আছে দীপ্তি।" বাণী আরও বলেন যে কবিগুরু কতবড় রসিক ও প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর প্রকাশনের ধারাই বা কি চমৎকার ছিল, সেটা বোঝা যায়, শিলং পাহাড়ে লাবণ্যর সঙ্গে অমিতর প্রথম সাক্ষাতের পরেই, ঘরে ফিরে এসে অমিত লাবণ্যর কন্ঠস্বর

সম্বন্ধে তার নোটবই খুলে লিখলো, "এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপ জলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

আমি ও অভীক বললাম যে, এতো প্রায় এক তরফা হয়ে যাচ্ছে, অন্যরাও কিছু বলুন! গৌরব বলল, আমার কাজ হচ্ছে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, চা-বাগানের কুলি-কামিন নিয়ে; সাহিত্য চর্চা আমার ঠিক আসেনা, অবশ্য আমার অর্ধাঙ্গিনী হয়তো কিছু বলতে পারেন। শ্রীমতি মিত্র আমাকে বললেন যে আপনিতো মাপু-টংপু ঘুরেছেন, আপনি কিছু বলুন না। আমি বললাম, মংপু দেখে এসে বলার মতো আমার তেমন কিছু মনে পড়েনি, কিন্তু একটা অসাধারণ আনন্দ পেয়েছিলাম এই জন্যে যে মৈত্রেয়ী দেবীদের যে বাংলোতে কবিগুরু মনে হয় চারবার গিয়েছিলেন, সেই বাংলো ঘুরে ঘুরে দেখার শেষে, কেয়ার-টেকার যখন Visiter's বুকখানা সই করার জন্য আমার সামনে ধরলো, আমি একটু পাতা উল্টে পেছনের দিকে কে কি লিখে গেছে দেখতে যেয়ে লক্ষ্য করলাম, মাত্র দুদিন পূর্বেই মৈত্রেয়ী দেবী স্বয়ং এই বাংলোতে এসে Visiter's বুকে প্রায় একটা অনুচ্ছেদ কি সুন্দর করেই না লিখে গেছেন। আমিতো প্রায় চীৎকার করে সেই খাতাখানা আমার সব সঙ্গীদের সামনে মেলে ধরলাম আর সবাই তাতে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভাবুন একবার, যে লেখিকা এই বাংলোতে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন, চার-চার বার পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও মানুষকে এই বাংলোতে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন এবং দৈনন্দিন কথা-বার্তা ও নানান ঘটনার তাৎক্ষণিক নোট লিখে রেখে, কবিগুরুর মহা প্রয়াণের পরে পরেই 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' লিখে শুধু কবিগুরুর নানান আনন্দদায়ক দিকই আমাদের কাছে তুলে ধরেননি, তেতো কুইনাইন প্রস্তুতকারি একটা কারখানা ও অখ্যাত মংপুর মত স্থানকে আমাদের কাছে একটা তীর্থস্থান করে তুলেছেন, সেই প্রিয় লেখিকাকে মাত্র দুদিনের জন্য আমরা সাক্ষাৎ করতে না পারায় সকলেই হা-হুতাশ করতে লাগল, আমাদের অবস্থা দেখে নেপালি কেয়ার টেকার তখন মুচকি হাসছে।

ওদিকে সঙ্গীরা সকলেই আমাকে চাপ দিতে লাগল যে ওদের তো লেখা আসে না, আজকের সকলের অনুভূতি আমি যেন ঐ Visiter's বই-এ লিখে রেখে যাই। কোন কিছু লেখার কথা এখানে আসার পূর্বে আমার মনেই আসেনি, Visiter's বই সই করে চলে যাব, এটাই শুধু মনে ছিল। যাহোক সঙ্গীদের

চাপেই হোক বা নিজের মন থেকেই হোক, লেখার একটা অনুপ্রেরণা পেলাম, লিখলাম ঃ—"মনে হয় স্কুল জীবনের শেষে বা কলেজ জীবনের প্রারম্ভে, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পড়ে মনে বাসনা জেগেছিল, এই স্থানটি দেখতেই হবে। বহু বছর পরে আজ সেই সুযোগ এলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত তাঁর শয়ন কক্ষ, বৈঠকখানা ঘর, তাঁর সময়ের দুতিন পাতা খবরের কাগজ, কবির ব্যবহৃত হোমিওপ্যাথি বা বায়োকেমিক ওষুধ রাখার কাঠের ছোট বাক্স, বাংলোর সুমুখের সবুজ প্রাঙ্গণের ডান দিকের শেষে, একটা চারদিকে কাচের জানালা ঘেরা গোল ঘর, সেখানে বসে উনি প্রাত্যহিক ভোরের চা সেবন করতেন। এই সব দেখে যেমন বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হলো আর ধন্য হলো জীবন, তেমন আবার 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ-এর' সঙ্গে যিনি তাঁর লেখা দিয়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় লেখিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী দুদিন পূর্বে এখানে এসে গেলেও যেন তাঁর সান্নিধ্যের মাধুর্য আমাদের অনুভূত হচ্ছে। আজ কার মুখ দেখে আমরা উঠেছিলাম, মনে নেই। একদিনেই এতো আনন্দিত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত হব তা ছিল আশাতীত। তাই, বিদায়ের পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকেও জানিয়ে গেলাম আমাদের সকলের সশ্রদ্ধ প্রণাম।"

শ্রীমতী বাণী বললেন, "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" বইতেও কবিগুরুর অনেক রসিকতা আছে, যথা নিকষকালো রং-এর তাঁর প্রিয় ভৃত্য, যতদূর মনে পড়ে, বনমালীকে উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মংপু ওর কেমন লাগছে। বনমালী বলেছিল, খুব ভাল, কর্তামা রোজ তাকে দুধ খেতে দেন। জবাবে কবি বলেছিলেন, কর্তামাকে বলিস প্রত্যহ তোর শরীরে দুধ মাখাতে।

এমন সময় অভীক বললো, সত্যি মিথ্যা জানি না, তবে কবিগুরুর এমন একটা রসিকতার গল্প প্রচলিত আছে যে শান্তিনিকেতনে প্রাত্যহিক সকালের আসরে রবীন্দ্রপ্রেমিক প্রমথ বিশি মহাশয় উপস্থিত থাকতেন। কবিগুরু কথা-বার্তার ফাঁকেই ফিকে লাল রং-এর এক গ্লাস তরল পদার্থ খেতেন। বিশি মহাশয় জুল জুল নয়নে ঐ তরল পদার্থের দিকে তাকিয়ে থাকতেন দেখে, কবি একদিন তাঁর ভৃত্যকে বলেন, ওহে, এক গ্লাস প্রমথকেও দাও। প্রমথ তো তখন ভীষণ গৌরবান্বিত, আর উপস্থিত সকলেই প্রায় ঈর্ষান্বিত! গ্লাস হাতে নিয়ে, এক চুমুক খেয়েই বিশি মহাশয় টের পেলেন যে সবটাই শুধু নিমপাতার জল। তখন তিনি না পারেন গলাধঃকরণ করতে, না পারেন ওগ্‌লাতে। পরের দিন দেখা গেল,

সকালের আসরে বিশি মহাশয় অনুপস্থিত।

এই সময় আমারও বিশি মহাশয়ের একটা গল্প মনে পড়ে গেলে বললাম, উনি মনে হয় খুব শরৎ চাটুজ্যের বিদ্বেষী ছিলেন, যে জন্য অনেকের সন্দেহ যে ছদ্মনামে শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব লেখার চেষ্টায়, হারিয়ে যাওয়া ইন্দ্রনাথকে সাধুর বেশে ফিরিয়ে এনে রাজলক্ষ্মীকে তার দ্বারা ইলোপ করান, কিন্তু সেই লেখা বাজারে চলেনি। অন্যদিকে "দেবদাস-এর" কাহিনী বাজারে বার হলে যখন চতুর্দিকে 'বাহবার' হৈ, চৈ পড়ে যায়, তখন বিশি মহাশয় নাকি টিপ্পনী কেটে বলেছিলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে কি আর বারাঙ্গনাদের এমন বাস্তব চিত্র তুলে ধরা যায়? শরৎ চাটুজ্যের কানে একথা পৌঁছুলে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'অভিজ্ঞের হাতে ধরা পড়ে গেলাম।'

এবার তার গভীর নীরবতা ভেঙ্গে আমি বর্তমান আলোচনার উত্থাপক পিউরিট্যান ধীরেন চন্দকে কিছু বলতে বললে, সে বলে যে রবীন্দ্রনাথের 'সাজাহান' কবিতা নিশ্চয় সকলেরই পড়া আছে। একনিষ্ঠ প্রেমের উপর এমন সুন্দর কবিতা আর কেউ কোথাও পড়েছেন কি?

আমার মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল, 'সাজাহান'-এ কবি একনিষ্ঠ প্রেমের কথা কোথায় লিখেছেন বুঝি না। শরৎ চাটুজ্যের 'শেষ প্রশ্ন'-তে কমল বলছেন, "তার তো শুনেছি আরও বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকেও ভালবাসতেন। হয়তো মমতাজকে কিছু বেশি হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না, সে তার ছিল না।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী বাণীও বলে উঠলেন, শুধু 'শেষ প্রশ্ন-র' কমল কেন, স্বয়ং রবি ঠাকুরও তো তাঁর 'শেষের কবিতায়' লাবণ্যের মুখে প্রশ্ন তুলেছেন, 'আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্য সাজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্য এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড় প্রেমের দান। তাজমহলে সাজাহানের শোক প্রকাশ পায়নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।'

'শেষের কবিতা' বার বার পড়ে আমার নিজেরও মনে হয়েছে, কবিগুরু কি সত্যিই তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের প্রচারক ছিলেন? শুনেছিলাম, কোন এক বিদেশী কবিকে তার প্রাণাধিক প্রিয় প্রেমিকা বিয়ের প্রস্তাব দিলে, সেই কবি নাকি বলেছিলেন, "প্রেমিকা হিসেবে তাকে হারাতে চান না বলেই তিনি তাকে বিয়ে করতে পারেন না।" শেষের কবিতায়ও দেখি, অমিত লাবণ্যকে প্রাণভরে

ভালবেসেও বিয়ে করার জন্যে খুব একটা চেষ্টা করল না, বিয়ে করল সেই কেটি মিটারকেই যাকে সে সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চায়নি, যদিও সাত ব'ছর পূর্বে ইংলেন্ডে এক জ্যোৎস্নাস্নাত রোম্যান্টিক রজনীতে অমিত কেটির হাতে একটা হীরের আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সাত ব'ছর পরে অমিতর চোখে কেটি অনেক বদলে যায়। অন্যদিকে, কেটিকে বিয়ে করার সবকিছু ঠিক করেও, আর লাবণ্যের সঙ্গে শোভনলালের বিয়ে হচ্ছে জেনেও, অমিত লাবণ্যের ছাত্র যতিকে বলছে, "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্য ও আমার যে ভালবাসা সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

লাবণ্যকে অমিত লিখে পাঠাল—

"তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,/অন্তরের অলক্ষ্যালোকে তোমার অন্তিম আগমন।/লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি ;/আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।/জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান/সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।/বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে/পূজা মূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।"

লাবণ্য এই কবিতা পেয়ে, আরও অনেক কথার সঙ্গে অমিতকে জানাল—

"কোনদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে./বসন্ত বাতাসে/অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস/ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,/সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে তোমার প্রাণের প্রান্তে ;/বিস্মৃত প্রদোষে/হয়তো দিবে সে জ্যোতি, হয়তো ধরিবে কভু নাম হারা স্বপ্নের মূরতি। তবু সে তো স্বপ্ন নয়,/সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,/সে আমার প্রেম।/তারে আমি রাখিয়া এলেম/অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।/পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে/কালের যাত্রায়।/হে বন্ধু, বিদায়।

লাবণ্য তার কবিতার একেবারে শেষে লিখেছে—

তোমারে যা দিয়েছিনু তার/পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।/হেথা মোর তিলে তিলে দান,/করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান/হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।/ওগো তুমি নিরুপম/হে ঐশ্বর্যবান,/তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;/গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।/হে বন্ধু বিদায়।

এইসব ভেবে চিন্তে, আমার বার বারই মনে হয়েছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কি, সেই প্রাচীন ও প্রচলিত একটা সত্যকেই বিশ্বাস করতেন যে "Man

chooses women not wife !"

আমার এই কথা বা প্রশ্নের উপর সেদিন উপস্থিত কেউ কোন মতামত প্রকাশ করেননি। বেশ কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ থাকার পর, শ্রীমতী মিত্র, অনেক রাত হয়ে গেছে বলে আমাদের খাবার টেবিলে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন। খাবার টেবিলেও আর বিশেষ কোন কথা হল না। সেখানে দুদিন খুব আনন্দ, ফুর্তি ও পিক্‌নিক্‌ করে আবার শিলচরে ফিরে এলাম।

ওদিকে এক বিপদ যে ঘাড়ে চেপে বসেছিল, সেটা শিলচর পেঁছিই অবশ্য জেনেছিলাম। সেবার আমি যখন বরাবরের মত কিশোরগঞ্জে যাই, তখন বদরপুর ঘাটে থেকে গিয়েছিলাম দুতিন দিনের জন্য। তখন বরাক নদীর প্লাবনে শিলচর শহর ভেসে গিয়েছিল। ট্রেন চলাচল বদরপুর জংশন থেকে শিলচর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে পোস্টাল ডাকও। আমিও দুতিন দিনের জন্য এই সুযোগটাই নিয়েছিলাম। তখন কি আর জানতাম যে, সেবারই আমায় বিয়ে করতে হবে আর অন্যদিকে আবার একটা বিশেষ কাজের জন্য ঢাকা থেকে অ্যাসিস্‌টেন্ট কালেকটার একজন ডেপুটি-সুপারকে আমার কাছে পাঠাবে! হয়েছিলও তাই। আমি শিলচর পেঁছুবার কয়েকদিন পরই ঢাকা আপিস থেকে চিঠি পাই যে ২রা কি ৩রা আগষ্ট, ১৯৪৬ সালে ডেপুটি-সুপার বদরপুর ঘাট বা শিলচরের কোথাও আমাকে খুঁজে পায়নি। আমি তাহলে কোথায় ছিলাম? শিলচর পেঁছেই চন্দের নিকট থেকে এই বিপদের খবর পেয়ে আমি একটা ছুটির দরখাস্ত ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর আমার পিয়নকে কিশোরগঞ্জে পাঠিয়েছিলাম একটা চিঠির খসড়া দিয়ে, যে চিঠি মা আমাকে সাধারণ কাগজে লিখবেন এই বলে যে "বাবা ভীষণ অসুস্থ, এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি কিশোরগঞ্জ চলে আসবে। শিলচরে প্লাবনের জন্য চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাম বন্ধ আছে বলে লোক পাঠিয়ে এই চিঠি দিলাম।" ঢাকা আপিসে আমার চিঠির জবাবের সঙ্গে মায়ের ঐ চিঠিখানা গেঁথে দিয়ে আমি লিখলাম যে ঐ চিঠি পেয়ে কিশোরগঞ্জে পেঁছে জানলাম যে আমি বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিলাম না বলে, আমার বাবা ও মা বিয়ের সব কিছু ঠিক করে ঐভাবে আমায় ডেকে নিয়ে যখন বিয়ের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করলেন, তখন অনেক ভেবে চিন্তে পিতামাতার মনে আর ব্যথা না দিতে আমি একেবারে বিয়ে করেই শিলচর ফিরে এসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। কিছুদিন পর আমার ছুটি মঞ্জুর হয়ে এলে বুঝলাম এ যাত্রাও পার পেয়ে গেলাম। প্রতি মাসে দশদিন আমাকে বদরপুর ঘাটে

থাকতে হত। সেই সময় এলে বাণীকে নিয়েই বদরপুরে এসে টিলার উপর একটা ছোট বাংলোতে উঠলাম। এখান থেকেই প্রত্যহ বিকেলে বদরপুর চা বাগানে বাণীকে নিয়ে বেড়াতে যেয়ে খুব উঁচু একটা টিলার উপরে ম্যানেজারের বাংলোর সামনের বাগানে বসে নিচে বরাক নদী, তার উপরে রেলের সুন্দর পুল ও নদীর ওপারে ঘন সবুজ নর্থ কাছাড় হিলসের সৌন্দর্য উপভোগ করতাম। আসামের সবুজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যই বড় মনোরম!

যাহোক, একদিন বদরপুরের বাংলোতে বসে কিছু লেখা-পড়ার কাজ করছি। হঠাৎ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, নিচে কায়স্থবেড়িয়ার রাণী তার এক খুড়তুত ভাইকে নিয়ে এর তার সঙ্গে কথা বলছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, বাণীকে 'একটু বাইরে যাচ্ছি' বলে, নিচে নেমে রাণী ও তার ভাইকে 'আমার সঙ্গে চলো' বলে নিকটেই ডাকবাংলোতে নিয়ে যেয়ে তাদের ওখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, আমার ও বাণীর বিয়ের খবরটা সত্যি কিনা তা যাচাই করতে তারা শিলচর হয়ে এখানে এসেছে। আমি বললাম সেটাতো তুমি আমায় একটা চিঠি লিখেই জানতে পারতে, এতদূরে আসার কি প্রয়োজন ছিল। আরও বললাম যে, যা শুনেছো সেটা সত্যি। তুমিতো সবই জানো। যে বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম, তাতে এ বিয়ে না হওয়াটাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। ঈশ্বরের অসীম দয়ায় আমরা সফল হয়েছি। তুমি কি এটা হিংসে করবে না আমাদের মঙ্গল কামনা করবে? রাণী তার ভাইকে ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে, তার দুহাতে আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি জানো, তোমাকে পেতে আমি ঈশ্বরকে কত কায়ো-মনে ডেকেছি, তোমার মন পেতে আমার অবুঝ মনে কত কিছুই করেছি, তবু আমি জানতাম, বাণীর পাশে দাঁড়াবার যোগ্য আমি নই আর তোমরা উভয়ে যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছ, যে কঠিন লড়াই করেছ, তাতে আমার মনে যত দুঃখ-ব্যথাই হোক, তোমাদের এই মহামিলনকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তোমরা সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও। তারপর রাণী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, আমাকে প্রণাম করল এবং আশীর্বাদ চাইল। আমি তাকে বললাম—আমি কোনদিন তোমাকে ভুল বুঝিনি, ঘৃণাও করিনি। আমিও তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমিও সব দুঃখ-বেদনা ভুলে, সংসারী হও, সুখী ও দীর্ঘজীবী হও। বেঁচে থাকলে জীবনে আমাদের আবার দেখা হবে বন্ধুরূপে, শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে। ডাকবাংলোর চৌকিদারকে রাণী ও তার ভাইয়ের দুপুরের খাবার তৈরি করে দিতে, তার হাতে

কিছু বেশি টাকা পয়সা দিয়ে আসি। রাণী ও তার ভাইকে ওখানেই স্নান-খাওয়া সেরে বিকেলের গাড়িতে কায়স্থবেড়িয়ায় রওনা হয়ে যেতে বলে ফিরে আসি। বিকেলে বদরপুরের চা বাগানে নিত্যকার মত বেড়াতে যেয়ে রাণীর ঘটনাটা বাণীকে বললে সে খুব দুঃখ প্রকাশ করে। আমাদের বিয়ের পর শিলচরের কিছু কিছু ঘটনা পূর্বেই লিখেছি। আর তেমন কিছু মনে পড়ছে না। শিলচর বা কাছাড়ের জলবায়ু বাণীর বোধহয় সহ্য হচ্ছিল না, পেটে একটা ব্যথা শুরু হয়েছিল। কোনও ডাক্তারই কিছু করতে পারছিল না। এক বৃদ্ধ ডাক্তার অভিমত দিলেন যে বাণী তার জন্মভূমি কিশোরগঞ্জে গেলেই পেটের এই ব্যথা সেরে যাবে। বাণীর তখনই কিশোরগঞ্জে ফিরে যেতে একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। আমার মনেও খুব দুঃখ হচ্ছিল। তবু নিরুপায় হয়ে মাত্র এক-দেড় মাস শিলচরে থাকার পরই তাকে আমাদের কিশোরগঞ্জের বাসায় চিকিৎসা ও পড়াশুনোর জন্য রেখে এলাম। ঠিক হলো যে বাণী আর কলেজে না যেয়ে বাড়িতেই পড়াশুনো করে প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে আই. এ. পরীক্ষা দেবে। এই ঘটনা সত্যি আমাদের জীবনের একটা ট্র্যাজেডি। এখনও মনে হলে বড় দুঃখ হয়। একদিকে, আমাদের বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে বাণীদের বাড়ির পরিবেশের অনেক ফারাক। অন্যদিকে প্রায় পাশেই তাদের নিজেদের বাড়ি হলেও সেখানে তখন যাতায়াত সম্ভব নয়। বাণীর জীবনধারার এই কষ্ট আমি খুবই অনুভব করতাম বলে, চাকুরির ঝুঁকি নিয়েও মাঝে মাঝেই কিশোরগঞ্জে এসে বাণীকে সঙ্গ দিতে চেষ্টা করতাম। আমার নিকট কোন অভিযোগ না করলেও আমি বুঝতে পারতাম যে ঐ জীবনধারা বাণী ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তার চরিত্রের এও একটা মহৎ গুণ ছিল যে একেবারে অসহ্য বা অসম্ভব না হলে কোন অভিযোগ করত না। এ কথা আমি খুব জোর দিয়েই বলতে পারি যে আমাদের ঐ সময়ে, বিশেষ করে দেশ বিভাগের পরে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনের যুগে, আমরা যে সাড়ে চুয়াল্লিশ বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়েছি, তাতে আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে বহু ঝড়-ঝাপটা এলেও কোনদিন ভুল করেও সংসার ভাঙ্গার কুমন্ত্রণা বাণী আমায় দেয়নি, বরং আমাকে ওভাবে চিন্তা করতে বুঝলে আমাকে বুঝিয়েছে এটা হয় না, তুমিই তো বাড়ির বড় ছেলে, তোমাকেই তো সব সহ্য করে, সব কিছু মানিয়ে নিয়ে সংসারটাকে ধরে রাখতে হবে। এমনই সুন্দর ছিল তার মন, এমনই সুন্দর ছিল তার শিক্ষা। একথা মনে হলেই এখনও শ্রদ্ধায় তার কাছে আমার মাথা নত হয়ে আসে।

১৯৪৭ সালটা শুধু ভয়ঙ্করই ছিল না, ছিল আমাদের কাছে একটা অভিশাপ-ও। রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার দাপটে, আমাদের নাগালের বাইরে সারা ভারতবর্ষে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যে তার আবর্তে আমরা সকলেই যেন ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেলাম। বাণীর মনোবেদনার কথা চিন্তা করে যখন কি করে তাকে একটু শান্তি ও সুখ দিতে পারি এইসব চিন্তা-ভাবনা করছি, তখনই ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি বদলি হয়ে এলাম মেঘনা নদীর পারে, ভৈরববাজার-আশুগঞ্জে। ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলা বা আরও স্পষ্ট করে কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমানার সংযোগস্থলে। আশুগঞ্জে কোন ভাড়াটে বাড়ি ছিল না। ভৈরববাজার অলিখিত ভাবে তখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। তবে একটা সুবিধে ছিলো, ওখান থেকে কিশোরগঞ্জ মাত্র ত্রিশ মাইল দূরত্বে থাকায়, আমি সপ্তাহে দু-তিন বার কিশোরগঞ্জে এসে বাণীকে সঙ্গ দিতে পারতাম।

দু-এক মাসের মধ্যেই বঙ্গ-বিভাগ স্থির হয়ে গেল। ভারত সরকার আমাদের কাছে পাকিস্তানে থাকবো কি ভারতবর্ষে থাকবো, মানে চাকুরি করব তার "অপ্‌শন্" চেয়ে পাঠাল। দু'প্রকারে অপ্‌শন্ ছিল। একটা ফাইনাল। অপরটা প্রভিশনাল। প্রভিশনাল অপ্‌শনের সুবিধা ছিল, ছয় মাসের মধ্যে ফাইনাল অপ্‌শন্ দিতে হবে। দেশ বরাবরের মতো ছেড়ে চলে যাবো, এটা আমি ভাবতেই পারছি ম না। তাই আমি প্রভিশনাল অপ্‌শনে পাকিস্তানে চাকুরি করব বলেই জানালাম। উদ্দেশ্য পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে পাকিস্তানে থাকার সুবিধে-অসুবিধেগুলো বুঝে নেব। এমন সময় আমার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল, যাতে আমার প্রাণ ঈশ্বরের কৃপায়ই হয়তো বেঁচে গেল।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল কি মে মাস হবে। আমি কিশোরগঞ্জের বাসায় আছি 'ফ্রেশ লিভে'।[১] আমাদের বাড়ি বা বাসার পেছনের বাড়িতেই হয়েছে স্থানীয় কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের ইন্‌সপেক্টরের Office-Cum-Residence. আমাদের বাসা থেকেই আমার নজরে পড়ল যে সেই পূর্বে উল্লিখিত মুণ্ডা পাঞ্জাবী অ্যাসিস্‌টেণ্ট কালেকটার ও ময়মনসিংহের সুপার ঐ বাড়িতে ইন্‌সপেক্টরের খোঁজ করছে। আমি জানতাম ইন্‌সপেক্টর সেদিন বাড়ি ছিল না, বাইরে টুরে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার দুবোনকে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে এটা শিখিয়ে বসিয়ে রাখলাম যে ঐ এ. সি. ও সুপার আমাদের বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করলে তারা বলবে যে আমি ভৈরববাজারে কি আশুগঞ্জে আছি। ময়মনসিংহের সুপার, যিনি খুব ভয়ে ভয়ে আমার সঙ্গে শিলচর থেকে আইজলে গিয়েছিলেন তিনি

১। অননুমত ছুটি।

আমাদের ঐ বাসা চিনতেন। হলোও তাই। তাঁরা আমার বাসায় এসে আমার খোঁজ করে চলে গেলেন। আড়ালে থেকে ওঁদের কথায় বুঝলাম যে, এ. সি. ওখান থেকে চট্টগ্রাম যাবেন, আর সুপার ফিরে যাবেন ময়মনসিংহে। বেলা এগারটায় একটা ট্রেন কিশোরগঞ্জ হয়ে চট্টগ্রাম যাবে ভৈরববাজার—আশুগঞ্জ হয়ে। পথে উনি আমার খোঁজ করতে পারেন, এই আশঙ্কায় আমি তৈরি হয়ে নিলাম। একটা ব্যাগে আমার ইউনিফরম্ ভরে কিশোরগঞ্জ স্টেশনে যেয়ে, গাড়ির এন্‌জিন যেখান থেকে জল নেবে, তার কাছাকাছি একটা চা-এর স্টলে একটু আড়াল করে বসে রইলাম। আপার ক্লাস বগি থাকে গাড়ির মাঝামাঝি। গাড়ি এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়ালে আড়াল থেকেই এ. সি কে মাঝামাঝি একটা বগিতে উঠতে দেখে আমি ঠিক এন্‌জিনের পেছনের বগিতে উঠে বসলাম। এবং গাড়ি চলতে শুরু করতেই ল্যাভ্যাটরিতে যেয়ে সাধারণ জামাকাপড় ছেড়ে ইউনিফরম পরে নিলাম। ত্রিশ মাইলের মধ্যে কয়েকটা স্টেশনে থেমে থেমে গাড়ি ভৈরববাজার পেঁছুতেই, আমি এক ফাঁকে প্ল্যাটফরমে নেমে দুচার পা হেঁটে যেতেই, স্থানীয় ইন্‌সপেক্টর ছুটে এসে আমায় বলল, ঐ গাড়ির একটা সেলুনকারে বসে আমাদের এ. সি. আমার খোঁজ করছেন। আমি ঐ সেলুনকারে যেতে একেবারে এক গাল হেসে, এ. সি. আমাকে ইংরেজিতে বললেন, "তোমাকে এখানে পেয়ে খুব ভাল হল। গাড়িতে উঠে এস, আমার সঙ্গে আখাউড়া জংশন পর্যন্ত যাবে, অনেক আলোচনা আছে।" আমি গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। ঐ সেলুনকারের অন্য পাশেই বসেছিলেন একজন মুসলমান রেলওয়ে অফিসার। সেলুনটা তারই, সেটা নিয়ে টুরে বার হয়েছেন ভদ্রলোক। দুএক মাস পূর্বে আমাদের ঢাকার এ. সি.-র আপিস চলে গেছে চট্টগ্রামে, সেখানে থেকে কেন্দ্রীয় শুল্ক ও চট্টগ্রামের sea port-এর customs-এর কাজও একই সঙ্গে দেখাশুনো করার সুবিধার জন্য। চট্টগ্রামের এই রেলওয়ে অফিসারের সঙ্গে আমাদের এ. সি.-র সেখানেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব। তাঁর সেলুনকার নিয়ে ঐ অফিসার আমাদের এ. সি-র এলাকার মধ্যেই ঘুরবে বলে, বেশ আরাম করে ঘুরে, আমাদের এ. সি.ও টুর দেখিয়ে তাঁর অধীনস্ত কিছু আপিস পরিদর্শন করেছেন বলে দেখাতে পারবেন, এই জন্যে তাঁর মাসিক টুর প্রোগ্রাম অনুসরণ না করেই বার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কিশোরগঞ্জের ইন্‌সপেক্টর সেদিন তাঁর আপিসে না থাকায় কোন কাজই দেখাবার মাল-মশলা পাওয়া গেল না। এত কথা আমাকে না বলে শুধু বললেন যে তাঁর প্রোগ্রাম অনুযায়ী আর দুদিন পর তাঁর কিশোরগঞ্জ আপিস পরিদর্শন

করার কথা, সুতরাং ঐ আপিসের ইন্‌সপেক্টর হয়তো তাঁর নিজের টুরে বার হয়ে গেছে, তাই উনি আমাকে ব লেন যে এই সেলুনটা আখাউড়া স্টেশনে দু-তিন ঘণ্টা থাকবে, ঐ ফাঁকে আমি যদি Tobacco licensed dealer-এর চার-পাঁচ খানা Account Book তাঁকে পরীক্ষা করার সুযোগ করে দিতে পারি, তবে সেদিনের তাঁর daily diary-র কিছু মাল-মশলা পাওয়া যায়। আমি ওগুলোর ব্যবস্থা করে দিতে পারব বলায় উনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, ছোটবড় সকলেই তাহলে বে-আইনি সুযোগ-সুবিধা নেয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে, আমাদের ভ্রমণ ভাতার রেট অনেক কম ছিল বলে, আমাদের শিলচরের ঐ উচ্চুঙ্গা সুপার মাঝে মাঝেই শেয়ারে আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে বিভিন্ন চা-বাগান পরিদর্শন করতেন। কিন্তু একদিন আমার চোখের সুমুখেই চারটে চা-বাগান একদিনে পরিদর্শন করে, বিভিন্ন তারিখে সই করলেন, milage ইত্যাদি বেশি দেখিয়ে ভ্রমণ ভাতা বেশি আদায় করার জন্য। তখন অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার কোন মনোমালিন্য ছিল না।

বেলা একটা নাগাদ আমরা আখাউড়া জংশনে পৌঁছে, আমি ও এ. সি. স্টেশনের 'কীলনারের' রেস্তোরাঁয় বসে, চা, পাঁউরুটি-টোষ্ট ও ডিমের পোচের অর্ডার দিয়ে খাবার অপেক্ষা করছি। এমন সময় প্ল্যাটফরমের দিক থেকে একটা বিরাট হৈ চৈ ও গোলমালের শব্দ ভেসে এলো। দেশ বিভাগের তখন মাত্র কয়েক মাস বাকি। এরও বেশ পূর্ব থেকেই যেখানে সেখানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লেগে যেত। গত এক ব'ছরের মধ্যেই আখাউড়া থেকে অল্প দূরে নোয়াখালির কুখ্যাত দাঙ্গা হয়ে গেছে, যার জন্য মহাত্মা গান্ধীজীকে নোয়াখালি যেয়ে ক্যাম্প করে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল, তারপর হ'ল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের "The Great Killing", ওদিকে বিহারের দাঙ্গা হয়ে গেল, ছুটে এলেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খান। সেই ভয়াবহ সময় তখন চলছে দেশে। একটু বেশি হৈ চৈ হলেই মানুষ ঐ দাঙ্গার ভয় পায়। এ. সি. আমায় বললেন, বাইরে যেয়ে কিসের গোলমাল হচ্ছে দেখে আসতে। আমি যেয়ে দেখলাম স্টেশনের উত্তর দিকে যে ছোটখাটো একটা দোকান-বাজার আছে ওদিক থেকে বেশ কিছু হিন্দু জনতা প্ল্যাটফরমে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে ইউনিফরম পরা মুসলমানদের একটা আনসার দলের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারছে, আবার প্ল্যাটফরম থেকে আনসার দলও একই কাজ করছে। আমাদের ইউনিফরম দেখে সাধারণ লোক পুলিশের উঁচু অফিসার মনে করে ভুল করত।

আমি স্পটে যেয়ে দাঁড়াতেই দুদিকের পাথর বৃষ্টিই কমে গেল। আমি হাত তুলে দুদিকেই অনুরোধ করে পাথর ছোঁড়া একেবারেই বন্ধ করে যা জানলাম তা এই যে, সিলেট বা শ্রীহট্ট ভারতবর্ষে থাকবে না পাকিস্তানে থাকবে সেটা নির্ণয় করার জন্য তৎকালীন ভারত সরকার সিলেটে গণভোট নেয়া ধার্য করেছিল। ঐ গণভোটের প্রচারের জন্য চট্টগ্রাম থেকে একটি 'আনসার' বাহিনী সিলেট থেকে প্রচারাভিযান শেষ করে চট্টগ্রাম ফিরে যাবার পথে ঐ জংশন স্টেশনে নেমে স্টেশনের বাইরে ঐ বাজার থেকে হিন্দু আম বিক্রেতার নিকট আম ক্রয় করতে যেয়ে, কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি থেকে পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়ে যায়। খবরটা এ. সি -কে দিয়ে মাত্র চা খেতে আরম্ভ করেছি এমন সময় একজন মুসলমান এ. এস. এম্ এসে আমায় বলেন যে স্যার, যতক্ষণ গাড়িটা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণই পুনরায় গোলমালের আশঙ্কা থাকবে, এন্‌জিন ড্রাইভার ভয়ে গাড়ি ছাড়তে সাহস পাচ্ছে না কারণ লাইনের পাশে দোকান ঘরের ফাঁকে ফাঁকে হিন্দু জনতা পজিশান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তলোয়ার, লম্বা লম্বা দা আর ইঁট-পাথর নিয়ে। আপনি যেয়ে ওদের একটু বুঝিয়ে বললে হয়তো আপনার কথা শুনে গাড়িটা চলে যেতে দেবে। চা-টা খেয়েই আমি যাচ্ছি বললে, সে ভদ্রলোক চলে গেলেন, এ. সি. আমায় বলেন, রায় তুমি তোমার 'কাস্টমস্ এণ্ড সেণ্ট্রাল একসাইজ' ব্যাচ্‌টা খুলে ফেল, তোমার কাঁধে শুধু স্টার দুটো থাক আর মাথায় থাক 'পীক্যাপ'। তাতে তোমার কাজের সুবিধে হবে। আমি আমার 'ব্যাচ্‌টা' খুলে ট্রাউজারের পকেটে রেখে, এ এস্. এম্.-এর ঘর থেকে ভদ্রলোককে নিয়ে লাইনের পাশে হিন্দু পল্লীতে চলে গেলাম। এ. এস. এম. ততোটা যেতে সাহস করল না। আমি হিন্দু পল্লীর নেতাদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের কথা নিয়ে এসে এ. এস. এম.কে বললে, এনজিনের মুসলমান ড্রাইভার আমাকে জোড় হাত করে বললো যে স্যার, এনজিনের তো কোন দরজা নেই, সেখান দিয়ে আমাকে মেরে দিতে পারে, আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে এনজিনে চলুন, আপনাকে আমি সিগন্যালের কাছেই নামিয়ে দেব। তাই হলো, গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে আমি দেখলাম হিন্দু নেতারা জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেদের ছেলেদের দমিয়ে রাখছে। সিগন্যালের নিকট থেকে স্টেশনে ফিরে এলে আমার এ. সি. বললেন, রায়, আমি ঐ সেলুনকারে ঐ রেলওয়ে অফিসারের সঙ্গে ব্রাঞ্চ লাইনের একটা নিকটবর্তী স্টেশনে যাচ্ছি, সেখানে তাঁর কাজ হয়ে গেলে আমরা চট্টগ্রামে ফিরে যাব। এখানে আজ আমাদের আর কোন কাজ হবে না। তুমিও যে কোনও

ট্রেনে আশুগঞ্জে ফিরে যাও। এ. সি. চলে গেলে আমি কীল্নারের রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে এক কাপ চা চাই। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার আমাকে জোড় হাত করে বলে, স্যার, গণ্ডগোলের ভয়ে আমরা দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাচ্ছি, এখন আর চা বানাবার কোন উপায় নেই। ওখান থেকে বার হয়ে দেখি, অত বড় জংশন স্টেশন প্রায় খালি হয়ে গেছে, কোন লোকজন নেই। স্টেশনের সব ঘর বন্ধ, এমনকি খোলা জায়গায় বই, চা বা ফলের ভেণ্ডাররাও তাদের দোকান বন্ধ করে চলে গেছে বা যাচ্ছে। একটু পরেই দেখলাম আমি একলা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, কোন গাড়ি কোনদিক থেকেই যাতায়াত করছে না। তৃতীয় শ্রেণীর খোলা বিশ্রামঘরের একটা বেঞ্চে বসে ভাবছি, আমার কি করা উচিত। এমন সময় হিন্দু পল্লীর দিক থেকে 'আল্লা-হু-আকবর' আর 'বন্দেমাতরম' চীৎকার ভেসে আসতে লাগল। আমি স্টেশনের ওভারব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করলাম। সঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্রীজ থেকে নেমে উক্ত দোকান-বাজারে যেয়ে একটা মাত্র দোকান খোলা পেয়ে, জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ওখানে কোন পুলিস থানা নেই, কাছেই একটা ফাঁড়ি আছে। ফাঁড়িতে যেয়ে দেখলাম একজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ বা লালপাগড়ি পুলিস একটা লাঠি হাতে নিয়ে ফাঁড়ি পাহারা দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ইনচার্জ এ. এস আই. অন্য কন্‌স্টব্‌ল্‌দের নিয়ে কাজে বার হয়ে গেছে। (পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে নিকটবর্তী এক গ্রামে তারা নেমন্তন খেতে গিয়েছিল।)

আজ ইংরেজী ২২/৫/৯১ সকাল ৬টা কি ৬-১৫ মিনিট। টেবিলের কাছে এসেছি লিখতে বসব। কিছুদিন হল এই সময়টায় বসে ঘণ্টাখানেক আমার এই কাহিনীগুলো লিখছি। টেবিলে বসবার পূর্বেই পাশের বাড়ির রেডিও থেকে একটা খারাপ খবরের আওয়াজ পেয়ে, তাড়াতাড়ি ট্র্যানজিস্টারটা খুলে, রাজীব গান্ধীর হত্যার মর্মান্তিক খবরটা শুনলাম। এটা ঠিক আমার আশঙ্কার মধ্যে ছিল না। সোফায় বসে পড়লাম। হতভম্ব হয়ে ভাবছি দেশটা কোনদিকে যাচ্ছে? হত্যায় কি কোন সমস্যার সমাধান হয়? আমি ইতিহাসের ছাত্র। এমন কোন উদাহরণ মনে পড়ল না। মনে হল আমাদের দেশেই অহিংসার এত বড় প্রতীক ও জাতির জনককে একটা দেশপ্রেমিক (?) মূর্খ হত্যা করল। ইন্দিরা গান্ধীকেও দুই বিশ্বাসঘাতক মূর্খ হত্যা করল! রাজীব হত্যার মূর্খ কে বা কারা এ মুহূর্তে জানি না!

১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে তখন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে

পড়ি। ব্রিটীশ পার্লিয়ামেণ্টে তখনকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে বলেছিলেন, ভারতের মানুষ এখনও স্বাধীনতা পাবার উপযুক্তই হয়নি। স্বাধীনতা দিয়ে, ওদের ছেড়ে আমরা চলে এলে, ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে মরবে। এই খবর পরের দিন আমাদের পত্র-পত্রিকায় খুব বড় বড় করে ছেপে বার হলো যতটা বড় করে আজ ছাপা হয়েছে রাজীবের হত্যাকাণ্ড। সেদিন চার্চিলের ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদে যারা কলেজে ধর্মঘট করিয়েছিল তার উদ্যোক্তা আমিও ছিলাম একজন। ক্ষোভে আমি ফেটে পড়েছিলাম। তার উপর আবার পূর্বে উল্লিখিত বন্ধু ফরওয়ার্ড ব্লকের ময়মনসিংহের নেতা অমর রায়ের অনুরোধে তাঁদের একটা মাসিক পত্রে, চার্চিলের ঐ উক্তির বিরুদ্ধে খুব আক্রমণাত্মক একটা রচনা লিখে প্রশংসাও কুড়িয়েছিলাম। কিন্তু আজ বারে বারেই মনে হচ্ছিল, সেদিন চার্চিলই কি সঠিক ছিলেন? ভাসা ভাসা মনে পড়ে, তখন বোধ হয় ১৯৪৪ সাল। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম পুত্র সন্তান হলো, তা নিয়ে আমরা কত আনন্দ করেছিলাম। সেই সুন্দর, হাসিহাসি, নিষ্পাপ মুখায়বের রাজীব আজ চলে গেল। বাড়ির সকলেই তখন ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কেউ ট্র্যানজিস্টারের আর কেউ টি ভি র সুমুখে। আমার ছোট ছেলে টুনুন বলল, মা আজ বেঁচে থাকলে কেঁদে ভাসাতেন। কথাটা একেবারে খাঁটি সত্য। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব, এঁরা সকলেই বাণী ও তার পিতার বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

দেশ সেবার কি চরম পুরস্কার! এই নেহরু পরিবারে ৺মতিলাল নেহরু দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, জেলও বোধহয় গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ৺জওহরলাল নেহরু তো জীবনের বেশির ভাগটাই বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর বার বার জেল খেটেছেন। জওহরলালের আত্মজীবনী, কি তাঁর ছোট বোন প্রয়াত কৃষ্ণা হাতীসিং এর লেখা "কোন খেদ নেই" বইতে পড়েছিলাম যে একবার এলাহাবাদে ঐ পরিবারের সবাই যখন জেলে, তখন কিশোরী ইন্দিরা একা আনন্দ ভবনে, কেয়ারটেকারের কাছে মানুষ হচ্ছেন। সেই ইন্দিরা ও তার জ্যেষ্ঠ সন্তানকে এই দেশের মানুষই করল হত্যা! দিগ্‌বিজয়ী আলেকজ্যান্দার ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে বলেছিলো, "সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!" এই কথাটা আজ বারবারই মনে হচ্ছিল।

আবার পুরানো কথায় আসি। ফাঁড়ির লাঠিধারী পুলিস আমায় তাদের একজন অফিসার মনে করে নিয়মিত ভাবে স্যালুট করল। আমি তার সুযোগ

নিয়ে, নিকটবর্তী গ্রামের গণ্ডগোলের কথা বলে, ফাঁড়িতে তালা লাগিয়ে আমার সঙ্গে আসতে বললে, সে কোন আপত্তি না করে চলে এলো। তাকে সঙ্গে করে ঐ গ্রামের এক প্রান্তে যেয়ে দেখি, সেখানে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে নানারকম অস্ত্র হাতে বহু মুসলমান, আর গ্রামের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে নানান অস্ত্র হাতে কিছু হিন্দু। দু'দিকেই একনাগাড়ে মার মার স্লোগান দিয়ে চলেছে। গ্রামের শিশু ও স্ত্রীলোকেরা ভয়ে কাঁপছে। আমাদের দেখেই অনেকে এসে পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাদের বাঁচান, আমাদের বাঁচান।' বড়ই কষ্ট লাগল এই ভেবে যে, রাজনীতিবিদরা মানুষের মন বিষিয়ে দিয়েছে এমন করেই যে সামান্য বিবাদ-বিসংবাদ কত বড় আকার নিতে পারে। প্ল্যাটফরম থেকে ঐ ট্রেনটাকে পার করে দেবার পর আর ঝগড়া-বিবাদের কিছু ছিল না। যাদের সঙ্গে বিবাদ, তারা তো ঐ ট্রেনে চট্টগ্রামের পথে অনেক দূরে চলে গেছে। গ্রামের লোকেদের, 'দেখি কি করতে পারি' বলে ওখান থেকে বার হয়ে এসে সঙ্গের পুলিসটিকে জিজ্ঞাসা করে নিকটেই একটা পোষ্ট-আপিসে গেলাম। ওটা সৌভাগ্যবশতঃ খোলাই ছিল। মুসলমান শুভ্র শ্মশ্রুওয়ালা পোষ্টমাষ্টারকে বললাম, তিনটে Urgent Police Telegram তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তিনি তিনটে ফরম এগিয়ে দিলেন, একটা Supdt. of Police, কুমিল্লা, একটা Dy. Supdt. of Police, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, তৃতীয়টি Special Dy. Supdt of Rly. Police, ভৈরববাজারকে এখানকার ভয়ঙ্কর অবস্থা জানিয়ে পুলিস ফোর্স পাঠাতে অনুরোধ করলাম। ফরমগুলোতে আমার নাম সই করে দিলাম এবং টেলিগ্রাম না পাঠানো পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর রসিদ নিয়ে সঙ্গের পুলিসটির হাতে দিয়ে বললাম, তোমার ও. সি. ফিরে এলে তার হাতে দিও। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার ওভারব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে চারদিকের অবস্থা দেখছি। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম কতকগুলো আগুনের গোলা এসে ঐ গ্রামে পড়ছে। সঙ্গের পুলিসটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এ এক অভূতপূর্ব নূতন অস্ত্র। অর্থাৎ তীরের মাথায় পাটের পুটলী বেঁধে, তাকে কেরোসিন বা পেট্রোল দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে আগুন ধরিয়ে ধনুকের সাহায্যে দূরে নিক্ষেপ করা। তখন আমাদের দেশে বহু ছনের বা সনের চালের ঘর ছিল। ঐসব ঘরে ঐ আগুনের তীর এসে পড়লে সহজেই আগুন লেগে যায়। আমরা দেখলাম অন্ততঃ ঐ গ্রামের তিনটে বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। আর অন্যদিকে 'আল্লা-হু-আকবর' আর 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির আওয়াজে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। অবস্থা

ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। কিছুই আর করতে পারছি না বলে বড় অসহায় বোধ করছি। এমন সময় দেখলাম একটা এন্‌জিন একটা বগি নিয়ে আখাউড়া স্টেশনে এলো। বগি থেকে নামল, চারজন বন্দুকধারী গোর্‌খা পুলিস আর একজন হাবিলদার। এদের পাঠিয়েছিল Dy. Supdt. of Rly. Police, ভৈরববাজার। আমরা দুজন ব্রীজ থেকে নেমে এলাম। আমাকে দেখে গোর্‌খা হাবিলদার অবস্থাটা জেনে নিয়ে বলল, রেল এরিয়ার বাইরে যাবার তার কোন এক্তিয়ার নেই. "মগর রেল এরিয়াকে অন্দর কই ঝামেলা করেগা তো হাম 'গোলি' (গুলি) মার দেগা।" এই বলে তারা স্টেশন বিল্‌ডিং-এর চারপাশে পজিশান্‌ নিল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে ঐ গ্রামে যেয়ে নেতাদের বুঝিয়ে বললাম যাতে ওদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্টেশন বিল্‌ডিং ও প্ল্যাটফরমে পাঠিয়ে দেয়। একটু পরেই স্ত্রীলোক ও শিশুর দল ছুটে এসে স্টেশনে আশ্রয় নিল। চীৎকার করতে করতে আলুথালু চুল ও অর্ধ-বিবস্ত্র অবস্থায় তাদের সেই ছুটে আসা দেখলে পাষণ্ডের চোখেও বুঝি জল আসবে। বেলা পড়ে এসেছে। এমন সময় লুঙ্গি-পরা এক মুসলমান ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার ডান হাত তার দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, স্যার, আল্লা আপনাকে দোয়া করবে, আমার বাচ্চাটাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন। কোথায় তাঁর বাচ্চা জানতে চাইলে সে বলল, ঐ স্টেশনের পাশের বাজারে তাঁর একটা 'ইসলামিয়া লাইব্রেরি' নামে বই-এর দোকান আছে। তাঁর বাচ্চাটাকে দোকানে রেখে সে দুপুরের খাবার খেতে নিকটেই স্টেশনের উল্টোদিকে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল। ফিরে এসে আর ওখানে যেতে সাহস পাচ্ছে না, গেলেই হিন্দুরা তাদের হাতের দা দিয়ে তাঁকে কেটে ফেলবে। বুঝলাম কাজটা খুব-ই কঠিন হবে। হিন্দু ছেলেরা লম্বা লম্বা তরবারীর মত দা নিয়ে পাগলের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি বলে আমি সঙ্গের পুলিসটিকে নিয়ে ঐ বাজারের দিকে গেলাম। ঐ গ্রামের হিন্দু নেতাদের সঙ্গে তখন আমার মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেছে। তাদের বললাম যে তাদের জন্য সামান্য হলেও তো কিছু করেছি। এবার আমার একটা কথা রাখতে হবে। তারা ঈশ্বরের দিব্যি কেটে আমার কথা রাখবে বললে আমি সেই বন্ধ লাইব্রেরিটা দেখিয়ে বললাম যে ওখান থেকে একটি মুসলমান ছেলে আমি বার করে নেব। তারা রাজি হয়ে বলল, ঠিক আছে আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান। আমি তবু ওদের দুজনকে কাছাকাছি থাকতে বলে, ঐ লাইব্রেরির বন্ধ দরজায় জোরে আঘাত করতে লাগলাম। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। ছেলেটির বাবা তার নাম

আমাকে বলে দিয়েছিল, সেই নাম ধরে ডেকে বললাম, আমি পুলিস তোমার কোন ভয় নেই, বেরিয়ে এসো। তবু সাড়া নেই। তখন দরজার কাঠের ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে চোখ রেখে দেখলাম যে তের-চৌদ্দ বছরের একটি বালক বড় বড় চোখ করে ফাঁসীর আসামীর মতো দরজার দিকে তাকাচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে বললাম যে এই কাঠের ফাঁক দিয়ে তুমি তাকিয়ে দেখ, আমি পুলিস, তুমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসো। এবার ছেলেটি সেই ফাঁক-ফোকর দিয়ে আমাকে ও লালপাগড়ি-ওয়ালা পুলিসকে দেখে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে বার হলো। তাকে দরজায় তালা মারতে বললে, তার হাত এতই কাঁপছিল যে সে তালা লাগাতে পারল না, চাবি ও তালা চেয়ে নিয়ে আমি দরজায় তালা লাগিয়ে, ছেলেটিকে আমার হাতে ধরে রেখে পুলিসটিকে আমার পেছনে আসতে বলে স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পুলিসটি চীৎকার করে উঠল, স্যার! সাবধান! পেছনে তাকিয়ে দেখি, যে দুই নেতাকে আমি নিকটেই থাকতে বলেছিলাম তারা একটি হিন্দু যুবককে তার লম্বা দা সহ, রাস্তার উপর ফেলে চেপে ধরে আছে আর পুলিসটি তার লাঠি উঁচিয়ে ধরে আছে। নেতা দুজন আমাকে বলল স্যার, এর বাড়ির সব কিছু পুড়ে গেছে বলে ওর মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমরা ওকে ধরে রাখছি, আপনি স্টেশনে চলে যান। ছেলেটিকে নিয়ে স্টেশনে আসতে আসতে পুলিসটি বলল স্যার, ঐ মাথা-খারাপ লোকটা আপনার দিকে ছুটে যাচ্ছিল আর বলছিল যে আজ ঐ দারোগাকেই কেটে ফাঁসিতে ঝুলব। স্টেশনে পেঁছে ঐ মুসলমান ছেলেটিকে তার পিতার হাতে দিলে, ভদ্রলোক আনন্দে কেঁদে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, আমাকে কয়েকবার আদাব দিয়ে, আল্লার কাছে আমার জন্য দোয়া ভিক্ষা করে, ছেলেকে একরকম বুকে চেপে ধরেই স্টেশনের উল্টোদিকে চলে যায়।

আখাউড়া স্টেশনের নিকটবর্তী 'পাগাচং' নামে একটি গ্রাম ছিল, শুনেছিলাম সেখানের মুসলমানরা নাকি খুব দাঙ্গাবাজ। সেই গ্রাম থেকে কয়েক হাজার মুসলমান, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার দিক থেকে রেললাইন ধরে আখাউড়া স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি তখন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। ওদের আসতে দেখেই গোর্খা পুলিস হাবিলদার ক্ষেপে যায় এবং তার বন্দুকধারী চার পুলিস নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। স্টেশন প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, চেঁচিয়ে সেই জনতাকে হিন্দিতে বলে যে আর এক পা এগুলেই আমি গুলি করব। তার মুখ থেকে ভয়ানক গন্ধ আসছিল দিশি মদের। অবস্থা বুঝতে আমি তার সঙ্গে

গিয়েছিলাম। তার ঐ চিৎকারের পরেও জনতা এক দু পা এগিয়ে আসতেই সে তার বন্দুকধারী পুলিশদের হুকুম দিল, take position। গুলি চলুক এটা আমার মন চাইছিল না। জনতা এই position নেবার হুকুম শুনে আবার থমকে দাঁড়াল। এ অবস্থায় আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলাম না। জনতা দেখে মনে হল সংখ্যায় তারা পাঁচ হাজারেরও বেশি হতে পারে। কয়েক মিনিট সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আবার জনতার দিক থেকে ধ্বনি উঠল, 'আল্লা-হু-আকবর।' তারা দু এক পা এগিয়েও এল। পুলিস আর জনতার মধ্যে ফারাক তখন মাত্র পনের গজের মত হবে। হাবিলদার পাঁচ রাউণ্ড ফায়ারের অর্ডার দিল। নিজের কোমর থেকেও রিভলবার বার করে জনতার দিকে বাগিয়ে ধরল। মোট দু রাউণ্ড গুলি বোধ হয় আমি দেখেছিলাম, মানুষগুলো গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে, আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, ঘুরে স্টেশনের দিকে রওনা হলাম, তখনও গুলির আওয়াজ শুনছি। আমি ফিরে এসে ওভারব্রীজের উপরে যেয়ে আবার দাঁড়ালাম। মনটা তখন আমার বিষাদে ভরে গেছে। এতটা বাড়াবাড়ি হবে বুঝতে পারিনি।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। প্ল্যাটফরমের আলো জ্বলে উঠল। সন্ধ্যার অন্ধকারে উক্ত গ্রামের বহু বাড়ি আগুনে জ্বলছে। স্টেশনের তিন দিক থেকেই 'আল্লা-হু-আকবর' ধ্বনি ভেসে আসছে। আমার সঙ্গী লালপাগড়ি পুলিস একবার ব্রীজের উপরে এসে আমায় জানাল, স্যার, তিন দিক থেকে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার মুসলমান স্টেশন সহ ঐ গ্রাম ঘিরে ফেলেছে, ঐ পাঁচ জন বন্দুকধারী পুলিস আর কি করবে। এই যখন পরিস্থিতি, তখন দেখলাম কুমিল্লার দিক থেকে চার পাঁচটা বগি নিয়ে একটা ট্রেন আখাউড়া স্টেশনে এসে থামল। পঞ্চাশ জন বন্দুকধারী পুলিস, তিন চার জন অফিসার ও ইংরেজ S. P. ঐ গাড়ি থেকে নেমেই চারদিকে ছুটে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ব্রাহ্মণবেড়িয়া থেকে অন্ততঃ ত্রিশ জন বন্দুকধারী পুলিস নিয়ে D. S. P. ও অন্য একটা গাড়িতে এলো এবং চারদিকে ছুটে গেল। এক ঘণ্টা কি তার কম সময়ের মধ্যে সব একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। কুমিল্লার এস. পি. ও তাঁর পুলিস ফোর্স আরও দশ কি পনের মিনিট পরে এলে সেদিন যে কি হত তা শুধু ঈশ্বরই জানেন!

গুলিতে হত, পনেরটা মৃতদেহ প্ল্যাটফরমে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে পুলিশ প্রহরায়। নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে একজন মুসলমান এম. এল. এ.-ও

এসেছেন। ইতিমধ্যে সেলুনকারে আমাদের এ. সি. ফিরে এসে, আমার নিকট সব ঘটনা জেনে কুমিল্লার ইংরেজ এস. পি. তার সবিশেষ পরিচিত বলে বিশ্রামাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে তখন এম. এল. এ., এস. পি এবং আরও কিছু স্থানীয় নেতা বসে আলোচনা করছেন। হঠাৎ উক্ত এ. সি. এসে আমায় ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে, এস. পি.-কে আমায় দেখিয়ে বললেন, আমার এই অফিসারই আজকের বিপজ্জনক অবস্থা রক্ষা করেছে। এস পি. আমার একটা লম্বা লিখিত বিবৃতি নিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই এ সি তাঁর সেলুনকারে চট্টগ্রাম রওনা হবার সময় আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, you have done a great job. তোমার উপযুক্ত পুরস্কারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ যাবে। এবার ট্রেন চালু হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আশুগঞ্জে ফিরে যাও। রাত্রি দশটা নাগাদ একটা মালগাড়ির গার্ডের সাহায্যে রাত্রি এগারটায় আশুগঞ্জের এ. এস এম বীরেন চক্রবর্তীর কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। আমি তখন ঐখানেই থাকি।

আশুগঞ্জের মোটামুটি সচ্ছল ও শিক্ষিত কয়েকজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে গান-বাজনার প্রেক্ষিতে আমার একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পরের দিন সকালে তাদের কয়েকজন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আখাউড়ার ঘটনার বিবরণ জেনে, গোপনে আমাকে বলে গেলো যে আপনি তো সঠিক কাজই করেছেন, কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী লোক আপনার বিরুদ্ধে খুব প্রচার করছে। আপনি ছুটি নিয়ে কিছুদিন অন্য জায়গায় থেকে এলে ভাল হয়।

সারাদিন এত কষ্ট করে, নিজের জীবন বিপন্ন করে এত বড় একটা ম্যাসাকার থেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে রক্ষা করার প্রতিদান যদি এই হয়, তবে এখানে আর মনুষ্যত্বের কি মূল্য আছে, এটা ভেবে মন আমার একেবারে ভেঙ্গে গেল। আমার দুজন পিয়নকে পরের দিন আমাদের কিশোরগঞ্জের বাসায়, আমার সামান্য মালপত্র পৌঁছে দেবার উপদেশ দিয়ে, সেদিন বিকেলেই ত্রিশ মাইল মাত্র দূরে কিশোরগঞ্জের বাসায় চলে গেলাম। পরদিনই দেশভাগের পরে ভারতেই কাজ করব, এই final option লিখে, দুমাসের একটা ছুটির দরখাস্ত এবং তার কার্যকারণ জানিয়ে চট্টগ্রামে এ সি.-কে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর তো সব ঘটনা জানাই ছিল। কিছুদিন পরই আমার ছুটি মঞ্জুর হয়ে এল আর সেই সঙ্গে আদেশ এলো, ছুটির শেষে, ১৯৪৭ এর পয়লা আগষ্টে কলকাতার কাস্টম হাউসে রিপোর্ট করতে। চাকুরিতে নিজের প্রিয় জন্মভূমির সঙ্গে আমার

গতানুগতিক সম্পর্ক এখানেই শেষ হয়ে গেল।

১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন আমার বড়ছেলে গৌতমের জন্ম হয় বাণীদের বাড়িতে। তার সামান্য পূর্বে আমি ও বাণী আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ বাড়িতে যাই। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে কিশোরগঞ্জে আমার খেলাধুলোর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতিতে ভরা, ভালবাসা ও প্রেমের সুখ-দুঃখ ও লড়াই-এর ঘটনাবহুল জীবন, আমার অন্তর-নিংড়ানো ভালবাসা ও আদরের কিশোরগঞ্জে ঐ ছুটির সময়টুকুই শুধু বিয়ের পরে, আমি ও বাণী উভয় পরিবারের সকলকে নিয়ে একটু সুখে ও শান্তিতে কাটিয়েছিলাম। আর সে সুযোগ কোনদিন পাইনি। অথচ, আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে বিয়ের পরে, ঐ প্রিয় মিউনিসিপ্যালিটির পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ফাঁকা প্রায় এক বিঘে জমিতে সুন্দর বাংলো ধরনের বাড়ি করে, সেখানেই সবাইকে নিয়ে আমরা বাস করব। অন্যদিকে ঢাকা সোনারগাঁও এর হামছাদির বাড়িও আমরা একেবারে ছেড়ে দেব না। ঐ গ্রামের বাড়িরও একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল, ছিল একটা আলাদা গ্রামীণ সমাজের স্বাদ। কিশোরগঞ্জ ও হামছাদি দুটোই সুন্দর, কিন্তু আলাদা তাদের রূপ ও স্বাদ। তাই ব'ছরে একবার হামছাদিও ঘুরে আসব।

কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য নিয়েই আমরা জন্মেছিলাম যে ঐ ভালবাসা ও লড়াই এর সফলতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অশনি রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড় এসে আমাদের সব কিছু ওলট পালট করে দিয়ে, আমাদের উড়িয়ে নিয়ে প্রায় একটা নতুন দেশের অপরিচিত পরিবেশে ফেলেদিল। সেখানেও আমবা নতুন ঘর বেঁধে আছি বটে, কিন্তু যে মধুর ও স্বপ্নের পরিবেশ পেছনে ফেলে এলাম, তা আর কোনদিন পেলাম না। বেশ কিছুদিন পূর্বে যখন গত বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে খণ্ডিত কয়েকটা দেশ এক হয়ে গেল এবং বাকি কয়েকটা সেই প্রচেষ্টা করছিল, তখন আমরা দুজন বাড়িতে বসে বসে আলোচনা করতাম যে আমাদের দেশটাও যদি এক হয়ে যেতো, তবে এখনও কয়েকটা ব'ছর না হয় সেই স্বপ্নের কিশোরগঞ্জে কাটিয়ে 'রাকুয়াইলের' শ্মশানঘাট দিয়েই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতাম! কিন্তু বাণীর প্রায় অকাল মৃত্যু সেই আশা ও কল্পনাকেও ভেস্তে দিয়ে গেল।

১৯৪৭ সালের পয়লা অগাষ্ট কলকাতা কাস্টম হাউসের হেড কোয়ার্টারে কাজে যোগ দিলাম। দেশভাগ, স্বাধীনতা ও চাকুরেদের অদল-বদলে উঁচু মহল দিশেহারা হয়ে আমাদের অনেককে ট্রেনিং-এর নামে একমাস কাস্টম হাউসেই রেখে দিলেন। তারপর কয়েকমাস হুগলিতে কাটিয়ে বর্ধমান জেলার কাটোয়াতে

গেলাম। সেখানে কোয়ার্টার পাওয়ায় বাণী ও এক বছরের বড়ছেলে ফল্গু (গৌতম) সেখানে চলো এলো। তারপর, ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর হয়ে, কোচবিহারে বদলি হয়ে এলাম। কোচবিহার করদ রাজ্য থাকাকালীন, ময়মনসিংহ থেকে একবার ঐ রাজ্যে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম। কোচবিহার টিমে তখন ওখানের শেষ রাজা ক্যাপটেন এবং সেণ্টার ফরওয়ার্ডে খেলেন। আমি গিয়েছিলাম ময়মনসিংহ 'ফ্রেণ্ডস ইলেভ্ন্' টীমের ক্যাপটেন এবং লেফ্ট ফুল ব্যাকে খেলতে। ঐতিহ্য বা প্রথা অনুযায়ী 'টস্' করার পূর্বে রাজা মহাশয় কিন্তু তাঁর আভিজাত্য বজায় রেখে, দুই টিমের ক্যাপটেন হিসেবে আমার সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক্' করলেন না। কিন্তু আমাদের টিম-ম্যানেজারের উপদেশ অনুযায়ী, আমি মহারাজকে অন্ততঃ তিন চারবার বাঁচিয়ে খেলেছিলাম। অর্থাৎ ঐ তিন চারবার আমার ট্যাক্লিং বা রির্টান শটে মহারাজা আঘাত পেতে পারতেন। তবুও আমরাই দু গোলে জয়ী হলাম। আমি তখন বি এ. পড়ছি। ঐ টুরনামেণ্ট শেষ হবার পূর্বেই কোচবিহার ষ্টেট্ পুলিস অফিসারের চাকুরির অফার পেয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহণ করিনি।

১৯৫৫ সালে যখন আবার চাকুরিতে বদলি হয়ে কোচবিহারে গেলাম তখন ঐ করদ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। তখনও ঐ শহর মোটামুটি সাজানো-গুছানো ও বেশ সুন্দর ছিল। রাজপ্রাসাদটিতো ছিল অপূর্ব, শুনেছি বাকিংহাম প্রাসাদের অনুকরণে ওটা করা হয়েছিল। উক্ত ফুটবল খেলার সময়তো মহারাজকেও দেখেছিলাম অপূর্ব সুন্দর, কল্পনার সত্যিকারের রাজপুত্র। তার বহু পরে, 'পোলো' খেলার দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঐ মহারাজের এক বোন অপরূপা গায়ত্রী দেবী, জয়পুরের মহারাণী। রাজনীতির জগতের অনেকেই হয়তো তাঁকে চেনেন। লোকমুখে শুনেছি প্রয়াত রাজমাতাও নাকি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন।

কোচবিহারে যেয়ে আমাদের মনে হল, ছেড়ে আসা দেশের সবুজ পরিবেশের অনেক কিছু ফিরে পেলাম। তখন আমাদের ছোট ছেলে, এক বছরের টুসুনও আমাদের সঙ্গে আছে। চারজনের পরিবার। আমি, বাণী, ফল্গু ও টুসুন। কোচবিহারে যাবার পূর্বে যে সব জায়গায় ছিলাম, সে সব স্থানেরও অনেক কিছুই লেখার ছিল, বিশেষ করে বিষ্ণুপুর তো ঐতিহাসিক স্থান। বই এর কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে, শুধু কোচবিহার সম্বন্ধেই কিছু লিখছি।

এখানেই বাণী ফিরে পেয়েছিল তার কিশোরগঞ্জের ফেলে আসা সাংস্কৃতিক

জীবন। তাই চার বছর পরে ওখান থেকে বদলি হয়ে কলকাতা আসার দিন, ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাণী বলেছিল, 'জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কোচবিহারেই রেখে গেলাম।'

কোচবিহার রেল স্টেশনের ওপরই ছিল কাস্টমস আপিস। আমি ও সি.র চার্জ নিলাম। স্টেশনের পেছনেই পিলখানা রোডে তিনচার মিনিটের রাস্তায় আমার বাসাবাড়ি। বাড়ির মালিক আশি বছরের বৃদ্ধ ডাঃ যোগেন বর্মন ছিলেন Founder of Coochbehar Congress Party. এক বাড়িরই সামনে আমি আর পেছনে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ থাকতেন। জেলার এম. এল. এ. ও এম. পি.রা কোচবিহারে গেলেই ডাঃ বর্মনকে প্রণাম করে যেতেন। কেন জানি না, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে দারুণ স্নেহ করতেন। ঐ ভি আই পি দের সঙ্গে আমায় পরিচয় করে, তাঁদের নিকট আমার উচ্চ প্রশংসা করতেন। শেষে তো, তাঁর বসত বাড়ির বিরাট জমি থেকে আমাকে প্রায় সাত কাঠা জমি বিনামূল্যে দিতে চেয়ে বললেন, আমি জীবিত থাকতেই ওখানে বাড়ি করে নাও। সে কথা শুনে আবার স্টেশনের এ. আই. ও ডাবলিউ আমায় বললেন এ সুযোগ ছাড়বেন না। আপনার বাড়ি করতে যত কাঠ লাগবে তা জলের দরে আমি আপনাকে দিয়ে দেব। আপনার খরচা লাগবে শুধু মিস্ত্রীরির আর ছাদের টিনের। কোচবিহারের সবুজ প্রাকৃতিক শোভা ও ফেলে আসা জন্মভূমির পরিবেশ ইত্যাদিতে আমি ওখানে বাড়ি তৈরি করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু বাবা ও মার আপত্তিতে তা হল না। কলকাতার সর্বসময়ের 'রথযাত্রার ভিড়' ও হৃদয়হীনতায় যখন মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়ি, তখন কোচবিহারে বাড়ি না করার জন্য আপশোষ হয়!

আমার বাসার পেছনেই ছিল এগ্রিকালচার স্কুল ও ফারম। সেখানের শ্রীপবিত্র চক্রবর্তী, প্রিনসিপাল ছিলেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি রেখা চক্রবর্তী ছিলেন বাণীর অন্তরঙ্গ বান্ধবী। নৃত্য ও সঙ্গীতে তিনি খুব পটু ছিলেন। ঐ ফারমের কর্মীবর্গ মোটামুটি সকলেই ছিলেন সংস্কৃতিবান। স্কুল-বাড়িতে একটা ছোট অডিটোরিয়ামও ছিল। শ্রীমতি চক্রবর্তী ও বাণীর উৎসাহ, উদ্যোগ ও পরিচালনায় ঐ অডিটোরিয়ামে আমাদের সকলকে নিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, নাটক, থিয়েটার, আবৃত্তি, ট্যাবলো, পাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে ছোটদের নাটকানুষ্ঠান ইত্যাদি নানারকম সাংস্কৃতিক কাজকর্ম লেগেই থাকত। এইসব অনুষ্ঠানে, শহরের আরও কিছু বিশিষ্ট

পরিবারবর্গও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত। কোচবিহার শহর সংলগ্ন 'পাতলা খাওয়া' ফরেস্টে হতো আমাদের পিকনিক। একবার তো, একটা গন্ডারের বাচ্চা পিকনিক স্পটে আমাদের সহযোগী হতে চাইলে, তা নিয়ে আমাদের ভয় ও আনন্দ মিশ্রিত কত হৈ চৈ হয়ে গেল।

একবার উক্ত সব পরিবারের নারী-পুরুষ মিলে, আমরা শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো' নাটক মঞ্চস্থ করলাম। কোচবিহারে পূর্বে আর নারী-পুরুষ মিলে কোন নাটক হয়নি। এজন্য শহরের ভদ্রমহলে আমাদের কিছু সমালোচনা হচ্ছিল। স্থানীয় কলেজের প্রিনসিপ্যাল তো খুবই বিরুদ্ধে ছিলেন। ঐ নাটক মঞ্চস্থ করার দিন, আমরা যেমন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করি, তেমনি আবার উক্ত প্রিনসিপ্যাল মহাশয়কে পবিত্রবাবু ও আমি একরকম ধরে বেঁধেই নিয়ে আসি। সেদিন নাটকের শেষে, ঐ প্রিনসিপ্যাল মহাশয় আমাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "এই নাটক দেখতে এসেছিলাম একটা ক্ষুব্ধ মন নিয়ে, কিন্তু ফিরে যাচ্ছি খুশি ও আনন্দিত হয়ে।" সারা শহরেই ঐ নাটক খুব প্রশংসিত হয়েছিল। এরপরই দেখা গেল, শহরের টাউন হলে একের পর এক নারী-পুরুষ মিলে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। এই সংস্কৃতির জোয়ার, কোচবিহারে আমরাই এনে দিলাম। কোচবিহারে আমাদের ঐ জীবন-ধারা এটাই প্রমাণ করে যে মানুষ যদি আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সামান্যতম সামাজিক ও সংস্কৃতিবানও হয়, তাহলে আমাদের এই সমস্যা-সঙ্কুল দেশ ও সমাজেও জীবনকে কতটা আনন্দময় করে তোলা যায়। ভাবলে এখনও মনে হয়, কোচবিহারের ঐ চার বছর যেন আমরা শুধু আনন্দ-উৎসবেই দিন কাটিয়েছি। অন্যদিকে ছিল শীতকালে, কোচবিহারে বিখ্যাত 'রাসমেলা'। শহর তো বটেই, সারা জেলাটাই যেন একমাসের ঐ উৎসবে মেতে উঠতো। সারাদিনে সব কাজকর্ম তাড়াতাড়ি শেষ করে, সন্ধে হতে না হতেই নারী-পুরুষ সবারই মেলায় যাওয়া চাই। সন্ধের পরও আমার আপিসে জরুরি কাজের চাপে আমি প্রতিদিন বাণীকে সঙ্গ দিতে না পারলেও, বাণী ছেলেদের ও কাজের লোককে নিয়ে মেলায় চলে যেত। এক মাস ভরা এমন উজ্জ্বল ও আনন্দময় মেলা আমরা আর কোথাও দেখিনি। এখনও মনে হলে, প্রাণ যেন সেখানে ছুটে যেতে চায়।

আমার কোচবিহার আপিসে ছিল একটি মৈথিলী ব্রাহ্মণ, সেপাই এর কাজ করত। মাত্র পনের ব'ছর বয়েসে রাজমাতার রাঁধুনী হয়ে এসে, তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমে কোচবিহার স্টেটের শুল্ক বিভাগ, পরে কেন্দ্রীয় শুল্ক ও কাস্টমস বিভাগের

চাকুরিতে আসে। নাম নাথুনী মিশ্র, কিন্তু সবাই ডাকতো মিশির বা ঠাকুর মশাই। সে ছিল যেমন বুদ্ধিমান তেমনই কর্তব্যপরায়ণ। প্রকৃতপক্ষে আমার সংসারের রান্না ছাড়া আর সব কিছু চালাতো সে, টাকাটা দিতাম আমি। আমার দুই ছেলেই মিশিরদা বলতে পাগল ছিল। এই মিশিরের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। কোচবিহার থেকে বদলি হয়ে কলকাতা আসার পথে মিশির আমাদের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত এসেছিল। সেখানের মেল ট্রেন ছেড়ে দিলে, সে কেঁদে কেঁদে প্ল্যাটফরমের উপরই প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লে, রেল পুলিশের ও সি তাকে ধরে ধরে বিশ্রামাগারে নিয়ে সুস্থ করে। পুরানো ফাইল খুঁজে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছু নিদর্শন পেয়ে সেগুলো এখানে ছেপে দিলাম।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

"নটীর পূজা"

পরিচালিকা—

রেখা চক্রবর্ত্তী,

বাণী রায়

ঃ চরিত্র ঃ

মহারাণী—পারুল

বাসবী—রাণী নন্দী

মালতী—লক্ষ্মী

কিংকরী—লক্ষ্মী

রত্নাবলী—অনিতা

মল্লিকা—জয়া

উপালী—বাসন্তী

নন্দা—শান্তি দত্ত

১ম রক্ষিনী—দীপিকা

নটী—চিন্ময়ী দত্ত

অজিতা—চায়না

উৎপলপর্ণা—বাসন্তী

২য় রক্ষিনী—নিভা

সঙ্গীত পরিচালনায়—

রেখা চক্রবর্ত্তী।

যন্ত্র সঙ্গীত—

বেহালা—কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ।

বাঁশী—কুমার কুসুমেন্দ্রনারায়ণ।

দিলরুবা—

তবলা—শ্রীবাণীন রায়।*

---

* লেখকের ভাল নাম।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের—

"তাইতো"

এতে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন—

ঃ পুরুষ ঃ

জীবনময়—শ্রীআশীষ রায়
দীননাথ— „ তারকনাথ বিশ্বাস
সমর— „ পবিত্র চক্রবর্ত্তী
সমীর— „ সন্তোষ বিশ্বাস
সুহাস— „ মিহির গাঙ্গুলী
সুরেশ (ম্যানেজার)— „ হিরন্ময় দাস
৪র্থ পক্ষীয় বৃদ্ধ— „ বিজয় নন্দী
পল্লব— „ বিজন চাকী
বিরূপাক্ষ— „ বারীণ রায়১
সিনেমার দর্শকগণ— „ রমেশ গিরি
„ মলিন দাস
„ উপেন চক্রবর্ত্তী
সমীরের বন্ধু— „ কণক চ্যাটার্জ্জী
„ মলিন দাস
গাঁট কাটা— „ রমেশ গিরি
„ মলিন দাস
মাতাল— „ বারীণ রায়২
দুষমন সিং— „ অনিল প্রামাণিক
শিষ দেওয়া তরুণ— „ রমেশ গিরি
পত্র বাহক— „ উপেন চক্রবর্ত্তী।

ঃ স্ত্রী ঃ

মল্লিকা—রেখা চক্রবর্ত্তী
বল্লিকা—উমা দাস
মালবিকা—বাণী রায়
নিস্তারিনি—শান্তি দেবী
মুখরা নারী—পুষ্প নন্দী
বসুন্ধরা—রত্না চক্রবর্ত্তী
৪র্থ পক্ষের স্ত্রী—পুষ্প নন্দী
মাতালের স্ত্রী—বাণী রায়
বকুলিকা (পটী)—রাণী নন্দী।

(১)+(২) লেখকের ভাল নাম।

CENTRAL EXCISE & LAND CUSTOMS CLUB, COOCHBEHAR.

DRAMA "BHARATE CHAI" OR "HOUSE TO LET"

Producer :—Central Excise & Land Customs Club, Coochbehar.

Directed by :—Sri M. L. Sarkar, Sri B. Roy[১] & Sri B. Banerjee.

ACTORS & ACTRESS :—

B. Bhattacharjee, B Banerjee, H Mukherjee, S C. Roy, B. Roy,[২] A Dasgupta, S. Mukherjee, G. Choudhury, D. Ghosh, H. Dhar, B. Mukeerjee, R Das, J N. Chakraborty, P. C. Talukdar, D. Rakshit, N. Sinha, [illegible]. Basak, G. Mukherjee, S. Seal, A. Bhattacharjee, Kumari Dalu, Kumari Chitralekha, Kumari Rita

এই কোচবিহার থেকেই একদিন জীপগাড়িতে বড় পুত্র ফল্গু ও কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে ভুটান রাজ্য সীমান্তে কুখ্যাত বক্সাদুয়ার বন্দীশালা দেখতে দেখতে গিয়েছিলাম। দেশভাগের পূর্বে, আমাদের সেই বাংলার সব বাঘা বাঘা বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে, পাহাড়ের উপর ঐ দুর্গম বন্দীশালায় বিনা বিচারে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আটকে রাখা হত। ওখান থেকে যেমন পালাবার ছিল না কোন পথ, তেমনি ছিল না আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয়জনের সাক্ষাতের কোন সুযোগ। লোকালয়হীন পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে একটা টিলার সামান্য স্থান নিয়ে এই বন্দীশালায় বহু টিনের চালের ঘর দেখেছি। কাঁটাতারের উঁচু বেড়ার জাল চারদিকে। ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দীশালার মতো চারদিকে উঁচু কয়েকটা ওয়াচ-টাওয়ার। দুদিকে গভীর খাদ, একদিকে সামান্য দূরে ভুটান রাজ্যের সীমান্ত। শুধু একদিকের পায়ে হাঁটার রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে আসা যায়। কিন্তু সেখানেও হিংস্র জানোয়ারের ভয়। ইংরেজ রাজত্বের কি অভিনব আবিষ্কার! আমাদের নমস্য যে সব বিপ্লবীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য এখানের এই ভয়ঙ্কর নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন, তাঁদের সকলের নাম আজ

(১)+(২) লেখকের ভাল নাম।

আর মনে নেই, তবে আমার স্মরণশক্তি যদি ঠিক থেকে থাকে তবে অনুশীলন দলের প্রয়াত আশুতোষ কাহেলি ও বি. ভি. দলের প্রয়াত জ্যোতিষ জোয়ারদারের নাম উল্লেখ করতে পারি। জানা-অজানা সকল বিপ্লবীদের উদ্দেশেই ঐ বন্দী-শালার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সন্ধ্যার সামান্য পূর্বে কোচবিহারে ফিরে আসি।

অন্য একদিন বাণী, দুই ছেলে, আমি ও এগ্রিকালচার স্কুলের দু'তিন জন পারিবারিক বন্ধুদের নিয়ে ঐ জীপগাড়িতে রওনা হলাম আসামের ধুবড়ির ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে। কোচবিহারের সীমানা ছাড়িয়ে আসামের সীমানায় প্রবেশ করতেই কেমন একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করলাম শিলচরের কথা মনে করে। প্রকৃতির রূপ এখানে আরও সবুজ, আরও গভীর। ধুবড়ি পেঁছুবার সামান্য আগেই নজরে এলো গৌরীপুরের (আসাম) রাজবাড়ি। আমাদের যৌবনকালের জনপ্রিয় ও বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক ও নায়ক প্রয়াত প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়ি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ছাত্রজীবনে এই প্রখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে পত্রালাপ ছিল। জীপ থামিয়ে রাজবাড়ির নিকটে যেয়ে কারুর সঙ্গেই কোন যোগাযোগ করা গেল না। সামান্য দূরে একটা টিলার উপর বড় একটা বাগান বাড়ির মতো দেখে, সেখানে যেয়ে যাঁকে পেলাম তিনি প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই বলে পরিচয় দিলেন। তিনি 'লালজি' বলেই সাধারণত পরিচিত। সামান্য কয়েক ব'ছর পূর্বে এই লালজিকেই একজন হস্তি-বিশারদ রূপে টিভির একটা ইনটারভিউতে দেখে, একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেলেও চিনতে পেরেছিলাম। টিলার উপর যে বাগানবাড়িতে তাঁকে পেলাম, সেটা যতদূর মনে পড়ে, ওঁদের মাটিয়াবাগ প্যালেস বলে পরিচিত। যাহোক কোচবিহার থেকে এসেছি শুনে, উনি কষ্ট করে ঐ বাড়ির বড় হল ঘরে তাঁদের পারিবারিক বহু শিকারের জন্তু-জানোয়ার দেখালেন। মৃত জন্তু-জানোয়ার কৃত্রিম উপায়ে সজীব করে রাখার প্রচেষ্টা দেখে বেশ ভালই লাগল।

আমরা প্রয়াত প্রমথেশ বড়ুয়া মহাশয়ের বিখ্যাত 'মুক্তি' ছবির শুটিং-এর কথা উল্লেখ করে জানলাম যে বড়ুয়া সাহেব তাঁর পুরো টিম নিয়ে এসে এই প্রাসাদেই ওঠেন। তার পেছনের জঙ্গলেই প্রায় সব আউটডোর শুটিং করেন। গৌরীপুর এস্টেটের হাতির দল ব্যবহার করা হয়। যে বিশেষ হাতিটি ছবিতে বার বার দেখা যায়, সেটা বড়ুয়া সাহেবের খুব প্রিয় হাতি। নাম ছিল জংবাহাদুর। তিনি আরও বলেন যে ধুবড়ি যাবার পথে একটু এগিয়ে যেয়েই বাঁদিকে যে

নদীটা দেখবেন, তার নাম 'গদাধর'। এই নদীর তীরেই তাঁদের গৌরীপুর অবস্থিত। আর এই নদীকে ব্যাকগ্রাউণ্ড করেই 'মুক্তি' ছবিতে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গান গাওয়া হয়েছিল। আমাদের কালের অতি প্রিয় 'মুক্তি' ছবির পশ্চাদপর্বের অনেক কিছু এখানে এসে জানতে ও দেখতে পেয়ে মন আনন্দে ভরে গেলো। কতদিনে, তখনকার সমবয়েসী প্রিয় ও আপনজনদের এই আনন্দের ভাগ দিতে পারব তার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম। সেখান থেকে ধুবড়ি যাবার পথে, যখন জীপগাড়ি ঐ 'গদাধর' নদীর পাশ দিয়ে চলেছে, তখন ড্রাইভারকে গাড়ি একটু ধীরে চালাতে বলে আমরা সকলে কোরাসে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গাইতে গাইতে একসময় ধুবড়ি পেঁাছে গেলাম।

ধুবড়ি পেঁাছে ব্রহ্মপুত্র নদ দেখে তো আমরা একেবারে বিমূঢ়। কি বিরাট তার রূপ! দেখে সত্যি ভয় হয়। আমরা পাড়ে বসে অনেকক্ষণ ব্রহ্মপুত্রের সেই বিশাল ও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আলোচনা করে, নিকটেই কাস্টমস্ আপিসে যেয়ে দেখি আমার এক পুরানো সহকর্মী ও বন্ধু, শিলচরের ধোয়ারবন্দ চা বাগানের অরুণ বসু সেখানে বসে আছে। আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। অরুণ ব'ছরখানেক পূর্বে সেখানে বদলি হয়ে এসেছে। সেদিন অরুণের সাক্ষাৎ আমার ও বাণীর কাছে ছিল একটা উপরি পাওনা। ফেরার পথে আমাদের জীপেই অরুণ গৌরীপুর পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। রাত্রি প্রায় আটটা নাগাদ আমরা গল্প করতে করতে কোচবিহারে ফিরে এলাম।

যতদূর মনে আছে, ১৯৪০ সালের কাছাকাছি, শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া কলকাতা থেকে সুরমা মেলে, তৎকালীন সিলেটের একটা মহকুমা শহর হবিগঞ্জে যাচ্ছেন, ওখানের একটা সিনেমা হলের উদ্বোধন করতে। সে সময় সুরমা মেল দিনের বেলা ময়মনসিংহ হয়ে সিলেট যেত। বড়ুয়া সাহেবের জনপ্রিয়তা তখন একেবারে তুঙ্গে! বাংলার যুব সম্প্রদায় তখন কেউ তাঁর হাঁটার কায়দা নকল করছে, কেউ তাঁর 'মুক্তি' ছবির পোশাক নকল করে নিজেদের ধন্য মনে করছে। অন্যদিকে ঢাকার কুট্টি সম্প্রদায়. নিজেদের ভাষায় তাঁর 'দেবদাস' ছবির অভিনয়ে পারুলের সংলাপে বলছে, "দেব্‌দা, দেব্‌দা, তুমি নাকি হালায় আমারে ফালাইয়া কইলকাতা যাইবা গিয়া?" আর দেবদাস তখন বঁড়শির হুইল গোটাতে গোটাতে বলছে, "পারুল! তুই হালায় একটা বোদাই! তরে ফালাইয়া আমি কইলকাতা যামু! তুই না আমার 'কইল্‌জা'!"

যাক, সুরমা মেল তখন ময়মনসিংহ স্টেশনে পাঁচ/দশ মিনিট থামতো। কিন্তু

জনতা, বিশেষ করে ছাত্র জনতার অনুরোধ বা জোরাজুরিতে সুরমা মেলকে অনেকক্ষণই সেদিন থামতে হল। একটা আপার ক্লাস বগিতে ছাত্ররা কেউ প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে, কেউ কামরার ভেতরে উঠে বড়ুয়া সাহেবকে নানাভাবে সম্বর্ধনা করলো। শেষে উদ্দাম হৈ চৈ এর মাঝে, একসময় সুরমা মেল গন্তব্য-স্থানের দিকে রওনা হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর, কোনও একটা দৈনিক খবরের কাগজে বড়ুয়া সাহেবের একটা বিবৃতি প্রকাশিত হয়। উনি তাতে বলেছিলেন যে "ওমুকদিন ময়মনসিংহ স্টেশনে সুরমা মেলের কামরা থেকে আমার একটা ওমুক মডেলের পেন হারিয়ে গেছে। মনে হয়, সেদিন যে বন্ধুরা আমায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন, তাঁদের কেউ আমার সঙ্গে 'লুকোচুরি' খেলছেন। জগৎ-বিখ্যাত কোন এক হলিউডের নায়িকা সেই পেনটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন বলেই সেটা আমার কাছে খুব-ই মূল্যবান। এটা ভেবে যদি বন্ধুটি অনুগ্রহ করে পেনটা আমায় ফেরত দেন তবে বাধিত হব।"

এ বিবৃতির পরিণতি আমার জানা নেই। আমার ধারণা ঐ বিবৃতি হয়তো বড়ুয়া সাহেবের 'চোর' বন্ধুটির কাছে ঐ পেনটার মূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

কথায় কথা বাড়ে, যেমন স্মৃতি টানে স্মৃতি। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি হুগলির শ্রীরামপুরে চাকুরিরত ছিলাম। তখন আমাদের আপিসে পাপু মুখার্জি নামে একজন সাব-ইন্‌সপেক্‌টার ছিল। বাড়ি ছিল ভবানীপুরের 'বসুশ্রী' সিনেমা হলের পেছনে। 'বসুশ্রী'-র মণ্টু বোস, সিনেমা জগতের প্রয়াত একেবারে টপ্‌ হিরো বা মহানায়ক উত্তমকুমার ইত্যাদি ছিল তার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু।

তখন উত্তম সবেমাত্র তিন চারটে ছবিতে অভিনয় করেছে, নামি-দামি হিরো হয়ে ওঠেনি। বয়োকনিষ্ঠ পাপু খুবই সরল ও ভাল ছেলে ছিল বলে আমার খুব স্নেহেব পাত্র ছিল। সে প্রায়ই উত্তমকুমার তার বাল্যবন্ধু, খুব অন্তরঙ্গ ইত্যাদি বলে আপিসে গল্প করত। একদিন কপট বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলাম, যাও যাও, সিনেমা ষ্টারদের নিয়ে অনেকেই এমন চালবাজি করে, তোমাকেও দেখছি সে দোষে পেয়েছে। পাপুর মনে হয়তো কথাটা খুব লেগেছিল। তাই পরের রবিবারেই উত্তমকুমারকে নিয়ে সে আমার শ্রীরামপুরের বাসায় যেয়ে উপস্থিত। আমি তখন বাসায় ছিলাম না। এসে শুনলাম যে পাপু আমার

স্ত্রীকে ও উপস্থিত অন্য সকলকে উত্তমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, চা-মিষ্টি ইত্যাদি খেয়ে বলে যায় যে বৌদি, বারীনদা এলে বলবেন যে, তাঁর ছোট ভাই পাপু চালবাজ নয়। উত্তম আমার বন্ধু না হলে, সেই ভবানীপুর থেকে বিনা প্রয়োজনে আমার সঙ্গে এতটা পথ চলে আসতো না।

পরের দিন থেকে তো আপিসে পাপুর ওজন ভীষণভাবে বেড়ে গেল। ১৯৫০ কি '৫১ সালে মনে হয় কলকাতায় একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল। বাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন দেশের ছয়খানা বিশিষ্ট ছবির দুখানা করে টিকিট কিনতে কলকাতা এসে পাঁচখানার টিকিট পেলুম, কিন্তু 'Fall of Berlin'-এর টিকিট 'বসুশ্রী'-তে পেলাম না। 'হাউজ ফুল।' হঠাৎ পাপুর কথা মনে পড়াতে তার বাড়ি যেয়ে কথাটা বললে, পাপু তখুনি আমায় নিয়ে হলে মণ্টু বোসের সঙ্গে দেখা করে জানলো যে সত্যি একখানা টিকিটও নেই। তারা অবশ্য বললো, সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই। আপনি 'শো' এর দিনে হলে এসে পাপুর সঙ্গে দেখা করবেন এবং পাপুর সঙ্গে বসেই ছবিখানা দেখে যাবেন। কি হবে না হবে, নিশ্চিত হতে না পেরে 'শো' এর দিনে একলাই প্রায় একঘণ্টা পূর্বে হাজরার মোড়ে এসে দেখি, সেখান থেকে মানুষের ভিড়ে ট্র্যাফিক জ্যাম; 'বসুশ্রী'-র দিকে এগুবার কোন উপায় নেই। পুলিস ঐ ভিড়ের মধ্যে টিকিট চেক্ করে, টিকিট হোল্ডারদের শুধু অতিকষ্টে হলের দিকে যাবার পথ করে দিচ্ছে। আমার তো মাথায় হাত! সব চাইতে পছন্দের ছবিটাই বুঝি দেখা হল না। এমন সময় মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। একজন পুলিস অফিসারকে আমার সরকারি পরিচয়-পত্র দেখিয়ে বলি যে আমার টিকিট নিয়ে আমাদেরই একজন সাব-ইন্সপেকটর 'বসুশ্রী' হলের ভেতরে অপেক্ষা করবে, কাজেই আমার তো এখানে টিকিট দেখাবার উপায় নেই। অফিসারটি আমায় পথ করে দিয়ে হলের পুলিস পাহারায় বন্ধ করা কোল্যাপ্‌সিব্‌ল্ গেটের কাছে পৌঁছে দিতেই, ভেতরে অপেক্ষারত পাপু ছুটে এসে আমায় হলের বারান্দায় ঢুকিয়ে নিয়ে বললো যে, "আমি তো ভয় পেয়েছিলাম যে শেষ পর্যন্ত গেটের কাছে পেঁছুতেই পারবেন না।" 'শো' আরম্ভ হবার সময় তখন প্রায় হয়ে গেছে। পাপু আমাকে নিয়ে হলের দোতলায় উঠে যেয়ে একটা দরজার পাশে লম্বা একটা বেঞ্চে বসাল। দেখি আমার পাশেই বসে আছেন উত্তমকুমার। পাপু তাকে বলল, সেদিন শ্রীরামপুরে তোকে এই বারীনদার বাড়িতেই নিয়ে গিয়েছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ উনি বাড়ি ছিলেন না। উত্তমকুমার মৃদু হেসে আমার সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলেন।

'Fall of Berlin' তখন প্রায় চার ঘণ্টার বই ছিল। বিরতির ফাঁকে ফাঁকে উত্তমের সঙ্গে সেদিন নাটক-সিনেমা নিয়ে বহু আলোচনাই হয়েছিল। আমি তাঁকে গুরুদাসের (বন্দ্যোপাধ্যায়) কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি মোটামুটি তাঁর প্রশংসাই করেছিলেন। আশুতোষ কলেজে ১৯৩৮-৩৯ থেকে ১৯৩৯-৪০ সাল আই এ ক্লাসে আমি, জীতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস, নীহার ও ইন্দু এক বেঞ্চেই বসতাম, একে অন্যের প্রক্সিও দিতাম। পূর্বে উল্লিখিত ভারতলক্ষ্মী পিক্চারসের 'পরশমণি' ছবিতে আমি ও গুরুদাস একসঙ্গেই ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম, পরিচালক প্রফুল্ল রায় ও সঙ্গীত পরিচালক হিমাংশু সুরসাগরের কাছে। কিন্তু ভাল করে গান গাইতে না পারায় গুরুদাস সিলেকটেড হল না, আমি হলাম। কিন্তু আমি ঐ ছবির কাজে যোগ দেয়ায়, গুরুদাস আমার উপর একটু অসন্তুষ্টই হয়েছিল। তারপর আই. এ. পাশ করে আমি ঢাকায় এন্‌জিনীয়ারিং পড়তে যেয়ে, বহু বাংলা ছবিতে গুরুদাসকে, বরযাত্রীর বেশে, চা-পার্টিতে চা ইত্যাদি খেতে দেখেছি। আর পরে তো সে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের রোলে একেবারে বাংলা বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। তখনও অবশ্য কোথাও দেখা-সাক্ষাৎ হলে কথা-বার্তা বলতো, না চেনার ভান করত না।

যাহোক, সেদিন 'Fall of Berlin' দেখার কয়েকমাস পরে, একদিন বিকেলে বিশেষ প্রয়োজনে ভবানীপুরে পাপুর বাড়িতে যেয়ে তাকে না পেলে, তার বাড়ির লোক বললো যে 'পূর্ণ সিনেমা'-র উল্টো দিকে একটু বাঁয়ে ৺দ্বারিক চক্রবর্তীর (পূর্বে উল্লিখিত) বাড়ির বৈঠকখানার আড্ডায় পাপুকে পেতে পারেন। ঐ বৈঠকখানা আমার দেখা। দ্বারিক চক্রবর্তী কিশোরগঞ্জেরই লোক। আমি সেই বাড়ির খোলা গেট দিয়ে সোজাসুজি একেবারে বৈঠকখানায় যেয়ে হাজির হলে, ফরাসে বসা চার পাঁচটি ছেলে যার যার সামনের Coin-গুলো তার তার পেছনে লুকিয়ে, সন্দিগ্ধ চোখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কাকে চাই ? তাদের প্রত্যেকের মুখেই ভয়ের ছাপ ! মানে আমি সাদা পোশাকের পুলিস, তাদের 'ফ্লাস' খেলা ধরতে এসেছি কিনা এই ভয় ! পাপু ওখানে ছিল না। শ্রীমান উত্তমকুমারও সেই ভীত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি তাকেই হেসে বললাম. কয়েকমাস পূর্বে যে আমি, পাপু আর আপনি 'বসুশ্রীতে' এক বেঞ্চে বসে Fall of Berlin' দেখলাম, সেটা এর মধ্যেই ভুলে গেলেন। সবার মুখেই তখন স্বস্তির হাসি ফিরে এলো। উত্তমকুমার বললেন, বসুন, বসুন, সত্যি হঠাৎ ঘাবড়ে যেয়ে আপনাকে চিনতে পারিনি। আমরা একটু 'ইয়ে' খেলছিলাম তো !

কোচবিহারের বিখ্যাত 'রাস' মেলায় একবার গুরুদাস, মলিনা ইত্যাদিকে নিয়ে তার বিখ্যাত 'যুগাবতার' করতে গেল। গুরুদাস এসেছে জেনে তারা যে বাড়িতে উঠেছে, সেখানে দেখা করলে আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব আনন্দ প্রকাশ করে বললো, তুই এখানে কি করছিস। আমি বললাম, আমি এখানের ও. সি. কোচবিহার রেলওয়ে কাস্টমস্ স্টেশন। উভয়ে মিলে বহু পুরানো স্মৃতির জাবর কেটে, আমি বললাম, প্রতি রাতেই তো তোর 'থেটার'। কাল সকালে আয় না আমার বাড়িতে একটু চা-টা খাবি। সে বলল, নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু তুই বেলা নটায় এসে নিয়ে যাবি। আর 'চ' আমার সঙ্গে, মলিনাকে তুই নিজে একটু বলবি। আমি যেতে যেতে ভাবলাম, আবার মলিনা কেন? আমি তো ঠিক নায়ক-নায়িকার ফ্যান হয়ে আসিনি, এসেছি আমার পুরোনো বন্ধুর কাছে। জীতেন, নীহার, ইন্দু হলেও আসতাম! মলিনা তো আমাদের থেকে বয়সে অনেক বড়। স্কুল জীবনের শেষের দিকে কি কলেজে পড়ার প্রথম দিকে, ময়মনসিংহ-গীতিকার 'মহুয়া' পর্বের ছবিতে মলিনাকে প্রয়াত দুর্গাদাস ব্যানার্জীর সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় দেখেছি, যে ছবিতে জাদুকরের রোলে প্রয়াত অহীন্দ্র চৌধুরী 'ভানুমতির খেল' 'ভানুমতির খেল' চীৎকার করে জাদু দেখিয়ে বেড়াত। কাজেই গুরুদাসের সঙ্গে মলিনাকে নিমন্ত্রণ করার কারণ না বুঝলেও (অনেকদিন পরে বুঝেছিলাম) গুরুদাসের অনুরোধে মলিনাকে নিমন্ত্রণ করতে হল। মলিনা একবার আমার পাশে দাঁড়ানো গুরুদাসের দিকে তাকিয়ে রাজি হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে এসে ভাবলাম, আমি তো গুরুদাসকে যেয়ে একটা রিকশায় বসিয়ে নিয়ে আসতাম। এখন আবার মলিনা থাকলে এটা কেমন দেখাবে! বিড়লাদের Cooch-Behar Plywood কোম্পানির কার্যকরী ম্যানেজার, প্রতিবেশী চ্যাটার্জীবাবুকে ব্যাপারটা বলে তাঁদের জীপ গাড়িটা চেয়ে ঠিক করে রাখলাম। আর তাঁকে ও আরও দুএকজন বিশিষ্ট নাগরিককে পরের দিন সকালে গুরুদাসের সঙ্গে চা খেতে নিমন্ত্রণ করে রাখলাম। চা-এর সঙ্গে ভাল স্ন্যাক্সেরও ব্যবস্থা করা হল। পরের দিন ঠিক পৌনে নটায়, আমি জীপ গাড়ি নিয়ে গুরুদাসদের আস্তানায় প্রবেশের পথে দেখলাম পনের/বিশটি অল্প বয়সের ছেলে 'অটোগ্রাফ' নেবার আশায় ঐ বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি গুরুদাসদের আস্তানার দরজায় কড়া নাড়লে, পাশের জানালা খুলে গুরুদাস আমায় দেখেই জোড়হাত করে বললো, "মাফ্ কর ভাই, আমরা যেতে পারব না। ঐ দেখ্, বাইরে কতগুলো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে অটোগ্রাফ নিতে, বার হলেই মারা পড়ব।"

আমি বললাম, "এরা মোটামুটি সকলেই আমার চেনাজানা, তুই জীপে বসে চার/পাঁচটা অটোগ্রাফ দিতে দিতেই আমি গাড়ি ছেড়ে দেব।" কিন্তু সে কিছুতেই ভরসা না পাওয়াতে, আমি রাস্তায় নেমে এসে ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বললাম। ওঁদের বাবা, কাকা, মামা, জ্যাঠা প্রায় সকলেই আমার পরিচিত। ওঁদের বললাম যে তোমাদের ভয়ে গুরুদাস-মলিনা বেরুতে সাহস পাচ্ছে না, না বার হলে তো একটাও অটোগ্রাফ পাবে না। তার চাইতে বরঞ্চ তোমরা ঠিক করে নাও যে, যে কোনও পাঁচজন অটোগ্রাফ নেবে, এর চাইতে বেশি ওঁদের জ্বালাবে না তবে আমি ওঁদের বাইরে নিয়ে আসি। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, আমার কাছে আবদার করে বললো যে মেশোমশাই আমরা সাত জন অটোগ্রাফ নেবো এবং কথা দিচ্ছি, এর বাইরে আর কেউ ওঁদের কোনওরকম জ্বালাতন করবে না। আমি পুনরায় যেয়ে গুরুদাসকে পুরো দায়িত্ব নিয়ে ভরসা দিলাম এবং ওরা না গেলে, আমাকে আমার এলাকায় কতটা অপদস্ত হতে হবে তাও বুঝিয়ে বলার পরও যখন সে রাজি হল না, তখন বিরক্ত হয়ে জীপ গাড়ি নিয়ে বাসায় ফিরে এসে নিজেরা-নিজেরাই চা-টা খেয়ে গল্পগুজব করলাম। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে থিয়েটার-সিনেমার লোক যতই অন্তরঙ্গ হোক, এদের সংস্পর্শে আর কোনদিন যাব না। ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতা কলেজে পড়তে এসেও আমার এবংবিধ একটা বিতৃষ্ণার কথা লিখেছি বলে মনে হয়।

আমার আপিসটা ছিল কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের উপরই, ওঁদেরই বিল্ডিং-এ। কাজও ছিল মোটামুটি রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গেই। অনেক সময় কাজের সমন্বয়ের জন্য আমাদের রাতেও আপিসে কাজ করতে হত। উক্ত ঘটনার তিন চার দিন পরে একদিন রাত্রি আটটার সময় কিছু সহযোগী নিয়ে আপিসে কাজ করছি। এমন সময় স্টেশন মাষ্টার আমার আপিসের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, আমাকে ইশারা করে বাইরে ডেকে নিয়ে খুব নিম্নস্বরে বললেন, যে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামালয়ে খুব গোপনে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছেন। আমাকে ডেকে খুব গোপনে খবরটা আপনাকে দিয়ে, আপনাকে ওখানে যেতে অনুরোধ করেছেন। আমার মুখ দিয়ে ফস্ করে বার হয়ে গেল, "আমার হাতে এখন এতো কাজ যে এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই।" স্টেশন-মাষ্টার আমার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাই কিছুক্ষণ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন।

আমাদের ইদানীংকালের প্রয়াত বিখ্যাত নায়িকা মহুয়ার পিতা 'নীলু' বাল্যে

ও যৌবনে আমার খুব 'নেওটা' ছিলো। দেশভাগের পর নীলু ও তার পরিবার দমদমে থাকতো। মহুয়ার প্রথম বই বোধ হয় 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'। তার শুটিং করতে দমদম থেকে টালিগঞ্জের একেবারে কুঁদঘাটের কাছে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে এসে করা খুবই কষ্টকর বলে আমাকে অনুরোধ করে মাঝে মাঝেই এসে পিতা আর কন্যা আমার বাড়ির একটা খালি ঘরে থাকতো আর আমাদের সঙ্গেই খেতো। ঐ সময়টায় বাড়িতে কাজের লোক সহ শুধু আমি আর বাণী থাকতাম। মহুয়া তখন খুবই অল্প বয়সের। সারাদিনই আমাকে আর বাণীকে জেঠু আর জেঠুমা বলে একথা-সেকথায় পাগল করে তুলতো। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও আমার বাড়ি থেকে এক দেড় মিনিটের রাস্তা। কিন্তু হাজারবার বলেও সে তার শুটিং দেখতে আমাকে নিয়ে যেতে পারেনি। 'মেয়েটা এত করে বলছে, বড় মায়া লাগে' বলে, বাণী আমার অনুমতি নিয়ে মহুয়ার সঙ্গে একদিন তার শুটিং দেখতে গিয়েছিল। পরে তো খুব নাম করে আমাদের বাড়ির কাছেই মহুয়া বাড়ি ভাড়া করে থাকতো। তার পিতা নীলুও প্রায়ই মেয়ের বাড়িতে এসে থাকতো। আমার বাড়িতেও আসতো। কিন্তু তার বহু অনুরোধেও আমি কোনদিন মহুয়ার বাড়িতে যেতে পারিনি।

১৯৬০ সালে সিনেমা ফিল্ম্ (Exposed)-এর উপর কেন্দ্রীয় শুল্ক বসলে দক্ষিণ কলকাতার সব ফিল্ম্ ল্যাবর্যাটোরিগুলোর Excise net work চালু করে দিতে, আমাকে সরকার থেকে তিন মাসের জন্য ঐ স্টুডিওপাড়ায় বা তখনকার চলতি ভাষায় 'টলিউডে' deput করা হয়। নিউ থিয়েটারস্ স্টুডিওর ভেতরে India Film Laboratory-র একটা ঘরে আমার অস্থায়ী আপিস খোলা হয়, আর স্থানীয় প্রত্যেকটা Film Laboratory-তে একজন করে ইনস্পেক্টর বসিয়ে দেয়া হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত বিপ্লবী অনন্ত সিং এ সময়ে সিনেমার ছবি তৈরির কাজে নেমেছিলেন। বেঙ্গল ফিল্ম্ ল্যাবর্যাটোরিতে প্রায়ই আসতেন। উনি মনে হয় পুলিসকে খুবই ঘৃণা করতেন। কারণ on duty আমি খাঁকি ইউনিফরম পরে থাকতাম বলে, আমার দিকে ঘৃণার চোখে তাকাতেন। আমি কিন্তু তখনও মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তারপর একদিন ঐ ল্যাবর্যাটোরির ম্যানেজার মিঃ চ্যাটার্জী তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে আমি ইউনিফরম পরা অবস্থায় তাঁকে প্রণাম করি। এতে উনি এতোই সুখী হয়েছিলেন যে, এখানে এলেই আমার খোঁজ করতেন এবং গেলেই গল্প করতেন। বহু পরে

ডাকাতি কেসে ওঁনার যখন বিচার চলছে, তখন তাঁকে মাঝে মাঝেই জেল-কাস্টডি থেকে পুলিস এসকর্টে কোর্টে নিয়ে যেতে আমার বড় ছেলের ডিউটি পড়ত। তখন উনি চোখে আর প্রায় দেখতেই পেতেন না, পারতেন না ভাল করে হাঁটতে। আমার বড় ছেলে, অনন্ত সিং এর সঠিক পরিচয় জানতো না। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমার উপদেশ মতো এর পর থেকে সে অনন্ত সিংকে জেল গেট থেকে একেবারে প্রিজনারস ভ্যান পর্যন্ত খুব যত্ন করে এনে তুলে, কোর্টেও খুব যত্ন করে নিয়ে যেত। অনন্ত সিং এজন্য ছেলেকে খুব আশীর্বাদ করলে, সে বলেছিল, আমিতো পূর্বে আপনাকে চিনতাম না, এখন বাবার নিকট থেকে আপনার পরিচয় পেয়ে তাঁরই উপদেশ মতো যতটা সম্ভব আপনাকে সাহায্য করি। জানিনা, ভুলপথগামী ও মৃত্যুপথ যাত্রী আমাদের যৌবন কালের এই বিখ্যাত বিপ্লবীর সেদিন আমার কথা মনে হয়েছিল কিনা!

বিপ্লবী বাঘা যতীনের সময়ের, শ্রীরামপুরের ভারতবিখ্যাত বিপ্লবী বর্তমানে প্রয়াত জীতেন লাহিড়ীর সঙ্গেও পরিচয় হয়, তাঁর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের একটা বড় হোস্‌পাইপ ইত্যাদি তৈরির ফ্যাকটরিতে। কিশোরগঞ্জের 'কারঙ্কার' বাড়ির বন্ধু মণি কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের তরফে ঐ ফ্যাক্‌টরির চার্জে ছিল। কলকাতা থেকে আমি পরিদর্শনে গেলে, মণি আমাকে লাহিড়ী মশাই এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁকে প্রণাম করলে, তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আর ছাড়তেই চান না। কথায় কথায়, আমি ওঁনাকে বলেছিলাম যে তাঁর বিপ্লবী জীবনের কথা, জার্মানীতে পালিয়ে যাবার কথা ইত্যাদি পড়েছি, আর আমার মনের শ্রদ্ধা আজ তাঁকে জানাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। উনি বললেন, তোমার মুখে আজ নতুন কথা শুনছি। বর্তমানে তো আমাদের কেউ চেনেই না, আমাদের খোঁজ কেউ করে না। শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। আমাদের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সুখের জীবন ছেড়ে প্রাণ দিলেন বা বেঁচে থাকলেও যৎপরোনাস্তি দুঃখ—নির্যাতন বরণ করে নিলেন, অন্তত আমাদের প্রজন্মের মানুষরা তাঁদের ভুলে যায় কি করে! আমার মনে হয় দিনে দিনে 'ইমান' খুইয়ে আমরা বুঝি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি! সেদিন অনেক রকমের কথা হয়েছিল ওঁনার সঙ্গে। কথা দিয়ে আসতে হয়েছিল, ওদিকে গেলে, ফ্যাক্‌টরিতে ওঁনাকে না পেলেও সংলগ্ন তাঁর বাড়িতে অবশ্যই যেন দেখা করে আসি। উনি এখন আর বেঁচে নেই। যে রাস্তার উপর ঐ ফ্যাক্‌টরি তার নাম হয়েছে এখন জে. এন. লাহিড়ী রোড। আর তাঁর বাড়ির বিরাট এলাকার

নাম 'লাহিড়ী পার্ক'।'

কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের চাকুরিতে ১৯৪৪ সালে যোগ দিয়ে এক নাগাড়ে চৌদ্দ বছরের বেশি, বাইরে বাইরে বা মফঃস্বল শহরে কাটিয়ে ১৯৫৮ সালে কলকাতায় পোস্টিং পেয়ে এসে আর আমাকে বাইরে যেতে হয়নি। কোচবিহার আমাদের কাছে শুধু খুব সুন্দর ও প্রিয়ই ছিল না, ছিল লক্ষ্মীমন্তও। ওখানের ভাল কাজ করার রেকর্ডেই আমি সমসাময়িক ও সিনিয়র অনেককেই পেছনে ফেলে দু-দুটো প্রমোশন পেয়ে কলকাতা আসি। আমার ঐ ভাল কাজের রেকর্ড গড়ার পেছনে ছিল সেপাই মিশিরের অসংখ্য অবদান। মিশির কোচবিহার জেলার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখত। বহু গোপন সূত্র থেকে সে ভয়ানক সব খবর এনে আমায় দিত। তার ফলে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বহু বেআইনি আমদানি করা মালপত্র আমার হাতে ধরা পড়ত। আর চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যেত। এইভাবে কাজের ভাল রেকর্ড করে, out of time আমি যে দুটো প্রমোশন কোচবিচারেই পেয়ে যাই, সেটা আমায় অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল বলেই, কলকাতা এসে, All India Service-এ বহুজনকে পেছনে ফেলে ভারত সরকারের India Revenue Service (I. R S.) এ-উত্তীর্ণ হলেও Assistant Collector-এর পদ পেতাম না। এজন্য আজও আমার প্রিয় সেপাই মৈথিলী ব্রাহ্মণ নাথুনী মিশিরকে দূরে থেকেও আমার প্রণাম জানাই।

আমরা বর্তমান বাড়িতে প্রবেশ করি ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে কোচবিহার থেকে বদলি হয়ে কলকাতা এসেছিলাম। তারপর কখনো আমি ও বাণী, আর কখনো ছেলে, বৌ ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে নিয়ে, ভারতবর্ষের বহু জায়গা ভ্রমণ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। যথা— বকখালি, দীঘা, শান্তিনিকেতন, কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেঁদুলী, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, ম্যাসেঞ্জোর, দার্জিলিং, পশুপতি ও ধুলাবাড়ি (নেপাল), মিরিক লেক, কালিমপঙ, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, ভুটানের ফুন্টসিলিং, সিকিমের গ্যাংটক, দুর্গাপুর, মুরশিদাবাদ, সিমলা, কুলু, মানালি, রোটাংপাস, ধরমশালা, ডালহৌসি, ছাম্বা, খাজিয়ার, ভারমৌর, চণ্ডীগড়, কালকা, পিঞ্জোর-উদ্যান, কাশ্মীরের শ্রীনগর, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, শোনমার্গ ইত্যাদি। দিল্লি, আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন, ফতেপুর সিক্রি, বম্বে, গোয়া, রাজস্থান, হলদিঘাট ও রক্ত তালাও (মানে পুকুর) সহ, আমেদাবাদ. মহারাষ্ট্রের নাসিক, বিজাপুর, আহমদনগর, ঔরঙ্গাবাদ, অজন্তা, ইলোরা, দৌলতাবাদ দুর্গ, পুনা, প্রতাপগড়, (যেখানে আছে শিবাজীর ভবানী মন্দির,

জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উন্মোচিত ঘোড়ায় আসীন শিবাজীর মূর্তি, আফজল-খাঁর নিধনস্থল ও তাঁর সমাধি) মহাবালেশ্বর, রাজগীর, নালন্দা, গয়া, বারানসী, মীরাট, হরিদ্বার, লছমনঝুলা, দেরাদুন, কেদারনাথ, বদরীনাথ, পাউরি, শ্রীনগর ও পথের প্রায় সকল প্রয়াগ, পুরী, ওয়ালটেয়ার, ভিজেকাপট্টম, মাদ্রাজ, পক্ষিতীর্থম, মহাবলীপুরম, পণ্ডিচেরী, মাদুরা, ত্রিবেন্দ্রাম, কন্যাকুমারীকা, দেওঘর, জামশেদ-পুর, কিরিবিরু, মধ্যপ্রদেশের সাতনা, পান্না, খাজুরাহো, আসামের গৌহাটি, লামডিং ও আরও বহু স্থান যা পূর্বেই লিখেছি পাঞ্জাবের অমৃতসর, গুরুদাসপুর ইত্যাদি। হয়তো মনে না পড়া আরও কত জায়গার নামই অলিখিত রয়ে গেল। উপরোক্ত বহু জায়গায় আমরা দু-তিনবারও গিয়েছি। এ ছাড়াও ফুটবল খেলতে আর চাকুরির কাজে আমাকে বরিশাল বাদে সেই সংযুক্ত বাংলার প্রতিটি জেলায় যেতে হয়েছে, অন্যদিকে পাটনা, কাটিহার, তোপচাঁচী, ছাপরা, মজঃফরপুর, বেরিলী, সীতাপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, সাজাহানপুর, মুসৌরি, আম্বালা, সাহারানপুর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, কর্ণাল, পানিপথ, বাখরানাঙ্গাল, বিখ্যাত আর্টারী বর্ডার, করদরাজ্য আগরতলা ইত্যাদি। হয়তো ভুলে যাওয়া আরও কত নাম-ই রয়ে গেল।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে অন্ততঃ বারবার, কলকাতার এস, বি মুরিং থেকে লাক্সারি লঞ্চ M. V. vigilant নিয়ে সুন্দরবনে একেক ট্রিপে Prevention of Smuggling-এর কাজে আমাকে দশ দিন থেকে বিশ-বাইশ দিন, পশ্চিমবঙ্গের সারা সুন্দরবন চষে ফেলতে হয়েছে। তখন একদিকে যেমন বঙ্গোপোসাগরের মুখে মায়াদ্বীপ, ডালহৌসি আয়ল্যাণ্ড, ক্যানিং, বাসন্তি, গোসাবা, সাতজালিয়া, সন্দেশখালি, সজনেখালি ইত্যাদি বহু জায়গা ও দ্বীপ দেখে এসেছি, অন্যদিকে ভারত-পূর্বপাকিস্তানের সীমান্ত নদী রায়মঙ্গল ও তার আশেপাশের বহু বড় বড় নদী-নালায় স্মাগলার, ডাকাত ও পূর্ব-পাকিস্তানের কাস্টমস্ ও তাদের বর্ডার পুলিসবাহিনীর সঙ্গে যে কতদিন কত রকমের লড়াই করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এগুলো, আর আপিসের কাজে বা বেড়াতে যেয়ে ভারতবর্ষের বহুস্থানে যে সব ভয়ঙ্কর ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি তার সব লিখতে গেলেও আলাদা একটা বড় বই হয়ে যাবে। তার মাত্র কয়েকটা কাহিনী নিচে দিলাম।

গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের উপর অমৃতসর-লাহোর বর্ডারে আটারি কাস্টমস্ স্টেশনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। সূর্যাস্তের পর ওখানকার Retreat

(সাময়িক অবসর) সত্যিই দেখবার মতো। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের গরমে ওখানে যেতে হয়েছিল আপিসের কাজে অমৃতসর থেকে কয়েক মাইল দূরে। জি. টি. রোডের উপর মাত্র একফুট ফারাকে দুটো লাইনে সাদা রং-এর দাগ কেটে দুদেশের বর্ডার নির্দেশ করা আছে। রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং এর মতো দুদিকে দুটো লোহার গেট। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঐ গেট দুটো খোলা থাকে, তারপর এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া দুদেশের দিকেই ঐ লোহার গেটের অনেকটা আগে দুটো লকগেট আছে। দর্শনার্থীরা শুধু লকগেট পর্যন্ত আসতে পারে। আপিসের কাজের সুযোগে আমরা একেবারে শেষ সীমানার 'ইনার' গেট পর্যন্ত গিয়েছিলাম বেলা চারটায়। কাজ শেষ করে লক্ষ্য করলাম, ভারত ও পাকিস্তানের সেন্ট্রি যার যার হাতে স্টেনগান নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে কথাও বলছে। খুবই অবাক হলাম, কারণ এ দৃশ্য পূর্বে আর কোথাও দেখিনি। পাকিস্তানের সেন্ট্রিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইধার কই পাঠান আদমি হ্যায় ? সে বলল, হাম পাঠান হ্যায়, বলিয়ে জি ক্যায়া চাহিয়ে ? বললাম, কুছ নেহী, ব্যাস্ এইসেহি পাঠান লোগসে বাতচিৎ করনেকো জী কর-রাহা-থা। শুনে পাকিস্তানি সেন্ট্রি খুশির হাসি হাসল। লাহোরের দিকে দেখিয়ে তাকে বললাম, ম্যায় ক্যা বর্ডার কা উস্‌পার যা সাকতা হুঁ ? সেন্ট্রি বলল, সখসে যাইয়ে। মাত্র এক পা বাড়িয়েছি, দুমিনিট হেঁটে গেলেই পাকিস্তান কাস্টমস আপিসে যেয়ে, ওদের অফিসারদের সঙ্গে একটু বাতচিৎ করে আসব। ১৯৪৭-এর পনরই অগাস্টের পূর্বে তো আমরা একই সরকারের চাকুরে ছিলাম। কিন্তু পেছন থেকে অ্যাসিসটেন্ট কালেকটার মিঃ গুপ্তার স্বর ভেসে এলো, Roy ! do'nt go beyond the boarder please, একথা বলে উনি আমার কাছে এসে ইংরেজিতেই বললেন, সেন্ট্রিদের সঙ্গে কথা বলছ দেখেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে তুমি Unusual কিছু একটা করবে। তাই আমি নজর রাখছিলাম। For God's sake do not land yourself in trouble and pull me there too.' আমার নিকট থেকে কথা আদায় করে উনি অন্য দিকে চলে গেলেন। লাহোরের দিকে তাকিয়ে দেখি, লক্‌গেটের ওপাশে বহু দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতের ইশারায় ডাকলাম। ঐ হাতের ইশারায়—তারাও 'না'-এর সংকেত জানাল। এর কয়েক মিনিট পরই পাকিস্তান সেন্ট্রির ডিউটি বদল হলো। সে আমাদের সেন্ট্রির সঙ্গে করমর্দন করে চলে গেল। নূতন যে এলো সে-ও তেমনি করমর্দন করে, স্টেনগান

হাতে আমাদের সেন্ট্রির পাশাপাশি দাঁড়াল। আটারিতে জুলাই মাসে সূর্যাস্ত হয় বেলা আটটায়। 'Retreat' দেখার জন্য আমরা পাশেই কাষ্টমস আপিসে বসে অপেক্ষা করছি।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায় সূর্যাস্তও হলো, আর ভারত ও পাকিস্তান দুদিক থেকেই বিউগল বাজিয়ে পাঁচ জনার একেকটি দল যার যার হাবিলদারের পেছনে মার্চ করে এসে বর্ডার লাইনে দাঁড়াল। দুই হাবিলদার করমর্দন করে, যার যার পতাকা একই সঙ্গে নামিয়ে নিল। তারপরে এক সঙ্গেই যার যার লোহার গেট টেনে লাগিয়ে তালা মেরে আবার মার্চ করে যার যার তাঁবুতে ফিরে গেল। নিয়মানুবর্তিতার এই দৃশ্য সত্যি বড়ই উপভোগ্য, একেবারে ছবির মতো! এরা উভয় দেশেরই বর্ডার ফোর্স।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। এর পূর্বে কাণ্টমস আপিসে বসে যে কাহিনী শুনছিলাম, তাই শুনতে পুনরায় সেখানে ফিরে গেলাম। ১৯৬৫-র ইন্দোপাক লড়াই এর এক গভীর রাত্রি। আটারি বর্ডারে তখন কোন বর্ডার ফোর্স ছিল না। সব কিছুই কাষ্টমস বিভাগ কণ্ট্রোল করত। সেই গভীর নিস্তব্ধ রাতে, কাস্টমস আপিসের ঘুমন্ত অফিসার তাঁরই সেপাই এর ডাকে উঠে দেখেন, একজন Indian Major তাঁকে বলছেন, "Hurry up! Open the boarder gate! Come on quick". কাস্টমস অফিসার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, proper authority-র অর্ডার ছাড়া সে গেট খুলবে কি করে? মেজর রেগে যেয়ে বললেন, I am now the proper authority. Come on, bring your order book, quick. অর্ডার বুক বার করে দিতেই, তাড়াতাড়ি খস্‌খস্‌ করে, তাতে অর্ডার লিখে দিলে, কাস্টমস অফিসার নিজে ছুটে যেয়ে গেট খুলে দিয়ে তার আপিসের বারান্দায় উঠতে না উঠতেই, পেছনের অন্ধকার থেকে জি. টি. রোড ধরে কয়েকটা যুদ্ধের ট্যাঙ্ক এগিয়ে গেল। প্রথমটা এক ধাক্কায় পাকিস্তানের গেট ভেঙ্গে ফায়ারিং করতে করতে পাকিস্তানে প্রবেশ করে গেল। পেছনের ট্যাঙ্কগুলো প্রথম ট্যাঙ্কটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেল। কাস্টমস অফিসার তাড়াতাড়ি তার আপিসের ছাদে উঠে গেল লড়াই দেখতে। কিন্তু পাকিস্তানের দিক থেকে কোন প্রতিরোধ দেখা গেল না। শুনেছিলাম 'ইছাগোল' খাল ঐ সীমানা থেকে লাহোরের দিকে মাত্র সাত মাইল দূরে। খালের অপর পারেই কংক্রীটের মজবুত বাঙ্কার। ভারতীয় সৈন্য ঐ 'ইছাগোল' খালে পেঁাছে, বাঙ্কার আক্রমণ করে লাহোর দখল করবে কিনা এজন্য অনেকদিন অপেক্ষা

করছিল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে লড়াই থেমে যায়, একথা হয়তো এখনও অনেকের মনে আছে। যা হোক, সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা অমৃতসরের দিকে রওনা দিই। পথে লক্ষ্য করেছিলাম, ভারতের দিকেও খুব পুরু কংক্রীট বাঙ্কার শেষ হবার পথে।

চা-বাগানের উৎপন্ন loose চা এর উপর যেমন কেন্দ্রীয় শুল্ক আছে, তেমনি আবার বড় বড় চেস্টে এ গুঁড়ো চা বাদ দিয়ে, তার চাইতে ছোট একটা নির্ধারিত পরিমাণ থেকে একেবারে সর্বরকম চা এর প্যাকেটের উপর পুনরায় কেন্দ্রীয় শুল্ক ছিল 'as duty on package Tea'. খিদিরপুরে এমন বহু Tea packers আছে। যার মধ্যমণি এবং অতি বৃহৎ ছিল হাইড রোডের Brooke Bond Tea Co. Lipton Tea Co তাদের package Tea factory তখনও ওখানের Transport Depot Road এ transfer করেনি। ১৯৬০-৬১ সালের কথা বলছি। Brooke Bond Tea Co তখনও একেবারে পুরোপুরি ইংরেজদের হাতে। Factory Manager থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে works—Director এবং Managing Director পর্যন্ত (শেষের দুটো একেবারে All India Post, মানে সারা ভারতে ওদের যা যা চা বাগান বা package tea factory আছে, তার সবার জন্য) সবই ছিল একেবারে লালমুখো খাঁটি ইংরেজ এবং Home থেকে Appointment করা। নিচের দিকে কিছু কিছু 'টেস্, টোস্, মেটে, ভোঁস্' থাকলেও উপরের দিকে কেউ ছিল না।

১৯৬০-৬২ সালে, Central excise-এর ঐ Range-এ আমি ছিলাম ডেপুটি-সুপার। আমার আপিস ছিল Brooke bond tea factory-র ভেতরেই ওদের Administrative building এ। আমাকে সাহায্য করার জন্য ওখানে ছিল চার পাঁচ জন ইনস্পেক্টর, তিন চার জন সাব-ইনস্পেক্টর ও চার পাঁচ জন সেপাই। অন্য ছোট ছোট দু-তিনটে ফ্যাক্টরি নিয়ে একেক জন ইনস্পেক্টর ও এক দুজন সেপাই ছিল।

আমি ওখানে কাজে যোগ দিয়েই লক্ষ্য করলাম, শুধু Brooke bond factory-র সমস্ত এলাকাটাই Central excise duty-র জন্য bonded area করে রাখা হয়েছে। যদিও ওখান থেকে চা blend করে dutyable প্যাকেজ চা ছাড়াও বড় বড় চেস্টেও চা নানান জায়গায় পাঠানো হয়। এটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায় বিবেচিত হওয়ায়, একদিন আমি Factory Manager কে বললাম, "তুমি যদি আমার প্লান মতো তোমার Factory প্রেমিসেস

Loose Tea এবং package Tea-এর কাজ অল্প খরচের বাফার ওয়াল দিয়ে আলাদা করে নাও, তবে শুধু তোমাদের package tea operation area আমি bonded area রেখে বাকী সমস্ত factory area, out of bond করে দিতে পারব ; তাতে Loose Tea Section এ Central Excise Formalities করতে তোমার যে সাত আট জন কর্মচারি আছে, আর এজন্য যে পরিমাণ হিসাবের বড় বড় খাতা পত্র লাগছে তার আর কিছুই প্রয়োজন হবে না। তবে আমাকে কথা দিতে হবে যে একজন বাড়তি কর্মীকেও তোমরা Sack করতে পারবে না।" Factory Manager আমার হাত ধরে সে কথা দিয়ে ছুটে গেল মধ্য কলকাতায় তাঁদের হেড আপিসে, তাঁদের All India Managing Director ও Works Director-এর কাছে। পরের দিন তিন জনই এসে, আমার নিকট থেকে প্লানটা বুঝে নিল। বিদ্যুৎ গতিতে সব কাজ সারা করে, তাঁরা আমার through তে, আমাদের কলকাতার 'হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট' কালেকটরের কাছে দরখাস্ত করলেন। এক মাসের মধ্যে সব কিছু হয়ে গেল। Managing Director নিজে আমার আপিসে এসে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে গেলেন, This is a land-mark in the history of our factory.

চাকুরিতে যোগ দেবার পূর্বে ইংরেজ চরিত্র খুব নিকট থেকে দেখবার—বোঝবার বিশেষ সুযোগ পাইনি। পরাধীনতার জ্বালায় ও স্বদেশী আন্দোলনে, তার উপর রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের ইতিহাস ও হেস্টিংসের ইম্‌পীচ্‌মেণ্ট পড়ে ওঁদের শুধু ঘৃণাই করে এসেছি। Brooke Bond-এর উক্ত ঘটনার পরে, ওদের Administrative Officer Mr. Mukherjee আমার বাড়িতে খুব আসতে আরম্ভ করলেন। আমার সঙ্গে খুব Intimacy করে, আমার মাসিক মাইনে ও other facilities জানলেন। তারপর একদিন, আমাকে 'আফিসার-ট্রেনি' হিসাবে ওঁদের কোম্পানিতে যোগ দিতে অনুরোধ করে, আমাকে বোঝালেন, যে বর্তমানে সরকার থেকে আমার যা মাসিক আয়, ওঁদের Concern-এ 'ট্রেনি' হিসাবেই আমি তার তিনগুণ পাব। আর এক বছর পরেই সেটা চার গুণ দাঁড়াবে। আমাকে ঐ চাকুরি অফার দেবার তাঁর কি ক্ষমতা আছে জানতে চেয়ে আসল সত্যিটা জানতে পারলাম। মিঃ মুখার্জী খোলাখুলি আমাকে বললেন, "আমি ওঁদের কোম্পানির মাসিক খরচ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি। এটা নিয়ে ওঁদের বোর্ডে একটা মিটিং হয়েছে। কোন Indian Concern হলে আপনাকে হয়তো লুকিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা reward দিত, যেটা ঘুষেরই

নামান্তর। কিন্তু ইংরেজ চরিত্র আলাদা। তাঁরা ঐ ভাবে আপনাকে ছোট করার কথা ভাবতেও পারে না। বোর্ড আমার উপর ভার দিয়েছিল, আপনার সঙ্গে intimacy করে আপনার মন জেনে নিতে যে কি ভাবে এবং আপনার সম্মান রক্ষা করে তাঁরা এর return দিতে পারে! এখন আপনি বিচার বিবেচনা করে আমাকে যা বলবেন, আমি বোর্ডকে তাই জানাব।" আমি তিন দিনের সময় চেয়ে নিলাম। ১৯৪৪ সালে, মানে ইংরেজ আমলে, প্রাইভেট কোম্পানির বেশি মাইনের চাকুরির চাইতেও 'স্থিতির' জন্য সরকারি চাকুরি, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি আমাদের কাছে ছিল সবচাইতে লোভনীয়। আমার পিতাও সরকারি চাকুরে ছিলেন। তিনি তখনও জীবিত। মাইনে কম হলেও, তখনও সরকারি চাকুরির আকর্ষণ আমাদের মন থেকে যায়নি। তাই বাবা ও আর কয়েক জনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মিঃ মুখার্জীকে আমার অমত জানিয়ে দিলাম। মিঃ মুখার্জী intimacy-র খাতিরেই হয়তো জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বড় ছেলে কি পড়ছে? জানালাম, স্কুলে পড়ছে। উনি দুঃখ করে বললেন, "By the time, he would be a graduate, গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে। যে সাহেবরা আজ আপনার উপকার করতে চাইছে, তাঁরা সবাই তিন থেকে পাঁচ বছরের চুক্তিতে চাকুরি করতে এসেছেন। ওঁরা কেউ তখন থাকবেন না। আমিও হয়তো থাকবো না।" আর ঠিক হয়েও ছিল তাই!

তবে এই ইংরেজ চরিত্রের আরও অনেক কিছু তখনও আমার অজানা ছিল। যে Brooke সাহেব খিদিরপুরে দুই কাঁধে দুই ব্যাগ নিয়ে Brooke Bond Tea নামে ছোট ছোট প্যাকেটে চা বিক্রয় করে Brooke Bond Co. স্থাপন করেছিলেন, ১৯৬০-৬১ সালে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক লণ্ডনবাসী তাঁর নাতি মিঃ ব্রুক তখন সারা পৃথিবীতে ছড়ানো Brooke Bond Co.-র একচ্ছত্র মালিক। শুনেছিলাম দু'তিন ব'ছরে একবার তিনি তাঁর সব establishment পরিদর্শনে বার হন। বোধহয় ১৯৬১ সালেই তিনি কলকাতা এসেছিলেন। তবে তার পূর্বে অন্য একটা খবর না জানালে শেষের দিকে সমন্বয় থাকবে না বলেই লিখছি। পূর্বোক্ত Works Director-এর পঞ্চান্ন/ষাট বছরের মেমসাহেব Works Director-এর সঙ্গে সর্বদাই ওঁদের খিদিরপুরের ফ্যাক্টরিতে আসতেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন খুব সরলা আর হুজুকে। ফ্যাক্টরিতে এলেই, কোথাও সিগারেট খাওয়া বারণ বলেই হয়তো আমার আপিসে এসে, আমার টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আমার অনুমতি নিয়ে সিগারেট খেতেন আর বক্‌বক্‌

করে বহু কথা বলে যেতেন। কখনো আমাকে "My boy, My son" বলেও ডাকতেন আর বলতেন, "I like you very much, why did you not join our concern ?" আমি শুধু মৃদু হাসতাম, তবে তাঁকে খুবই সম্মান করতাম। Works Director ফ্যাক্টরিতে কাজ সেরে আমার আপিসে এসে তাঁর মেমসাহেবকে নিয়ে চলে যেতেন, আর বলতেন, "Mr. Roy is a very busy officer, don't disturb him." মেমসাহেবও ছাড়ার পাত্রী নন। জবাব দিতেন, "No ! No ! he likes me very much."

ওদিকে তৃতীয় প্রজন্মের Mr. Brooke, তৎকালীন "Tea-king" কলকাতা আসছেন। ফ্যাক্টরিতে সাজ সাজ রব। কয়েক লক্ষ টাকা তো রেনভেশনে (renovation) খরচা হয়ে গেল। শুনলাম মিঃ এবং মিসেস Brooke কে ফ্যাক্টরির Terrace Cocktail Party-তে অভিনন্দন জানানো হবে। আমিও একটা নিমন্ত্রণ চিঠি পেলাম। পার্টিতে পোশাক নির্দিষ্ট করা। নিচে লেখা R. S. V. P. সঙ্গে সঙ্গে আমার লিখিত অমত জানিয়ে দিই। Factory Manager চিঠি পেয়েই আমার আপিসে ছুটে এলেন। আমি জানিয়ে দিলাম, তোমরা যে পোশাক নির্দিষ্ট করেছ সে পোশাক আমার নেই। ম্যানেজার বললেন, "It was a mistake made by my P. A. you are exempted from the prescribed dress. Please join the party, otherwise, it would be my discredit" আর, 'না' করতে পারলাম না। Administrative Officer মিঃ মুখার্জিকে ঘটনাটা জানিয়ে বললাম, "আমি তো মদ খাই না, তো পার্টিতে হাঁদারামের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো ? ম্যানেজারকে এটা আপনি বুঝিয়ে বলে আমায় রেহাই দিন না কেন।" মুখার্জি সাহেব বললেন, "আপনি পার্টিতে না এলে ম্যানেজার ভয়ানক discredited হবেন, সুতরাং আমার কোন যুক্তিই তিনি শুনবেন না, আবার আপনার কাছে ছুটে যাবেন। সেটা ভাল দেখাবে না। তার চাইতে আপনাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি, আপনার কোন অসুবিধেই হবে না। পার্টিতে বেয়ারারা ট্রে-তে করে ড্রিঙ্কসের গেলাস ও নানা রকমের খাবার নিয়ে সারকেল দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আপনি খাবারগুলো খুশি মতো তুলে নিয়ে খাবেন আর বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা করে এক গেলাস Brandy তুলে নেবেন। তাতে দুএক পেগ Brandy থাকবে। গেলাসটা বাঁ হাতে রেখে মাঝে মাঝে ঠোঁটে ঠেকিয়ে সিপ্ করার ভান করবেন বা দুএক সিপ খেলেও কোন নেশা হবে না। মোট কথা দুঘণ্টার পার্টি শেষ না

হওয়া পর্যন্ত গেলাস যেন খালি না হয়। কারণ খালি হলেই আবার নতুন একটা গেলাস আপনাকে নিতে হবে।" মুখার্জি সাহেবের কৌশল শুনে পার্টিতে গেলাম। সেখানে যেয়ে দেখি সব সাহেব আর মেমসাহেবের ভিড়। আর যেসব ইণ্ডিয়ানরা গিয়েছে তারা সবাই V. I P. শুধু আমি-ই হারাধনের একটি মাত্র 'হরিদাস'। তখনও আমার ইংরেজ চরিত্রের আসল বিস্ময় দেখার বাকি ছিল। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সন্ধে সাড়ে সাতটায় Managing Director ও Works Director, ব্রুক দম্পতিকে নিয়ে পার্টির একপাশের মাঝখানে মধ্যমনি করে দাঁড় করিয়েই, সকল V. I. P.-দের রেখে Managing Director এসে আমার হাত ধরে নিয়ে Brooke দম্পতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই তাঁরা দুজনেই মাথা হেঁট (Nod) করে 'হ্যাণ্ডশেক' ও 'হাউ-ডু-ইউ-ডু' করার পর মিঃ ব্রুক ধীরে ধীরে স্পষ্ট ইংরেজিতে আমায় বললেন, "My concern would remain ever-grateful to you for your great help." অকস্মাৎ ঐ অপ্রত্যাশিত কথায়, আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ায়, এর সুন্দর ও উপযুক্ত জবাব দিতে না পেরে, শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ইংরেজ Managing Director ইত্যাদির সততার কথা। মনে হয়, কয়েক মিনিট আমি বোধহয় স্বাভাবিক ছিলাম না। ইতিমধ্যে, পরিচয় পর্ব শেষ হয়ে খানাপিনা আরম্ভ হয়ে গেছে। মুখার্জি সাহেবের কৌশল অবলম্বন করে, আমি একটা ব্রাণ্ডির গেলাস বাঁ হাতে নিয়ে, ডান হাতে আমার পছন্দ মতো খাদ্য বেয়ারাদের হাতের ট্রে থেকে নিয়ে খাচ্ছি আর মাঝে মাঝে ব্রাণ্ডির গেলাস ঠোঁটে ঠেকিয়ে সিপের ভান করছি। এমন সময় হঠাৎ ধূমকেতুর মতো Works Director-এর মেমসাহেব[১] উল্টোদিকে এসে আমায় বললেন, "Young man, you are taking Brandy! This is taken by the pregnant ladies." বলেই, একটা বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "হেই! এক গ্লাস আচ্ছা স্কচ্-হুইস্কি লে আও।" বেয়ারা তো ছুটে যেয়ে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে এলে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে, আমায় বললেন, "take, take, don't be afraid my boy. I am here to help you." আমাকে প্রায় আর্ধেক গেলাস গিলিয়ে দিয়ে বললেন, "Now you sip slowly." এবার আমাকে

(১) আজ আর কারুর নাম মনে নেই বলে, designation উল্লেখ করে লিখছি।

ছেড়ে ব্রুক দম্পতির দিকে যেয়ে বললেন, "He is a very nice boy, I like him very much." ইংরেজ চরিত্রের আরও একটা নতুন দিক দেখলাম। Brooke Bond Concern-এ ব্রুক দম্পতি ও Works Director-এর মেমসাহেবের মধ্যে যে ফারাক, কোন ইণ্ডিয়ান কন্সারনের Works Director-এর পত্নী তো দূরের কথা, Director নিজেও অমন 'Tea King ও Queen'-এর সামনে আমার সঙ্গে ঐ ব্যবহার ও কথাবার্তা বলতে সাহস পেত না।

যাহোক, ঠিক সাড়ে নটায় পার্টি শেষ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সবাই নেমে যাচ্ছে। আমি ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, মাথা ঘুরছে। উক্ত মেমসাহেব আমার দিকে এগিয়ে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন আমি দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমি মৃদু হেসে বললাম, আমার হাঁটার ক্ষমতা নেই। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর স্বামীকে খুব নিম্নস্বরে কিছু বলে, আমার কাছে এসে আমার ডান হাত তাঁর কাঁধে তুলে দিয়ে, নিচে নামিয়ে এনে তাঁর গাড়িতে বসালেন, টালিগঞ্জে আমার বাড়ি জেনে নিয়ে, ড্রাইভারকে বললেন, টালিগঞ্জ চলো। গাড়ি আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে, বাণী বারান্দায় যেয়ে দাঁড়াতেই, আমার নিকট থেকে বাণীর পরিচয় জেনে, আমার সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে, বাণীকে বললেন, "my dear sweet daughter! Your husband has become a bit sick due to my fault. Please take care of him for the night for my sake." আবার গাড়িতে উঠে পার্কসার্কাস এলাকার দিকে চললেন। আমি বাথরুমে কোনও রকমে যেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলাম। পরের দিন দুপুরে ঐ ভদ্রমহিলা আমার আপিসে এসে খবর নিয়ে গেলেন আমি সুস্থ হয়ে আপিস করছি কিনা।

ঐ মাতৃসমা মহিলার নাম আজ আর সঠিক মনে করতে পারছি না। মিসেস বার্ড হবে হয়তো। ওঁরা তো কবেই ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন। এতোদিনে হয়তো আর বেঁচেও নেই। তাঁর স্নেহময়ী সুন্দর মুখখানা এখনো চোখে ভাসে। দীর্ঘজীবনের চলার পথে এমনি কত মা, বোন, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় হয়, আবার একদিন তাঁরা হারিয়েও যায়। মন চাইলেও আর তাঁদের কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবন-ধারার সামান্য সৌন্দর্যের পথে, এটা বড়ই করুণ।

১২৮ নং রাসবিহারী এভেন্যুর প্রায় প্রাসাদ সম বাড়িতে থাকেন শ্রী ডি. কে. নাগ। বাড়ির গেটের স্তম্ভে শ্বেত প্রস্তরের নেমপ্লেট আছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বহুদিন উনি ছিলেন কলকাতায় ইন্দোনেশিয়ার কন্সাল-জেনারেল।

নানা রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। এখনও শ্নেছি করেন। ১৯৬০-৬১ সালে, আমার ব্রক বণ্ড ফ্যাক্টরির আপিসে একদিন নাগমশাই ময়মনসিংহ শহরের বিখ্যাত নাগরিক ও দেশনেতা প্রয়াত স্র্য সোমের এক পত্রকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। সেখানেই ওঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ওঁদের সমস্যাটা ছিল, ইন্দোনেশিয়ায় প্যাকেজ চা-এর একটা বিরাট কন্‌সাইন্‌মেণ্ট পাঠাবার এক্‌সপোর্ট পারমিট পেয়েছেন। চেতলায় গ্দাম ভাড়া করে বহ্ লক্ষ চা-ও স্টক্ করেছেন। কিন্তু প্যাকেট তৈরি করতে যেয়ে জেনেছেন যে, তা করতে গেলে কেন্দ্রীয় শ্লক বিভাগের লাইসেন্স লাগবে এবং আরও নানারকমের formalities করতে হবে। অন্যদিকে ওঁদের shipment-এর জন্য হাতে আছে বাকি চারদিন। কলকাতার কাস্টমস হাউজে যেয়ে যে P. R. O.-র সঙ্গে ওঁরা দেখা করেছেন, উনি প্রয়াত স্র্য সোমকে চিনতেন। উনি বলে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে যে আপনাদের সাহায্য করতে পারেন, তিনি ব্রক বণ্ড ফ্যাক্টরিতে বসেন। যদিও ওঁর বাড়ি ঢাকা জেলায় কিন্তু ময়মনসিংহের প্রতি তাঁর অসীম দ্র্বলতা। এই লাইসেন্স পেতে সাধারণ ভাবে একমাস সময় লাগে, কিন্তু আপনারা যেয়ে প্রয়াত স্র্য সোমের পরিচয় দিলে, উনি দিনকে রাত করে হলেও হয়তো দ্এক দিনের মধ্যে আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ওঁরা সরলভাবে আমাকে সব বললে, আমি জানালাম যে স্র্য সোম ছিলেন আমাদের খ্বই শ্রদ্ধেয়। Excise Department-এর তো অনেক বদনাম আছে। কিন্তু আমি জোর দিয়েই বলছি, আমার এখানে কোন Hanky-Panky পাবেন না। কিন্তু আইন-মাফিক কাজ করতে হবে। লাইসেন্স পেতে হলে, যে Condition গ্লো আপনাদের প্রণ করতে হবে সেগ্লো আপনারা লিখে নিন। সেগ্লো প্রণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি কাস্টমস হাউজ থেকে আপনাদের লাইসেন্স বার করে দেব। তারপর লোক লাগিয়ে রাতদিন কাজ করিয়ে নিলেই Shipment-এর প্র্বেই আপনাদের মাল তৈরি হয়ে যাবে। ওঁরাও দেখলাম বিদ্যুৎগতিতে সব কাজ শেষ করে পরের দিন আমার সঙ্গে আপিসে দেখা করলে, আমি একটু out of the way যেয়ে বেলা দ্টোর মধ্যে লাইসেন্স বার করে দিলে, ওঁরা প্রো কন্‌সাইন্‌মেণ্ট Shipment করে দেন। স্র্য সোমের যে পত্র 'নাগ'মশাই-এর সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি কিছ্দিন ময়মনসিংহে ওকালতি করতেন বলে বাবাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই বাবার সঙ্গে দেখা করার নাম করে আমার বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে দ্একদিন পরই এসে বাবার

সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে, ব্রুক বণ্ডের মুখার্জি সাহেবের মতো কৌশলে আমার মন বুঝতে এলেন। এবং এ সম্বন্ধে, কারুর সাহায্য পেয়ে তাকে কিছু reward দেয়া যে ঘুষের পর্যায়ে পড়ে না, সেটা বোঝাবার জন্য আমাদের তৎকালীন রেভেনিউ বোর্ডের একেবারে টপ্‌ম্যান, একজন বাঙ্গালি 'পুল অফিসার', যাঁকে উনি কাকাবাবু বলে ডাকতেন এবং যিনি তাঁকে বহু এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট পারমিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী, মানে সোমমশাই-এর কাকিমা ও তাঁর তিন মেয়েকে, বেনারসি শাড়ির কারিগরদের ঘর থেকে, চারখানা একেবারে বাছাই শাড়ি নিয়ে যেয়ে কাকিমার হাতে উপহারস্বরূপ তুলে দিয়ে, পরে কাকাবাবুর কাছে গালাগালি খেয়েও যে তাঁর স্নেহ থেকে শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত হননি, তার গল্প ফাঁদলেন। আমি সোমমশাইকে যুক্তি দিয়ে এটাও যে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, উৎকোচের পর্যায়ে পড়ে সেটা বুঝিয়ে দিলে উনি আমার কাছে হার স্বীকার করে উঠে গেলেন। উনি যাতে দুঃখ না পান, সেজন্য আমি সোমমশাইকে একথাও বলেছিলাম যে আমি যুধিষ্ঠির প্রতিপন্ন হবার প্রয়াসে এত সব কথা বলছি না। ময়মনসিংহ আমার অতীব প্রিয়। সেখানের কাউকে একটু out of the way যেয়ে যদি সাহায্য করতে পেরে থাকি, আর তার জন্য যদি কোন উপঢৌকন গ্রহণ করি, তবে আমার সেই কিছু করতে পারার যে নির্মল আনন্দ তা একটু ক্ষুণ্ণ হবেই। আমার মনের এই অনুভূতিটুকু যদি আপনি অনুগ্রহ করে বুঝতে চেষ্টা করেন, তবে আর আমাকে ভুল বুঝবেন না।

এরপর থেকে, নাগমশাই-এর বাড়ির সব উৎসব আনন্দেই উনি আমাকে ও বাণীকে আমন্ত্রণ করতেন আর ওঁর বাড়িতে গেলে খুব আদর-সমাদরও করতেন। ওঁর ঐ ১২৮ নং রাসবিহারী এভেন্যুর প্রকাণ্ড বাড়ির টেনিস লনে, প্রতি ব'ছর ১৭ই আগষ্ট ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হত। দিল্লি থেকে ওঁদের এমব্যাসির প্রথম কর্মসচিব আসতেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল উদ্বোধন করতেন, কলকাতায় অবস্থিত সকল দেশের কন্‌সিউলেটের প্রায় সকল দম্পতিরাই আসতেন আর আসতেন কলকাতার সব নামিদামি লোক। প্রতি ব'ছরই 'নাগ'মশাই এই উৎসবের নিমন্ত্রণ চিঠি নিজে এসে আমার বাড়িতে দিয়ে, বাণীকে কৌতুক করে বলে যেতেন, মেম্‌সাহেব! রায়সাহেবকে নিয়ে অবশ্যই যাবেন কিন্তু। এখানেও উক্ত টেনিস লনে কক্‌টেল পার্টি হত বলে, বাণী তো যেতোই না, আমিও প্রতি ব'ছর যেতে পারতাম না। কিন্তু যেবারই যেতাম, দেখতাম লাল, সাদা, পিংলে, কালো সাহেব ও মেমসাহেবের দল, গ্রুপে গ্রুপে দাঁড়িয়ে অতি নিম্নস্বরে কথাবার্তা

বলছে। সন্ধে সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠান আরম্ভের সময় তাদের কথাবার্তা চার-পাঁচ হাত দূরে থেকেও শোনা যেত না। কিন্তু সাড়ে আটটা নটায় যখন প্রায় সবার পেটেই বেশ কয়েক পেগ্ করে স্কচ্ হুইস্কি পড়েছে, তখন কথাবার্তার আওয়াজে টেনিস লন সরগরম হয়ে উঠতো। ওখানে আমি বিশ্ববিখ্যাত উদয়শঙ্করকে দেখেছি, ময়মনসিংহের গর্ব যাদুকর প্রতুল সরকারকে পেয়ে আলাপচারিতাও করেছি, তবে ওখানের আর এক গর্ব সত্যজিৎ রায়কেও দেখেছি কিনা সঠিক মনে করতে পারছি না। ওখানে হংস মধ্যে বকো যথার মতো আমি একলা এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতাম, মদ তো খেতামই না, শুধু ঘুরন্ত বেয়ারাদের ট্রে থেকে এটা ওটা তুলে নিয়ে খেতাম। সময় ও সুযোগ পেলে, নাগমশাই এক-আধবার আমার খোঁজ নিয়ে যেতেন। একা একা আমার ভাল লাগতো না বলেই কয়েক ব'ছর পর আমি আর যেতাম না।

হাওড়া সাঁতরাগাছির প্রায় আড়াই শ' ব'ছরের পুরানো চৌধুরী পরিবারের শ্রীবলাই চৌধুরী ছিলেন বেলুড় গ্লাস ওয়ার্কসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বেঁটে, পাতলা ছোটখাটো মানুষটি যে কি পরিমাণ কর্মদক্ষ ও রিসোর্সফুল ছিলেন তার সম্পূর্ণ বর্ণনা দেয়া কঠিন। কোন্ ক্ষেত্রে যে তাঁর হাত ছিল না তা আমার জানা নেই। বয়সে আমার চাইতে বড়ই ছিলেন কিন্তু প্রথম পরিচয়েই আমাকে যে কি চোখে দেখেছিলেন সে ঈশ্বরই জানেন। আমার সমস্ত প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করতে সবসময় তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে। অমন ব্যস্ত মানুষটার সময় বাঁচাতে আমি অনেক সময় আমার প্রয়োজনে তাঁকে খবর না দিলে, পরে জানতে পারলে অভিমান করে বলতেন, 'আমাকে একেবারে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন ?' কলকাতার যে কোন cricket test খেলায় আমার দুটো ভাল টিকিট একেবারে assured ছিল। I. F. A. ছাড়াও উনি কত ক্লাবের সঙ্গে যে জড়িত ছিলেন তা বলা কঠিন। আর হ্যাঁ! drink করতে পারতেন বটে। ছ-সাত পেগ্ হুইস্কি খেয়ে যেমন রাস্তা দিয়ে টগবগ করে হেঁটে যেতেন, তেমনি তার নিজের গাড়ি নিজেই নিখুঁতভাবে ড্রাইভ করে চলে যেতেন।

কয়েক ব'ছর আমি নাগমশাই এর ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে না যাওয়াতে, একবার বোধ হয় ১৯৭০ কি ১৯৭১ সালে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলে, আমি বললাম যে আমার একা একা ভাল লাগে না বলে আমি যাই না। কিন্তু উনি সেবার খুব চাপাচাপি করাতে, আমি উক্ত শ্রীবলাই চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করতে বললে, উনি সঙ্গে সঙ্গে তার কলকাতার আপিসে যেয়ে

আমার পরিচয় দিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসে আমায় ফোনে নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে বলাইবাবুও ফোনে জানান যে আমি যেন সেদিন সন্ধ্যে সাতটায় আমার বাড়িতে প্রস্তুত হয়ে ওনার জন্য অপেক্ষা করি। উনি তাঁর গাড়ি নিয়ে নিজে এসে আমায় তুলে নিয়ে নাগমশাই এর বাড়িতে এক সঙ্গে যাবেন। তাই হলো। ঠিক সাড়ে সাতটায় আমি ও বলাইবাবু নাগমশাই-এর টেনিস লনের এক কোণে দাঁড়িয়ে। অন্য সব বর্ণনা যা পূর্বে দিয়েছি সব তেমনই চলছে। বলাইবাবু আমাকে বললেন, আপনাকেও কিন্তু সামান্য খেতে হবে, নইলে একলা খেলে জমে না। আমি ব্রুক বণ্ডের মুখার্জী সাহেবের কৌশলের কথা মনে রেখে রাজি হলাম। বেয়ারারা ট্রে নিয়ে আসতে আরম্ভ করলে দুজনই দুটো গেলাস তুলে নিলাম। বলাইবাবু নিমেষে এক গেলাস শেষ করে আরও এক গেলাস হাতে নিয়ে আমাকে বললেন, হচ্ছেটা কি ? কখন গেলাস খালি করবেন। বললাম, ধীরে ধীরে না খেলে চট করে যেয়ে আমার মাথায় হিট্ করলেই আমি কাৎ। উনি বললেন, পেছনে তো বসার চেয়ার রয়েছে, আর আমার সঙ্গে গাড়ি, আপনার ভয়টা কি ? আমি ঐ সুযোগে চেয়ারে বসে গেলাসের বাকি মদটুকু পেছনে ফেলে দিয়ে, নতুন একটা গেলাস নিলাম। বলাইবাবু বললেন, আমার পেছনেও দুটো চোখ আছে, কি ছেলেমানুষী করছেন। এই বলে একটা ঝানু মুখের প্রৌঢ় বেয়ারাকে ডেকে তার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'কেয়া হালকা মাল লে আতা হ্যায়। ভারী মাল লে আও।' হালকা মাল, ভারী মালের আমিতো কিছুই বুঝলাম না। ওদিকে বেয়ারাটা তো প্রায় নাচতে নাচতে একটা ট্রের উপর দুটো স্পেশাল্ গেলাস নিয়ে এসে আমাদের দুজনার হাতে তুলে দিয়ে আবার প্রায় নাচতে নাচতে অন্যদিকে চলে গেল। বলাইবাবু একটা সিপ দিয়েই বললেন, হ্যাঁ, এবার ঠিক নম্বরি জিনিস দিয়েছে। খান! খান! সাড়ে নটার আর বেশি বাকি নেই। আমিতো একটা সিপ্ দিয়েই বুঝলাম যে এ একেবারে বোধ হয় 'র' স্কচ্ হুইস্কি। আমি প্রথম গেলাসটার মতো এটাও পেছনে ফেলে দিই কিনা সেদিকে বলাইবাবু ঠিক নজর রেখে চলেছেন। ব্রুক বণ্ডের মুখার্জী সাহেবের কৌশল কোথাও কাজে লাগলো না। আমি চেয়ারে বসে বসে একটু একটু করে খেয়ে বলাইবাবুকে বললাম, আমিতো দাঁড়াতেই পারব না তো টেনিস লন্ পার হয়ে যেয়ে আপনার গাড়িতে বসব কি করে ? বললেন, আমার কাঁধে হাত দিয়ে চলে যাবেন। উৎসব শেষ হয়ে গেলে সকলেই ধীরে ধীরে বিদায় নিলো। লন্ প্রায় খালি হয়ে গেল। আমি তখন চারিদিকে কি আছে

না আছে ভাল করে দেখতে-বুঝতেও পারছি না। বলাইবাবুর কাঁধে হাত রেখে লন্ পার হবার সময় আমার মনে হল যেন আমি বরিস্ স্কারলফের 'ফ্রাঙ্কেন-স্টাইন'-এর মত হাঁটছি। কি করে এসে গাড়িতে বসেছিলাম জানি না। নিজের বাড়ি চিনতে পেরে গাড়ি থেকে নেমে কোনও রকমে কলিংবেল বাজাতেই বাণী আর কাজের একটা ছেলে গেট খুলে দাঁড়াল। বলাইবাবু বাণীকে ফেস্ করার ভয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে একেবারে হাওয়া। ওদের দুজনার কাঁধে ভর দিয়ে বাথরুমে যেয়ে গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাণী অনেক চেঁচামেচি করেছিল, বিশেষ কিছু কানে যায় নি। শুধু মনে আছে বলেছিল যে আমি কালই নাগবাবুকে ফোন করে বলব যে আর কোনদিন যেন এই অনুষ্ঠানে তোমায় নেমন্তন না করেন। আমি ভাবছিলাম বলাইবাবু আমায় তো বাড়ি পেঁাছে দিলেন কিন্তু নিজে সেই সাঁতরাগাছি অবধি ড্রাইভ করে যাবেন কি করে! পরের দিন আপিসে যেয়েই তাঁর আপিসে ফোন করে দেখি, he is ok.

এর বেশ কিছুদিন পরেই এক সকালে খবরের কাগজ খুলেই দেখি আপিসে যাবার কি ফেরার পথে হাওড়ার কোন রাস্তায় তাঁর গাড়ি থামিয়ে বলাইবাবুকে টেনে নামিয়ে তাঁর গলা কেটে মুণ্ডটা একটা বাঁশের ঝাঁকার উপর বসিয়ে, কিছু তথাকথিত নকশাল ছেলে আপ-ডাউন বাস যাত্রীদের নাকি চুল ধরে মুণ্ডটা উঠিয়ে উঠিয়ে দেখাচ্ছে আর বলছে ডিফেন্স পার্টির সভাপতিকে দেখে যান। এরপর নাকি জনতা ও পুলিশ মিলে Witch-haunting করে ঐ এলাকার বহু ছেলেকে মেরে ফেলেছিল। অথচ, বলাইবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বুঝতাম যে নকশাল ছেলেদের প্রতি তার মনে একটা Soft Corner ছিল। তিনি ওদের পথকে সমর্থন না করলেও আদর্শকে একেবারে ফেলে দিতেন না। ভাগ্যের পরিহাস! নইলে এমন একটা হৃদয়বান, কর্মদক্ষ ও রিসোর্সফুল মানুষের এমন একটা Violent death হবে কেন!

সাত বছর পূর্বে, ইং ১৯৮৪ সালের ২৯শে আগষ্ট আমি, বাণী, বৌমা রত্না ও নাতনি ঝিমলী (মামন), ছোটছেলে টুসুনের সঙ্গে রওনা হলাম কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনাথ দর্শনে। আমার ও বাণীর ঐ তীর্থ দর্শনের এটা ছিল তৃতীয় প্রচেষ্টা।

এই তীর্থ বা আশেপাশের পথের নৈসর্গিক দৃশ্যপটের বিবরণ দিতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি। কেদারনাথ দর্শন করে নেমে আসছি একটা পোনিতে

(Pony) চেপে। পরিবারের অন্যরা একটু পেছনে, কেউ পোনিতে, কেউ ডানডিতে। লক্ষ্য করলাম, একটি অবাঙালি ত্রিশ প'য়ত্রিশ বৎসরের মেয়ে, ছেলেদের মতো প্রায় ট্রেক করার পোশাকে, একটা ঝরনা থেকে বোতলে জল ভরে, একজন সবল যুবকের মতো আমার পাশ দিয়ে প্রায় আমার পোনির সঙ্গে হে'টে চলেছে। একটু বিস্মিত হয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটিকে বললাম, "It is really nice to see that you are walking like a young-man" মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে জবাব দিল, "I am used to it."

গোড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের একটা প্যাকেজ টুরের বাসে হৃষিকেশ থেকে আমরা এই পথে রওনা হয়েছিলাম আটাশ জন যাত্রী, যার অর্ধেকের বেশি বাঙালি। কেদারনাথ থেকে সেদিন আমরা নেমে এসে রাত্রি কাটালুম গুপ্ত-কাশীর সুন্দর একটা দোতলা বাড়িতে। ডাইনিং হলে খাবার খেতে যেয়ে উক্ত মেয়েটিকে দেখে, আমি বিস্মিত হয়ে ইংরেজিতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি আশ্চর্য, আমরা কি একই বাসে ভ্রমণ করছি! মেয়েটি বললো ঠিক তাই। আপনি সামনের সীটে বসেছেন বলে হয়তো পেছনের সীটে আমাকে লক্ষ্য করেননি। এই উপলক্ষে, মেয়েটির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সকলেরই পরিচয় হলো। তার নাম হাঁন্সা পেটেল, অবিবাহিতা। বম্বেতে I. O. C.-র একজন অফিসার। তার সঙ্গে তাদের আফিসের একজন সহকর্মীও এসেছে, নাম মিঃ চন্দ্রন, কেরলবাসী আর হাঁন্সা গুজরাটী। আরও জানা গেল যে, তাদের বম্বে আপিসে এমন ছ-সাত জনার একটা দল আছে, যারা সবই অবিবাহিত। ওদের 'হবি-ই' হলো, বছরে যতবার সম্ভব প্রমোদ-ভ্রমণে বার হওয়া। কেদার-বদরী এবার ওদের তৃতীয় ভ্রমণ। হাঁন্সা ও চন্দ্রন আমাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে গেল। বস্তুত, আমরা সব যাত্রীরা প্রায় এক পরিবারের মতোই চলছিলাম। দূর ভ্রমণে এটা পাওয়া যে কতবড় ভাগ্য সেটা যারা পেয়েছেন, তারাই বুঝতে পারবেন।

বদরীনাথ যাবার পথে যোশী মঠ থেকে রওনা হয়ে সামান্য এগিয়ে যেয়েই খবর পাওয়া গেল, পথে ধস নামার জন্য যাতায়াত কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ আছে। বাস থেমে গেল প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টার জন্য। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য হাঁন্সার উদ্যোগেই, রত্নাকে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলো, আবার হাঁনসাও আমাদের অনুরোধে একটা মীরার ভজন গেয়ে শোনাল। হয়তো রত্নার গোপন ইশারায়, হাঁন্সা ও চন্দ্রন আমায় চেপে ধরলে, হিন্দীভাষী যাত্রীদের কথা

মনে রেখে আমার এই বুড়ো বয়েসের ভাঙ্গা গলায় কয়েকখানা হিন্দী ভজন গাইতে হলো। সবাই মিলে এমনি গান গেয়ে আমরা ঐ আটকে থাকার সময়টা আনন্দেই কাটিয়ে দিলাম।

ফল হলো, বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে আমাদের রাত্রিবাস ছিল রুদ্রপ্রয়াগে। কর্ণাটক থেকে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একাই এসেছিলেন এই তীর্থ দর্শনে। তিনি প্রস্তাব দিলেন, সেদিন তাঁর জন্মদিন। রুদ্রপ্রয়াগে সেই রাতে আমাদের সকলের গান গাইতে হবে 'গাড়োয়াল মণ্ডলের রেস্ট-হাউসে। আর সে রাতের আমাদের সকল যাত্রীকে তিনি-ই ডিনার খাওয়াবেন। আমাকে বললেন, তুমি-ই গানের আসর পরিচালনা করবে। দুর্গম ও কষ্টসাধ্য তীর্থ যাত্রার পথে সকল যাত্রী এমন মিলেমিশে একাকার হয়ে চলার আনন্দ যে কতটা স্বর্গীয়, সে আর কি বলব! এ কখনো ভোলা যায় না। এসব ঘটনা সোনার মত উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে চিরকাল মনে থেকে যায়। যতদূর মনে পড়ে পরের দিনই আমরা হৃষিকেশে পেঁছিই। এক সাথে চলার যাত্রা আমাদের এখানেই শেষ। হৃষিকেশে গাড়োয়াল মণ্ডলের রেস্ট-হাউসে বসে হাঁন্‌সা বলে, যে তোমাদের বাঙ্গালি মেয়েদের মত শাড়ি, শাঁখা ও সিঁদুর খুব পরতে ইচ্ছে করে। এটা যে বিবাহিতা বাঙ্গালি মেয়েদের পোশাক সেটা বুঝিয়ে বললেও হাঁন্‌সা বলে, 'তাহোক, আমি পরব।' এতে বাণী তাকে বলে যে "ঠিক আছে, তোমার যখন এতই পছন্দ, তোমার ঠিকানা লিখে দাও, আমরা কলকাতা পেঁছেই তোমাকে ওসব জিনিস পার্শেলে পাঠিয়ে দেব।" হান্‌সা তার ঠিকানা দিয়ে রত্নাকে ও আমাকে অনুরোধ করে যে রবীন্দ্রনাথের "মন মোর মেঘের সঙ্গী। উড়ে চলে দিগদিগন্তের পানে। নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে। রিমিঝিম্ রিমিঝিম্ রিমিঝিম্," এই গানখানা ইংরেজি হরফে লিখে এবং 'লাইন বাই লাইন,' ইংরেজিতে এর অর্থ বর্ণনা করে তাকে অবশ্যই পাঠাতে। পরের দিন ভোরে, হাঁন্‌সা ও চন্দ্রন, তাদের বিদায়ের পূর্বে আমাদের ঘরে আসে। হাঁন্‌সা বাঙ্গালি মেয়েদের মতো আমাকে ও বাণীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ চায়। সকলেরই তখন চোখ ছলছল। ওদের বিদায় যেন অতি আপন জনের বিদায় ব্যাথার মতো বুকে বাজে। আমরাও সেদিন খানিক পরেই একটা ট্যাক্‌সীতে দিল্লি রওনা হয়ে যাই।

কলকাতা ফিরে এসে দুর্গাপুজোর পরে শুভ বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে হাঁন্‌সাকে তার বম্বের ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠাই। কিন্তু বহুদিন পরে ১৯২২ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে লেখা তার জবাব পাই, ১৯২৫ সালের ২রা

জানুয়ারী। চিঠিখানার কপি নিচে দিলাম।

25th December, '46.

My dear Roy mohashay,

Thank you so much for your letter and Bijoya greetings. My apologies for sending a late reply, I was out on tour for 2 months and your letter was opened by me and read on return a few days ago. I have just come back from an adventurous trek 'Manang Torung Pass' (altitude-17,800' ft.) —'Muktinath' in Nepal with my brother and two other friends. Through God's grace and blessings, of all elders, we have returned safely with no problem of mountain-sickness, no trouble at all, although this is the first time we ever went to such altitude. We came back via Delhi and hence my intended trip did not materialise. Reunion with your family, particularly with sweet Ratna and Mamon will have to wait for some future date.

My friend Chandran sends his regards to all of you. He joins me in wishing all of you a very happy 1946. There was a wedding in Calcutta in the family of some friends who have now given me 'Sankha'. Please therefore, don't bother to send it to me.

Ratna may be reminded that she was to write to me and give me words for my favourate Bengali Song She Sang—'Rim Zim Zim'.

With worm regards and Pranama,
Hansa.

এই চিঠি পেয়ে পরিবারের আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হলাম। রত্না আমায় বললো বাবা গানটা ইংরেজি শব্দে লিখে তার অর্থ বা ভাব ইংরেজিতে আপনি-ই ঠিক করে লিখে দিন। আমি ঐ কঠিন কাজটা বেশ সময় নিয়েই করলাম, যাতে একেবারেই আজেবাজে না হয়ে যায়। তারপর একটা চিঠির সঙ্গে সেটা 'হাঁন্সা'কে পাঠিয়ে দিলাম তার বম্বের ঠিকানায়।

বহুদিন পর ১৯৩২-র ৮ই মে বম্বে থেকে লেখা মিঃ চন্দ্রনের নিকট থেকে আমার কাছে এলো এক মর্মান্তিক চিঠি। সে লিখেছে,

'The reason for this letter is a very sad incident. Hansa expired on the 27th• April. It breaks my heart even to day to write about it. Suddenly, it was discovered that she had a tumour in the overies. On 8th of Feb., she was operated. The ovaeries and uterus were removed. It was malignant. So, they started chemotherapy treatment. But it was discovered that the Cancer had spread to other parts of the body, including the lungs.···She faced the whole thing with courage and died the same way.···We travelled together such a lot, not only the whole of India, but nearly half the world including Europe & U. S. A. She was very fond of travelling & meeting new people & making friends···.

Hansa received your letter of 12th Feb. along with one from Ratna. She read it and also gave it to me to read She was very happy about it and was delighted with the Bengali Song you had sent with a fine translation in English. In her death bed, she used to read it as & when possible and took inspiration from the same. This was lying by her side when she breathed her last.···

Hansa, I know, was very fond of your family, particularly Ratna & Mamon. I am sure, she will want me to send her love to all of you.

With fondest regards & a kiss to Mamon from me

Sd/- G. R. Chandran.

আমার দুই পুত্র, কন্যা নেই। এ নিয়ে আমার ও বাণীর আপশোষের সীমা ছিল না। 'হাঁনসার' মধ্যে কি সেই ঈপ্সিত কন্যাকে খুঁজে পেয়েছিলাম ? নইলে, সেদিন ঐ চিঠি পেয়ে, পরিবারের সকলের চোখই জলে ভরে গিয়েছিল কেন, এমন কি পাঁচ/ছয় ব'ছরের মামনেরও ? সেদিন আমাদের বাড়ির স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাও প্রায় অচল হয়ে যায়। রক্তের সম্বন্ধ-ই যে আত্মীয়তার মাপকাঠি নয়, প্রিয় হাঁনসার মৃত্যু আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে যেন সেটাই আবার বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

আমাদের সকলের অতি প্রিয় জেঠামশাই ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের তবলচি। বেহালাটাও তিনি সুন্দর বাজাতেন। ঢাকার মুড়াপাড়ার জমিদার বর্তমানে

প্রয়াত বিখ্যাত তবলা-বাদক কেশব ব্যানার্জীর সঙ্গেও তিনি এক আসরে তবলা বাজাতেন।

কিন্তু দেশের মাটিকে এত ভালবাসতে আর বড় একটা কাউকে দেখিনি। জেঠামশাই ও জেঠুমা তাঁদের একমাত্র কন্যা রাণীকে নিয়ে দেশে থাকতেন। আমাদের সামান্য জমি-জিরেত ছিল। তার আয়েই তিনি কষ্ট করে সংসার চালাতেন। প্রয়োজনে বাবা সাহায্য করতেন। বাবা এবং বড়মামা তিনবার জেঠামশাইকে কলকাতায় মোটামুটি ভাল চাকুরির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি কোনও না কোন অজুহাতে দেশে চলে গিয়ে আর চাকুরিতে ফিরে আসেননি। এই জন্য তিনি সকলের অপ্রিয় ছিলেন।

আমার ষোল ব'ছর বয়েসে, ঐ বাড়িতে বসেই জেঠামশাই একদিন এসব আলোচনা উপলক্ষে আমায় বলেছিলেন যে দেশের মাটি ছেড়ে কোথাও যেয়ে উনি বেশিদিন থাকতে পারেন না, ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। আরও বলেছিলেন যে উনি কোন ঐশ্বর্য চান না, দুটো ডাল-ভাত খেয়ে দেশের মাটিতে থেকে তাঁর শান্তি। অথচ তিনি কিন্তু অলস ছিলেন না। সারাদিন বাড়ি আর জমি-জমার তদারক করতেন, নিজেও প্রচুর পরিশ্রমের কাজ করতেন। তাঁর দৌলতেই, ছুটির সময় দেশে গিয়ে আমরা একেবারে ঝকঝকে—তকতকে বাড়ি পেতাম।

মনে হয় জেঠামশাই এর দেশের মাটির উপর এই মনের টান আমি কিছুটা উপলব্ধি করেছিলাম। আমারও মনে হত, মোটামুটি সচ্ছলতার অভাব না হলে, আমিও দেশ ছেড়ে বিদেশে থাকতাম না। উনি আদর করে আমায় 'মানু' (মানিক) ডাকতেন। তাঁর সেই সুন্দর স্নেহময় মুখখানা আজও আমার চোখে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ভাসে। ১৯৪৮ সালে, আমার বড় ছেলের অন্নপ্রাশনে তিনি শেষ-বারের মত কিশোরগঞ্জে এসেছিলেন! আমার মাকে খুব স্নেহ করতেন। বাড়ি ফেরার সময় আকারে ইঙ্গিতে তাঁর নিকট থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গিয়ে ১৯৪৯ সালেই জেঠামশাই তাঁর প্রাণাধিক দেশের মাটি থেকে পরলোকে গমন করেন।

বাবা ছিলেন রেগে গেলে যেমনি নির্দয়, সাধারণভাবে আবার তেমনি সদাশয়। আমি একটু লক্কা বা দুর্বার ছিলাম বলে, আমাকে ছোট বেলায় উনি প্রচণ্ড মারধর করতেন। ঐ মারধরের সময় পাড়ার অনেক দিদি ও মা-মাসিমাদের চোখে জল পড়ত। আমার উপর বাবার ঐ কঠিন শাসন পাড়ায় একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার চাকুরি জীবনে, বাবা যখন দেশ ছেড়ে আমার হুগলী শ্রীরামপুরের আপিস বাড়িতে চলে এলেন, তখন, পূর্ববঙ্গের অনেকেই

ঐ বাসা বাড়িতে এবং পরে টালিগঞ্জের চন্ডীতলার বাসাবাড়িতে দেখতে আসতেন, বাবা ও আমি এক বাড়িতে কেমন করে আছি। সব দেখেশুনে, অর্থাৎ আমার পিতৃভক্তি দেখে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে, আমার পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে যেতেন।

বাবা ছিলেন, খুবই সংবেদনশীল। কেউ কোন সাহায্যের জন্য এসে দাঁড়ালে নিজের স্বল্প ক্ষমতার মধ্যেও তাকে প্রাণপণ সাহায্য করতেন। গরিব ছাত্র ও বহু গরিব মেয়ের বিয়েতে উনি আর্থিক সাহায্য করেছেন।

ময়মনসিংহ শহরে ও আমাদের দেশের গ্রাম হামছাদি ও তার আশেপাশে এত বড় অপেশাদার কীর্তনিয়া আর কেউ সে সময়ে ছিল বলে শুনিনি। আমার সেই অল্প বয়সেও দেখেছি বাবা অপূর্ব পালা কীর্তন গাইতেন। সেই কীর্তন শুনতে শুনতে অনেক নারী ও পুরুষ অচৈতন্য হয়ে পড়তেন, বাবা নিজেও কখনো-সখনো অচৈতন্য হয়ে যেতেন। ময়মনসিংহ জেলায় ছিল বহু জমিদার ও তালুকদারের বাস। তাদের প্রায় সকলেরই জেলা শহরে বাড়ি ছিল। এমন সব বাড়ি বা অন্য আরও সব নাম করা বাড়ি ঐ শহরে বড় কমই ছিল, সেখানে বাবাকে পালা কীর্তন করতে হয়নি। রাত ৯টা বা ১০টায় ময়নসিংহের বাসা বাড়িতে খেয়ে দেয়ে ঘুমুতে তাঁকে খুব কমই দেখেছি। প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও তাঁর পালা-কীর্তনের আসর থাকতো। এজন্য তাদের একটা অপেশাদার দলও ছিল। সেই দলে আট/দশজন কীর্তন-পাগল মানুষ ছিলেন। আমার বাল্যে দেখা তাদের সকলের চেহারা মনে পড়লেও, মাত্র এক জনার নামই মনে আছে। তিনি ছিলেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়, প্রয়াত রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। বর্তমানের বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের পিতা।

বাবা ও প্রয়াত রাধাগোবিন্দ পোদ্দার মহাশয় এতই অন্তরঙ্গ ছিলেন যে তাঁরা এপার বাংলায় এসেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত যোগাযোগ রেখে চলতেন।

নবদ্বীপের বিখ্যাত কীর্তনিয়া প্রয়াত প্রাণাধিক গোস্বামী ছিলেন বাবার কীর্তনের শিক্ষা-গুরু। আমার বাল্যে ময়মনসিংহ শহরে, মাঝে মাঝে ঐ মধুকণ্ঠী প্রাণাধিক গোস্বামীর নিকট থেকে বাবার শিক্ষা গ্রহণ আমি দেখেছি। ময়মনসিংহ শহরের মানুষ বাবাকে এক ডাকে চিনতেন। বাবার এই জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহু ভাবে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। পূর্বেই বলেছি যে বাল্যে আমি একটু দুরন্ত ছিলাম। এই কারণে শহরে বহুস্থানে মাঝে মাঝে লঙ্কাকান্ড বাঁধিয়ে,

বাবার ঐ জনপ্রিয়তার জোরে বেঁচে যেতাম।

প্রতি ব'ছর পুজোর ছুটিতে বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে দেশের 'হামছাদি'র বাড়িতে যেয়েও নিস্তার পেতেন না। অন্ততঃ দশ বারো দিন এবাড়ি ওবাড়ি, এগ্রাম-সেগ্রামের বহু গণ্যমান্য বাড়িতে বাবাকে পালা কীর্তন করতে হত। ময়মনসিংহ শহরের সেই অপেশাদার দলের অভাবে, বাবাকে দেখতাম, খোল বাজাতে জেঠামশাই, হারমনিয়ামে বড় কাকা, বাঁশিতে ছোটকাকা, করতলে তাছপুর মামাবাড়ি থেকে আমার মাসতুত ভাই অনিল দত্ত এবং এই রকম আরও কিছু মানুষ নিয়ে দল গড়ে পালা কীর্তনের আসরে যেতেন। জেঠামহাশয়ের সুপারিশে, আমিও কোন কোনও আসরে শ্রোতা হবার অনুমতি পেতাম। পুজোর সময় আমাদের আশেপাশের গ্রামে নৌকো ছাড়া যাবার উপায় ছিল না। যে বাড়িতে কীর্তনের আসর বসতো সেখান থেকে বড় নৌকো এসে বাবাকে সঙ্গীসাথী সহ খুব আদর যত্ন করে নিয়ে যেত। আবার কীর্তনের শেষে গভীর রাতে ঐ নৌকোতেই বাড়ি পেঁাছে দিত। যে সব বাড়িতে এই রকম কীর্তনের আসর বসতো, সেখানে সাধারণত পুজো-মণ্ডপ বা কোন মন্দিরের সামনেই বিরাট নাট-মন্দিরের বা তা না থাকলে বেশ বড় করে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে সেখানে আসর বসত। একধারে চিকের আব্রু টাঙিয়ে মেয়েদের বসার জায়গা করা হত। এমন সব আসরে দুতিন শত মানুষের সমাবেশ হত।

পানামের বিখ্যাত ব্যাবসায়ী ও খুব দাম্ভিক জমিদার প্রয়াত আনন্দ মোহন পোদ্দার, অখণ্ড বাংলার এক সময়ের এম. এল. সি-র বাড়িতে বাবার এমন গানের আসরে আমিও একবার উপস্থিত ছিলাম। ভদ্রলোক প্রতি ব'ছর, কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পী আনিয়ে নিজের পুজো-মণ্ডপে বৃহদাকার প্রতিমা গড়িয়ে দুর্গা পুজো করতেন। কীর্তনের জন্য বাবাকে এতই খাতির করতেন যে প্রতি ব'ছর অষ্টমী পুজার রাতে নৌকো পাঠিয়ে বাবাকে সেই পুজো-মণ্ডপে নিয়ে, পুজো দেখিয়ে নিজে সঙ্গ দিয়ে আদর যত্ন করে খাইয়ে আবার নৌকো করে বাড়ি পেঁাছে দিতেন। বাল্যে বাবার সঙ্গে আমিও কয়েকবার ঐ পুজো মণ্ডপে গিয়েছি। বাবার এই সব সমাদর আমার অন্য ভাই বোনেরা দেখার বড় একটা সুযোগ পায়নি।

আমাদের 'হামছাদি' গ্রামের দুমাইলের মধ্যেই 'হারিয়া' গ্রামের জমিদার 'চৌধুরী'দের বাড়িতে এমনি এক কীর্তনের আসরে আমি একবার যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে গানের প্রারম্ভে এবং শেষে বাবার সঙ্গে কি আদর যত্ন-ই না পেয়েছিলাম। কীর্তন শুরু হবার পূর্বে কারো অনুরোধে, বড় কাকা একটি

বাংলা-ভজন গেয়েছিলেন। তাঁর সুকণ্ঠের সেই সঙ্গীত প্রায় তিনশ দর্শক স্তব্ধ হয়ে শুনেছিলেন। বড় কাকা যে এতো ভালো গাইতেন, তা আমি পূর্বে জানাতাম না।

আমাদের গ্রামের উত্তরে দুমাইলের মধ্যেই বারদি গ্রামের "নাগেরা" ছিল খুব ডাকসাইটে জমিদার। তাঁদেরই এক শরীক প্রয়াত যোগেশ চন্দ্র নাগ মহাশয় তখন অতি বৃদ্ধ, কোনও রকমে বেঁচে আছেন। তিনি নাকি তাঁর পুত্র জ্যোতিষ নাগকে বলেন যে হামছাদি গ্রামের উমেশবাবুর কীর্তন না শুনে তিনি মরেও শান্তি পাবেন না। পুজোর ছুটিতে তিনি বাড়ি আসেন, ছেলেকে একবার খোঁজ করে দেখতে বলেন। জ্যোতিষবাবু আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে তাঁর বৃদ্ধ পিতার এই শেষ ইচ্ছে জানালে, বাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, নিজের ভাইদের ও গ্রামের উক্ত সঙ্গীদের নিয়ে, নৌকোয় বারদি গ্রামে যেয়ে মৃত্যুপথ যাত্রী যোগেশবাবুকে পালা কীর্তন শুনিয়ে আসেন। কীর্তনের শেষে ভদ্রলোক আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাবার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে অজস্র আশীর্বাদ করেন। মামাবাড়ি তাছপুরের আমার মাসতুত ভাই শ্রীঅনিল দত্ত আসরে বাবার সঙ্গী ছিলেন। ঐ আসরে পনের দিন পরেই যোগেশবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, যে কীর্তন গান বাবার প্রাণ ছিল, যার জন্য কি দেশে কি ময়মনসিংহ জেলায় এত যশ, এত আদর-সমাদর পেয়েছিলেন, মাত্র চল্লিশ ব'ছর বয়সে বাবা তাঁর সুমধুর কণ্ঠ চিরতরে হারিয়ে ফেলেন। কত রকমের চিকিৎসা, 'ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র' কিছুতেই কিছু হল না। অনেকের ধারণা, অতিরিক্ত গানেই এই পরিণতি। তিনি নিজেও কিছু কীর্তন-গান লিখে সুর দিয়েছিলেন। বোন হেনা একটু বড় হলে, তাকে নিজের ঐ ভাঙা গলায় সে সব কীর্তন শিখিয়েছিলেন। ওঁনার সাধ-ইচ্ছামত, হেনা ওনাকে কীর্তন গেয়ে শোনাতেন, গ্রামোফনের রেকর্ড বাজিয়েও ওনাকে কীর্তন শোনান হত। তারপর এপার বাংলায় এলে, উনি রেডিওতে কীর্তন শুনতেন। আশেপাশের বাড়ি থেকে রেডিওতে কীর্তনের সুর ভেসে এলেই, বাণী ছুটে এসে, বাড়ির রেডিও টিউন করে বাবাকে সেই কীর্তন শুনতে বলতো। এজন্য বাণীর উপর বাবা খুব খুশি ছিলেন। মাঝে মাঝেই দেখতাম অত বড় একজন কীর্তনিয়া চোখ বুজে ঐ সব গান শুনতেন। আর তাঁর চোখের জলে গাল ভেসে যেত। বাড়ির কে কতটা বুঝত বা অনুভব করত জানি না। কিন্তু আমি বাবার অতীত জানতাম বলে, এই দৃশ্য দেখলে, দুঃখে আমার বুক ফেটে যেত, আমি

অন্য ঘরে সরে যেয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করতাম। আমার বড় ছেলে ফল্গু একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা বাবা, দাদু সর্বসময়ই এমন 'হুঁ হুঁ হুঁ' করেন কেন?" তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, "ওটা 'হুঁ হুঁ হুঁ' নয় উনি মনে মনে কীর্তনের সুর ভাঁজেন, একদিন খুব বড় কীর্তনিয়া ছিলেন।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু কাহিনী-ই ছিল বাবার পালা কীর্তনের বিষয়। যেমন, 'নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন' ইত্যাদি। আমি বৈষ্ণব সাহিত্য না পড়লেও, বাবার পালা কীর্তন শুনে শুনে ঐসব বহু কাহিনী আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, যেমন বাল্যকালে ময়মনসিংহের Gospel Hall-এ যেয়ে পাদরী সাহেবদের মুখে "বাইবেল"-এর বহু কাহিনী শুনে শুনে, তাও প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫২ সালে, বাবার পক্ষে আর দূর-ভ্রমণ সম্ভব ছিলনা। আপিসের কাজে আমি কয়েকদিনের জন্য দিল্লি গিয়েছিলাম। বাণী আমার সঙ্গে ছিল। আপিসের কাজের শেষে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে, আমরা অন্য সব বহু দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে মথুরা ও বৃন্দাবন ঘুরে এলে, অন্য সব জায়গা এমনকি 'তাজমহল' ছেড়ে দিয়েও মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনা নিয়ে দিনের পর দিন বাবার কত প্রশ্নের যে জবাব দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর পালা-কীর্তনের প্রায় সব কাহিনী-ই ছিল মথুরা-বৃন্দাবন-যমুনা নিয়ে। এই স্থানগুলো সম্বন্ধে বাবার অসীম আগ্রহের কারণ আমি অনুভব করতাম। তাই, কখনো বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য সহকারে বাবার প্রত্যেকটি প্রশ্নের আমরা জবাব দিতাম, বুঝিয়ে বলতাম। আর বাবাকে ঐ সব জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতে পারলামনা বলে খুবই আপশোষ হত! এখনও হয়!

জেঠামশাই, বাবা ও কাকাদের পরে, আমি ও হেনা গান-বাজনার মাত্র ক, খ, গ বজায় রাখার চেষ্টা করলেও, এই অনাবিল আনন্দের শিল্প আজ আমাদের পরিবার থেকে একেবারে 'দিল্লি দূরে অস্ত' হয়ে গেছে!

১৯৬৬ সালে, বাবা ছিয়াত্তর ব'ছর বয়সে আমাদের ছেড়ে পরলোকে চলে যান। আমার হাতে তোলা, কিশোরগঞ্জের বাসাবাড়ির উঠানে বাবার একটা ফটোর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বাবার সেই দিনগুলোর কথা ভাবি আর চোখের জল ফেলি। আর তাঁর মৃত্যু দিবসে, সব ভাই বোন ছেলে, বৌ, নাতি-নাতনি একত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করি আর তাঁর প্রিয় স্তোত্র পাঠ করি "ভব সাগর তারণ কারণ হে···।" কিশোরগঞ্জে থাকা অবধি, প্রতি সন্ধ্যায় উনি স্তোত্র পাঠ করতেন। পরে, হেনা, খনু ও মঞ্জুকে দিয়ে হারমনিয়াম সহ এই স্তোত্র নিয়মিত পাঠ করাতেন।

১৯২৬ সাল থেকে ঐ একই ভাবে আমরা মার মৃত্যুদিবসও পালন করি।

আমাদের স্নেহময়ী মা ছিলেন অতি বুদ্ধিমতী আর আমাদের পরিবারের মধ্যমণি। বাবা খুব সদাশয় হলেও ছিলেন "গোঁয়ার গোবিন্দ"। সেই অর্থে, মার স্নেহ ও বুদ্ধি ছিল আমাদের পারিবারিক পরিপূরক। বস্তুত মার এই বুদ্ধি ও স্নেহ আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে রেখেছিল।

মা গ্রামের পাঠশালার সামান্য শিক্ষিতা হলেও, বড়মামার স্বদেশি করার সুযোগে, তৎকালীন আমলের জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করতে স্বদেশিওয়ালারা যে সব বই পড়তেন, সে সব পড়ার সুযোগ পেয়ে, মার মনে যে বই পড়ার আগ্রহ জন্মায় সে তাঁর মৃত্যুর তিন-চার ব'ছর পূর্ব পর্যন্তও, অর্থাৎ ওনার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বজায় ছিল। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও উঁনি মাঝে মাঝে খবরের কাগজ এবং বই পড়ে শোনাতে বলতেন। মা বাংলা সাহিত্য তো পড়েই ছিলেন এবং বিশ্ব-সাহিত্যেরও বহু বাংলা অনুবাদ বার বার পড়েছেন। এতে মার মানসিক প্রসারতা অদ্ভুত ভাবে বেড়ে যায় এবং উঁনি এতোটা কুসংস্কার মুক্ত হয়ে যান যে ওনার সমসাময়িক অনেকেই যে তাতে বিরক্তি বোধ করতেন, সেটা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। মা'র স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতা ও কুসংস্কার মুক্ত মন, আমাদের মতো পরিবারের মা'র সমবয়েসীদের মধ্যে খুব কমই দেখেছি। আমি এতে সত্যিই খুব গর্ব অনুভব করতাম। আমার নিজেরও খুব বাল্যে মার নিকট নানান বই এর গল্প শুনে শুনে, পড়ার আগ্রহ জন্মায়। তারপর থেকে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও, বাইরের যতটুকু সামান্য পড়াশুনো করেছি বা এখনও করি, তার জন্য আমি মার কাছেই ঋণী। বাবা পূর্বজীবনে এই রকম কি পড়াশুনো করেছেন জানি না। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে দেখেছি, বড় বড় মুনিঋষিদের জীবনী ও বৈষ্ণব সাহিত্য খুব পড়াশুনো করতেন। মা ঐ সব পড়েও অন্য সব পড়াশুনো করতেন।

এপার বাংলায় এসে, হুগলির শ্রীরামপুরেই আমরা পরিবারের সকলে একত্রিত হই। সেখানে, বিষ্ণুপুরে এবং টালিগঞ্জ চণ্ডীতলার বাসাবাড়িতে, প্রায় প্রত্যহ রাতের খাবারের পরে, বিশেষ করে আমি, বাণী, মা, খনু প্রায় এক-ঘণ্টা বা তারও বেশি, নানান আলোচনায় বসতাম। কোনদিন কোন বই নিয়ে, কোনদিন কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে, অন্যদিন ঐ রকমই অন্য কোন বিষয় নিয়ে। মাকে দেখতাম, একেবারে পাল্লা দিয়ে উঁনি আমাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেন। মোটামুটি পড়াশুনো না থাকলে মার পক্ষে এটা সম্ভব হত না।

সেই স্নেহময়ী মা ১৯২৭ সালে ছিয়াশি ব'ছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে যান। আজও একলা ঘরে, বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে মনে কোন দুঃখের উদ্রেক হলে, 'মা, মাগো' বলে তাঁকে স্মরণ করে যেন একটু শান্তি পাই!

আবার মূল কথায় ফিরে আসছি। দুই ছেলেকে ভাল স্কুলে কলেজে পড়াতে, তাদের ডাক্তার, এন্‌জিনীয়ার বা ঐ রকম কিছু করতে, এক ননদ ও নিজের এক ছোটবোনের বিয়ে দিতে, শ্বশুর-শাশুড়ির চিকিৎসা, তাঁরা কে কি খেতে ভালবাসেন, বাইরে কোন কাজে বার হলেই মনে করে, খুঁজে পেতে সে সব কিনে বা জোগাড় করে আনতে, চিকিৎসায় ডাক্তার ডেকে এনে ঔষধ ইত্যাদি দূর দূরান্ত থেকে জোগাড় করে আনা ইত্যাদি সব রকম কাজে বাণী যেন আকাশ-পাতাল চষে বেড়াতো। আবার এর উপর তখন বাড়ির দশ-বারো জনার সংসারের চাবিও তার হাতে। এই অমানুষিক খাটুনি খেটেও তার মুখে কোন দিন কোন বিরক্তি দেখিনি বরঞ্চ মনে হয় কর্তব্য করতে পারার আনন্দে যেন তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। আমি বরং বাড়াবাড়ির জন্য তাকে মাঝে মাঝেই সাবধান করতাম, কিন্তু বাণী ভ্রূক্ষেপও করত না। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ব'ছর বয়েস পর্যন্ত যে মানুষটা অসুরের মতো সব কাজ করতো, ধীরে ধীরে নানা রোগ এসে তাকে একেবারে জর্জরিত করে ফেললে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখে আমার বুক ফেটে যেত। তাই আমার আর্থিক ক্ষমতার বাইরেও, কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতাম তাকে সুস্থ রাখতে।

তবু কেন জানি মনে হয় সব দিক দিয়ে বাণীর উপযুক্ত মর্যাদা আমি দিতে পারিনি। আর সে জন্যে অকপটে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে শাস্তি প্রার্থনা করি। মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয় কিনা জানি না, যদি না হয়, ঈশ্বর প্রদত্ত আমার শাস্তিতে যদি বাণীর আত্মা শান্তি পায় তাহলে আমি বলি, হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে শাস্তি দাও! শাস্তি দাও! শাস্তি দাও!

আমার বোধ হয় জীবনের সব চাইতে বড় দোষ যে রেগে গেলে আমি যুক্তি, তর্ক, মনুষ্যত্ব সব হারিয়ে ফেলি। এর উত্তাপে বাণীকেও ভুগতে হয়েছে। সে তো এজন্য দুঃখ পেয়েছেই, আমিও বড় কম পাইনি। অনুতাপে দগ্ধ হয়েছি। বাণীকে সান্ত্বনা দিতে তার কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছি, মনে মনে এর পুনরাবৃত্তি করবনা বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, কিন্তু রেগে গেলেই আবার সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি। তার মৃত্যুর কয়েক ব'ছর পূর্ব থেকেই, আমি বাণীকে কোন গাল-মন্দ করলেই সে বলতো, তুমি এখনো আমায় বকো! আমি যখন আর থাকব না,

তখন এই অনুতাপেই তো তুমি নিত্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে। এটা মনে করেও তুমি আমায় আর বকো না। এ কথাগুলো আমি লিখতে পারছি না, অনেক সময় নিয়েও শেষ করতে পারছি না। বারে বারে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছছি, কয়েক ইঞ্চি দূরে বাণীর খুব জীবন্ত বাষ্ট ফটোটা দেখছি আবার দুচার কথা লিখছি, আবার উঠে ঘরে একটু পায়চারি করছি, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাণীর হাতে লাগানো গাছের ফোটা ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারছি না। পুনরায় এসে টেবিলে বসে লেখাটা এগিয়ে নিতে চেষ্টা করছি।

বাণী উক্ত কথাগুলো হয়তো মনের দুঃখে বলত, কিন্তু অভিশাপ দিয়েছে বলে তো বিশ্বাস করতে পারিনে। যতই রাগ আর গাল-মন্দ করি, সে তো জানতো ওটা সাময়িক তার প্রতি আমার ভালবাসা, প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা তো তো কোনদিন বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু গত ৩রা ফেব্রুয়ারির পর থেকে তো সত্যি আমি শুধু কেঁদেই চলেছি, ঘরেও কাঁদি, বাইরেও কাঁদি, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও কাঁদি। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও কাঁদি। আর সেই বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে যখন মনে হয় বিষাদে দম বন্ধ হয়ে আসছে, তখন মা, মাগো বলে চীৎকার করে যেন একটু ত্রাণ পাই। বাণীর কথাই তো সত্যি হলো— আমি কাঁদবো, আমি তো কেঁদেই চলেছি, কাঁদাই এখন আমার একমাত্র কাজ, শেষ হবে যার কেওড়াতলায়!

পাঁচ-ছয় ব'ছর পূর্বে আমার একটা কঠিন অনুশোচনা এসেছিল যে আমার রাগ-মর্জি'র জন্য বাণীকে যে দুঃখ দিয়েছি, এখন থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত করব, তাকে সর্বোতভাবে সুখী করব। এই উদ্দেশ্যে, কি আর্থিক কি শারীরিক ক্ষমতার বাইরেও তাকে আনন্দ দিতে, সুখী রাখতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু বেশি দিন সে সুযোগ পেলাম না। ঈশ্বর বড় তাড়াতাড়ি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই শরৎ সাহিত্যের ঘটনাবলী, নর-নারীর মনের দুঃখ বেদনার সূক্ষ্ম অনুশীলন, সমাজের কুশিক্ষা ও অন্ধ সংস্কারজনিত অবিচার ও অত্যাচারে আমাদের সমাজের, বিশেষ করে নারীর যন্ত্রণা ইত্যাদির কথা কাহিনী পড়ে আমার দৃষ্টি খুলে গেল। মনে হল যেন কুয়োর ভেতর থেকে একটা আলোকিত জগতে উঠে এলাম। তারপর কলেজে পড়ার সময় শুধু জগৎবিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যই নয়, ফরাসী, রুশীয়, চীন, জার্মানী, সংস্কৃত, উর্দু ইত্যাদি নানা

ভাষার নানা বিখ্যাত পুস্তিকার ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদ পড়ে, দৃষ্টিভঙ্গীর সচ্ছতা ও মনের প্রসারতা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। একথাতো শিক্ষিত সমাজের সকলেরই জানা যে ভাল ভাল জিনিস পড়া মানেই ধ্যান ধারণার প্রসারতা আর ঠিক তার উলটোটাই 'কুপমণ্ডকতা'। ১৯৪২'৪৩ সালের মধ্যেই আমার মনের ধ্যান-ধারণার বিপ্লব ঘটে যায়। এই বই পড়ার নেশায়, আমি ও বাণী অন্ততঃ তিন হাজার টাকার বইতো নিজেরাই কিনে ফেলেছি। এখনও কিনে চলেছি।

যাহোক, আমাদের সমাজে পঞ্চাশ ষাট ব'ছর পূর্বেও ছেলেমেয়েদের মোটা-মুটি নিগোসিয়েটেড বিবাহই হতো, এখনও হয়। এই বিবাহ প্রথার উদ্দেশ্য বহুল। বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুরুজনদের আলাপ-আলোচনায় যা যা শুনতে পেতাম তার মধ্যে জাত কুলের সংস্কার বা কুসংস্কারের বাইরেও বিবেচ্য ছিল ঃ— কনে বা বরের দেশ কোথায়, তারা সুন্দর না অসুন্দর, পরিবারটি শিক্ষিত না অশিক্ষিত। যে পাড়ায় তাদের বসবাস সেখানে তাদের সুনাম না বদনাম, দুটি পরিবার সমপর্যায়ের না আর্থিক ইত্যাদি অবস্থার বিস্তর ফারাক, ভাই বোনদের বিয়ে হয়েছে কোথায়, বর বা কনের মামাবাড়ি কোন জেলায়, সে পরিবারটি কেমন, অর্থাৎ বর বা কনের মা কিরকম পরিবারে মেয়ে। কারণ, বর বা কনের উপর যার যার মায়ের প্রভাবই তো বেশি থাকবে। The hand that rocks the cradle rules the nation, এই থিয়োরি বা মতবাদ ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোটামুটি উদ্দেশ্য, যে কনেকে ঘরের বৌ করে আনছি, সে বৌকে নিয়ে পরিবারের সকলে সুখী হতে পারবে তো? অন্যদিকে যে বাড়িতে মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছি, সেখানে মেয়ে সুখ-শান্তি পাবে তো? ঐ সময়ে গুরুজনদের মুখে একটা কথা বা প্রবাদ প্রায়ই শুনতাম, যার সঠিক ভাষা মনে না থাকলেও অর্থটা হচ্ছে, আম-গাছে আমই ফলে, জাম গাছে জাম, শ্যাওড়া গাছে শ্যাওড়াই ফলে, ফলে না আম জাম।' সে সময়ে এই প্রবাদকে খুব মূল্য দেয়া হত।

মনে হয় এই বই-এর কোথাও লিখেছি যে যৌবনে এ ব্যাপারগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করতে পারিনি, পরের দ্বিতীয় চিন্তায় (2nd thought) মনে হল কায়স্থবেড়িয়ার রাণীর এমন হলো কেন? পূর্বে উল্লেখিত প্রবাদের সপক্ষে সামান্য কিছু লিখছি। বাণীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠার বহু পূর্বেই, রাণীর দাদা আমাকে ভাল করে না চিনেই তাঁদের কায়স্থবেড়িয়ার বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় বাস্তবিক

পক্ষে তার বোন রাণীর কাছে আমায় ঠেলে দিলেন। তারপর ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি আমাকে বিয়ে করার জন্য রাণীর সকল প্রচেষ্টা, প্রয়াস ও সাধনার কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিখলে নিষ্ঠুর মানুষের চোখেও দুফোঁটা জল ঝরবে! তার পরিবারের সকলের সাহায্যে, যত রকম পন্থা অবলম্বন করা যায় তার কোন কিছু করতেই রাণী কসুর করেনি এই উদ্দেশ্যসাধনে। আমার মধ্যে সে যে কি পেয়েছিল, সেটা আমি আজও ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনে।

অথচ পাঁচ-ছয় ব'ছরের দীর্ঘ সময়ে তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে বা প্রবোধ দিয়ে, কখনো রাগ করে বা আঘাত দিয়ে এবং পরে বাণীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হলে, বাণীর কথা, তার লেখা ভূরি ভূরি চিঠি দেখিয়ে ও পড়িয়ে রাণীকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে তাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কা-কস্য-পরিবেদনা! রাণী কিছুতেই তার মনকে বোঝাতে বা দমাতে পারতো না, আমাকে কথা দিয়েও না, ঠাকুর স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেও না। কিন্তু কায়স্থবেড়িয়াও কিশোরগঞ্জের মতই ছিল একটা মহকুমা শহর, ওখানে দুএকটি ভাল ছেলে তাকে ভালওবাসত। কিন্তু রাণী তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করত। আমাকে সব বলত, তাদের চিঠিপত্রও দেখাতো।

আমি এমনও করেছি যে তার কাকুতি-মিনতি ভরা আহ্বানের চিঠির পর চিঠি পেয়েও জবাব দিইনি এবং একবার প্রায় ব'ছরখানেক কায়স্থবেড়িয়ায় যাইনি। তখন সে তার পরিবারের কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমার কর্মস্থলে চলে যেতো। এমন অবস্থায় বেশ কয়েকবার রাণীকে সেখানে আমার বিশেষ পরিচিত বাড়িতে, একবার তো শিলচরের সেই ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের বাসায়ও তাকে রাখতে হয়েছিল। রাণীর দাদা কিশোরগঞ্জে থাকতেন। সেই সুবাদে, আমি কিশোরগঞ্জে গিয়েছি খবর পেলেই, রাণী সেখানে তার দাদার বাসায় যেয়ে, ওখান থেকে আমাদের বাসায় চলে যেতো। কোন কোনওবার আমাদের বাসায় পৌঁছে জানতে পারত, পূর্ব রাত্রে আমি শিলচর চলে গেছি। কত কথা আর লিখব, বহু কিছুই রয়ে গেল।

রাণীর প্রতি আমার স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকলেও তার প্রতি প্রেম-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আমার মনে অঙ্কুরিত হয়নি। আমার মনে হয়, প্রেম-ভালবাসায় শ্রদ্ধা একটা বিরাট factor. বাণীর প্রতি আমার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। যা লেখা হয়তো উচিত নয়, রাণীর ভালবাসার গভীরতা বোঝাতে তাও আজ আমায় লিখতে হচ্ছে, যাতে তাকে কেউ না ভুল বোঝে।

আমার বিয়ের বারো-তের ব'ছর পরে, রাণীর কলকাতার বাসায় এক দুপুরে

হঠাৎই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। ঠাট্টা করে আমি বলেছিলাম, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমায় বিয়ে করতে না পারলে চিরকুমারী থাকবে, এখন নিশ্চয়ই বুঝেছো সেসব কত ঠুনকো ? তুমি তো এখন তিন ছেলের মা হয়ে কত সুখী। আমার সত্যি খুব ভাল লাগছে তোমার সংসার দেখে ! রাণী একটু গম্ভীর হয়ে গেল, একটু সময় নিয়ে বলল, "তাহলে শোন, বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। দেশ ভাগ হল। কায়স্থবেড়িয়া আমাদের ছাড়তে হল। বাবা চলে গেলেন পরলোকে। এপার বাংলায় এলাম। আমাদের এতবড় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা একেবারে শেষ হয়ে গেল। দাদা আমার বিয়ের চেষ্টা করছেন অভাব-অনটনের মধ্যেও। আমি মত দিতে পারছিনে। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমার মনের সে জায়গায় বসাতে আমার বুক ফেটে কান্না আসতো। মা আমাকে বোঝান, তিনি আর কতদিন আছেন, আমার তো একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন। মার উপদেশে ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করলাম। দাদাকে মত দিলাম। বিয়ের রাতে চোখ বুজে তোমাকে ধ্যান করতে করতে এসে বিয়ের আসনে বসলাম। ধ্যান করছি আমার উল্টো দিকে যিনি বসে আছেন, তিনি আর কেউ নন, সে তুমি-ই। আমার সাত রাজার ধন সেই মানিক। শুধু বিয়ে নয়, বিয়ের বাসরে, ফুলশয্যার রাতে, তারপর রাতের পর রাত আমি একই ধ্যান করে গেছি ! আমার স্বামী বলতেন, তুমি মাঝে মাঝে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড় কেন ? কি আর বলব ? বলতাম এটা আমার ছোটবেলার অভ্যেস।" এইসব বলতে বলতে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বালিশে মুখ গুঁজে রাণী বিছানায় শুয়ে পড়ল। মিথ্যে বলব না, সেদিন আমার চোখও ভিজে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারিনি। রাণীর কথাগুলো কেমন একটা অসম্ভব মনে হলেও, মিথ্যে বলে বিশ্বাস করতে পারিনি। কোন বড় অভিনেত্রীও ঐ কথাগুলো অভিনয় করে এমন স্বাভাবিক করে বলতে পারতো কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে নিজেকে সামলে নিয়ে, রাণী বালিশ থেকে মাথা তুলে একটু মৃদু মলিন হেসে বলল, "কায়স্থবেড়িয়া যদি ছাড়তে না হত তবে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হত না। আমি চির-কুমারীই থাকতাম। আর তুমি বাণীকে বিয়ে করলেও, আমার মনে আমার মানিকই থাকতে, এখনো তাই আছো, তবে বাণীর সঙ্গে আমি কোন শঠতা বা বেইমানি করব না। যা আছে তা আমার মনেই থাকবে।"

খুব একটা ভারী মন নিয়ে রাণীর বাড়ি থেকে ফিরে এলাম। তার ভালবাসার গভীরতা এমন করে পূর্বে কখনও বুঝিনি। কিন্তু বুঝলেও যে

কি করতাম জানি না। কারণ মনে আছে, ওদের বাড়িতে প্রথম দিনের পরিচয়েই উপলব্ধি করেছিলাম যে ঐ পরিবারে সত্যিকারের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রবেশ করেনি, রাণী দশম শ্রেণীতে পড়লেও, লেখা-পড়ার দীপ্তি বলতে তার মধ্যে কিছু নেই। তার বাবার বড় ব্যবসা থেকে পরিবারে ভাল টাকা আসে সত্যি, কিন্তু কোন সংস্কৃতির প্রবেশ নেই। বাড়ির বাইরে তাদের স্থানীয় আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে শিক্ষিত কাউকে দেখিনি। তার বৌদি আমাদের প্রজন্মের মানুষ হলেও, আমার মা এক প্রজন্ম পূর্বের মানুষ হয়েও তার চাইতে অনেক গুণ বেশি শিক্ষিতা। যেমন চল্লিশ পঞ্চাশ ব'ছর পরে দেখেছিলাম, আমাদের কোন কোন বৈবাহিক-বৈবাহিকা বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও 'কেলাব, কেলাস, পেলাস, গেলাস' ইত্যাদি বহু অশিক্ষিত ও গ্রাম্য উচ্চারণ করেন পঞ্চাশ ব'ছরের উপর কলকাতাবাসী হয়েও। আবার কেউবা প্রায় মূক কিন্তু তাবিজ-তন্ত্রী। নিজের এবং নিকটস্থ প্রায় সকলের শরীরে যেখানে যত জায়গা আছে সেখানেই তাবিজ পরার পরামর্শ ও ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আর তারা মন্দির-মস্‌জিদ ও নানা জায়গার বড় বড় গাছতলায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের ঠকাতে যত প্রতারক বসে আছে, বহু অর্থ ব্যয়ে তাদের কাছে ছুটোছুটি করে, তুলনামূলক ভাবে বেশি রোগে ও দুর্ঘটনায় ভুগছে। কেউ আবার সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা 'চাচা কাহিনী'-র সেই বরিশালের বিপ্লবী চাচার মত বেকার। ইংরেজ বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যিনি তাঁর পেশা বলেছিলেন—লিকুইডেশন্। আবার কেউ বা ডবল-ডেকার বাসের খানদানি প্যাইলট।

অন্যদিকে, আমাদের তো দূরের কথা, আমাদের পূর্ব প্রজন্মের বা তারও এক প্রজন্ম আগের কারও কথাবার্তায় গ্রাম্য উচ্চারণও শুনিনি, কারও শরীরে তাগা-তাবিজও দেখিনি। অথচ তাঁরা কেউ তো নাস্তিক ছিলেন না, আমরাও তা নই। আমার মা বাংলা সাহিত্যের বাইরেও বহু ইংরেজি, ফরাসি, রুশীয় ইত্যাদি বিদেশী সাহিত্যের বাংলা অনুবার পড়েছিলেন। বাণীও স্কুল-কলেজের পড়ার বাইরে জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত প্রচুর পড়াশুনো করে গেছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই যে আকাশ পাতাল প্রভেদ তা নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র সমশিক্ষিতা ও সমসংস্কৃতিসম্পন্না স্ত্রীকে হারিয়ে এক বাড়িতে বাস করা যে কতখানি কষ্টকর, মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক তা শুধু আমার মতো ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবেন। আমার বাবা বলতেন, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য পরের প্রজন্মকে শিক্ষায়-দীক্ষায় একধাপ উঠিয়ে দেয়া। বাবা পেরেছিলেন। আমি বা

আমার কোন কোনও বোন নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করলেও বাবা ব্যর্থ হননি। কিন্তু আমি হয়েছি। আর জীবনের একেবারে শেষ ধাপে এসে তারই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। যাহোক রাণীর কথায় ফিরে এসে বলছি যে এমন সব আরও বহু কারণে ঐ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া বা রাণীকে আমাদের পরিবারের বধূ করে আনা আমার কাছে ছিল কল্পনাতীত!

এটাই হয়েছিল আমার ও রাণীর জীবনের বড় ট্র্যাজেডি। বাণী সবই জানতো, তাকে সবই জানাতাম, এমনকি উপরিউক্ত রাণীর বেদনাদায়ক কথাগুলোও তাকে বললে, বাণী হতভম্ব হয়ে বলেছিল, এও কি সম্ভব! কিন্তু রাণীর অনুরোধেই একদিন বাণীকে নিয়ে রাণীদের বাড়ি বেড়াতে গেলে, রাণী আটার লেচিতে চিনি মিশিয়ে সেগুলো ডালডাতে ভেজে চা-এর সঙ্গে আমাদের খেতে দিলে, বাড়িতে ফিরে এসে বাণী বলেছিল, রাণীকে দেখে তো তার আর্থিক অবস্থা খারাপ মনে হল না। তবে ওগুলো সে আমাদের কি খেতে দিয়েছিল। কোনও ভদ্রলোক কি অতিথিকে এসব খেতে দেয়? তারপর হেসে বলেছিল, তুমি ওকে বিয়ে করলে আজ গাড়ি হাঁকাতে পারতে। জানতো, আমড়া গাছে আমড়াই হয় আম হয় না!

তাই বলছিলাম, যৌবনে এই দিকটা সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা না করলেও, বিয়ের ব্যাপারে পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষার সমপর্যায়ভুক্তির কথাটা নিশ্চয়ই আমার সচেতন মনে না থাকলেও অবচেতন মনে ছিল, নইলে রাণী ও আমার ঘটনার এই পরিণতি হবে কেন?

১৯৪২/৪৩ সাল থেকে ১৯৪২/৪৩ সাল পর্যন্ত আমি এই ধারণাই পোষণ করে এসেছি যে আমাদের সমাজের বিবাহ প্রথার চাইতে পাশ্চাত্য প্রথা অনেক ভাল ও উপযোগী। তখন যে ব্যাপারগুলো সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করতে পারিনি সেগুলো হলো, পাশ্চাত্যের বর-কনে বিয়ে করেই পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেখানের ছেলেমেয়েরা একেবারে খোলাখুলি মেলামেশা করে। এমন কি কখনো, বিয়ের পূর্বেই তারা কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করে একের সঙ্গে অন্যের বনিবনা হবে কিনা সেটা বুঝে নেয়া ওদের সমাজে নিন্দনীয় নয়। এমন আরও অনেক কিছু ওদের সমাজে আছে যা আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। ওদের সামাজিক বাঁধন ও আমাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান এখনও রয়ে গেছে।

আমি ও বাণী অনেকটা পাশ্চাত্যের নিয়মেই অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে বিয়ে করেছিলাম। তাই আমাদের দুই ছেলেই যখন একই নিয়ম অনুসরণ করল,

আমরা তখন আমাদের বিশ্বাস ও নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথা মনে করে, উভয় ছেলের ব্যাপারেই খুব সহানুভূতিশীল ছিলাম। এতটাই ছিলাম যে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে এতটা খোলাখুলি মেলামেশা ও ভাবী বৌমাদের আমাদের বাড়িতে বিয়ের পূর্বেই প্রায় নিজেদের কন্যাসম আদর-আপ্যায়নের উদাহরণ যে খুব কমই আছে এটা বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি। আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কারুর কোন উপদেশ বা কটাক্ষই আমাদের নড়াতে পারেনি।

তারপর দুই ভাবী বৌমার অভিভাবকরা যখন জানতে এসেছে আমাদের কোন দাবি-দাওয়া আছে কিনা, তখন হাসতে হাসতে বলেছি, শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিলেই আমরা খুশি হব। ওদের বিয়ের পরেও আমরা শ্বশুর-শাশুড়ীর ক্ষমতা ফলাইনি, কন্যা ও বন্ধুর মত ব্যবহার করেছি। যে সব ব্যাপারে শুধু ছেলেদের সঙ্গে আলোচনাই যথেষ্ট সেখানেও বৌমাদের মতামত নিয়েছি। শুধু কোন অসম্মানজনক কথা বা ব্যবহারের সঙ্গে আপোষ-রফা করে চলতে পারিনি। জানি না, বৌমারা এ বিষয়ে আমার নীতি কতটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। জানি না এই জন্যেই যে কারুর নিন্দা-মন্দ করার বিনা অভিপ্রায়েই বলতে চাই যে সকলেই সকল শিক্ষার সুযোগ পায় না। স্কুলে-কলেজে পুঁথিগত শিক্ষা পেলেও নৈতিক, ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা মানুষ সাধারণত পেয়ে থাকে প্রথমত নিজের পরিবার থেকে, তারপর আত্মীয়স্বজন থেকে, সত্যিকারের শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করে, আর ভাল ভাল বই পড়ে। এ সুযোগ সকলে পায় না। গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার বা ব্যবহারের মাত্রা জ্ঞান খুব একটা সোজা বিষয় নয়, এ শিক্ষা সাধারণত নিজের পরিবার থেকেই পাওয়া যায়, ভাল ভাল বই পড়েও পাওয়া যায়। আমরাতো এই শিক্ষাই পেয়েছি যে গুরুজনরা আমাদের সমালোচনার উর্ধে। দোষগুণ নিয়েই প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীতে বাস করে। গুরুজনরাও দোষের উর্ধে নয়। কিন্তু আমরাতো এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি যে বয়োকনিষ্ঠরা তাঁদের সমালোচনা করার অধিকারী নয়, তাঁদের অসম্মান করে কথা বলারও অধিকারী নয়। সেটা করলে তাদের যদি নিজের শিশু সন্তান থাকে তারাও এই কুশিক্ষা পাবে এবং ঐ শিশু সন্তান দ্বারা তারাও একদিন একইভাবে অপমানিত হবে। কারণ কেউ তো দোষগুণের উর্ধে নয়। ভুলত্রুটি তো তারাও করতে পারে, আজও পারে, বৃদ্ধ বয়সেও পারে।

কিন্তু বাণীর মৃত্যুর পর দুটো ঘটনায় আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেছি।

একদিন আমার কন্যাসম এক আত্মীয়া আমার আঠার বছর বয়েসের বড় নাতির বয়েসী একটি ছেলেকে বলছে যে সমাজের বুড়োগুলো যত নষ্টামোর গোঁড়া। এই যে দেখিস না আমাদের সব বুড়ো রাজনীতিজ্ঞগুলো, এরা সব দুনম্বরি, এদের সবগুলোকে একেবারে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। আর ভালবেসে বিয়ে করতে চাও তো কর, কিন্তু ভালবাসবে একজনকে, দুজনকে নয়। আমি জানি, আমার ঐ চল্লিশ বৎসর বয়েসের আত্মীয়াটির স্কুল-কলেজের কেতাবী বিদ্যা থাকলেও সাধারণ জ্ঞান অত্যন্ত কম এবং বিশ্বের ইতিহাস বা বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই বললেই চলে। সে কি করে জানবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইংরেজ জাতির ট্র্যাডিশনই ছিল যে তাঁদের দেশে ষাট ব'ছর বয়েসের নিচে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। কারণ যার শেষ বিচার-বুদ্ধির উপর একটা জাতির ভাগ্য নির্ভর করছে তাকে পাকা মাথার মানুষ হতে হবে। কাঁচা মাথার কাঁচা বিচার-বুদ্ধি দেশ ও জাতির সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। বিস্ময়ের বিষয়, অতি সমসাময়িক নিজের দেশের প্রয়াত রাজীব গান্ধীর কথাও তার মনে হল না যে অতি ভাল ও সজ্জন ব্যক্তি হয়েও, কাঁচা বয়েস ও কাঁচা বুদ্ধির জন্য দেশটাকে কি করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে গেল! আসলে, আমি জানি, আমার ঐ আত্মীয়ার রাজনীতির অ, আ জ্ঞানও নেই, তাই রাজনীতিতে ঐ অল্প বয়েসের রাজীব কি ভুলত্রুটি করেছে, সেটা বোঝার ক্ষমতাও তার নেই। রাজনীতিজ্ঞকে তার গালি দেওয়া অনেকটা চা-এর দোকানে বসে রাজনীতি করার শামিল।

আমার ঐ আত্মীয়া, ঐ ছেলেটিকে আরও বলেছিল যে বুড়ো মানুষগুলো adjust করে চললে সমাজে আর কোন গোলমালই থাকে না, adjust করা শিখতে হয়। আমার মনে হলো, সমাজ-সংসারে হাজারো গোলমালের কারণগুলোর মধ্যে বুড়োদের adjust করতে না পারার point তো 'সিন্ধুতে বিন্দুতে মাত্র'। কথাটা হয়তো আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। তাই মনে হচ্ছিল, কোন বয়োকনিষ্ঠের আমাকে কোন অপমানসূচক কথা বললে বা ব্যবহার করলে, হাসি-মুখে সেটা হজম করা যদি তথাকথিত adjustment হয় বা সদ্য মৃত স্ত্রীর শোকাতুর স্বামীর সঙ্গে সামান্যক্ষণের জন্য আলাপরত পুত্রকে তার স্ত্রী ডেকে নিয়ে যেয়ে অন্য ঘরে V. C. R.-এ রাত দশ-এগারটা থেকে রাত একটা-দুটো পর্যন্ত সাধারণভাবে অপসংস্কৃতিতে ভরা হিন্দি ছবি দেখার সঙ্গে যদি হেঁ হেঁ, হাঁ হাঁ করাই তথাকথিত adjustment করার রূপ হয় বা বাড়ির সকলের মা বা মাতৃতুল্য কারুর মাত্র দেড় মাস পূর্বে মৃত্যুর শোকাভিভূত বাড়িতে যদি ছুটির

দিনে সকালে, দুপুরে ও রাতে V. C. R-এ ঐ বাড়ির শোকাতুর পিতার উপস্থিতিতেই ক্যাসেটের পর ক্যাসেট চালিয়ে amusement করার সঙ্গে adjustment করতে হয়, তাহলে তো বলব, হে ঈশ্বর আমাকে আর শুধু শুধু বাঁচিয়ে রেখে, এভাবে বস্তাবন্দী করে না পিটিয়ে, তাড়াতাড়ি তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও। অবশ্য, উক্ত কোন ব্যাপারেই আমি টুঁ শব্দটিও করিনি, শুধু হাঁ করে চেয়ে দেখেছি। তবে একদিন বহু পুরানো একটা ঝাপসা স্মৃতির কথা মনে পড়েছিল। সেটা ইং ১৯৪৩/৪৪ সাল। কমরেড এম্. এন্. রায় Independent India নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বার করতেন। আমাদের কম্যুনিস্টদের চোখে তখন তিনি Renegade এ বিষয়ে উনি তাঁর একটা রচনায় লিখেছিলেন যে রাশিয়ায় থাকতে যখন নানা কৌশলে ভারতবর্ষে গোপনে অর্থ, সাহিত্য, বই ইত্যাদি পাঠিয়ে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পত্তন করেছিলাম, তখন কি আমি জানতাম যে I was giving birth to some naughty children!

আর আমি সত্যি এক নারীর বেশি ভালবাসা পেয়েছি। সেটা আমি তো লুকোইনি। ওতে আমি কোন অপরাধ করিনি, তাই আমার কোন হীনমন্যতাও ছিল না। বিয়ের পূর্বেই আমার স্ত্রীকে সব বলেছি, আলোচনা করেছি এবং এই লেখার অগ্রভাগে তা উল্লেখও করেছি। শুধু তাই নয় জ্যেষ্ঠ আত্মীয় বা আত্মীয়া এবং কনিষ্ঠা কন্যাসম আত্মীয়াদের নিকটও সে গল্প করেছি। কিন্তু আমার কোন কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আত্মীয়া, আমার কাছে প্রকাশ না করলেও, আমি জানি এবং বেশ ভাল করেই জানি, যে তারা কেউ কেউ একের বেশি ভালবাসাবাসি করেছে। আমি কাউকে ঘৃণা করে নয়, শুধু যুক্তি ও উদাহরণের জন্যই এসব উল্লেখ করছি। আমার যে আত্মীয়া আমাকে শুনিয়ে ঐ ছেলেটিকে ঐ কথাগুলো বলল, তার তো অর্ধেক জীবন এখনও পড়ে আছে। মুখে মুখে হাতি ঘোড়া মারা তো খুব-ই সহজ। কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষিত এবং নরনারীর আত্মিক বা জৈবিক প্রকার ভেদ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞ তারাই জানেন, ঐ জোর দিয়ে কিছু বলা, কচুপাতার উপর জল দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বড় কিছু নয়। ঈশ্বর না করুন, সেই মানসিক ঝড় যদি তাদের জীবনে কোনদিন আসে, যা মুনি বিশ্বামিত্রকেও পরাজিত করেছিল, যা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, তবে সেদিন এই অপোগণ্ড বৃদ্ধকে তারা যেন একবার স্মরণ করে।

কয়েকদিন পরে, ঐ ছেলেটি এ বাড়িতে এলে এক দুপুরে আমার সঙ্গে ছেলেটি ও আমার দুই নাতনি খাবার টেবিলে যখন খাচ্ছি, তখন আমার চার/পাঁচ

ব'ছরের ছোট নাতনি আমায় জিজ্ঞাসা করে যে আমাদের বাড়ির কুকুরটার নাম লুসি কেন? ডগ্ আর বিচ্-এর প্রভেদ ওকে বুঝিয়ে বললে, ঐ নাতনির প্রশ্নে আমাকে আরও বলতে হয় যে ওটা ডগ্ হলে, নাম হতে পারতো, লালু, কালু, ভুলু বা ইংরেজিতে খুব চলতি নাম টম। আমাকে একেবারে হতবাক করে দিয়ে ঐ উনিশ ব'ছরের ছেলেটি বলে ওঠে কেন, রুজভেল্ট, চার্চিল বা স্তালিনও হতে পারত। আমি স্তম্ভিত হয়ে বলি, কুকুরের ঐ নাম যারা দিতে পারে তারা তো মানুষ নয়ই, পশুরও অধম। আমি বাধ্য হয়ে খুব ছোট করে ঐ তিন মহাপুরুষের পরিচয় দিলে, ছেলেটি বলে, আমাদের দেশে তো এরকম অনেক আছে তাদের নাম দেয়া যায়। আমি বলি, তাই বলে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী বা জ্যোতি বসুর নামে কুকুর পোষা যায় না! হঠাৎ আমার মনে পড়ল কয়েকদিন পূর্বে এই ছেলেটিকেই তার ও আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া বলেছিল, আমাদের বুড়ো রাজনীতিজ্ঞগুলো সব দুনম্বরি, এদের সব লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমার মনে হলো, "The hand that rocks the cradle rules the nation."

অন্য একদিন, বাণীর মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পরে, আমার কন্যাসম এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, আমার উপস্থিতিতেই, আমার এক ছেলেকে একটা ব্যাপারে ভাল করে না জেনেশুনে আমাকে কটাক্ষ করে বলে যে অকালে হলেও আমার স্ত্রী মরে যেয়ে বেঁচে গেছেন, বেঁচে থাকলে অনেক দুঃখ পেতেন, পৃথিবীটা বড় কুৎসিত, পারভারশনে ভরা, এরকম পারভারশনের শিকার তারা নিজেরাও হয়েছে। আমি তো হতবাক! একবার সীতাকে স্মরণ করে বলছি, 'পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও' আর একবার আলেকজ্যান্দার-এর কথা মনে হচ্ছে, 'সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!' তবে ঈশ্বর সেদিন আমাকে রক্ষা করেছেন যে, দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়িনি, নিজেকে অতি কষ্টে দমন করে রেখেছি, কারণ সেদিন রাগে জ্ঞান হারিয়ে আমার মনের সঞ্চিত ঝুড়ি খুলে যদি চেঁচামেচি করতাম তবে এ পাড়ায় আমি বা আমার ছেলেরা আর কাউকে মুখ দেখাতে পারতাম না। ছেলেকে যখন পরে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুই কি শিক্ষা পেয়েছিস, সে বলেছিল, 'বিশ্বাস করো তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা আমি কিছুই জানতাম না।' আমার সেই কন্যাসম আত্মীয়া কিন্তু আজও তার ঐ অমার্জনীয় ঔদ্ধত্যের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চায়নি বা অনুতাপও প্রকাশ করেনি। সেদিন রাতে শুয়ে হঠাৎ বহুদিন পরে ফরাসি লেখক রুশোর confessions-এর কথা বার বার মনে হচ্ছিল। নিজের

পরিবার ও পরিচিত অনেকের কেচ্ছা-কাহিনী লিখে যে বই আজও মনে হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। কলেজ জীবনে ওটা পড়া, তবু যেন মনে হয়, ঐ বই-এর শেষেই পাঠক-পাঠিকাদের একবার নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে যে, ঐ বই-এর চরিত্রগুলোর চাইতে নিজের চরিত্রের গোপন ব্যাপারগুলো আরও নিম্নমানের কিনা! জানি না, অন্যদের কি অভিজ্ঞতা, আজ ৭০ ব'ছর বয়েস পার হয়ে এসে, আমাদের সমাজ সম্বন্ধে তো আমার ধারণা যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা আর মানসিক প্রসারতাবিহীন হীনমন্যতায়, আমাদের সমাজে sex crime-কেই অন্য সব গর্হিত crime-এর চাইতে বড় করে দেখা হয়। আর sex নিয়ে আমাদের সমাজে নানা আটুনি-বাঁধুনির ফাঁদে পড়ে গোপনে এখানে বিশেষ করে অসম sex crime হয় বেশি। আর যারা এটা করে বেশি, তারাই আবার অন্যের বেলায়, বোধহয় হিংসায়, চেঁচায়ও বেশি এই ভেবে যে তাদের গোপন ঐ কাজগুলো তো আর কেউ জানে না! এই কথাগুলো আমাদের সমাজ সম্বন্ধে আমার বই পড়া অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতাও কিছু আছে।

সব চাইতে বেদনাদায়ক হচ্ছে, এখন আমার মন চায় সারাদিনে অন্ততঃ কিছুক্ষণ আমি যেন নীরবে, নিভৃতে বসে বাণীর কথা ভাবতে পারি, তার ফটোর সুমুখে দাঁড়িয়ে বা বসে একটু ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে পারি, হয়তো বা তাতে একটু শান্তি পেতাম। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে উল্লিখিত Irritative এবং provocative ব্যবহার ও কথাবার্তায় সে সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত।

এই লেখার প্রারম্ভে, এসব কথা লিখতে হবে বলে কল্পনাও করিনি। কিন্তু আজ যেন মনের ভেতর থেকে কে ঠেলে আমায় এসব লিখতে বাধ্য করল। কিছুতেই কলম থামাতে পারলাম না। তাই কেউ যদি আমার এ লেখায় দুঃখ পায় তো জ্যেষ্ঠই হোক আর কনিষ্ঠই হোক তার কাছে আমি আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখলাম।

মানুষের জীবনের একটা বড় ট্র্যাজেডি এই যে কারো কারোর প্রথম জীবনের গড়া দৃঢ় বিশ্বাস চোখের জলে মনের বেদনায় ভেঙ্গে যায়। আমার জীবনেও দেখছি সেই ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। ১৯৪২/৪৩ সাল থেকে ১৯৭৯/'৮০ সাল পর্যন্ত নরনারীর বৈবাহিক মিলনের প্রথা নিয়ে আমার মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, যা নিয়ে জীবন-ভোর কত তর্ক-বিতর্ক করেছি, সে বিশ্বাসের জোর তো আমার মনে আজ আর নেই। একেই কি বলে অভিজ্ঞতা? ইংরেজ জাতি কি

অভিজ্ঞতা থেকেই ষাট বছর বয়েসের কমে কাউকে তাঁদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে দিত না ? ১৯৪১/৪২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের ভারত বিদ্বেষী বক্তৃতায় কলেজে স্ট্রাইক করিয়ে দিয়ে, আবার পরিণত বয়সে যে সে ভুলের জন্য আপশোষ করেছি, তারও নাম কি অভিজ্ঞতা ?

বাবার কর্মস্থল ময়মনসিংহ বা কিশোরগঞ্জে বা আমাদের দেশের বাড়ি হামছাদি বা মামাবাড়ি তাজপুর গ্রামে, আমাদের জীবনধারা ছিল এইরকম যে, যে পাড়ায় আমরা থাকতাম, সেখানে আশেপাশের প্রায় সকলেই জন্মগত এবং পেশাগতভাবে ছিল ভদ্রলোক। সামান্য আর্থিক বৈষম্য থাকলেও, সেটা প্রায় ধর্তব্যের মধ্যে পড়তো না। এর সুবিধে ছিল প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনত, জানত, সবার বাড়িতে সবার খোলামেলা যাতায়াত ছিল, আড্ডা-সমাবেশ হতো। অনেকটা যেন একই পরিবারের বিভিন্ন ইউনিট্। জেলা শহরেই হোক, মহকুমা শহরই হোক, আর গ্রামই হোক, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো, গান-বাজনা, নাটক-থিয়েটার ইত্যাদি আরও সব সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কাণ্ড লেগেই থাকতো। আর মোটামুটি সকলেই এসব ক্রিয়া-কাণ্ডে অংশগ্রহণ করতো। পাড়ায় পাড়ায় না হলেও কয়েকটা পাড়া নিয়ে বা দুএকটা গ্রাম নিয়ে একটা লাইব্রেরি থাকার সুযোগে, প্রায় সকলেরই পড়াশুনোর সুযোগ ছিল। এই সব খোলামেলা যাতায়াত ও মেলামেশা এবং উক্ত সব ক্রিয়া-কাণ্ড মনুষ্যত্ব বিকাশের অনন্ত সুযোগ এনে দিতো, যা স্কুল-কলেজের কেতাবি শিক্ষায় বড় একটা হয় না বলেই আমার বা অনেকের অভিজ্ঞতা।

কলকাতা বা টালিগঞ্জের যে শহরতলিতে আমরা বাস করি, তার জীবনযাত্রা উক্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। এখানে হয়তো আমার বাড়ির একপাশে এক অতি অশিক্ষিত নিম্নজাতের বাড়ি, অন্যপাশে হয়তো মাত্র এই প্রথম জাতিগত পেশা ছেড়ে 'কোটা'-র (Quota) সুযোগে ব্যাংকে কাজ করে এক ধোপা অথবা নাপিত পরিবার, তার পাশেই আবার হয়তো এক ব্রাহ্মণ যজমান পরিবার, তার পাশেই হয়তো দুনম্বরি কারবারের কোন অশিক্ষিত ধনী পরিবার, তার পাশেই হয়তো এমন কোন পরিবার যার কোন রোজগেরে বেটাছেলে নেই, একটি বা দুটি মেয়ে সন্ধ্যের পর খুব সেজেগুজে প্র্যাকটিস্ করতে বেরিয়ে যেয়ে রাত বারটা-একটায় দামি দামি মোটর গাড়িতে বাড়ি ফিরে আসে। এইরকম সব জগাখিচুড়ি ভাবে বাড়ি ঘর গড়ে উঠেছে, তাও আবার একেক পরিবার একেক জেলার। বাস্তবিক পক্ষে সকলের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিতে

এতই প্রভেদ যে সাধারণ ভাবে মেলামেশার কোন উপায়ই নেই, ঘনিষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা। আমাদের এ অঞ্চলে তো একটা এমন লাইব্রেরিও নেই যেখান থেকে বই এনে কেউ পড়তে পারে। সংস্কৃতির নামে যে দুএকটা অনুষ্ঠান এদিকে-ওদিকে হয়, তাও থাকে অপসংস্কৃতিতে ভরা। ভাল কোনও অনুষ্ঠান হলেও মাইক্রোফোন এম্প্লিফায়ারে হিন্দি গানের হুল্লোড়। তাতে সকলের যোগ দেবারতো কোন সুযোগই থাকে না। আমাদের ঐ মফঃস্বল শহরের সমাজে হিন্দি সিনেমা খুব কমই দেখান হত। কিন্তু কি বাংলা আর কি হিন্দি, কোন সিনেমা আমরা দেখতে পারব, সেটা অভিভাবকরা ঠিক করে দিতেন। আমার ষোল ব'ছর বয়েসেও বাবা আমাকে দুর্গাদাস-উমাশশীর "চণ্ডীদাস" বা প্রমথেশ-যমুনার "দেবদাস" ছবি দেখতে দেননি।

আমি ও বাণী জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় মফঃস্বল শহরের সেই সুন্দর পরিবেশের মানসিকতা নিয়েই দেশ ভাগের দুর্ভাগ্যে এপার বাংলায় এসেও সেই মানসিকতা আজও হারাইনি। কিন্তু আমাদের পরিবারের পরের প্রজন্মের কেউ তো ঐ সুন্দর পরিবেশে মানুষ হবার সুযোগ পায়নি, কিছু দেখেওনি।

স্ত্রীর অকাল মৃত্যু অনেকের জীবনেই ঘটে, আমারও ঘটেছে। সেই কঠিন বেদনা তো আমাকে এখন কুরে কুরে খাবেই। কিন্তু যেটা কোনদিন কল্পনাও করিনি, সেটা এই যে, বাণীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ি থেকে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনা বা পূর্বে বর্ণিত আমাদের পারিবারিক পরিবেশের সব কিছু একেবারে হারিয়ে যাবে! এই কঠিন শাস্তি ও অসহ্য বেদনা আমি সইতেও পারছি না, কাউকে বোঝাতেও পারছি না। আমি তো শুধু স্ত্রী-হারাই হইনি, আমি হয়েছি মানসিকভাবে সর্বহারা! জানি না, জীবনকে আর কতদিন এভাবে টেনে নিয়ে যেতে পারব! আমাদের সময়ের বর্ণিত পরিবেশে যাঁরা মানুষ হয়েছেন, জীবন কাটিয়েছেন, পড়াশুনো করেছেন, তাঁরাই হয়তো শুধু আমার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন আর বুঝতে পারবেন আমার সম্যক অবস্থাটা।

যাহোক, এবার একটু অন্য কথায় আসি। কথাটা কিছু নতুন নয়, তবু পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। আমাদের সমাজের উচ্চ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজের পাঠ বা তিন চারটে পাশ শেষ করে, চাকুরি করুক বা গৃহস্থালি-ই করুক, তাদের কাছে উচ্চ শিক্ষা ও বৃহত্তর জগতের জ্ঞান আহরণের পথ খুলে যেত। অর্থাৎ, বৃহত্তর জগতের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি, জানবার ইচ্ছে থাকলে, অজ্ঞতার কারণে তা জানার বা বোঝার কোন অসুবিধে

থাকতো না। তাই, স্কুল কলেজের পাঠ শেষ করেও, এই সত্তর বৎসর বয়সেও আমি বা আমাদের প্রজন্মের অনেকেই এখনও দেশী-বিদেশী ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি পড়েই চলেছি, কারণ শিক্ষার তো শেষ নেই। সেতো অনন্ত! এই পড়াশুনো আর তা থেকে আহরিত শিক্ষাইতো আমাদের কূপমণ্ডুকতা থেকে তুলে নিয়ে বিশ্বজনীন ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। বাল্যের বোধোদয় থেকে আজ এই সত্তর ব'ছর বয়েস পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, কত অসংখ্য কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়েছি, আমার নিজস্য বিশেষ অর্থে ধর্ম মানলেও, কোন বিশেষ ধর্মই এক মাত্র পথ বলে আমি মানি না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান বা অন্য আরও কোন ধর্ম বা গোষ্ঠীর মানুষকে আমি আলাদা করে দেখতে পারিনা, কোনও মানুষকে দেখে, সে কোন ধর্মের একথা আমার মনেই আসেনা, মানুষকে তার ধর্ম ছাড়া শুধু মানুষ বলে দেখার ও ভাবার সবলতা আমি অর্জন করেছি তো বিশেষ করে ঐ পড়াশুনো থেকেই! ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দাঙ্গায় নিজের জীবন বিপন্ন করে বেশ কিছু মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনার চারিত্রিক মানসিকতা ও সাহস অর্জন করেছিতো বিশ্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য ইত্যাদির অনুশীলন করেই।

সব ধর্মের পুস্তকেই ভাল ভাল কথা বা উপদেশ আছে প্রচুর। কিন্তু সেই সব উপদেশ ও রীতি-নীতির প্রয়োগে, একদল কুচক্রী ও স্বার্থান্বেষী মানুষ, নিজেদের সুখ-সুবিধে বজায় রাখার প্রয়াসে, পাদ্রী, মোল্লা, গুরু, সন্তু, মহন্ত ইত্যাদিদের সঙ্গে আপসে বা আতাতে, অজ্ঞ ও অসহায় জনসাধারণকে যে কি ভাবে ঠকিয়ে চলেছে, সেটাও বুঝতে পেরেছি এবং বুঝে এসেছি, উক্ত ঐ অনুশীলন থেকে, আর চুপ করে না থেকে বহু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে এটা বোঝাবার চেষ্টাও করেছি, এখনও করে যাচ্ছি ঐ শিক্ষা থেকেই।

বাল্যে শুনেছি, বড়রা ঠাট্টা করে বলতো, 'যার নেই কোন গতি, তার হচ্ছে "হোমিওপ্যাথি।" অর্থাৎ যারাই রুজি-রোজগারের কোন পথ পেতনা তারাই একটা হোমিওপ্যাথির ডাক্তারখানা খুলে বসত। আর, নিজে বড় হয়ে, প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরে উক্ত প্রচলিত কথাটার পাশে আমার আরও একটি কথা মনে হত, 'যার নেই কোন গতি, তার হচ্ছে সাধুমতি।' ১৯৫২ সালে, আমি ও বাণী উত্তর-ভারতে বেড়াতে যেয়ে, এক সকালে লছমনঝুলার সেই বিখ্যাত ঝুলন্ত পুল পার হয়ে, কিছু মঠ-মন্দির আর অসংখ্য সাধুসন্তদের আয়েশী জীবন যাত্রা দর্শন করে গঙ্গার অপর পার দিয়ে হৃষীকেশের দিকে যখন হেঁটে আসছিলাম, তখন

বেশ ফর্সা, নাদুস-নুদুস, মুখে কপালে চন্দনের তিলক আঁকা, তেল চক্‌চকে শরীরের এক যুবা সাধু বাবাজীকে দেখে আমরা দাঁড়ালাম। উনি তখন একেবারে পারের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার জলস্রোত দর্শন করছিলেন। আমার সেই একত্রিশ ব'ছর বয়েসের চপলতায়, সাধুর পাশে যেয়ে দাঁড়িয়ে, আমার হিন্দী ও বাংলা মিশ্রিত ভাষায় বললুম, "নমস্তে সাধু বাবাজী, কাহা র‍্যতা হ্যায়।" নিকটেই একটি আশ্রম দেখিয়ে বাবাজী বললেন, 'উহা'। বললাম, "মালুম হোতা হ্যায়, বহুত ঘিউ মাখ্‌খন খাতা হ্যায়, বহুত আরাম্‌সে হ্যায়!" সাধু বাবাজী সামান্য হেসে তাঁর ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে, হাত তুলে আকাশের দিকে দেখালেন, মনে হলো 'বরাতের' ইশারা বা ঈশ্বরকে দেখালেন। আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাণী আমার জামা টেনে বললো, "যাও! কি আরম্ভ করেছ, এখন চলো।"

অনেকেরই হয়তো মনে আছে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজী তাঁর মন্ত্রীত্বের গোড়ার দিকে একবার চীৎকার দিয়েছিলেন যে এই লক্ষ লক্ষ সব সাধু রাস্তায়, ঘাটে, গাছের তলায় বসে অলস জীবন কাটায়, এদের এই জীবন যাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়ে, এই man-power দেশের অন্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো উচিৎ। অবশ্য তিনি আর পরে এ নিয়ে কিছু করেননি। যেমন করেননি, কালোবাজারীদের নিকটস্থ লাইট পোষ্টে ফাঁসী দেবার ব্যবস্থা!* কিন্তু এই সাধুবেশে স্বতন্ত্রভাবে বা সমষ্টিগতভাবে অজ্ঞ জনসাধারণকে ঠকানো তো রয়েই গেছে বা বেড়েই চলেছে। অজ্ঞ জনসাধারণকে এই ঠগ্‌দের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব কি শুধু সরকারেরই? শিক্ষিত মানুষদেরও তো এটা অবশ্য কর্তব্য, যদি তারা উচ্চ শিক্ষার দ্বারা নিজেদের সংস্কার মুক্ত করতে পারেন। আমাদের প্রজন্ম অবধি বহুর মধ্যে এই কর্তব্যচেতনা দেখেছি, নিজেরাও করেছি, এখনও করছি।

রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদি বহু বিষয়ই স্কুল কলেজের পঠন-পাঠনের বাইরেও আমাদের প্রজন্মের উচ্চ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষদের পড়তে হয়েছে, কোন বাধ্যবাধকতায় নয়, মনের টানে, প্রাণের আবেগে, আর শুধু দেশাত্মবোধের স্বার্থেই নয়, বিশ্বভাতৃত্বের স্বপ্নেও। এ সব বিষয়ের কতটুকু গভীরে আমরা পেঁছুতে পেরেছি সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু কমবেশি প্রাথমিক জ্ঞান সকলেরই হয়েছে। এই জ্ঞানটুকু নিয়ে অন্ততঃ দেশে বা বিদেশে,

---

* যা উনি স্বাধীনতার মাত্র কয়েক ব'ছর পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন। জেল থেকে বার হয়ে এসেই উনিশ শ বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে ইংরেজ কৃত কৃত্রিম মন্বন্তরের ভয়াবহতার কথা জেনে।

কি হচ্ছে না হচ্ছে, কে কি বলছেন না বলছেন, ঘটনার স্রোত কোন খাতে বইছে, এসবের ভাল-মন্দটাও বোঝার খানিকটা ক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি, এবং অন্যদের বা ছোটদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি ও এখনও করি। ১৯৪৩/৪৪ সালে প্রয়াত কমরেড এম্. এন. রায় তাঁর পাক্ষিক Independent India পত্রিকায় লিখেছিলেন, "একজন মানুষ, ইতিহাস, দর্শন, অঙ্ক ও বিজ্ঞানে সুনিপুণ (Master) না হয়ে সে নিজেকে কি করে একজন মার্কসবাদী বলে প্রচার করতে পারে, সেটা আমি বুঝি না।" এটা দেখে, আমি মার্কসবাদ পড়েও নিজেকে কোনদিন মার্কসবাদী বলতে সাহস পাইনি। তাই বলে কি পৃথিবীর মার্কসবাদীদের কাজ কর্ম বা পদক্ষেপ সম্বন্ধে আমি অন্ধের মতো থেকেছি, নিশ্চয়ই নয়। সেগুলো বোঝবার চেষ্টা করেছি, অনেক কিছু বুঝেওছি, সেগুলো আলোচনা-সমালোচনা করেছি, ঐ প্রাথমিক জ্ঞান দিয়েই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব করে হয়েছেটা কি? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, যৎসামান্য হলেও কিছু হয়েছে। ছাত্র জীবনে ছিটেফোঁটা হলেও দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছি, সমাজ সেবার জন্য সভা-সমিতি করেছি, হাতে-কলমে কিছু কাজও করেছি। চাকুরি জীবনে কঠিন চাকুরি করেও (বিশেষ করে কলকাতার বিশ ব'ছরের চাকুরি জীবনে বাড়ি থেকে সকাল সাড়ে আটটায় বার হয়ে আপিস থেকে রাত আটটা/নটায় বাড়ি ফিরে এসেও, সমাজ সেবার জন্য সভা-সমিতি করেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছি, অনেক অন্যায় রোধ করেছি, বহু সমাজদ্রোহীকে দমিয়েছি, সংশোধন করেছি, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচার করেছি। আন্দোলন করেছি। চাকুরি থেকে এগার ব'ছর পূর্বে অবসর নিয়ে আরও বেশি করে এ সমস্ত কাজে ও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। অবশ্য এ সবই 'সিন্ধুতে বিন্দু মাত্র' তবে বিন্দুর সমষ্টিতেই তো সিন্ধু!

পৃথিবীতে বহুজীব আছে, আমরাও জীব, কিন্তু আমরাই শুধু মনুষ্যজীব। কেন? না, আমাদের rationality আছে, আছে চিন্তা শক্তি। আর এই চিন্তা শক্তির জোরেই, এই চিন্তা শক্তির অনুশীলনে আর মানবিক উন্নতির প্রচেষ্টায় আমরা পঞ্চাশ হাজার ব'ছর পূর্বে, হাতদুটো পায়ের মতো ব্যবহার করে, চারপায়ে বা পিঠকুজো করে হাঁটা থেকে বর্তমান উন্নত পর্যায়ে উঠে এসেছি। পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে এখনো আছে অনেক অন্যায়, অনেক বিরোধ, আছে অনেক বর্বরতা, আবার এসব অন্যায়, অবিচার, বর্বরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টাও চলছে অনবরত।

পৃথিবীও থেমে নেই, মানুষেও থেমে নেই। যে সুন্দর ও নির্মল মনুষ্য সমাজের কল্পনা আমরা করি, তা আসতে এখনও হয়তো সুদীর্ঘ কাল বাকী, তবু প্রচেষ্টা তো চলছে, মানুষই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, চালাবে, চালিয়ে যেতেই হবে, হাত পা গুটিয়ে থাকলে তো ওটা আর আকাশ থেকে পড়বে না!

মানুষ ভিন্ন অন্য জীব যখন জন্মায়, তখন শিশু জীবদের মা তাদের লালন পালন করে। তারপর শিশুরা নিজে নিজে চলার শক্তি আহরণ করলে, মা তাদের ছেড়ে দেয়; তারা চরে খায়, বাচ্চার জন্ম দেয়, তারপর একদিন মরে যায়। বাচ্চারা আবার একই পথ অনুসরণ করে। তাইতো পঞ্চাশ হাজার ব'ছর পূর্বে এই সব জীব যা ছিল, এখনও কম বেশি তাই আছে। কিন্তু মানুষ? মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর সভ্যতায় বিকশিত হবার অনুশীলনে এগিয়েই চলছে, চলবেও। কোথাও বা কোন কোনও দেশে উল্টো দিকে চাকা ঘোরাতে চেষ্টা করা হচ্ছে বটে কিন্তু পেরে উঠছে না, পারবে না! কিন্তু, তার জন্য মানুকে তো হাত পা গুটিয়ে থাকলে চলবে না, উপরিউক্ত অন্য জীবদের মতো শুধু নিজেরটা দেখলেই চলবে না, শুধু নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে না। প্রত্যেকটি মানুষকে মনুষ্য সমাজের জন্য কিছু না কিছু করতে হবে, সামান্য কিছু হলেও করতে হবে, এক বিন্দু হলেও কিছু করতে হবে, নইলে তো সে মনুষ্য নামের উপযুক্তই হতে পারে না, তার স্থান হওয়া উচিৎ অন্য জীবদের সঙ্গে, বিশেষ করে যে মানুষ লেখাপড়া শিখেছে বলে দাবী করে, শিক্ষিত লোক বলে পরিচয় দয়। আমরা বাল্যে পড়েছি, 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবনি পরে/সকলের তরে সকলে আমরা,/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' শুধু পড়ি-ই নি, এটা আমাদের বাল্য মনে একরকম গেঁথে গিয়েছিল। বাল্য জীবনে আরও এই রকমের অনেক কিছুর সঙ্গে এটাও ছিল একটা দিকদর্শন। যতদূর মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দের কোন বই-এ যেন পড়েছিলাম, মানুষ হয়ে যখন জন্মগ্রহণ করেছ, তখন মানুষের জন্য, সমাজ-শিক্ষার জন্য তোমাকে তো কিছু করতেই হবে। কিন্তু মনে হয়, বর্তমানে কখনো-সখনো যখন শিশুদের পড়া কানে আসে, তখন উক্ত কবিতাটা বা এইরূপ আরও বহু নীতিশিক্ষা মূলক কবিতা কিছুই আর শুনতে পাই না। মনে হয় বর্তমান পাঠ্য পুস্তকে এগুলো আর নেই। মনে পড়ে, আমাদের বাল্যে স্কুলের কোনও একটা পিরিয়ডের পড়া, সময়ের পূর্বেই শেষ হয়ে গেলে, বাকি সময়টুকু মাষ্টার মশাইরা কত রকমের হিতোপদেশ বা নীতিশিক্ষার এমন সব

গল্প বলতেন যে সেগুলো আমাদের বাল্য জীবনের বনেদে গেঁথে যেত। মনে হয় যা শুনেও থাকি যে বর্তমান মাষ্টার-মশাইরা এসবের ধারে কাছেও যান না।

১৯৫৮ সাল থেকে এখন অবদি মোটামুটি কলকাতায়ই আছি।

১৯৭৫ সালে, এখানে টি. ভি. চালু হলে, আমি সঙ্গে সঙ্গে তা ঘরে আনিনি। আমার বৃদ্ধা মাতা তখন অসুস্থ্য, ঘরের মধ্যে শুধু চলাফেরা করতে পারেন। উনি একদিন আবদার করে বললেন, "তোরা তো 'হলে' যেয়ে সিনেমা/নাটক দেখতে পারিস, আমিতো পারিনে। বই পড়ে পড়ে আর কত সময় কাটানো যায়? আমাকে একটা টি. ভি. কিনে দে।" মার এই আবদার আমার মনে এতো কঠিন দাগ কেটেছিল যে সেদিনই যেয়ে একটা ভাল টি. ভি. সেট কিনে এনে একেবারে চালু করে দিলাম। তখন পাড়ার অন্য আর একটা বাড়িতেই মাত্র টি. ভি. সেট্ ছিল। সুতরাং টি. ভি. চলাকালীন বাড়িতে খুব ভিড় হত। সন্ধ্যে থেকে টি. ভি. চলা বড় একটা বন্ধ হত না। কিছুদিন পরেই লক্ষ্য করলাম, টি. ভি. চলাকালীন বাইরের কেউ কোন কাজে আমাদের বাড়িতে এলে, সকলেই যেন একটু বিরক্তি বোধ করত। ভাবলুম এবং বাড়িতে আলোচনাও করলুম যে টি. ভি. তো আমাদের কিছুটা অসামাজিক করে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে পাড়ায় টি. ভি.-র সংখ্যা বাড়তে লাগলো আর ঐ অসামাজিকতাও বাড়তে লাগলো। টি ভি. চলাকালীন, প্রয়োজনেও কেউ কারুর বাড়ি যেতে দ্বিধা বোধ করতো। বিনা প্রয়োজনে সন্ধ্যের পর শুধু দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ আলোচনার জন্য কেউ কারুর বাড়িতে আর প্রায় যায়-ই না। একটা বহু পুরানো প্রথা, মানে সন্ধ্যের পর সামাজিক দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা, ভাব-ভালবাসার আদান প্রদান সমাজ থেকে প্রায় মুছে গেল। যারা কাজের লোক বা চাকুরিজীবি, সপ্তাহে ছয় দিন তাদের সন্ধ্যের পরই একটু দেখা-সাক্ষাতের অবসর, কিন্তু ঐ দেখা-সাক্ষাতের রেওয়াজ প্রায় উঠে গেল, যাদের ঐ সময়ে একটু পড়াশুনোর অভ্যেস আছে, টি ভি-র আকর্ষণেই হোক আর আওয়াজেই হোক, এই পড়াশুনোও দেখলাম প্রায়-উঠে যাবার পথে। এই হলো টি. ভি কালচার।

টি. ভি. কালচারের পেছন পেছন এলো ভি. সি. পি/ভি. সি. আর। এবার আর টি. ভি স্টেশনের সময়ের উপর নির্ভরশীল থাকতে হলো না। যখন খুশি দোকান্ থেকে ক্যাসেট আনো আর চালাও। সকাল নেই, দুপুর নেই, চালালেই হলো। আমার বাড়ি ছাড়া অন্ততঃ আর দুটো বাড়ি পাড়ায় আছে জানি, সেখানে যখনই যাই তখন প্রায়ই দেখি টি. ভি.তে ক্যাসেট চলছে। অন্য সব বাড়ির সঠিক খবর অবশ্য জানিনা।

অন্যদিকে, একেবারে তিন-চার বৎসর বয়সের বাচ্চা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের দেখছি বেশি বেলায় ঘুম থেকে উঠে, পড়ছে নয়তো স্কুলে যাচ্ছে। যারা দুপুরে স্কুলে যাচ্ছে তারা সন্ধ্যায় ফিরে এসে হয় বাড়িতে নয় কোচিং ক্লাসে আবার পড়তে যাচ্ছে। আর যারা সকালে স্কুলে যাচ্ছে, তারা দুপুরে ফিরে এসে হয় পড়ছে বা মার সঙ্গে ক্যাসেট দেখছে, নয়তো কোচিং ক্লাসে যাচ্ছে। ওদের জীবনে স্কুল, পড়া, কোচিং-ক্লাস, টি. ভি. ক্যাসেট, খাওয়া-দাওয়া, বেশি রাতে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু নেই, নেই স্কুলে কোন খেলাধুলো বা স্পোর্টসের কোন আমোদ-প্রমোদ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নেই স্কুল থেকে ফিরে এসে পাড়ার পার্কে বা কোন ফাঁকা মাঠে খেলাধুলো, সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা, আলোচনা, ভাব-ভালবাসা বিনিময়ের কোন সুযোগ। এরা শুনি পড়ার চাপে নুয়ে পড়ছে, আর লেখাপড়া শেখা মেসিন হচ্ছে, কিন্তু মানুষ তো হচ্ছে না, মানুষ হতে হলে লেখাপড়ার সঙ্গে আর যা যা করতে হবে, শিখতে হবে, যে পরিবেশে থাকতে হবে, তার সুযোগ কই ?

আর এই বাচ্চাদের বা স্কুলের ছেলে মেয়েদের পিতা-মাতারা কি করছেন ? মা যদি গৃহস্থালি করেন তবে অনেকেই সময়ের সুযোগ পেলে ক্যাসেট দেখেন। আর মা যদি চাকুরে হন, তবে আপিস থেকে ফিরে এসে রাতের খাওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে স্বামী-স্ত্রী মিলে ক্যাসেট নিয়ে বসে পড়েন। আর শরীর আর চোখের উপর অত্যাচার করে রাত্রি বারটা, একটা বা দুটো পর্যন্ত ক্যাসেট দেখেন। খবরের কাগজ, বা ভাল বইটই পড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। শুনতে পাই, সারাদিন খাটা-খাটুনির পর ক্যাসেটের হালকা আমোদ-প্রমোদই নাকি ভাল লাগে। বই-এর গভীরতায় বা খবরের কাগজের (খুন-খারাপি, রেল-বাস এক্সিডেন্ট, খেলাধুলো, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদির বাইরে), কোন গভীর বিষয়ে নাকি মনসংযোগ আসে না। ক্যাসেটে এঁরা কি দেখছেন ? শতকরা ৯৯টি-ই অপসংস্কৃতিতে ভরা আর মার-দাঙ্গার হিন্দী বা ইংরেজী ঘটনা। ব'ছর দুতিনেক পূর্বেও আমাদের অঞ্চলের কোন সিনেমা হলে খুব আপত্তিকর কোন অপসংস্কৃতির ছবি দেখালে, আমরা আন্দোলন করে সেই ছবি দেখানো বন্ধ করে দিয়েছি। আর এখন ? এখন তো টি. ভি., ভি. সি. পি. আর ভি. সি. আর. সেই অপসংস্কৃতি একেবারে ঘরে ঘরে সেঁধিয়ে দিয়েছে। একে রুখবে কে, কি করে ? "চোখের উপর উক্ত টি. ভি. ও ক্যাসেট নিয়ে মশগুল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় জীবনকে ওরা কি মনে করে 'আহার-নিদ্রা-মৈথুন ?' কিন্তু এটাতো পশুর জীবন ধারা, মানুষের

জীবনধারা বা মানুষের জীবন-দর্শন তো এটা হতে পারে না! হলেতো, অদূরে ভবিষ্যতে মানুষ আর পশুতে একাকার হয়ে যাবে!"

রাজ্য কেন্দ্রকে বলে এটা দেয়নি ওটা দেয়নি, রাজ্য সরকারের বিপক্ষ দল বলে, রাজ্য সরকারের হাতে তো এটা ওটা আছে, সেগুলো ওরা কেন ঠিক মতো করেনি। আর আমি বর্তমান প্রজন্মের পিতামাতাকে বলি, আপনাদের নিজেদের হাতে যা যা আছে, সেগুলো নিজেদের জন্য ও পরের প্রজন্মের জন্য সঠিকভাবে করে যাচ্ছেন না কেন? কি উদাহরণ রাখছেন নিজের সন্তানদের কাছে? এই জীবনধারা ও পরিবেশ থেকে কি একটাও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল, সুভাষচন্দ্র বা সুকান্ত বেরুবে? একটাও না! খুব জোর দুএকটা প্রয়াত জগদীশ বসু, সত্যেন বসু বা মেঘনাথ সাহার প্রেতাত্মা বার হলেও হতে পারে। বাংলা মায় ভারতের সব কিছুতেই এই উচ্চ-নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজই নেতা ও পথপ্রদর্শকের জন্ম দিয়ে এসেছে, আর আজ এই টি. ভি., ভি. সি আর. কালচারই বোধহয় সেই সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির শবের কফিনে শেষ পেরেক বসিয়ে দিচ্ছে!

শোবার ঘর, গ্যারেজ, ম্যাজানাইন ফ্লোর, লবি ইত্যাদি ছয়-সাতখানা ছোট বড় ঘর নিয়ে আমার বাড়ির একতলা। ১৯৩৩ সালে, কাজের লোকজন সহ পরিবারের মোট বার জন এই বাড়িতে এসে উঠি। তার উপর বিবাহিতা বোনেরা বৃদ্ধ পিতা-মাতার টানে একজন না একজন তাদের ছেলেমেয়ে সহ প্রায়ই থাকত। ধীরে ধীরে বাবা পরলোকে চলে গেলেন। ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেল। ছোট ভাই গড়িয়া নিজের বাড়ি করে তার পরিবার নিয়ে চলে গেল। বিবাহিত বড় ছেলেকে নকসাল আমলে পুলিস কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় তাদের আর বাড়ি এসে থাকার উপদেশ দিতে পারলাম না। ছোট ছেলে বিয়ে করল, কিন্তু সেও নতুন চাকুরি পেয়ে বম্বে চলে গেল। রইলাম মা, আমি, বাণী ও কাজের লোক। মা মাঝে মাঝে তাঁর অন্য সন্তানদের বাড়ি বেড়াতে গেলে, বাড়িতে থাকতাম শুধু আমি আর বাণী। ১৯৩৪-তে ছোট ছেলে কলকাতায় বদলি নিয়ে, পরিবারসহ আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এলো। আমার একতলার উপরে সে দোতলা করে উপরে উঠে গেল। ১৯৩৬ সালে মা আমাদের সকলের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। একতলায় রয়ে গেলাম আবার সেই আমি আর বাণী। মাঝে মাঝে দুজনে বসে ১৯৩৩ সালের সেই বারজন বাসিন্দার ভরাট বাড়ির সঙ্গে বর্তমানের একতলায় আমাদের 'রাণী

আর টুনীর' বাসের তুলনা করে প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম আর বলতাম, যেদিন-গুলো চলে যায় তাই বুঝি ভাল! পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বয়েস বৃদ্ধির ঝামেলায় আর বাবা ও মার অনুপস্থিতিতে বোনদের যাতায়াতও খুবই কমে যায়। বাড়িতে সকলের উপস্থিতির সেই উৎসব-মেলা আর প্রায় ঘটে উঠত না। এমন কি বাবা ও মার যে বাৎসরিক মৃত্যুদিনে, সকলে মিলে স্মরণ সভা করতাম, তাতেও উপস্থিতির সংখ্যা ধীরে ধীরে একেবারেই কমে গেল।

তারপর নেমে এল ১৯৯১-র সেই অভিশপ্ত ৩রা ফেব্রুয়ারি। বহুদিনের দুঃখ-কষ্ট-লড়াই-এর সঙ্গিনী আমায় একেবারে একাকীত্বের গভীর অন্ধকারে ফেলে চলে গেল। দোতলা-একতালা করে রান্নার অসুবিধের জন্য ছোট বৌমার খুব কষ্ট হয় জেনে রান্নাটা দোতলায় নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে দিলাম। জল খাবারটা নিচে বসে খেলেও দুপুর ও রাতে উপরে যেয়ে খেয়ে আসি। ছোট ছেলে, বৌমা, নাতনীরা কখনো সখনো নিচে আসে, দুএকটা কথাবার্তা হয়, সকলেই তো ব্যস্ত, বাচ্চা নাতনী দুটো পড়া, টিউটার বা কোচিং ক্লাসে প্রায় নুব্জ। বাণীর জীবদ্দশায় তার মহিলা বান্ধবী যাঁরা খুব আসতেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়েই গল্প-গুজব করতেন, তাঁরাও একে একে আসা বন্ধ করলেন, আমাদের সামাজিক চোখ ঠারাঠারির ভয়ে। প্রতিবেশীরা কেউ কখনো আসেন, কিন্তু তাঁরাও বলেন, বৌদিও নেই, আপনার বাড়ির সেই আদর-যত্নের প্রাণখোলা পরিবেশও আর নেই, কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগে, ভাল লাগে না। ভোর পাঁচ-ছটা থেকে রাত দশ-এগারটা পর্যন্ত আমি মোটামুটি একা। খবরের কাগজ, মাসিক পত্র-পত্রিকা, কোন ভাল বই পেলে পড়ি আর এই বইটা লিখি। বাণীর ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে অতীত আর বর্তমানের কথা ভাবি আর চোখের জল ফেলি। পুরানো ফাইল বার করে বাণীর সেই একেবারে কাঁচা বয়েসের কাঁচা হাতের অগোছালো ভাষায় লেখা চিঠি থেকে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত পরিণত বয়সের লেখা যে চিঠিগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি, সেগুলো পড়তে পড়তে আত্মমগ্ন হয়ে একেক সময় কিশোরগঞ্জের সেই সুখ-দুঃখের সোনায় মোড়া দিন-গুলোতে চলে যাই বর্তমানকে সম্পূর্ণ ভুলে। তখন মনে যেন আর কোন দুঃখ-বেদনাই থাকে না। কিন্তু আবার যখন বর্তমানে ফিরে আসি, তখন আর ঘরে টিকতে পারি না, দম বন্ধ হয়ে আসে, ঘরের বাইরে যেয়ে মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে, মনকে অন্যমনস্ক করে যেন একটু স্বস্তি পাই।

মাঝে মাঝে, কৈশোর থেকে এই সত্তর ব'ছর বয়েস পর্যন্ত নিজের জীবনটা

যখন পর্যালোচনা করি, যার এক চতুর্থাংশও এখানে লিখেছি কিনা সন্দেহ, তখন মনে হয় খেলাধুলো, গান-বাজনা ছাড়াও আমার এই কর্মবহুল জীবনের বর্তমান পরিণতি কেন এমন হলো ? আমি তো সারাজীবন পরোপকারই করে এসেছি, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি, সবল-দুর্বলের বিবাদে দুর্বলকে সাহায্য করেছি, জলে ডোবা, সাপে কামড়ানো, রাজনৈতিক দাঙ্গায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজের জীবন বিপন্ন করে, বিশেষ করে নকসাল আমলে, আমি, বাণী ও বড়ছেলে মিলে, এ পর্যন্ত মোট পনের ষোল জনের প্রাণ রক্ষা করেছি, সদাই উদার নীতি অনুসরণ করেছি, আক্রান্ত না হলে কাউকে আক্রমণ করিনি, কোন মাস্তান বা রুস্তমের হুমকিতে মাথা নত করিনি, তার পুরস্কার কি জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে, একাকীত্বের অন্ধকারে 'নিজভূমে পরবাসী' হয়ে থাকা !

Imphal

My dear dada Barin,

Thank you very much for your kind information about the book you have published[১] in memory of my beloved sister-in-law. I am sure that my sister[২] is really happy to have it. If you can spare one for me, of course, I shall be glad to have it too. Dear dada, I and my husband give a serious thought about you. and my husband really feels for you. So he has asked me to invite you to come and stay with us—as long as you like. Our home, we feel, is your own home. When we think about your staying alone, all alone in your residence, we are really sorry I am even wondering what has happened to my two dear nephews and their wives and how can they leave you alone like that As for me and my husband, we are never enjoying a luxurious life We live in a very simple way and that made me, in

(১) Under Publication-কে সোয়ামী ভুল বুঝে এইরকম লিখেছে। তার দিদিকে বই পাঠাব লিখেছিলাম, পাঠিয়েছি লিখিনি।

(২) Mrs Rosiama (সোয়ামীর দিদি)

fact, hasitate to ask you to come, because you have to adjust yourself with our simple life. From our side we really welcome you to come and stay with us. I am happy that you valued the Bible which we have sent. Had my father been still alive, he would have been so happy about it.…My daughter Sylvia also passed her M. D. exam. from the All India Institute of Medical Science, and will take sometime more to come back home.…I am really happy that my sister and you have a link in letter again.…Please do not worry too much about yourself alone, for we are all together as one family.

Your loving sister,
Sawmi

স্থানের অভাবে প্রো চিঠিটা ছাপান সম্ভব হল না। লেখিকার সামান্য উল্লেখ ও পরিচয় সাতান্ন, আটান্ন, সাতষট্টি ও আটষট্টি পৃষ্ঠায় আছে। শিলচর লক্ষ্মীপুরের প্রয়াত রেভারেণ্ড থিয়াঙ্গার বাংলোতে যে দু-আড়াই বছর আমার যাতায়াত ছিল, তখন লেখিকার বয়স মাত্র সাত-আট বছর। লুসাই ছাড়া অন্য ভাষাতে তার দখল ছিল না। সুতরাং দেখা হলে একটু আদুরে মিষ্টি হাসির বিনিময় ছাড়া, মেলামেশার ছিল না কোন সুযোগ। লেখিকা এখন পোঢ়া ভদ্রমহিলা। সিনিয়র আই. এ. এস স্বামী উচ্চবর্ণের নাগা জাতির মানুষ। বর্তমান মণিপুর সরকারের একজন সেক্রেটারি।

আমার যে অসহায় অবস্থার কথা জেনে তিনি এই চিঠি লিখেছেন, সেই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব-ভারত ও তার বাইরেও আমার প্রায় সব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরাই মোটামুটি জানেন। কিন্তু আমাকে আশ্রয় দেবার আহ্বান এলো সুদূর ইম্ফলের বোন সোয়ামী ও আগরতলার গরীব প্রিয় খুড়তুত ভাই পথিকের নিকট থেকে। পথিক ও আমি একবাড়ির ছেলে, সমবয়েসী ভাই আর বন্ধুও বটে। বাণীর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বেও আমার এখানে থেকে, হাসপাতালে বাণীকে দেখে গেছে। কিন্তু সোয়ামী? তার আহ্বান শুধু মহা আনন্দেরই নয়, অতি বিস্ময়করও বটে। পূর্বে লেখা 'হানসার' কাহিনীর উপসংহারে বলেছিলাম যে রক্তের সম্পর্কই যে আত্মীয়তার একমাত্র মাপকাঠি নয়, হানসার মৃত্যু চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেল। সোয়ামীর চিঠি তার দ্বিতীয় উদাহরণ।

গাছ-গাছালি

এ ব্যাতিক পেয়েছিলাম মার নিকট থেকে। শহরের বাসা-বাড়িতে কম বেশি যতটুকু ফাঁকা জমি পেয়েছি, সেখানেই মার উৎসাহে ফুল ও ফল গাছ লাগিয়ে ভরে ফেলেছি। ফুল গাছের কেতাবী নাম আমার ভাল জানা নেই। কিশোরগঞ্জের বাসায়ও নানারকম ফল ফুলের গাছ লাগিয়েছি। ভৈরববাজার-আশুগঞ্জ থেকে তিন প্রকারের ফুল গাছ এনেও ঐ বাসায় ফুল ফুটিয়েছিলাম। একটার নাম স্পাইডার লিথিলি (লিলি), অন্যটা বন ফুল কি ঘাস ফুল, আর একটা বেলুনের মতো গোল লাল রঙের 'বল-লিলি'।

১৯৫০ সালে, বাবা ও মা কিশোরগঞ্জ ছেড়ে আমার শ্রীরামপুরের আপিস-বাড়িতে চলে আসার সময় শুধু স্পাইডার লিথিলির কয়েকটা মূল নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। দোতলার খোলা বারন্দায়, দেড় ফুট উঁচু করে মাটি ফেলে সেখানেই ঐ ফুল ফুটিয়েছিলাম। কিন্তু, ঘাস ফুল আর বল-লিলি কোথাও আর খুঁজে না পেয়ে সে আপশোষ আমার রয়েই গেল। আর বদলির চাকুরিতে ঐ স্পাইডার-লিথিলি, আমার সঙ্গে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, কোচবিহার, বেহালা, চণ্ডীতলা (টালিগঞ্জ) ঘুরে-বেড়িয়ে এসে আমার বর্তমান বাড়িতে থিতু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে।

অন্যদিকে, বহু খোঁজাখুঁজির পর ১৯৫২ সালে, আমার আপিস ইউনিটের একজন অফিসার শ্রীমজুমদার তাদের শেওড়াফুলির বাড়ি থেকে বল-লিলি আর ঘাস ফুলের গাছ এনে নিজের হাতে আমাদের বাগানে পুঁতে দিয়ে যায়। বহুদিন পর, হারানো জিনিস প্রাপ্তির আনন্দে আমরা খুব উৎফুল্ল হই।

বাড়িতে বেশ অনেকটা ফাঁকা জমি থাকার সুযোগে, মা, আমি, বাণী ও ফল্গু আম, কাঠাল, নারকেল, লেবু, কাকরোল, বকফুল, কুল, সজিনা, মানকচু ইত্যাদি আর অন্যদিকে কত রকমারি ফুল গাছ লাগিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। প্রচুর নারকেল, লেবু ইত্যাদি প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের খাইয়ে আমরা খুব আনন্দ পাই।

স্পাইডার-লিথিলি গাছগুলো নজরে পড়লেই এখন মনে মনে বলি, 'সেই সুদূর বাংলাদেশের ভৈরববাজার থেকে তুলে এনে প্রথমে কিশোরগঞ্জ, তারপর আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও বাস্তুহারা করে পশ্চিমবঙ্গের কত জায়গায় ঘুরিয়ে

এনে এই টালিগঞ্জে তোমাদের রেখে গেলাম। এবার তো আমারও বিদায়ের সময় হয়ে এলো, বিদায় দাও ভাই।" আমাদের পরের প্রজন্মের শুধুমাত্র বড় ছেলেই গাছ-গাছালির বাতিক পেয়েছে। আর কেউ বড় একটা ওদিকে ফিরেও তাকায় না। মনে হয় আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বা এই গাছগুলো একেবারে অনাথ হয়ে পড়বে!

তিন প্রজন্মের মধ্যেই কি নিদারুণ পরিবর্তন! গাছ-গাছালির বাতিক ছাড়াও আমার জেঠামশাই ও বাবারা চার ভাই-ই ছিলেন গান-বাজনায় একেকজন একেক দিকে স্থানীয় দিকপাল। পরের প্রজন্মে, আমি খেলাধুলোর দিকে যাওয়ায়, গান-বাজনায় খুব একটা অগ্রসর না হতে পারলেও, আমারই প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রচেষ্টায় ছোট বোন হেনা গানে প্রভূত উন্নতি করেছিল। কলকাতায় নিয়ে এসে একটু তালিম দিলেই বিখ্যাতও হতে পারত! কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। আর তৃতীয় প্রজন্মে? বড় ছেলে গাছ-গাছালির বাতিক (?) বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু আর কেউ, বৌমা, নাতি-নাতনীরা পর্যন্ত গান-বাজনা ভালবাসলেও, নিজেরা কিছু করার ধারে কাছেও গেল না!

যা হোক, মার নিজের হাতে লাগানো একটা 'কাঞ্চন' ফুল গাছ খুব যত্নে মার স্মৃতি-করে বাঁচিয়ে রেখেছি। ওতে প্রচুর ফুল ফোটে। কাছে দাঁড়ালেই মার সেই স্নেহময়ী মুখখানা মনে পড়ে। বাণী মাঝে মাঝেই বাজারে গেলে যে কত রকমের বাহারি পাতা আর ফুল গাছের টব রিকশা করে নিয়ে এসেই আমায় বলতো, "আমার তো আর লাগাবার ক্ষমতা নেই। তুমি জায়গা পছন্দ করে লাগিয়ে দাও।" তার মৃত্যুর চার-পাঁচ মাস পূর্বেও একদিন মেরুন ও সাদা রং-এর দুটো মুশুন্ডো ফুল গাছ ও একটা 'রাধা চূড়া' গাছ এনে আমাকে দিয়ে লাগিয়েছিল। তার মৃত্যুর পরে 'মুশুন্ডা' গাছ দুটো ফুলে ফুলে একেবারে নুয়ে পড়ে যেন আমায় বলতো, "তোমার জীবনের লড়াকু সাথী তোমায় ছেড়ে চলে গেলেও দেখো, সে আমাদের মধ্যেই ফুটে আছে। বহুদিন ঐ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে অঝোরে কেঁদেছি আর মনে হয়েছে কেন বেঁচে আছি!

বাড়ির দক্ষিণ সীমানায় পাশাপাশি দুটো পাতা-বাহার গাছ বড় ও খুব ঝাঁকড়া-মাকড়া হয়ে আছে। বেশ কয়েক বছর হলো, প্রতি মে-জুন মাসে, দুজোড়া 'বুলবুল' পাখি এসে ঐ গাছে বাসা বেঁধে, ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফুটোয়। বাচ্চা হলে ওদের আঁধার খাওয়ায় আর কাকের উপদ্রব থেকে বাঁচায়। আমি ও বাণী খাটে বসে ঐ 'বুলবুলদের' কাজের ধারা লক্ষ্য করে খুব আনন্দ পেতাম।

কাকের উপদ্রব থেকে বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে বুলবুল জোড়া দুটোকে আমরাও নানাভাবে সাহায্য করতাম। কাক তাড়িয়ে দিলে, পাখিগুলো তাকিয়ে আমাদের দেখতো। কি ভাবতো জানিনা। এবারও সেই দুজোড়া বুলবুল এসেছে, হয়তো বাসাও বেঁধেছে। মাঝে মাঝে আমার নজরে পড়ে, কিন্তু পূর্বের মতো দেখার সেই মন তো আর নেই। যার সঙ্গে খাটে বসে এইসব দেখতে দেখতে আলাপ-আলোচনা করতাম, আনন্দ করতাম, যার চিৎকারে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, একটা লম্বা বাঁশের টুকরো নিয়ে কাকে তাড়াতে বাগানে ছুটে যেতাম, তিনি তো আমার পাশে আর নেই, কোনদিন আর আসবেও না এই বুল-বুলদের সংসার দেখতে!

চল্লিশ বছর পরে আবার কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে।

মানুষ ভাবে এক হয়-আর। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সালে চাকুরি থেকে অবসর নেয়া অবধি সময়ের মধ্যে, তিন তিনবার পাশপোর্টের দরখাস্ত করার বিভাগীয় অনুমতি চেয়ে পাইনি। অবসর নেবার পরে, একবার বাংলাদেশে যেয়ে প্রিয় জন্মভূমির মাটিকে শেষবারের মতো প্রণাম করে আসার প্রকট বাসনা থাকলেও, মার ও বাণীর অসুস্থতা ইত্যাদি নানা অসুবিধের জন্য আর যাওয়া হয়ে না ওঠায়, এই ইচ্ছে একেবারেই পরিত্যাগ করেছিলাম চোখের জলে বুক ভাসিয়ে! বাণী আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল যে কারুরই জীবনের সব আশা পূর্ণ হয় না, এই ভেবে মনকে শক্ত কর। কিশোরগঞ্জে তো আমারও কত সুখ-স্মৃতি পড়ে আছে, আমার এত অসুস্থতা না থাকলে তো তোমার সঙ্গে আমিও যেতে পারতাম। আমিতো নিজের মনকে শক্ত করে রেখেছি।

কিন্তু, ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে এমন অবস্থা হল যে প্রায় প্রতি রাতেই বাংলাদেশের পরিচিত স্থান ও মানুষজনদের স্বপ্নে দেখতে পেয়ে ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠি। সারারাত আর ঘুম আসে না, বিছানায় শুয়ে ছটফট করি। আমার অবস্থা দেখে বাণী বললো, এই সত্তর ব'ছর বয়েসের অসুস্থ্য শরীরে যদি সাহস পাও তবে অল্প কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আস। আমার এত রোগ নিয়ে তোমাকে ছাড়া একা থাকতে আমি বড় একটা সাহস পাই না। নারায়ণগঞ্জের এক ভাগ্নেকে কলকাতা পেয়ে, তাকে ভরসা করে, ১৯৫০ সালের ১৯শে মার্চ মাত্র দশ দিনের জন্য পেট্রাপোল—বেনাপোল বর্ডার দিয়ে, রাস্তার সব কিছু ভাল করে

এবং শেষ বারের মতো দেখার লোভে, বেনাপোল থেকে দিনের বাসে ঢাকার পথে রওনা হলাম। আমার পরিচয় পেয়ে, দুই বর্ডারের কাস্টমস ও পুলিশ বিভাগের লোকেরা, যৎপরোনাস্তি সম্মান ও খাতির যত্ন করায় এবং বিদেশ যাত্রার কোন ফরম্যালিটিজের ঝামেলা পোহাতে না হওয়ায়, মনেই হয়নি যে আমি কোন বিদেশে প্রবেশ করছি। বেনাপোল থেকে বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করলাম। জানালার পাশে বসে ঠিক ছোট বালকের মতো এদিক সেদিক তাকিয়ে বহু পূর্বের দেখা গ্রামের দৃশ্য দেখে মন যেন আনন্দে নেচে উঠলো। বাস চলছিল যশোরের উপর দিয়ে। সেখানের বিখ্যাত ক্যানটনমেন্ট নজরে পড়ল। বাস রাস্তার বাঁদিকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রক্ষিত প্রয়াত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের' কালো রং-এর দোতলা বাড়ি দেখে সত্যি বড় আনন্দ পেলাম। কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়ে সেই বাস রাস্তারই বাঁদিকে দেখলাম 'এরো' মার্ক দিয়ে লেখা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহের রাস্তা। হিসেব করে দেখলাম, দশ দিনের ভিসায় ফেরার পথে, শিলাইদহ দেখে যাবার কোন আশাই নেই। মনটা আপশোষে ভরে গেল। শিলাইদহের অবস্থানের সঠিক ধারণা থাকলে দশদিনের এই ভ্রমণ সূচীতে এই মহান তীর্থ স্থানের হয়তো একটা জায়গা করে নিতে পারতাম। যশোরের পরে ফরিদপুরের উপর দিয়ে এসে অপরাহ্ণে সেই স্বপ্নের পদ্মা নদীর পারে বাস থামল। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ব'ছর পূর্বের পদ্মার সেই সুন্দরী ও ভয়ঙ্করী রূপ দেখার জন্য তখন আমি চারিদিকে তাকাচ্ছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। ভাগ্নে টীপুর নির্দেশ মত নদীর চর ভেঙ্গে অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসে নির্দিষ্ট মোটর লঞ্চে উঠলাম। তাড়াতাড়ি লঞ্চের আপার ডেকে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে আমার দেখা সেই পদ্মাকে খুঁজে না পেয়ে বড়ই হতাশ হলাম! ভাগ্নেকে বললাম, আমাদের সেই পদ্মা তো হারিয়ে গেছেরে টীপু। দেশ ভাগের পূর্বে, কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে, ভোর ছটায় গোয়ালনন্দে পেঁছে বিরাট স্টীমারে চেপে এই পদ্মার উপর দিয়েই তো দুপুরে নারায়ণগঞ্জে পেঁছুতাম। সে কি বিরাট বিশাল পদ্মা। কোথাও কোথাও এপার থেকে ওপার নজরে আসতো না। সাদা রং-এর পাল উঠিয়ে ছোট-বড় শত শত নৌকো স্টীমারের আশপাশ দিয়ে যাতায়াত করত। কোনও স্টীমার ঘাটে যথা রাজবাড়ি, ভাগ্যকুল, লৌহজং, তারপাশা ইত্যাদিতে যাত্রী ও মাল ওঠা—নামার জন্য স্টীমার দাঁড়ালে, ছোট ছোট কত নৌকো কত রকমারি খাবার নিয়ে যাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের আশায়

নানা রকম চীৎকার করতে করতে স্টীমার ঘিরে ফেলত। এই যাত্রা পথের সেসব হৈ চৈ, ছুটোছুটি, আনন্দ-উৎসব মনে হল সব যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। এমনি আরও কতশত স্মৃতির কথা যখন আমি একটা উদাস মনে টীপুকে বলে যাচ্ছি, তখন পেছন থেকে কে যেন কথাটা ছুড়ে দিল, "পদ্মার এই দুর্দশার জন্যে তো আপনারাই দায়ি!" সেদিকে তাকিয়ে দেখি চার-পাঁচ জন সার্ট-ট্রাউজার পরা যুবক ও এক মৌলবী সায়েব। জিজ্ঞাসা করতে একটি যুবক মৃদু হেসে আমায় জানালো কথাটা সেই বলেছে। এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলার অনুমতি চেয়ে ও পেয়ে বললাম, আমার পাশে দাঁড়ানো ভাগ্নের নিকট জেনেছি যে আপনারা প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে জানি, বহুপূর্বে গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ মুরশিদাবাদ হয়ে কলকাতা দিয়ে হুগলী নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়তো। যে পদ্মার কথা একটু পূর্বেই আলোচনা করছিলাম তখন তার সেই ভয়ঙ্করী রূপ ছিল না। বোধহয় আমাদের বাল্যে বা তারও পূর্বে ভৌগোলিক কারণে, মুরশিদাবাদের ফরাক্কার নিকটে গঙ্গার মূল প্রবাহ পদ্মার দিকে মোড় নিলে, পদ্মার বুক সেই জল স্রোত বহন করতে না পারায়, তা বহু গ্রাম শহর ও রাজ্যপাট ধ্বংস করে, পদ্মাকে ঐ ভয়ঙ্করী রূপ দেয়, আর তার নাম হয় 'কির্তী নাসা।' ফলত, হুগলী নদীর জল কমে যায় আর কলকাতা বন্দরের মৃত্যু ডঙ্কা বেঁজে ওঠে। সমস্ত পূর্ব ভারতের life blood ঐ কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতেই ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা এলো। স্বাধীন ভারত শাসনের মানদণ্ড যাদের হাতে সেই উত্তর প্রদেশ ও পাশের বিহারে ফসলী জমিও ক্ষেত-খামারে জলসেচের প্রয়োজনে গঙ্গা থেকে বড় বড় খাল কেটে, ফরাক্কার বহু পূর্বেই গঙ্গার জল টেনে নেয়া হল। সে কত হাজার কিউসেক্ জল তার সঠিক পরিমাণ এই মুহূর্তে আমার মনে না থাকলেও, সে পরিমাণ যে অনেক তা জোর দিয়েই বলতে পারি। আর ঠিক এই কারণেই সুকা মরশুমে যে সামান্য পরিমাণ জল ফরাক্কায় পেঁছোয় তা নিয়ে এখন আমরা দুই বাংলা মারামারি করছি। কিন্তু তাতে না বাঁচছে পদ্মা, না কলকাতা বন্দর, বেঁচে থাকছে শুধু দুই বাংলার তিক্ততা। ভারতীয় হিসেবে এ দায়িত্ব এড়াতে পারিনে। কিন্তু বাঙ্গালী হিসেবে এর পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অখণ্ড বাংলার এক তৃতীয়াংশ নিয়ে যে পশ্চিমবঙ্গ সেটাতো ভারতবর্ষের একটা অতি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র! বিশাল ভারতের লোকসভায় আমরা বিয়াল্লিশ জন মাত্র সভ্য পাঠাতে পারি। ভারত সরকারের পলিসি—

ম্যাটারে তাঁদের কোন ভয়েসই (Voice) নেই। এখনও ভারত সরকার চালায় হিন্দী বলয়, আমরা প্রায় দর্শক। ১৯৪৯ সালে, একটা পরিসংখ্যানে দেখেছিলাম, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা লগ্নে, সারা ভারতের মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের (Industries) পঞ্চাশ ভাগ ছিল বাংলায়, মানে মোটামুটি কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও উত্তর বাংলায়। আর আজ? সারা ভারতের শিল্পে পশ্চিমবঙ্গে স্থান, যতদূর জানি পঞ্চম। তাই বলছিলাম ভারত সরকারের পলিসি ম্যাটারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি করুণ!

আবার দেখুন, মীরাট, অযোধ্যা বা দারভাঙ্গায় যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়; তাতে আমাদের না আছে স্বার্থ, না আছে সমর্থন। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দাঙ্গা করিনা বা হতে দিই না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ঐ সব দাঙ্গা বন্ধ করার না আছে আমাদের সুযোগ, না আছে ক্ষমতা। কিন্তু ঐ সব দাঙ্গার খবরে এই বাংলাদেশে আমাদের কিছু মুসলমান ভাইয়েরা যখন এখানের হিন্দু ভাইয়েদের উপর প্রতিশোধ নেয়, তখন আমরা খুব বেদনা বোধ করি। উপস্থিত মুসলমান ভাইয়েরা ও মৌলবী সায়েব মন দিয়েই আমার কথাগুলো শুনছিলেন কিন্তু কোন জবাব দেননি। লঞ্চ তখন প্রায় ওপারে মানিকগঞ্জের ঘাটে এসে গেছে। আমার মন ফেলে যাওয়া প্রিয় দেশের স্পর্শের আনন্দে টগবগ করছে। তাই বোধহয় প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই আরও কিছু কথা আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল। মুসলমান ভাইদের বললাম, আমি ভাল হিন্দী বলতে পারি না, ভাল বুঝিও না। হিন্দী ভাষী ভাইদের সঙ্গে কথা বলে ভারতের নাগরিক হিসেবে নিশ্চয়ই আনন্দ পাই। কিন্তু আজ আপনাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে, আমরা ভিন্নধর্মী হয়েও যে আনন্দ পেলাম তার তুলনা নেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চুয়াল্লিশ ব'ছর বাস করে এবং বাড়িঘর করেও কিন্তু মনে হয়, এই বাংলা দেশটাই তো আমার দেশ। আপনারা বাংলা ভাষার জন্য, বাংলা দেশের স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করেছেন, বাংলাভাষাকে যে আপনাদের রাষ্ট্রভাষা করেছেন তাতে আমরা গর্বিত! দেখলাম উপস্থিত মুসলমান ভাই ও মৌলবী সায়েবের মুখেও আনন্দের হাসি। একটি ছাত্র দু হাত দিয়ে আমার ডান হাত চেপে ধরে বলল, দেশের প্রতি আপনার ভালবাসা সত্যি অসীম, এমন বড় একটা দেখি না। বহুদিন আপনার কথা মনে থাকবে! লঞ্চ তখন ঘাটে দাঁড়িয়ে গেছে।

এপারে এসে আমাদের নির্দিষ্ট বাসে বসলে, বাস ঢাকার পথে ছেড়ে দিল। দুদিকে তাকিয়ে আপন দেশের পুরানো ছবি দেখছি। কি যে ভাল লাগছে!

আবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ বারের মত দেখার বেদনা বোধও করছি। বারবারই মনে হচ্ছিল, যে মাটিতে জন্ম নিয়েছিলাম, যে মাটি, হাওয়া ও পরিবেশে জীবনের প্রথম ছাব্বিশটা ব'ছর কাটিয়েছিলাম, যা আবার ফেলে যেয়ে বহু ব'ছর একটা হা-হুতাশের মধ্যে কাটাচ্ছি, পুনরায় আজ আবার সেই মাটি, হাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে ফিরে এসে যে আনন্দের শিহরণ অনুভব করছি তাতো এ জীবনে আর কোনদিন পাবোনা! কদিন পরেই সেই হা-হুতাশের মধ্যে ফিরে যেয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব, আর মনের আয়নায় ছবি হয়ে থাকবে এই প্রিয় জন্মভূমি! বাস চলছে। ডানদিকে ওদের নতুন গড়া ও সুন্দর আলোকিত স্বাধীনতার স্মৃতি শৌধ দেখলাম। আর বাঁপাশে নতুন গড়া সুন্দর বিমান বন্দর। তারপর ধানমণ্ডী পার হয়ে ঢাকার বর্তমান 'গুলিস্তানে' পেঁছে বাস বদল করে রাত সাড়ে নটায় নারায়ণগঞ্জে জেঠতুত বোন রাণীর বাড়িতে পেঁছুলাম। এতো আলোর ঝলমল রাতেও আমার দেখা ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জ কিন্তু খুঁজে পেলাম না, পেলাম না অতিপরিচিত 'দোলাইগঞ্জ, ফতুল্লা ও চাষারা।' মনে হলো, ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বুঝি একটা নতুন সহরের পত্তন হয়েছে। এরপর একদিন দিনের বেলায়ও টীপু আমাকে ঢাকা শহরে এনে অতি পরিচিত উয়ারী, টিকাটুলি, নবাবপুর ইত্যাদি স্থান দেখালেও আমি কিছুই চিনতে পারিনি। ঢাকার সেই খোলামেলা 'রমনাও' যেন বহু অট্টালিকার ভিড়ের চাপে হারিয়ে গেছে। শেষে অনেক খুঁজে পেতে, ঢাকার বিখ্যাত ছাত্রাবাস মুসলিম হল, আমার বাস করা আসানুল্লা মেন হোস্টেল আর মাঝে মাঝে এসে যে ক্লাবে খেলতাম সেই ভিকটোরিয়া ক্লাব দেখেই মনকে সান্ত্বনা দিলাম। তারপর গেলাম মিড্‌ফোর্ড হাসপাতালে। এই হাসপাতালেই আমি যে অসুস্থ হয়ে সাত-আটদিন ছিলাম সে তো পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেই সুন্দর স্নেহময়ী নার্স সুশান ডিয়াজ, প্রিয় রায়, বাঘা আই. সি. এস. শ্রীরঞ্জিত রায়ের কথাও মনে পড়ল। কিন্তু এখানেও পূর্ব পরিবেশের কিছুই চোখে পড়ল না। জানতাম, সে সময়ে ঐ হাসপাতালে সুসঙ্গ—দুর্গাপুরের জাঁদরেল ও হাজং বিদ্রোহ খ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনিসিং মৃত্যু শয্যায় শায়িত। হাসপাতালের আপিসে দেখা করে সেই লড়াকু শ্রদ্ধেয় নেতাকে শুধু একটু চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাসপাতাল সুপারের অনুমতি ছাড়া সেটা সম্ভব নয় বলে জানলাম, অথচ সুপারকে কখন পাওয়া যাবে, সেটাও সঠিক করে কেউ বলতে পারল না। আপিসের লোকেরা অবশ্য ভালভাবেই বললেন, উনি

'কোমা' স্টেজে আছেন, দেখলেও চিনতে পারবেন না ইত্যাদি। আমি যে কেন ওঁকে শুধু চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিলাম, তারা মনে হয় সেটা বুঝলই না। কলকাতা ফিরে এসে কিছুদিন পরেই খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পড়লাম। যাহোক, হাসপাতাল থেকে হতাশ মনে সাভারে যেয়ে দিনের বেলায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার স্মৃতি শৌধ ঘুরে ফিরে দেখে এলাম। বড় সুন্দর এই স্মৃতি শৌধ। মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। ঢাকার টি ভি. সেণ্টার থেকে মাঝে মাঝেই এই শৌধ দেখানো হয়।

কিন্তু আমার দেখা ঢাকা সত্যি খুঁজে পেলাম না। পেলাম না সেই ঢাকাই কুট্টি-সম্প্রদায়কে। যাদের প্রতি আসানুল্লার মেন হোস্টেলে একদিন রমনীদা ও সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণকারী রামনাথ বিশ্বাস আমাদের মনে স্নেহ-ভালবাসার উদ্রেক করেছিলেন। শুনলাম, তারা এখন ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে রিক্শা চালায়। আমাকে অনেকবার রিকশাও চাপতে হয়েছে। কিন্তু কারুর মুখেতো ওদের ডজন ডজন 'বুলির' একটাও কানে এলো না।

"আহেন মহারাজ পাঙ্খীরাজ ঘোড়া লাগাইছি, এক্কেবারে উড়াইয়া লইয়া যাইব।" "তোমার ঘোড়ার পিঠে কিসের ঘা?" "কইয়েনা না মহারাজ! রাস্তা দিয়াই খালি খালি যাওন লাগে দেইখ্যা পাঙ্খাঁ দুইটা কাইট্টা দিছি, ঘাও এহোনো হুকায় নাই, মলম লাগাইতাছি।"

"আরে, আরমানী টোলা' যেতে এক টাকা চাইছো কেন। আমরা তো চার আনায়ই যাই।" "আস্তে কন্ মহারাজ, গোড়ায় হাস্‌ব!"

"আরে মিঞা সায়েব, আউজগা জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ব না? আইজ যে ইন্দুগো 'হাক্রাইন্ত' (সংক্রান্তি)। "হাক্রাইন্ত-ডা আবার কি?" "হালায় এইডাও জাননা মিঞা! ঐ যে একটা মাস যায়গা, আর একটা মাস আইয়ে, হিয়ার চিপাচিপি সময়ডা অইছে হাক্রাইন্ত।"

"মিঞা জানোনা আইজ ইন্দুগো কার্তিক পূজা, জিনিষের দামত একটু আক্রা অইবই।" "কার্তিক হালায় আবার কেডাগো মিঞা?" "আরে মিঞা কার্তিকরে চিননা? ইন্দুগো দুর্গাপূজা দেখছ? হেইহানে, দেহ নাই দুর্গার একদিকে এউগ্গা সোন্দর পোলা শূলের মত বাঁশের আগায় বইয়া থাকে, হেউগাই কার্তিক!"

"কি বললে, টাকা টাকায় ইলিশ? টাকায় চারটে করে দেবেতো দুটো দাও।" "তা আইলে আইজ আর ইলিশ খাওন লাগবনা মহারাজ! চোক্‌লা (আঁশ)

লইয়া গিয়া অম্বল (টক্) রাইন্দা খান। ইলিশ মাছের গেরান (গন্ধ) বি পাইবেন আবার অম্বল বি খাইবেন।"

এমনি আরও বহু কথা, যা লিখতে গেলে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ভরে যাবে। সব কথা লেখা আমার উদ্দেশ্যও নয়। যা বলতে চাই তা হচ্ছে, যে ঢাকায় আমরা ছিলাম, গত চল্লিশ বিয়াল্লিশ ব'ছর কল্পনায় যে ঢাকার ছবি ভেসে উঠতো, সেখানে এই রকম পুরানো কিছু না পেলে যেন ঠিক মন ভরে না, সেই অনুভূতি ফিরে আসে না। আবার অন্যদিকে শহর হিসেবে ঢাকার উন্নতিতে কি ভালই না লেগেছে !

নারায়ণগঞ্জে সেই অত রাত্রে পৌছেও পরের দিন সকালে টীপুকে নিয়ে সকালেই উক্ত স্টেশনে যেয়ে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। দেখলাম, স্টীমার স্টেশনটি উঠে গেছে। অবহেলায় এবং স্টীমার উঠে যাবার কার্যকারণে, নারায়ণগঞ্জের সেই অপূর্ব সুন্দর স্টেশনটি প্রায় ভিখারীর রূপ নিয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে বাল্যে বাবা ও মার সঙ্গে বেলা এগারটা নাগাদ ট্রেনে এই ঝক্‌ঝকে ও ঝম্‌ঝমে স্টেশনে নেমে, বড় নৌকো করে প্রায় দশ মাইল দূরে 'হামছাদির' বাড়িতে গিয়েছি।

কি মনে করে জানিনা, একটা ছোট নৌকো ভাড়া করে টীপুকে নিয়ে, প্রায় আর্দ্ধেক শুকিয়ে যাওয়া 'মরা গাঙ্গ' শীতলক্ষা পার হয়ে, ত্রীবেণির খালের মুখে যেয়ে আরও একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এলাম। মনে পড়ল অতি নিকটেই 'বন্দর' নামক গ্রামে বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি) তাঁর বিপ্লবী জীবনের গোড়ার দিকে ঐ বন্দর স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন। আর অনুশীলন দলের বিপ্লবী কাজের অর্থের প্রয়োজনে, বিশেষ বিশেষ ধনী বাড়িতে ডাকাতি করতেন মাথায় পাগড়ী বেঁধে পাঞ্জাবী সর্দ্দারের বেশে। শেষে পুলিশের নজর থেকে গা ঢাকা দিতে শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরী নদীতে এক মাল্লাই খেয়া নৌকো চালাতেন। যাত্রীদের মধ্যে বন্দর ও মুন্সীগঞ্জের দারোগা-পুলিশ ও থাকতো। নতুন মাঝি দেখে কেউ সাধারণ উৎসুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতেন, বাবু 'নমামি'। যাত্রীরা বলতেন, এ আবার কি নাম ? মাঝির বেশধারী মহারাজ বলতেন, বাবু ! নমঃ আমি। এখানেই তখন মহারাজের আর এক সহযোগী বিপ্লবী নেতা ছিলেন প্রয়াত নরেন সেন। শুনেছিলাম, পরে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে মহারাজ হয়েছিলেন। এই দুই নেতাই তখনকার সারা-

---

১। নমশূদ্র আমি।

বাংলায় বিখ্যাত ছিলেন। আমাদের বাড়ির নিকটেই আমিনপুরের জমিদার পরিবারের ছিলেন নরেন সেন। তাঁর বংশধর প্রয়াত হাসিময় সেন-ও একজন স্বদেশী নেতা ছিলেন। আমি তাঁর স্নেহধন্য ছিলাম। তাঁদের জমিদার বাড়ির পেছনের ফুটবল মাঠে হাসিদার ডাকে বহু টুর্নামেণ্টে আমাকে খেলতে হয়েছে। সেই সময়ে ঐ পরিবারের আদর-যত্নের কথা আজও ভুলতে পারিনি। দেশভাগের পরেও টালিগঞ্জ—কুদঘাটের 'অনুশীলন ভবনে' যাতায়াতের পথে উনি আমার বর্তমান বাড়িতে কয়েকবার এসে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশে পেঁছানোর তৃতীয় দিনে (২১/৩/৪৬ইং) ঢাকার নূতন স্টেশন থেকে রওনা হলাম স্বপ্নের কিশোরগঞ্জের পথে। পূর্বে ঢাকার ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে রওনা হলে, রমনার উপর দিয়ে রেল লাইনের দুইপাশে ঢাকা ইউনিভারসিটি, ছলিমোল্লা হল, আসানুল্লা মেন হোস্টেল, বকসীবাজার, মিলিটারী ছাউনি ইত্যাদি দেখা একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এবার নূতন লাইনের নূতন পথে ওসব কিছুই দেখা গেল না। ট্রেন একটানা চলে, এমনকি টঙ্গি জংশন স্টেশন পার হয়ে, ভৈরববাজারের পথে থামল এসে ঘোরাশাল স্টেশনে। তারপর একেবারে ভৈরববাজার স্টেশনে এসে, এনজিন্ ঘোরাবার জন্য আধঘণ্টা বিরতি। এই আমার সেই বহুবার দেখা বহুঘটনার স্মৃতি বিজড়িত ভৈরববাজার। গাড়ি থামলে আমি সঙ্গে সঙ্গে নেমে, প্রায় দৌড়ে যেয়ে ওভার ব্রীজে উঠে পূর্বদিকে মেঘনা নদীর উপর রেল-ব্রীজ ও ওপারের উল্লেখিত পুরানো স্মৃতি মাখা আশুগঞ্জ স্টেশনের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে রইলাম। একের পর এক কত ঘটনার স্মৃতি মনের চোখে ভেসে উঠল, যার অন্ততঃ কিছুটা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আশুগঞ্জ ছাড়িয়ে আর দৃষ্টি না গেলেও মনে হল সামান্য দূরেই তো সেই কায়স্থবেড়িয়া রেল স্টেশন। বহুবার সুরমা মেলে রাত দুটো-আড়াইটায় ওখানে নেমে শহরে রাণীদের বাড়ি যেয়ে তাকে চম্‌কে দিতাম আর বলতাম যে তোমার এমন কি প্রয়োজন হল যে আমাকে অবশ্য অবশ্যই আসতে লিখেছো। পরের রাতে আবার সেই দুটো-আড়াইটায় রিক্‌শাওয়ালা এসে ডাকলে, ওদের পুকুর পার ও একটা ছোট মাঠ হেঁটে পার হয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো রিকশা পর্যন্ত টর্চ লাইট হাতে রাণী আমায় এগিয়ে দিত। কোন বারণ-ই শুনত না।

কোথাদিয়ে যে আধঘণ্টা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা শুনে ব্রীজ থেকে নেমে এসে গাড়িতে বসলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রথমেই এল কুলিয়ারচর, তারপর সরারচর স্টেশন। এখানের কাপাসাটিয়া গ্রামই

প্রয়াত মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর জন্মস্থান।

এই সরারচরে পৌঁছে বহুদিন পূর্বের একটা আনন্দের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এখানে এক খুব খানদানী মুসলমান জমিদার ছিলেন ফুটবল-পাগল আর তৎকালীন কলকাতার মহমডান স্পোর্টিং ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। ১৯৩৬ সালে আমি যখন স্কুলের ছাত্র তখন ঐ জমিদার ও কিশোরগঞ্জের ফুটবল চাঁইদের অনুরোধে বাবার অনুমতি পেয়ে ঐ জমিদারের পূর্ব পুরুষের নামে একটা চেলেঞ্জ শীল্ডের সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ খেলতে আর চার-পাঁচ জন বয়স্ক খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঐ জমিদার বাড়িতে গিয়ে চার-পাঁচ দিন ছিলাম। এই বাড়িতেই প্রথম মুসলিম খানদান ও সত্যিকারের মুসলমান বাবুর্চির রান্নার পরিচয় পাই। ওঁদের আদর-আপ্যায়নে আমি প্রায় দিশেহারা! কুয়ো বা ইঁদারার পারে তাঁদের ভৃত্যরা প্রায় শরীরে তেল মেখে, মাথায় জল ঢেলে, তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে দেবার জন্য ব্যস্ত থাকত। সেমি-ফাইনালে জয়ের পরে আমি চৌদ্দ পনের ব'ছরের বাচ্চা বলে, ঐ বাড়িতে গ্রামের লোক আমায় দেখতে আসত। পর্দানিশিন মুসলমান পরিবার। তবু একদিন একটা অজুহাত করে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অন্দরমহলে ডেকে নিয়ে জমিদার সায়েব আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেন। পরে শুনেছিলাম যে পর্দানিশিন বিবিজানদের আমাকে আড়াল থেকে দেখাবার জন্যই এটা করা হয়েছিল। ফাইনাল খেলায়ও আমরাই জয়ী হই তিন গোলে। দুটো গোল-ই আমি করি আর তৃতীয়টাও আমারই থ্রু-পাস থেকে অন্য একজন করে। সে জয়ের কি হৈ চৈ। হাতি সাজিয়ে, গ্যাস বাতি জ্বালিয়ে বিরাট মিছিল গ্রাম পরিক্রমা করল। সকলের অনুরোধে, জমিদার সায়েবের ছোট ভাই এর সঙ্গে আমারও হাতির উপর বসতে হল। পরের দিন সকালে, কিশোরগঞ্জ রওনা হবার পূর্বে, জমিদার সায়েব, ফিনলের আদি কাপড়ের এক পিস্ পাঞ্জাবী, একখানা ঐ কোম্পানিরই ধুতি ও একশত টাকা উপহার দিলে, আমি অনুরোধ করে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে অন্য উপহারগুলো নিয়ে কিশোরগঞ্জে ফিরে আসি। তখন খেলার জন্য অর্থ গ্রহণ আমরা চিন্তাই করতে পারতাম না। জীবনে আরও বহু বড় বড় জায়গায় বড় বড় টুরনামেণ্ট খেলেছি, কিন্তু, সরারচরে ঐ খেলার বৈচিত্র ও আনন্দ আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

সরারচর থেকে মাণিকখালি, গচিহাটা, যশোদলপুর ইত্যাদি স্টেশন পার হয়ে প্রায় বেলা দুটোয় এসে কিশোরগঞ্জ স্টেশনে নামলাম। উক্ত স্টেশনগুলো ও বিশেষ

করে কিশোরগঞ্জ নজরে এলে, আমি আবেগে কিছুক্ষণ সত্যি বোবা হয়েছিলাম। ময়মনসিংহ—কিশোরগঞ্জ, শিলচর—কিশোরগঞ্জ, এই যাতায়াত যে কত অসংখ্য বার করেছি তার কোন হিসাব করা সম্ভব নয়। যেখানেই যাই আর যেখান থেকেই ফিরে আসি, এই স্টেশনে পৌঁছুলেই মনে হত এটা আমাদের স্টেশন, যেন আমাদের সম্পত্তি! গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চারদিকে শুধু তাকিয়ে দেখছিলাম, মুখে কোন কথা সরছিল না। প্ল্যাটফরমের উপরে একটা সেড করা ছাড়া স্টেশনটার আর কোন পরিবর্তন না হওয়াতে, সেই পুরানো রূপ দেখতে পেয়ে কি না আনন্দ পেলাম। মনে হল যা যেমন ছিল, সবই তো তেমনই আছে, আমরাই শুধু নেই। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়ে, যাত্রী পার হবার গেট ছাড়িয়ে বাঁদিকে টিকিট কাউন্টারের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি ভেতরে কেউ নেই। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই জানালার কাছে এলেই যে ফর্সা, সুন্দর গোল মুখখানি দেখতাম, প্রয়াত সেই বীরেন চক্রবর্তীর মুখখানা চোখে ভেসে উঠল। উনি ছিলেন আমাদের শোলাকিয়া পাড়ার বন্ধু ননী ও হরির দাদা। প্রমোশন উপেক্ষা করে বরাবর ঐ একটি জায়গায় কাজ করে অবসর নেন।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা রিক্‌শায় বসে বললাম, ডাঃ বীরের ডাক্তারখানায় চলো। দেখলাম সতের ব'ছর পূর্বে উনি গত হলেও এখনও তাঁকে এক ডাকে সবাই চেনে। স্টেশনের বাইরেই সদর রাস্তা খারাপ থাকায় রিক্‌শা নিউটাউনের ভেতর দিয়ে চলেছে। চারদিকে তাকিয়ে আমার দেখা চল্লিশ বছর পূর্বের নিউ-টাউনকে মিলিয়ে নিচ্ছি। সব প্রায় তেমনই আছে, তবে নেম্‌-প্লেটগুলো বদলে গেছে।

কিশোরগঞ্জে আজ পৌঁছুবার পূর্বেই ট্রেনের কামরায় বসেই খবর নিয়ে জেনেছিলাম যে আমার সত্যিকারের বন্ধু এবং প্রায় সর্ববিষয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী কমরেড ওয়ালিনোয়াজ খান ব'ছর দুই পূর্বেই মাটি নিয়েছেন। শুনে দুঃখ হয়েছিল যে, সেইতো এলাম, কিন্তু দুটো ব'ছর পূর্বে এলাম না কেন। কিশোরগঞ্জ যেমন আমার কাছে এক মহাতীর্থ স্থান, তেমনি ঐ তীর্থস্থানের, আমার কাছে তিনিই ছিলেন এক বিরাট স্তম্ভ!

বেলা দুটা নাগাদ, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেখলাম, ডাঃ বীরের ডাক্তারখানার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, এতটা যে, আমাকে ওটা খুঁজে বার করতে হল। আর বড়ই বেদনাবোধ করলাম এটা জেনে যে, যে ছেলেটি ১৯৩৭/৩৮ সালে হাফ্‌পেন্ট

পরে আমার শ্বশুর মশাই-এর ডাক্তারখানার কাজে লেগেছিল, ১৯৫১ সালে ঐ বাড়ির সকলেই এপার বাংলায় চলে এলে, শ্বশুর মশাইকে যে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দেখ্‌ভাল করে আগলে রেখেছিল, আমি কিশোরগঞ্জে যাব শুনে, রোগ-শয্যায় শুয়ে তার কন্যা কৃষ্ণাকে দিয়ে বার বার চিঠিতে আমায় তাগিদ দিচ্ছিল, আমাদের সকলের অতি প্রিয় সেই উমাচরণ মাত্র সাত দিন পূর্বে মারা গেছে। উক্ত ডাক্তারখানার পেছনেই উমাচরণ বাস করছিল। সেখানে গিয়ে, উমাচরণের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দিয়ে, জানতে পারলাম যে তার মেয়ে কৃষ্ণা ও ছেলে রঞ্জন, তাদের পাশের বাড়িতে, শ্বশুরমশাই এর এক পুরানো রুগীর তত্ত্বাবধানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছে। সে বাড়ির মালিক অতি সম্মান ও সমাদর করেই আমায় বললেন, ডাক্তারবাবুর জামাইতো আমাদেরও জামাই, আপনার যতদিন খুসী নিজের মনে করে এখানে থাকুন। উমাচরণের ঐ মেয়ে কৃষ্ণা যেমন ভাল তেমনই স্মার্ট। সে-ই এখন আমার চোখে 'কিশোরগঞ্জ'! তার চিঠি-ই, এখনও আমার জীবনের এই অন্তিম কালে, আমার ও বাণীর অতি প্রিয় কিশোরগঞ্জের যোগাযোগ। কৃষ্ণার চোখ দিয়েই এখনও আমি কিশোরগঞ্জকে দেখতে পাই, তার স্পর্শ অনুভব করি। তাই তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই!

সময় নষ্ট না করে, ঐ বাড়িতে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে হাটা পথে শোলাকিয়ার উদ্দেশ্যে, খরমপট্টির মুখে এসে একটু থেমে মনটাকে শক্ত করে নিলাম। তারপর এগিয়ে চলেছি খরমপট্টির রাস্তা ধরে। দুপাশের সব বাড়ি-ঘরই আমাদের অতি পরিচিত। বিশেষ কোন পরিবর্তন নজরে পড়ল না, শুধু কিছু নেম-প্লেট ছাড়া। একটু এগিয়ে ডান দিকে সেই কাঁচা রাস্তার মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল, ১৯৪৬ সালের পয়লা অগাষ্টের বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকার রাতে, সুধাংশু ভট্টাচার্যের শ্বশুরালয়ের পেট্রোম্যাক্সের আলো, যা সেদিন আমাদের বিশেষ যাত্রাপথে একমাত্র বাধার সৃষ্টি করেছিল। বাণীর কথা মনে পড়ল। অসুস্থতার জন্যে, সে আমার সাথী হতে পারল না বলে, আমার এই তীর্থ দর্শনও সার্থক হল না। এটাও আমার জীবনের একটা ট্র্যাজেডি।

খরমপট্টি দিয়ে শোলাকিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছি। রাস্তার দুপাশে লাউন্দ, জয়কার, প্রয়াত বকুল দত্ত, ডাঃ সুনীল বিশ্বাস, মহেশ গুপ্ত (প্রয়াত কমরেড ভুপেশ গুপ্তের পিতা) ও আরও অনেক পরিচিত গুরুজন ও বন্ধুদের বাড়ি পার হয়ে এসে প্রয়াত প্রকাশ নন্দীর বাড়ির মোড়ে পৌঁছে, আমার বুক দুরুদুরু করে

উঠল এই ভেবে যে এবার ডান দিকের রাস্তায় প্রবেশ করলেই কি দেখব কে জানে! ঐ পথের শেষেই তো দাঁড়িয়ে আছে বহু উল্লেখিত আমাদের সেই ভাড়াটে বাড়ি, যেখান থেকে চোয়াল্লিশ ব'ছর পূর্বের এক ঝড়-বাদলার গভীর অন্ধকার রাতে আমরা রওনা হয়েছিলাম আমাদের মহামিলনের যাত্রাপথে! একটু বোধহয় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, তবু এগিয়ে যেতেই হল সামান্য কিছু দূরেই তো আমাদের জীবনযুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। আমাদের তীর্থস্থানের মধ্যমণি। দেখলাম আমাদের ভাড়াটে বাসাটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যেমন হয়েছে পাশেই বাসনা মাসীমাদের ভাড়াটে বাড়িটা। কিন্তু আশেপাশে আর কোথাও তেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন কিছুই হয়নি। তাই পাড়াটার মোটামুটি পূর্বের রূপ দেখে মনে বড় শান্তি পেলাম, গত চল্লিশ ব'ছর ধরে এই প্রিয় স্থানটির যে রূপ কল্পনায় ছিল, তার প্রায় সবই পুনরায় ফিরে পেয়ে। অবশ্য পুরানো সেই মানুষগুলো আর নেই। আমাদের ভাড়াটে বাড়িটার দক্ষিণ দিকে গুজাদিয়ার বাড়িটা একেবারে অবিকল তাই আছে। আমাদের জীবনের সেই বিশেষ রাতে, ঐ বাড়ির সামনের মাঠেই বৃষ্টির জমে থাকা জলে প্রচুর ব্যাং ক্রমান্বয়ে ডেকে চলেছিল, যখন প্রায় লাগোয়া আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসে আমি বাণী প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি। মনে পড়ল ঐ বাড়ির আমাদের ও বাণীদের সকলের অতি প্রিয় ভোলাদার কথা। যিনি এখন নিমতায় গুজাদিয়া লজ তৈরি করে বাস করছেন। আর বড় স্নেহময়ী মাসীমার কথা (প্রয়াত ডাঃ প্রভাত চক্রবর্তীর স্ত্রী)। তিনি এখন দমদমের নগেন্দ্র রোডে তাঁর বড় ছেলে খোকার বাড়িতে আছেন।

উত্তর দিকে এগিয়ে যেয়ে বাণীদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বড় শান্তি পেলাম, বাড়িটা একেবারে অবিকৃত দেখে। কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে, সেই বিখ্যাত মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধানো পুকুর ঘাটে গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোন কিছুরই তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। আশেপাশের ঘরবাড়ি সব তেমনই আছে, শুধু সেই প্রিয় মানুষগুলো নেই। মনে হলো যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতি। মানুষ, সমাজ, সংসারের এরূপ পরিণতি ইতিহাসে বুঝি খুব কমই আছে!

ঐ পুকুর ঘাটের সিঁড়িতে একটু বসলাম। মনে হল এই সেই পুকুর যেখানে বেশি বয়সে সাঁতার শিখে, সেই বছরই নরসুন্দা নদীতে সাঁতারের প্রতিযোগীতায় প্রাইজ পেয়েছিলাম। আর অন্যদিকে মেয়েদের এই সাঁতারেই বোন খণা প্রথম

পুরস্কার পেলে, তার পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উপস্থিত জনতার কেউ কেউ বলে উঠেছিল, আরে এতো মাণিকের বোন, ফার্স্ট হবেই !

বসে বসে ভাবছিলাম, এই সেই ঘাট যেখানে চাঁদনী রাতে বসে আমার প্রয়াত শাশুড়ী মাতাকে 'সুজন নাইয়ার' গান শোনাতাম। এই সেই পুকুর যেখানে ছোট্ট হেনা, বাণী ও রেখাকে বিভিন্ন প্রকারের সাঁতার শিখিয়েছি। যেখানে স্কুলের ছুটির দিনে পুকুরের চারপাশে ষোল চক্কর দিয়ে দীর্ঘ সাঁতারের অভ্যেস করেছি। এই সেই পুকুর যেখানে ছাত্র জীবনে লাফিয়ে পড়ে তিন তিন-বার তিনটি ডুবন্ত শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছি। একবার তো ১০৩° ডিগ্রী জ্বর শরীরে নিয়ে। বহু ঢোঁড়া সাপ ছিল এই পুকুরে। অনেককেই স্নানের সময় কামড়াতো। আমার ধারণা, কয়েক বছরে একশ এরও বেশি ঐ সাপ পুকুর ও তার আশেপাশে মেরেছি। গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটিতে এই পুকুরে আমরা পঁচিশ তিরিশ জন বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে হৈ চৈ করে স্নান করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কেটেছি। সেই শান্তি, সুনীল, মনু, ধীরু, বীরু, রঞ্জিত, জ্যোতিষ, চিতু, গণেশ, সুকুমার, সুশীল, ননী, হীরু, কানু, আবু, বিধু, অনিল, ধনা, মনাদের ফেলে আজ আমি একা এই পুকুর ঘাটে বসে আছি। দুচারজন ছাড়া আর কে কোথায় আছে জানি না। কেহ কেহ তো আমাদের ছেড়ে চলেও গেছে জানি। এমনি আরও কত শত কথাই একে একে মনে পড়ছিল, এ স্মৃতির তো শেষ নেই, মনে হয় এতো অসীম ! যখন উঠে পড়ব ভাবছি, তখন একটি মুসলমান যুবক আমার কাছে এসে সেলাম জানিয়ে বলল, মাপ্ করবেন, আপনি-ই কি মানিকবাবু, কলকাতা থেকে এসেছেন ? আমি সম্মতি জানালে, যুবকটি বলল, আমার নাম নুরমিঞা। আমার পিতা আপনার ঐ শ্বশুর বাড়ি ক্রয় করেছিলেন। আমি তার দ্বিতীয় পুত্র। উমাচরণের নিকট শুনেছিলাম যে আপনি শীঘ্রই এখানে আসবেন। ডাক্তারবাবুর কাছে আপনার ও বাণীদির ফটোও দেখেছিলাম। তাই এই ঘাটে আপনাকে দেখে চিনতে পেরেছি। চলুন আমাদের বাড়িতে। আমাদের সকলেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। নুরমিঞা আমাকে হাতে ধরে তাদের বাড়ির সদর গেট দিয়ে একেবারে ভেতরের উঠানে নিয়ে দাঁড় করিয়ে বলে, চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখুন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন কিনা। উল্লেখ করার মতো কোন পরিবর্তন দেখছি না আমি একথা বললে, নুরমিঞা বলল, কলকাতা ফিরে যেয়ে বাণীদি ও অমলদাকে (বাণীর দাদা) বলবেন যে তাঁদের বাড়ি তাঁরা যেমন রেখে গিয়েছিলেন, আমরা তেমনই রেখেছি।

আমি সম্মতি জানিয়ে, চারদিকে তাকিয়ে হাজারো স্মৃতির জাবর কাটছিলাম। যে সেমিসারকুলার কোঠা ঘরে বাণী পড়াশুনো আর রাত্রিবাস করত, অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। এই ঘরে শুয়ে শুয়েই বাণী শিলচর যাবার রাতে আমার গান শুনতো আর এই ঘর থেকেই সে আমাদের জীবনের সেই চরম ক্ষণটিতে গভীর রাতে বাড়ি ছেড়ে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে, মহামিলনের যাত্রাপথে রওনা হয়েছিল। যেখানে সেদিন আমি দাঁড়িয়ে এই সব পুরানো কথা ভাবছিলাম, সেখান থেকে ত্রিশ-চল্লিশ ফিট্ দূরেই আমাদের সেই ভাড়াটে বাড়ির উঠান। ঐ মুহূর্তে আমার পাশে বাণীর অনুপস্থিতি বড়ই প্রকট হয়ে আমার মনকে বিদ্ধ করছিল। নুরমিঞা এবার আমাকে বাণীদের সেই বিখ্যাত ও পবিত্র 'নয়া ঘরের' কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, এই ঘরটার সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু এটা আমাদের প্রয়োজন নেই, তবে শুনেছি বড় বড় সব নেতা নাকি এ ঘরে থেকে গেছেন। আমি ওখানে দাঁড়িয়েই ঐ নয়াঘরের আমার জানা ইতিহাস বললাম। এমন কি প্রয়াত মুজিবর রহমান সায়েব যে ভক্তিভরে ঐ ঘরের বারান্দায় মাথা ঠেকিয়ে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন সে ঘটনাও উল্লেখ করে নুরমিঞাকে অনুরোধ করে বললাম যে সম্ভব হলে, মিউজিয়াম মনে করে হলেও এ ঘরটাকে রক্ষা করে রাখলে আমরা খুব শান্তি পাব আর কৃতজ্ঞ থাকব। এর পর আমার অনুরোধে, ঐ বাড়ির উঠোন থেকে সামান্য মাটি একটা কৌটয় ভরে নুরমিঞা আমায় দিল। ঐ কৌট এখন আমার লেখার টেবিলে শোভা পাচ্ছে। তার পরে নুরমিঞা আমাকে তাদের পুবের ভিটের দালানে নিয়ে গেল। এই ঘরেই থাকতেন বাণীর বাবা ও মা। সেদিন বাণীর বিদায়লগ্নে তার বাবার টেবিল ল্যাম্পের বড় আলো দক্ষিণের দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে যাবার পথে পড়ায় বাণীকে ওনার খবরের কাগজ পড়ার অন্য-মনস্কতার সুযোগ নিয়ে, বার হয়ে আসতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। নুরমিঞা, আমার সে ঘর দেখা হয়ে গেলে, বাইরের বারান্দায় এনে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে অন্য একটা চেয়ারে বসে এক কাপ চা খেতে অনুরোধ করে। একটু পরেই এক প্লেট মিষ্টি ও দু'কাপ চা, অল্পবয়েসী সুন্দর একটি মিষ্টি চেহারার বৌ আমাদের সামনের টেবিলে রেখে আমাকে আদাব জানায়। আমিও সঙ্গে সঙ্গে আদাব জানালে, নুরমিঞা বৌটির পরিচয় দিয়ে বলে, ইনি আপনার বৌমা, আমার স্ত্রী। ওদের এই আদবে সত্যি আমি খুব অভিভূত হয়ে পড়ি। আমারই শ্বশুর বাড়িতে বসে, নুরমিঞার এই আদর-আপ্যায়ন, আমার এই তীর্থ দর্শনকে

বাস্তবিক আরও অন্তরঙ্গ, গভীর ও পবিত্র করে তোলে। খানিকক্ষণ ঐ বারান্দায় বসে চা ও জলখাবার খেতে খেতে, সুমুখের সবুজ প্রাঙ্গণ, রাস্তা ও পুকুর পারে চারদিকের পরিচিত দৃশ্যের উপর পুনরায় একবার চোখ বুলিয়ে, একসময় ভিজে চোখে ঐ দালান ও পাশের নয়াঘরের বারান্দায় মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে, শেষ দর্শনের বেদনা বুকে নিয়ে, বারে বারে ফিরে তাকিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম।

পরে একদিন ঠাকুর পাড়ার রাস্তার একেবারে পূর্ব কোণে যেয়ে কৈশোরের ছোবান আলির খবর নিয়ে জানলাম, সেও মাটি নিয়েছে। প্রায় সমবয়েসী এই ছোবান আমার খুবই 'নেওটা' ছিল। দৈনিক শহরে যাবার পথে, আমাদের ভাড়াটে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে, আমি উপস্থিত না থাকলেও, আমার খোঁজ-খবর নিয়ে যেতো। বড় আশা ছিল, ছোবানকে জড়িয়ে ধরে বহুদিনের অসাক্ষাতের বেদনা সামান্য লাঘব করব। কিন্তু হায়! তাও হল না। সেখান থেকে ভারি মনে সোজা পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে, পথের দুপাশে সবই পরিচিত বাড়ি ঘর দেখে দেখে, বিশেষ করে বন্ধু ধীরু লাহিড়ী, সাচাইলের বাড়ি, লণ্ডনবাসী বিখ্যাত লেখক ডঃ নীরোদ, সি, চৌধুরিদের বাড়ি, কারস্কার বাড়ি, বকুলতলার ঘাট, প্রয়াত রুহিনী চক্রবর্তী ও নির্মল রায়ের বাড়ি, অফিসারস্ ক্লাব আর কোর্ট-কাছারির মাঝ দিয়ে একেবারে কিশোরগঞ্জের খেলার মাঠে এসে আর দাঁড়াতে পারলাম না। নেহাৎ বালকের মত কাঁদতে কাঁদতে মাঠে বসে পড়ে, একেবারে নিজের আপন ও প্রিয় জিনিসের মতো ঘাস ও মাটিতে হাত বুলিয়ে যেন মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম।

এই সেই সুন্দর প্রাকৃতিক মাঠ, যার কোন ড্রেসিং-এর প্রয়োজন হত না। কৈশোরে ও যৌবনে যে আমাকে দিয়েছিল প্রচুর আদর ও সম্মান। ওখানে বসে কত আনন্দের স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। এই শুধু খেলার জন্য, এস. ডি. ও- প্রয়াত পি. কে. ভট্টাচার্য মশাই-এর আমার প্রতি অন্ধ স্নেহ-ভালবাসার কথা। মনে মনে বললাম, আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অনুমান চুয়ান্ন ব'ছর পরে, সেই মাঠে দাঁড়িয়ে আপনার স্নেহধন্য আদরে মানিক আপনাকে স্মরণ ও প্রণাম করছে! ওয়ালিনোয়াজ খান সায়েবের কথাও মনে হল। খেলার বিরতির সময় মাঠে প্রবেশ করে উনি আমাকে উৎসাহিত করতেন। আরও অনেকের সঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ল প্রয়াত ভানু দত্তরায় ও হাছু দাশের কথা। আমাদের সময় তাঁরা বয়স্ক হলেও ছিলেন আমাদের গর্ব আর আমাদের খেলার গার্জেন। আমাদের সময়ে আজিমুদ্দিন স্কুলের আমার সব চাইতে প্রিয় খেলোয়াড় ছিল আবদুল

করিম। কিন্তু শহরের বাইরে থাকতো বলে, কেউ তার খোঁজও দিতে পারল না।

এই মাঠে এখন গ্যালারি ও প্যাভেলিয়ান হয়েছে। তার কিছু কর্মকর্তা আমায় দেখে, মাঠ থেকে প্যাভেলিয়ানে নিয়ে বসালে, আমার পরিচয় দিলাম। তাঁরা খুব আদর যত্ন করে আমায় চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। কিশোরগঞ্জ কলেজের একজন প্রফেসর ও আজিমুদ্দিন স্কুলের এক টীচার (মানু স্যার) ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুজনই পরের দিন কলেজে ও স্কুলে যেতে আমায় আমন্ত্রণ করলেন। শুধু মাত্র একটা দিনই আমার হাতে ছিল বলে, কলেজে যেতে আমি রাজি হতে পারলাম না। প্রফেসর সায়েব বললেন, আপনার স্ত্রী এই কলেজে পড়তেন, কলকাতায় ফিরে গেলেই তো তিনি আপনাকে কলেজ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করবেন। তাছাড়া এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল ডঃ ডি. এল দাস মহাশয়কে আমরা কতখানি সম্মান দিয়ে থাকি তা আপনাকে দেখাতে পারলে খুব ভাল লাগত। ওঁদের নিকট থেকে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে মাঠে দাঁড়িয়েই বাণীদের সরযু বিদ্যানিকেতনের নতুন বাড়ি দূর থেকে দেখে, প্রাণের প্রিয় সেই খেলার মাঠ থেকে বার বার ফিরে তাকিয়ে বিদায় নিলাম। সেখান থেকে পশ্চিমে কিছুটা এগিয়ে রাকুয়াইলের শ্মশানের উপর দাঁড়িয়ে মাত্র চার ব'ছরের প্রিয় ভাই ঝুণ্টুর (অহীন্দ্র) জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলে আমার সাময়িক বাসস্থানে ফিরে এলাম। কিশোরগঞ্জের এই বিলম্বিত যাত্রায়, হাজার হাজার পরিচিত মানুষের মধ্যে মাত্র সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, ডাঃ শৈলেন রায় (হোমিও), ডাঃ জগবন্ধু সাহা (হোমিও), ডাঃ নৃপেন্দ্র পণ্ডিত (পূর্বে ডাঃ বীরের কম্পাউণ্ডার), ডাঃ সুধীর নাথ (পূর্বে ডাঃ প্রভাত চক্রবর্তীর কম্পাউণ্ডার), প্রয়াত মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর স্ত্রী ও কমরেড ওয়ালিনোয়াজ খানের ভাইপো আউয়াল খান, বর্তমানে কিশোরগঞ্জ উপজেলার সভাধিপতি।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই নিউটাউনে আউয়ালের বাংলোয় গেলাম, একরামপুরের পুল পার হয়ে, সহপাঠীর পিতার নামের 'জগতের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' ডাইনে রেখে। আমার শেষ দেখা হাফপ্যাণ্ট পরা আউয়াল, পাকিস্তান আমলে কিশোরগঞ্জের এম. পি. হয়েছিল। আমার উপস্থিতির খবর পেয়ে বাস্তবিক তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে, বাথরুম থেকে বার হয়ে এসে আমায় দেখে প্রথমেই বলল, মানিক চাঁচা আর যদি দুটো ব'ছর পূর্বে আসতেন, তবে চাঁচার সঙ্গে (ওয়ালিনোয়াজ) দেখা হত। উনি আপনার কথা প্রায়ই বলতেন। আর তার পরই জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবু তো নেই আপনি কোথায় উঠেছেন।

কোথায় উঠেছি জেনে, আপশোষ করে বলল, আমি তো এখানে আছি, আমার এখানেও উঠতে পারতেন। ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বললাম কাল সকালেই আমি চলে যাব, এসব কথা থাক্, তোমার চাঁচার কবরে আমায় নিয়ে চল, অথবা তুমি ব্যস্ত থাকলে আমাকে অন্য কারো সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দাও। আউয়াল জানাল, বেলা সাড়ে নটায় তার একটা জরুরী মিটিং আছে। নিকটেই দাঁড়ানো একটি যুবককে দেখিয়ে বলল, এ আমার ভাগ্নে। ওই আপনাকে আমাদের বাড়ির সুমুখে চাঁচার কবরে নিয়ে যাবে, আপনি কিন্তু কিছু মনে করবেন না। যুবকটিকে সঙ্গে সঙ্গে চা-জলখাবার আনতে বললে, আমি বারণ করে বললাম যে এই একদিনে আমায় বহু জায়গায় যেতে হবে, তাছাড়া আমি খেয়ে এসেছি। আমার অনুরোধে সে তার ফটোর এলবাম আনলে, তার থেকে পছন্দ করে আমি তার চাঁচার একটা ফটো তুলে নিয়ে পেছনে আউয়ালকে সই করে দিতে বললে, সে ফটোর পেছনে, 'স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ' লিখে সই করে দিয়ে বলল, আপনার শাশুড়ী মাতার অসুখের খবর পেয়ে ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি কলকাতা যেয়ে হঠাৎই সেখানে মারা গেলেন। খবরটা এখানে এলে একটা সরগোল পড়ে গেল। পূর্বে ও পরে কত ডাক্তারই তো কিশোরগঞ্জে এসেছে কিন্তু ওনার মত এত বড় ডাক্তার আর গরীবের প্রতি এত দয়ালু আর কাউকে আমরা পাইনি। আমাদের প্রজন্মের কেউ তাঁকে ভুলতে পারবে না। আমি রওনা হবার সময় আরও বলল যে চাঁচার কবর দেখে কিন্তু আমায় গালাগালি করবেন না। ঢাকায় পাথরের অর্ডার দিয়েছি। সব এসে পেঁছুলেই আমি সুন্দর করে কবর সাজাবো, আর তার ফটো তুলে আপনাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেব। আউয়ালের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তার ভাগ্নের সাথে একটা রিকশায় গিয়ে পুরানথানার বাজার থেকে কিছু ফুল কিনে বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু কমরেড ওয়ালিনোয়াজ খানের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, চুয়াল্লিশ ব'ছর পূর্বের আমাদের সেই বিয়ে বাড়ির রাস্তা ধরে। কবরের পাশে দাঁড়িয়েই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। তারপর একটু সামলে নিয়ে, সেই কবরের উপরের ফুল সাজিয়ে দিয়ে পাশেই বসে মনে মনে বললাম, 'হে আমার পরম ও চরম উপকারী সুহৃদ! তুমি আজ আর নেই। তোমার দেহ পড়ে আছে আমার সুমুখে ঐ মাটির তলায়। উপর থেকে দেখো তোমার কনিষ্ঠ প্রিয় বন্ধু মানিক তোমায় আজও ভোলেনি, কোনদিন ভুলবে না! হয়তো তোমার এই পবিত্র কবরে ফুল দেবার সুযোগ এ জীবনে আর আসবে না। তাই আজ আমার হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধার্ঘ্য তোমার কবরে রেখে গেলাম।' তখন আমার চোখের

জলে গাল ভেসে যাচ্ছে, ঐ অবস্থায়ই কবরের মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে বসেই রইলাম। উঠতে ইচ্ছে করছে না, উঠতে যেন পারছি না, এমন সময় আউয়ালের ভাগ্নে আমায় পেছন থেকে টেনে তুলে বলল, দাদু এবার উঠুন আপনাকে তো আরও বহু জায়গায় যেতে হবে। আমি উঠে দেখি ঐ যুবকটির চোখেও জল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালে সে নিজের থেকেই বলল, দাদু মহব্বৎ তো অনেক দেখেছি, কিন্তু আজ যা দেখলাম এমনটি আর কখনো দেখিনি। আবার আমরা রিকশায় উঠে বসলে, যুবকটি আমায় কথা মত আজিমুদ্দিন হাইস্কুলে পেঁাছে দিয়ে আদাব জানিয়ে চলে গেল। রিকশার ভাড়া আমাকে কিছুতেই দিতে দিল না।

প্রায় একচল্লিশ ব'ছর পরে, আমার প্রিয় স্কুলের গেটের কাছে যেয়ে দেখি, আমাদের খেলার মাঠ হুবহু পূর্বের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন আমার ভালবাসায় আমাকে খুশি করতেই সে এটা করে রেখেছে আমার অপেক্ষায়। মনে হলো এই তো কিছুদিন পূর্বেও যেন এই মাঠে আমি ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি খেলে গেছি। স্কাউটিং করেছি, রেড হাউজের[১] দলপতি হয়ে ড্রিল ও স্পোর্টস করিয়েছি। ঐ মাঠের পুরানো ছবি-ই দেখতে পাব এত বড় আশা আমার ছিল না। ঐ মাঠের সঙ্গে কত পুরানো সব কথা ও কাহিনী আর কত প্রিয় জনের মুখও স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছিল। হেড্মাস্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্তী, গেমটিচার সৈয়দ ফজলুল বারি সায়েব, জনাব ওয়াহেদ মিঞাসায়েব, শ্রীবিরাজ চক্রবর্তী, গোবিন্দবাবু, পণ্ডিতমশাই, মৌলবী সায়েব আরও কতজন। আজ সকলেই প্রয়াত। ওঁদের অনেকেই খেলার সময় ঐ মাঠে দাঁড়িয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। ইণ্টারস্কুল ফুটবলে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের কাছে পরপর উনিশ বার পরাজিত হয়ে, ওঁনারা আমার ক্যাপটেন্সির সময় যেন আমার উপরই সেই রেকর্ড ভাঙ্গার ভরসা করতে লাগলেন। ফজলুল সায়েব বলতেন, টীম ও প্লেয়ারদের জন্য তুমি যা যা সুযোগ সুবিধে চেয়েছো, হেডমাস্টার মশাইকে বলে আমি সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছি। তুমি কিন্তু আমার মুখ রেখো। ঈশ্বর আমাকে তাঁরও স্কুলের সকলেরই মুখ রাখতে সহায়তা করেছিলেন। বিশ বারের বার উক্ত হাইস্কুলকে সত্যি আমরা হারিয়েছিলাম, আমার স্ট্র্যাটিজি মেনেই।

---

(১) স্কাউটিং-এর মত স্কুলে স্কুলে হাউজিং সিস্টেম চালু হয়েছিল, ছাত্রদের স্বদেশী ও বিপ্লবী কাজ থেকে দূরে রাখতে। ইংরেজ সরকারের এই চালাকি পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

ফজলুল স্যারকে বলেছিলাম, আমার টীম দশ জনে খেলবে। হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে গত দশ ব'ছর যাবৎ শুধু খেলার জন্য যে ছাব্বিশ ব'ছরের রাম খোকা চারু বিশ্বাস খেলছে, আমি শুধু তাকে এমন ভাবে ট্যাক্‌ল করব যেন সে বল স্পর্শ করতে না পারে বা এক আধবার পারলেও কোন বিপদের কারণ না হয়। ফজলুল স্যার বলেছিলেন, সেটা তুমি অন্য কাউকে দিয়ে করাও, কিন্তু তুমি নিজে খেলো। আমি সে যুক্তি মানতে পারিনি। কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের সঙ্গে সেই উত্তেজনা পূর্ণ খেলার দিনে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, চারু বাস্তবিক ভাল করে বল তার আয়ত্বেই নিতে পারেনি। বল তার কাছে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার নিকট থেকে বল সরিয়ে দিয়েছি। তৎকালীন এস. ডি ও শ্রী পি. কে. ভট্টাচার্য সাহেব ভি. আই. পি. কর্ণারে বসে, আমি নিজের খেলা খেলছিনা দেখে, বিরতির সময় আমায় ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি চারুকে গার্ড করে রাখার নির্দেশ পেয়েছো? আমি মাথা নেড়ে তাই স্বীকার করি। সেদিন আমরা এক গোলে জয়ী হই। দীর্ঘ উনিশ ব'ছর পরে, আজিমুদ্দিন স্কুলের সেই জয়ের আনন্দ স্কুলের কয়েক শত ছাত্র মাঠে যে কিভাবে উৎযাপিত করেছিল তার বর্ণনা আর কি দেব। এরপরে প্রায় তিনচার দিন স্কুলে কোন পড়াশুনোই হয়নি। কি ছাত্র আর কি টীচার মহল, শুধু এই জয়ের আলোচনায়ই মশগুল ছিল। ফজলুল স্যার আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই জয়ে, আমার হয়ে স্কুলে ও বাইরে ওঁনার ঢাক পেটানোর ঠেলায় আমাকে শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে চলাফেরা করতে হত। ১৯৫১ সালের পরে ওঁনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কিন্তু শ্বশুর মশাই এর নিকট শুনেছি, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত, রাস্তায় ঘাটে ওঁদের দুজনের সাক্ষাৎ হলে প্রথমেই ফজলুল স্যার আমার খবর জিজ্ঞাসা করতেন। আজ আবার সেই প্রিয় স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে যখনই মনে হ'ল, আজ তো আর তাঁর সদাহাসি স্নেহমাখা মুখখানি দেখতে পাব না, আমার চোখ থেকে জলের ধারা যেন হুহু করে বার হয়ে এল।

এমন সময় স্কুলের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি এসে আমায় বলল, আপনি কি কোন প্রয়োজনে এখানে এসেছেন? হেড স্যার তাঁর ঘরে যেতে আপনাকে আদাব জানিয়েছেন। আমি জানালাম যে আমি এই স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র। স্কুল দেখতে এসেছি, এখুনি চলে যাব। তবে মিনু স্যার থাকলে তাঁকে খবর দিতে পার। একটু পরেই মিনু স্যারকে সঙ্গে নিয়ে হেড্‌স্যার জনাব এ. কে এম মিজানুর রহমান সায়েব এসে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেয়ে

বসিয়ে, টীচারস রুম থেকে আরও কয়েক জনকে ডেকে এনে সকলের সংগে আমার পরিচয় করেদিলেন। এক চল্লিশ ব'ছর পরে স্কুল দেখতে এসেছি শুনে সকলেই অবাক হলেন। আমাদের সময়ের কিছু কাহিনী সকলেই শুনতে চাইলে, উক্ত কিশোরগঞ্জের হাইস্কুলকে উনিশ ব'ছর পর হারানোর গল্প সহ আরও অনেক কাহিনী শুনে সকলেই খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর মিজানুর রহমান সায়েব আমাকে নিয়ে ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে টীচার ও ছাত্রদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে একচল্লিশ ব'ছর পর পুরানো স্কুলকে দেখতে আসার মনের টানের গভীরতা ইত্যাদির উদাহরণ দিলেন, তারপর স্কুলের পেছনে নতুন ছাত্রাবাস ও পুকুর ইত্যাদি দেখিয়ে আনলেন। দেখলাম তিনটে ক্লাস রুম ছাড়া আর সবটাই পাকা হয়ে গেছে। দোতলা বাড়ির প্রস্তুতিও চলছে।

এবার বিদায়ের পালা। আমার মন ভেতরে ভেতরে কাঁদছে। স্কুলের একজন কর্মচারিকে পাঠিয়ে একটা রিকশা ডেকে আনা হল। স্কুলের প্রায় সকলে মিলেই খুব সমাদর করে বিদায় মুহূর্তে আমায় বললেন, আজ খুবই আনন্দ পেলাম। আরও একবার এমন করে এসে আমাদের আনন্দ দিলে খুব সুখী হব। পশ্চিম দিকে রেল লাইনের ওপাশে ডিস্‌ট্যান্‌ট সীগনালের নিচে রিকশার দিকে যেতে যেতে মনে হল, এ স্কুল আমার খুবই প্রিয়। এখানে যা আমি দিয়েছি, পেয়েছি তার অনেক বেশি। কিন্তু আজকের এই অসামান্য অভ্যর্থনা আমার সকল পূর্ব পাওনাকে ম্লান করে দিল। রিকশায় ওঠার পূর্বে রেল লাইনের উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত স্কুল ও খেলার মাঠকে মনে মনে প্রণাম করে রিকশায় উঠে বসলাম। রিকশাকে একটু দাঁড়াতে বলে চারদিকটা ভাল করে দেখছি। ১৯৪৬-এর পয়লা অগাষ্টের সেই দুর্যোগের রাতে, বাণীকে নিয়ে এই ডিসট্যান্‌ট সীগনালের কাছে পেঁছেই, রেললাইনের ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে কিছুটা এগিয়েই, নরসুন্দা নদীর উপর রেলিং বিহীন ফাঁক ফাঁক করে পাতা স্লিপারে পুলের উপর দিয়ে হাত ধরে বাণীকে খুব সাবধানে পার করে, বয়লা গ্রামের দিকে খালি পায়ে হেঁটে যেয়ে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত পায়ে বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলাম। খানিকক্ষণ সেদিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে রিকশাওয়ালার তাগাদায় রওনা হতেই হ'ল। তারপর বলা যায়, শুধু আজকের বাকি দিনটাই হাতে আছে বলে, পাগলের মত শহরের চারদিকে ছুটে বেড়িয়েছি। প্রথমেই, কিশোরগঞ্জের বড় মসজিদ ও মুসলিম ছাত্রাবাস হয়ে, পুরান্ থানার বাজার বাঁদিকে রেখে, গৌরাঙ্গ বাজারের ভেতর দিয়ে জ্ঞানদাসুন্দরী পুল পার

হয়ে বাঁদিকে বাত্রিসের রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, না আছে সেই বড় লক্ষ্মী ভাণ্ডার, না আছে গঙ্গাসাগর বস্ত্রালয়। আবার উলটো দিকে নরসুন্দার দক্ষিণ পার দিয়ে পশ্চিমদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সেখানেও নেই সাধন বস্ত্রালয়। আরও এগিয়ে চললাম। রথখলার মাঠ বাঁদিকে রেখে, আমাদের দেখা টিনের কাঠামোর সেই প্রথম সিনেমা হলের পেছন দিক দিয়ে চলে গেলাম নগুয়া। সেখানে নূতন গড়া হাসমাতুদ্দিন হাইস্কুলের হেডটীচার আমার সহপাঠী সরাফুদ্দিন সায়েবের হাতে তার আজিমুদ্দিন স্কুলের প্রিয় ছাত্র শ্রীসুশান্ত সাহার[১] চিঠি দিতে। অতিকষ্টে সরাফুদ্দিনের নিকট থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে, ফিরে আসার পথে নগুয়ার প্রয়াত পরেশ দেসরকারের[২] বাড়ির সামনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে, এগিয়ে এসে জয়কার বাড়ি বাঁদিকে রেখে, উত্তরে আখড়া বাজারের পুল পার হয়ে, কিশোরগঞ্জের সদর থানা বাঁদিকে রেখে, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রয়াত জগদীশ চক্রবর্তীর বাড়ির মোড় দিয়ে, বন্ধু ক্ষীরোদ গোঁসাইদের 'লাখি' বাড়ি ও উলটো-দিকে শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে থামলাম। রিকশা ছেড়ে দিয়ে রামতুলসীর জঙ্গলের রাস্তায় কালীবাড়ির দিকে কিছুটা যেয়ে, বেলা প্রায় দুটো বেজে গেছে দেখে উমাচরণদের বাড়ি ফিরে এলাম।

পূর্বেই লিখেছি যে ঠাকুর পাড়ার রাস্তার পূর্ব মাথা থেকে সোজা অফিসারস ক্লাবের দিকে যেতে প্রয়াত ক্ষেত্র চক্রবর্তী উকিলের বাড়ি, মাথা কাঁপা অনিলদের বাড়ি, শান্তি দত্তরায়, কারঙ্কা, প্রয়াত নন্দু রায়, প্রয়াত বন্ধু ননী চক্রবর্তী ও তার ছোট ভাই আমার অতি প্রিয় হরি, আজীবনের বন্ধু অনিল রায়দের বকুলতলার বাড়িও দেখে এসেছিলাম। অন্যদিকে কলা বাগানের কালার বাপু, মজার বাপুদের পাড়া দেখে আসতে ছাড়িনি।

তবু জানতাম, অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেল। মাত্র দশ দিনের ভিসায় কিশোরগঞ্জে আর থাকার উপায় ছিল না। এও জানতাম যে জীবনে আরও একবার এসে সব দেখে যাবার সুযোগও হবে না। মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না। মনে মনে বারবার একথাটাই উচ্চারণ করে মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম।

---

(১) শ্রী সাহা বর্তমানে ইউ. বি. আই. কুদঘাট ব্রাঞ্চের অফিসার। আমাদের সহফুটবলার প্রয়াত উপেন সাহার পুত্র। সরাফুদ্দিন পূর্বে আজিমুদ্দিন স্কুলের শিক্ষক ছিল।

(২) পরেশ টালিগঞ্জের নেতাজী নগরে বহুদিন পূর্বেই মারা যায়।

গতকল্য থেকে আজ অবধি, কিশোরগঞ্জ শহরে আমার ও বাণীর জীবনের বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণের সংগে যে যে স্থানগুলো, দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ ব'ছর পূর্ব থেকেই জড়িয়ে আছে, বর্তমানেও যেগুলো প্রায় একই রূপে অধিষ্ঠিত থেকে দর্শন মাত্রই মনে আনন্দের দোলা দেয়, কিন্তু আবার যখনই মনে হয় ওদের নিকট তো আজ আমরা পরদেশী, আগামী কালই ওদের ছেড়ে চিরকালের মত চলে যেতে হবে, তখনই আনন্দিত মন ক্রন্দনে আপ্লুত হয়। এটা কি সুখ না দুঃখ, আনন্দ না নিরানন্দ, আশা না হতাশা, নাকি ঐ সব অনুভূতির কেমন একটা সংমিশ্রণ, সঠিক কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারলাম না।

আরও মনে হলো, ওগুলো যেমন ছিল তেমনই তো আছে। পরিবর্তন হয়েছে শুধু আমাদের। আমরা ওদের ছেড়ে চলে গেছি, বৃদ্ধ হয়েছি। মনের টানে দেখতে এসেও তো থেকে যেতে পারছি না। আমাদের বুঝি বেঁচে থেকেও চির-বিচ্ছেদটাই সত্য!

সেদিন সারারাত ঘুমুতে পারিনি। যখনই মনে হয়েছে আমার স্বপ্নের কিশোরগঞ্জে এ জীবনের এটাই শেষ রাত্রি, কিন্তু তবুও বাণী আর আমি এই তীর্থ দর্শনে এক সঙ্গে এসে আমাদের জীবনের সুখদুঃখের অসংখ্য স্মৃতির মালা গাঁথতে পারলাম না, তখন বুকটা কেমন ভারি হয়ে উঠে দমবন্ধ হয়ে আসছিল! বিছানায় শুইয়ে থাকতে পারছি না। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্মল হাওয়ায় নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেণ্টা করেছি। ১৯৯০ সালের তেইশে মার্চ ভোর সাড়ে পাঁচটায় উমাচরণের ছেলে রঞ্জন ও ডাঃ সুধীর নাথের (প্রয়াত ডাঃ প্রভাত চক্রবর্তীর ডিস্‌পেনসারির) সাহায্যে আমি ও ভাগ্নে টীপু দুটো রিকশায় কিশোরগঞ্জের রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। স্টেশনের সোজা রাস্তা খারাপ বলে রিকশা চলেছে গৌরাঙ্গ বাজার হয়ে, পূর্বের সেই লক্ষ্মী-ভাণ্ডার—গঙ্গাসাগরের পাশ দিয়ে স্টেশনের নতুন রাস্তায়। পথে যেতে যেতে, কমরেড ওয়ালিনোয়াজ খানের পিতামাতার নামে তাঁর নিজের গড়া হাইস্কুল ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর নামেই নতুন গড়া কলেজ চোখে পড়ল। ঐ স্কুল ও কলেজকে সেলাম জানিয়ে এক সময় এসে স্টেশনে পেঁছিুলাম। গাড়ি এলে রঞ্জন ও ডাঃ সুধীর নাথ একটা কামরায় আমাদের ভাল করে বসিয়ে দিল। গাড়ি ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতেই কেঁদে ফেললাম। মনে হল আমাদের নিজেদের ঘরোয়া স্টেশন বুঝি চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। গাড়ি সেই বয়লা গ্রামের পথের লেভেল ক্রসীং, পূর্বে বহুবার উল্লেখিত সেই রেলিংহীন স্লিপারের

পুল, ডিস্ট্যান্ট সীগনাল ও আজিমুদ্দিন স্কুল হয়ে এগিয়ে চলেছে নীলগঞ্জ স্টেশনের দিকে। পূর্বে এই পথে গাড়ির কামরা থেকে বাঁদিকে শোলাকিয়া পাড়ার কতকাংশ নজরে পড়ত। কিন্তু নতুন বাড়ি ঘরের ঘিঞ্জির চাপে এবার তার কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু আরও এগিয়ে গিয়ে কলাপাড়ার লেভেল ক্রসীং-এর বাঁদিকে কিশোরগঞ্জের একেবারে শেষ চিহ্নটুকু দেখে মনে মনে বললাম, বিদায়! বিদায়! বিদায়! আমার প্রাণের, আমার হৃদয়ের, বাণীর স্মৃতিমাখা আমার স্বপ্নের কিশোরগঞ্জ! তোমায় কোনদিন ভুলব না! আজ তোমায় ছেড়ে যাবার সময় জানিয়ে গেলাম আমার শেষ প্রণাম!

গাড়ি নীলগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলেছে। জানালা দিয়ে পরিচিত দৃশ্য দেখছি। চাষের জমি সব প্রায় সবুজ ধান গাছে ভরা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট চাষীদের গ্রাম, ছোট বড় গাছ-গাছালিতে ঢাকা। চাষী ভাইদের ছোট ছোট ক্ষুদে ক্ষুদে ঘরবাড়ি। সেই যেন একই দৃশ্য যা ১৯৩৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত দেখেছি। নীলগঞ্জ স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে, যাত্রী ওঠানামার ভীড়ের মধ্যে অবশ্য মনে হল হিন্দুর সংখ্যা বড়ই কম। আর অতীতের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ১৯৪২-এ ভারতের শেষ স্বাধীনতা আন্দোলনে, পলাতক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারকে বাণীদের নয়াঘরের আশ্রয় থেকে রেললাইনের হাঁটা পথে এই নীলগঞ্জ স্টেশনেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, পুলিশের নজর এড়িয়ে অন্য আশ্রয়ের পথে। ময়মনসিংহের আই. বি. ইন্সপেক্টার শ্রীকরালী বসু তখন কিশোরগঞ্জে তাঁকে খুঁজছে।

মাঝের দুএকটা স্টেশন পার হয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল পূর্বে উল্লেখিত রবি ও হেনাদের আঠার বাড়িতে। কামরার ডান দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে রবিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। নতুন বাড়িঘর ও গাছ-গাছালির আবরণের জন্য বাড়িটা স্পষ্ট করে দেখা না গেলেও তার সান্নিধ্য মনের গভীরে ধাক্কা দিল। কতবার এসেছি এই বাড়িতে, প্রতি ব'ছর ঘটা করে দুর্গাপুজো হত এখানে, মনের আয়নায় কত প্রিয়জনের মুখ ভেসে উঠল। আঠার বাড়ি ছেড়ে গাড়ি এসে থামল বোকাই-নগরী স্টেশনে। পূর্বে নাম ছিল সোহাগী। দেশ স্বাধীন হবার পরে স্থানীয় এক মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি বোকাইনগরী বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন, সোহাগী তার নামেই উৎসর্গ করে নামকরণ হয়েছে বোকাইনগরী।

প্রয়াত সেই মহান নেতার উদ্দেশ্যে সেলাম জানিয়ে, পরিচিত ঈশ্বরগঞ্জ স্টেশন হয়ে পৌঁছুলাম এসে পূর্বে উল্লেখিত গৌরীপুর জংশনে। সেখান থেকে সামান্য দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে শম্ভুগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে জানা গেল, সেই নদের

উপর দীর্ঘ রেলব্রীজের ত্রুটির জন্য গাড়ি ময়মনসিংহে যাবে না। অতএব, শম্ভুগঞ্জ থেকে, রিকশায়, নৌকোয় ও কিছুটা হেঁটে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে এসে একেবারে প্রায় অবোধ শিশু-বয়েস ও বাল্যের স্মৃতি মাখা ময়মনসিংহের কালীবাড়ির নিকটে এসে রাস্তায় উঠলাম। সেখান থেকে রিকশা চেপে স্টেশনের পথে প্রয়াত জগদীশ গুহর লাল রং-এর বিখ্যাত দোতালা বাড়ির সামনে এসে থামলাম। প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও বলতে পারি, ঐ বাড়ির ঠিক উত্তর পাশেই একতালা একটা ওঁদেরই ভাড়া বাড়িতে থাকাকালীন আমার তিন থেকে ছয় ব'ছর বয়সের বহু স্মৃতি এখনও মনে আছে। ঐ দোতালা বাড়ির পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই মেলামেশা ছিল। মা প্রায় প্রতি দুপুরেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। ওঁরাও আমাদের বাসায় যাতায়াত করতেন। ওঁদের একটা সার্কাসের দল ছিল। সেই সার্কাসের খেলা আমি বহুবার দেখেছি। ওঁদের উঠোনে ও বাগানে দুএকটা বাঘ বাঁধা থাকত। এক দুপুরে মা যখন ঐ বাড়িতে আড্ডায় মশগুল, আমি তখন চুপি চুপি উঠোনে যেয়ে একটা বড় বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে তার হাঁ-করা মুখে হাত ঢুকিয়ে খুব আদর করছি। তা দেখে, দোতালা থেকে জগদীশবাবুর স্ত্রী তো চিৎকার সুরু করে দিয়েছেন। সকলে উঠোনে এসে ভীড় করলেও বাঘের কাছে যেতে কেউ সাহস করছে না। সার্কাসের মালিক বুধাবাবু কোথা থেকে এসে ধমক দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে, খুব কৌশলে এসে আমাকে হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এই ঘটনা শহরে এত ছড়িয়ে গিয়েছিল যে পরের দুতিন দিন বহু লোক আমাকে দেখতে আসত।

আমাদের ভাড়া বাড়িতে থেকে আমার ছোটকাকু (পুটু) আনন্দমোহন কলেজে পড়তেন। নিহারদিও তখন ঐ বাড়িতে ছিলেন, তখনো তাঁর বিয়ে হয়নি। আমার পরের কোন ভাই-বোনেরও তখন জন্ম হয়নি। এর ঠিক উল্টো দিকেই ছিল সুসঙ্গ-দুর্গাপুর রাজের ময়মনসিংহের বাড়ি। ঐ বাড়ির মাঠেই বাল্যে আমি খেলাধুলো করতাম। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, ময়মনসিংহের বেশ পরিচিত দুই ভাই দোজন ও পুটনও ঐ মাঠে মাঝে মাঝে খেলত। রিকশা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাঁপাশেই বাল্য এবং যৌবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু যুগল নিয়োগীদের সেই বাড়ি ও ডানদিকে কানাই-বলাই-এর মন্দির অবিকল পূর্বের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে বাল্যে, মার হাত ধরে কতবার এই মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে এসেছি। আরও এমন সব পুরানো ও অবিকৃত কত বাড়িঘরই দেখতে দেখতে ময়মনসিংহের রেলওয়ে স্টেশনে এসে পেঁছুলাম।

জীবনের প্রথম ছাব্বিশটা ব'ছর অগুণিত বার এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেছি। তাকে প্রায় অবিকৃত দেখে পুরানো জিনিস ফিরে পাবার আনন্দ পেলাম। দীর্ঘ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ব'ছর পরও সেই পূর্বে দেখা জিনিসগুলো এমন অবিকৃত অবস্থায় দেখতে পাব, এত বড় আশা আমার ছিল না। এই স্টেশন দিয়েই, ই. বি. আর. ও এ. বি. আর. (ইস্টবেঙ্গল আর আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে) যার যার পথে যাতায়াত করত।

ভাগ্নে টীপু একটু অসুস্থ্য বোধ করায়, তাকে বিশ্রামাগারে ভাল করে বসিয়ে দিয়ে, আমি একটা রিকশায় বসে যতটুকু সম্ভব শহর ঘুরে দেখার জন্য রওনা হয়ে গেলাম। স্টেশন রোড ধরে শহরের দিকে এগিয়ে যেতেই বাঁদিকে Gospel Hall নজরে পড়ল। বাবা, আমার ছ-সাত ব'ছর বয়সে বাসা বদল করে নিকটেই লাহিড়ী বাড়ি পাড়াতে বাসা নিয়েছিলেন। প্রতি রবিবার বেলা দুটোয় আমরা ছোটবড় অনেক ছেলে ঐ Gospel Hall-এ আসতাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটা হলঘরে আরামপ্রদ সব বেঞ্চিতে বসতাম। ডায়াসে পাদ্রী সাহেব ও তাঁর বাঙ্গালী সহকারীরা বসে বাইবেলের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ছবি টাঙিয়ে, সেই সব গল্প বলে যীশুর মহিমা প্রচার করতেন। পরের রবিবারে আবার ঐ কাহিনী আমাদের মধ্যে যারা ভাল করে বলতে পারত তাদের সুন্দর সব ছবির এলবাম আর অন্য সবাইকে একটা করে সুন্দর ছবি দেয়া হত। ঐ ছবিই ছিল আমাদের আকর্ষণ। তবে ঐ সুযোগে বাইবেলের বহু কাহিনী জানা হয়ে গেলে, পরে বি. এ. ক্লাসে পাঠ্য বাইবেল পড়ার বেশ সুবিধে হয়েছিল। পরিচিত রাস্তা ও বাড়িঘর দেখে দেখে লাহিড়ী বাড়ি পাড়ায় এসে নামলুম। ওখানের তিনদিকে বাড়ি ঘেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে খোঁজ করে প্রাচীন কাউকেই পেলাম না। সাত-আটটা বাড়িতেই নূতন হিন্দু মালিক। তাদের নিকটেই জানা গেল বিরাট লাহিড়ী বংশের কেউ আর সেখানে নেই। আমাদের ভাড়াটে বাসাটার বৈঠকখানা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে জল এসে গেল। এই ঘরে বসেই কৈশোরে, সেই লীলাদেবী চ্যালেঞ্জ শীল্ড জয়ের পরে, থ্রি চিয়ারস ফর মানিক শুনেছিলাম।

বহুদিন ঐ বাড়িটায় ছিলাম। কৈশোরের বহু স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি। এখানে থাকাকালেই বোন হেনা, বিকলাঙ্গ কণা, ভাই পল্টু ও বোন খনার জন্ম। বাল্য খেলার সাথীদের কত মুখই না কল্পনায় ভেসে উঠল। খোকা, কামাখ্যা, ইন্দুভূষণ, কানাই, পরিমল, মনু, ফিটু, কানু আরও কতজন। দুএকজন ছাড়া আজ আর কে কোথায় আছে জানি না। ঐ বাড়ির সুমুখের মাঠেই কত মেহনত

করে আমরা সকলে মিলে সরস্বতী পুজো আর ঝুলন যাত্রার উৎসব করতাম। ময়মনসিংহ শহরে বেশ সমারোহ করেই চারদিকে এই ঝুলন উৎসব হত। লাহিড়ী-বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে, প্রয়াত রাজেন্দ্র কর্মকারের দোকান ঘরে সব লাইফ্-সাইজের জন্তু-জানোয়ার সাজানো ঐ উৎসবের কথা আমাদের সময়ের অনেকেরই হয়তো মনে আছে। উক্ত লাহিড়ী বংশেরই প্রয়াত শ্রীপরেশ লাহিড়ী, উকিল গোপনে বিপ্লবী কাজ করতে করতে, পলাতক জীবনে শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরির আশ্রয়ে যেয়ে, মহানন্দ গিরি নামে তাঁর গদিতে আসীন হন। তিনি সন্ন্যাসী বেশেই একবার কয়েকদিনের জন্য লাহিড়ী বাড়িতে এলে, বাবার সঙ্গে আমিও যেয়ে তাঁকে প্রণাম করি। এই বাড়ির সংলগ্ন জয়ন্তী বুক বাইণ্ডিং সপে, সাক্ষাৎ ও স্নেহ পেয়েছিলাম সাচ্চা ও খাঁটি বিপ্লবী ব্রজেনদার (ব্রজেন রায়)। সারাজীবন অতি কঠিন বিপ্লবের কাজে আর অন্যদিকে রুগী ও জনসেবার কাজ করে করেই, কঠিন ছোঁয়াচে বসন্ত রোগে একেবারে অকালেই ঐ মহৎ প্রাণটি ঝরে যায়। কিছুদিন পূর্বে বাল্যসাথী ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারকে ঐ কথা লিখলে, সেও জবাবে জানিয়েছিল, ব্রজেনদার মত সাচ্চা ও খাঁটি বিপ্লবীর সাক্ষাৎ সেও তার জীবনে আর পায়নি।

একসময় চোখের জল মুছতে মুছতে রিকশায় বসে উল্টোদিকের রাস্তায় বাজারের পথে উক্ত অরবিন্দদের বাসাবাড়ির দিকে যেতে চাইলে, বড় দরদী রিকশা চালক আবদুল কুদ্দুস জানালো, সায়েব রিকশা তো ওদিকে নেয়া যাবে না, দেখছেন না ঐ রাস্তায় মানুষ হাঁটাপথে এগুতে পারছে না। সময়ের অভাবে আর সেদিকে যেতে ভরসা করলাম না।

রিকশা এগিয়ে চলেছে গাঙ্গীনাপারের দিকে। আবদুল কুদ্দুস আমার মন বুঝতে পেরে কষ্ট স্বীকার করেও খুব দরদ দিয়ে আমাকে সব দেখাচ্ছে। কিছুটা এগিয়ে যেয়ে ঐ রাস্তার উপরেই ব্রাহ্মমন্দির ও লাল রং-এর উঁচু পাকা জলাধার অবিকৃত রূপেই দেখতে পেলাম। তার পূর্বে ডানপাশে একই রূপে দেখেছিলাম সেন ব্রাদার্সের দোতালা বাড়ি। সেই বাড়ির অন্তরঙ্গ বন্ধু সুনীল আজ কোথায় আছে জানি না। উক্ত জলাধারের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা রেললাইনের দিকে চলে গেছে, তার বাঁদিকেই প্রয়াত অবনীবাবুর কোচিং স্কুল আর একেবারে রেললাইনের ধারে হেমাঙ্গবাবুর বিখ্যাত কোচিং স্কুল। কতই না আড়াআড়ি ছিল এই দুই স্কুলের। আমি ও বোন হেনা ঐ দুটোতেই পড়েছি। হেমাঙ্গবাবুর স্কুলের পাশে রেললাইনের অপর পারেই ছিল বিখ্যাত উকিল প্রয়াত মহীম রায়ের বাড়ি।

বাইরে থেকে Friends Eleven টীমের হয়ে খেলতে এসে ঐ বাড়িতে থাকতে হতো। আরও একটু এগিয়ে গেলেই ছায়াবাণী সিনেমা হল (পূর্বের অমরাবতী থিয়েটার ও সিনেমা হল)। বাল্যে এই হলে নাটকও দেখেছি অবাক সিনেমাও দেখেছি আর প্রথম সবাক সিনেমা দেখেছিলাম 'প্রহ্লাদ'। যাহোক স্টেশন রোড দিয়েই এগিয়ে যেয়ে ডানদিকে দেখলাম মেয়েদের মহাকালী পাঠশালা, রাস্তার দিকে উঁচু প্রাচীরের আব্রু। এর পেছনেই বাবার প্রিয় দুর্গাবাড়ি। আরও এগিয়ে যেয়ে বাঁহাতে অলকা (পূর্বে এরিয়ান) সিনেমা হলকে বাঁদিকে রেখে সিটি কলেজিয়েট স্কুলের সম্মুখে রিকশা থেকে নামলুম। বাংলা দেশের সাপ্তাহিক বন্ধ শুক্রবার, আর আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছি শুক্রবারেই। স্কুলের ভেতরে প্রবেশ করে তাই কোন কোলাহল পেলাম না। এরই ঠিক উল্টো-দিকে মেয়েদের বিখ্যাত বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুল ও হোস্টেল। এ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন বিখ্যাত ও যবরদস্ত শ্রীমতি বিভুবালা বকসী। শোনা যায় ছাত্রীরা তাঁর সামনে পড়লেই একেবারে কেঁচো হয়ে যেত। ১৯৫৬ সালে, কোচবিহারে আমাদের পাশের বাড়িতে শ্রীমতি বকসী তাঁর এক ছাত্রীর বাড়িতে গেলে, আমার ও বাণীর ওনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। পরে বাণী আমাকে বলেছিল, দেখেছো এই বয়সেও কতটা ব্যক্তিত্বের ছাপ! দেখলাম বর্তমানে বিদ্যাময়ী স্কুলের পূর্বের সেই চাকচিক্য আর নেই, যাকে বলা যায়—not properly maintained. ওদিকে আবার সিটি স্কুলেরও রাস্তার দিকে দেখলাম দেয়ালের আব্রু। কুদ্দুসের নিকট জানলাম সিটি স্কুলের রাস্তার দিকের বারান্দা থেকে রোমিওদের ঠাট্টা-ইয়ারকি বন্ধ করার জন্য ঐ ওয়াল। সিটি স্কুল দেখলাম একেবারেই অবিকৃত। চারদিকের স্কুলবাড়ি ঘেরা কম্পাউণ্ডে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা হত। হত প্রয়াত ধীরেন সেনের ব্যায়ামাগারের প্রদর্শনী, গুরুসদয় দত্ত আই. সি. এসের উপস্থিতিতে নানা উৎসব, শেওরার দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের লাঠি ও ছুরি খেলা, পি সি. সরকারের (সিনিয়র) হাতেখড়ি নেয়া অ্যামেচার ম্যাজিক। কতশত প্রিয় বন্ধু ও সাথীদের কথাই মনে হল!

প্রিয়জনকে হারানো একটা ট্র্যাজেডি তো বটেই। আর সবার জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই এটা ঘটেও। কিন্তু দেশভাগের অভিশাপে আমাদের জীবনে এটা ঘটেছে বড় নির্মমভাবে! নয়তো আজ ময়মনসিংহ শহরে বহু বাল্যসাথী ও প্রিয়জনের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই পেতাম আর সেই স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ থেকে এভাবে বঞ্চিত হতাম না! স্কুলের ঐ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একে একে কল্পনায় ভেসে উঠলো,

সাতান্ন ব'ছর পূর্বের দেখা শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জনবাবু, প্রিয় শিক্ষক অবিনাশবাবু, অমরবাবু, কামোদাবাবু, আরও কতো শিক্ষক, সহপাঠী ও ছাত্র-বন্ধুদের প্রিয় মুখ আর অসংখ্য ঘটনার কথা। বাংলাদেশে থাকার ভিসা অনুযায়ী, আমার হাতে সময় মাত্র কয়েক ঘণ্টার। সেটা মনে থাকলেও, ফিরে আসতে পা যেন নড়তেই চায় না। মন বলে চলেছে, আর একটু, আর কয়েক মুহূর্ত, এইতো শেষ দেখা! ইচ্ছার বিরুদ্ধে একরকম যেন জোর করেই পেছন ফিরে বার বার তাকাতে তাকাতে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বার হয়ে এসে কুদ্দুস মিঞার রিক্‌শায় চেপে বসলাম। গাল বেয়ে তখন অঝোরে চোখের জল পড়ছে। দরদী রিক্‌শাচালক কুদ্দুস মিঞারও বোধ হয় আমার জন্যে দুঃখ হচ্ছিল, আমায় বললো, "সায়েবের মনটা দেখ্‌তাছি বড়ই নরম, ইস্কুলডারে খুব বালোবাসতেন।" মাথা নেড়েছি, তাকে কোন জবাব দিতে পারিনি। রিকশা এবার এগিয়ে চলেছে আনন্দমোহন কলেজের দিকে। বাঘরাপাড়া ডানদিকে রেখে, আশেপাশের বহু পুরাতন বাড়ি-ঘর ও নানা নিদর্শন, নতুন-বাজার, বন্ধু ও ভগ্নীপতি রবি করের পূর্ব আস্তানা বি. এস. গুহর বাড়ি পার হয়ে, সামান্য এগিয়ে শ্রীঅনিল রায়দের 'ধীৎপুরের' জমিদার বাড়ি। আরও সামান্য এগিয়ে যেয়েই বাঁদিকে প্রয়াত শ্যামাচরণ রায়ের বাড়ি, আর ঐ বাড়িরই মানুষ ছিলেন বিখ্যাত অশোক রায়, যিনি এখন প্রয়াত।

বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুপ্রবর উক্ত অনিল রায় 'Dhitpur House' নামে বিরাট বাড়ি করে আমাদের অঞ্চলেই এখন সসম্মানে অধিষ্ঠিত। 'টালিগঞ্জ অগ্রগামী' ক্লাবের তিনি একজন প্রভাবশালী সভ্য। আমাকে ও বাণীকে তিনি খুব স্নেহ করতেন, খোঁজখবর নিতেন। এখনও নেন। একেবারে দেশের ভাষায় কথা বলেন, খুব মিষ্টি লাগে।

প্রয়াত অশোক রায় ছিলেন, ময়মনসিংহে এককালের বিখ্যাত ও দুর্ধর্ষ বিপ্লবী। যার নামে তৎকালে প্রায়-বাঘে-মোষে এক ঘাটে জল খেত। যতদূর মনে আছে, ১৯৬২/৬৩ সালে তিনি ময়মনসিংহ শহর ছেড়ে এপার বাংলায় এসে আমার বর্তমান বাড়ির খুব নিকটেই তাঁর নিজের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পূর্বে, কিশোরগঞ্জের আমার শ্বশুর বাড়িতে ওনার খুব যাতায়াত ছিল দলীয় রাজনৈতিক কাজে। আমাকে ও বাণীকে উনি চিনতেন। শ্বশুরমশাই (ডাঃ বীর) আমাদের এ বাড়িতে কখনো এলেই, বাণীকে পাঠিয়ে অশোকবাবুকে খবর দিয়ে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব করতেন।

বাণী তাঁকে অশোককাকু বলে ডাকতো। প্রায় প্রত্যহ সান্ধ্য-ভ্রমণে বার হয়ে, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বাণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কিগো মাইয়া বালা আছতো? প্রফুল্লদার (ডাঃ বীর) খবর কি, চিঠিপত্র পাওতো?" ১৯৬৭ সালে উনি মারা যান। আমি তখন আপিসের কাজে কয়েকমাসের জন্য দিল্লীতে ছিলাম। অশোকবাবুর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই, বাণী ঐ বাড়িতে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে সেদিনই আমাকে তার প্রিয় অশোক কাকুর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে চিঠি দেয়।

৺অশোক রায়ের কথা লিখতে যেয়ে, প্রয়াত কুশা রায়ের কথাও মনে পড়ে গেল। দুজনই প্রায় সমবয়েসী যুগান্তর দলের বিপ্লবী, পণ্ডিতপাড়া ফুটবল টীমের খেলোয়াড়, কুশাদা গোলকীপার, অশোকদা হাফব্যাক, দুজনাই শহরের বিভীষিকা, অশোকদা বেশি, কুশাদা একটু কম। স্বদেশী করে উভয়েই আট-দশ বছর কারাগারে বাস করে এসেছেন।

ময়মনসিংহে স্কুলে পড়ার সময় ওঁদের সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছি। তারপর, কলকাতা, ঢাকা ও কিশোরগঞ্জ ঘুরে এসে আবার যখন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে বি. এ পড়তে এলাম, তখন ওঁরা আবার শহরে ফিরে এসেছেন। ঐ সময় কুশা রায়কে খুব একজন 'রসিক' মানুষ হিসেবে দেখেছি। নূতন বাজারে তাঁর ছোট ভাই খোকাদা একটা রেস্তোরাঁ খুলেছিলেন। ওখানে কুশাদা এসে মাঝে মাঝে বসতেন। বন্ধু-বান্ধবের আমন্ত্রণে আমাকেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ ঐ রেস্তোরাঁয় বসতে হতো। পূর্বে উল্লেখিত বন্ধু রবি করও মাঝে মাঝেই সেখানে চা খেতো। ঐ রেস্তোরাঁর, দুই ভাই-ই আমাকে খুব সমাদর করতেন, চা খেলে মূল্য নিতে চাইতেন না। আর কুশাদা ওখানে বসলেই বহু প্রকারের মজার গল্প বলতেন।

পূর্বে, মনে হয় শিলচর পর্বে জওহরলাল নেহরুর মেজাজের গল্প লিখেছি। তবে তিনি ছিলেন 'মেজাজী পণ্ডিত।' আর কুশাদার মুখে শুনেছিলাম এক অ্যাটোক্রেট্ ব্রিটিশ সিভিলিয়্যানের মেজাজের গল্প। ময়মনসিংহে আমাদের সেই স্কুল জীবনেই, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্রেহাম্সের বদ-মেজাজের কথা শুনেছিলাম। তখন ছিল পুরো স্বদেশী যুগ। মিঃ গ্রেহাম্স স্বদেশীওয়ালাদের দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, অনেক বাঙ্গালি স্বদেশীওয়ালা তাঁর ইংরেজি গালাগালি, যথা—ড্যাম্, ব্ল্যাডি, শোয়াইন, বাস্টার্ড ইত্যাদির সঠিক অর্থ বুঝতে পারে না। এজন্যে একটা ছোট নোট্-বুকে নিখাদ বাংলা গালাগালি, তাঁর কোন প্রিয় বাঙ্গালি অধঃস্তন কর্মচারির নিকট থেকে 'রোমান

এল্‌ফাবেটে' লিখে নিয়ে, জামার পকেটে রেখে, মাসিক জেল পরিদর্শনে যেতেন। জেলে প্রবেশের পূর্বে নোটবই খুলে উক্ত বাংলা গালাগালিগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতেন। তারপর যখন স্বদেশীওয়ালাদের সেলে যেয়ে, ওঁদের সুবিধে-অসুবিধে ও দাবী-দাওয়া নিয়ে তর্ক বেঁধে যেত, তখন গ্রেহাম্‌স সাহেব শালা, শুয়োরের বাচ্চা ইত্যাদির সঙ্গে অর্থ না বুঝে কাউকে বলে বসতেন, 'তুই আমার বহিন-জামাই আছি।' জেলের স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে তখন হাসির রোল পড়ে যেত। ওদিনে আবার গ্রেহাম্‌স সাহেব গট্‌ গট্‌ করে একটু আড়ালে যেয়ে নোট বইটা খুলে তাড়াতাড়ি দেখে নিতেন কোনও একটা কি দুটো গাল ফসকে (miss) গেছে কিনা! যেয়ে থাকলে ফিরে এসে বাকি গালগুলোও উগরে যেতেন।

ভদ্রলোক জীবিত কি মৃত, সঠিক জানি না বলে, কুশাদার বলা নামটা না লিখে, লিখছি নকুল ঘোষ পণ্ডিতপাড়া টীমের একজন জবরদস্ত ফুটবলার ছিলেন। কুশাদা বলতেন, নকুলের ইংরেজি বিদ্যার পরিধি ছিল, 'yes, no, very-good.' কিন্তু ইংরেজি বলার ইচ্ছে ছিল প্রবল। সুযোগ পেলেই ইংরেজি বলতেন, কেউ তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারতো না। একবার ক্লাবের কোন সদস্যের বিয়ের প্রস্তাব এলে, নকুলবাবুও ক্লাবের অন্য সদস্যদের সঙ্গে 'কনে' দেখতে যান। আর 'কনের' বাড়িতে বসেই 'কনের' সৌন্দর্যের প্রশংসায় বলে বসেন, একেবারে 'প্রেগন্যাণ্ট অব্‌ বিউটি।' ফিরে আসার পথে, ঐ রকম ইংরেজি বলার জন্য ধমক খেয়ে, ক্লাবঘরে ঐ 'কনে'র আলোচনায়, নকুলবাবু নাকি নিজেকে সংশোধন করে বলে ওঠেন, মেয়েটি দেখতে চমৎকার, সত্যি 'ওয়েল-ভেন্‌টিলেটেড্‌।'

কলকাতার প্রথম ডিভিসনে ফুটবল খেলার সুযোগ পেয়ে, সেখানে যাবার সময়, পণ্ডিতপাড়া ক্লাব কর্তৃপক্ষ নকুলবাবুকে বলে দিয়েছিলেন, কলকাতা পেঁৗছেই যেন তাঁর ঠিকানা জানিয়ে দেন। যাতে, ক্লাবের প্রয়োজনে, তাঁকে টেলিগ্রাম করে মাঝে মাঝে ময়মনসিংহে নিয়ে আসা যায়। নকুলবাবু কলকাতা পেঁৗছে তাঁর নামের সঙ্গে নিম্নলিখিত ঠিকানা পাঠিয়েছিলেন, "88A, Rash Behari Avenue, stick no bill, Commit no Nuisance, Calcutta."

এইরকম কত কাহিনীই যে কুশাদা রসিয়ে রসিয়ে বলতেন তার ইয়ত্তা নেই। বই-এর কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আর সব কাহিনী লেখা থেকে বিরত রইলাম।

আবার পূর্ব কথায় ফিরে আসি। রিকশায় বসে প্রয়াত শ্যামাচরণ রায়ের বাড়ি ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল বাঁহাতে রেখে পূর্ব পরিচিত পথে, একেবারে আমাদের আনন্দ মোহন কলেজের সামনে এসে নামলাম। শুক্রবারে কলেজ বন্ধ। কাউকেই

দেখতে পেলাম না। লক্ষ্য করলাম, কলেজের সম্মুখের Main Building-এর architecture হুবহু অনুকরণ করে, দুপাশে আরও দুটো এ রকম অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাতে পুরানো অট্টালিকার সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। কিন্তু ডান দিকের অট্টালিকার জন্য কলেজের ভেতরের প্রবেশ পথে, আমাদের সময়ের যে Ladies Section-এর আলাদা বাড়ি ছিল, সেটা ঠিক বাইরে থেকে দেখা গেল না। দুই অট্টালিকার ফাঁক দিয়ে, প্রিনসিপ্যাল প্রয়াত কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয়ের বাংলোর ও সেই বড় পুকুর পাড়ে, আমাদের হোস্টেলের কিয়দংশ দেখতে পেলাম। গুনে গুনে আমার থাকা ৬নং ঘরেরও হদিশও করতে পারলাম। রিকশাওয়ালা কুদ্দুস বলল, ঐ হোস্টেলে এখন আর কেউ থাকে না। কলেজের সম্মুখের খেলার মাঠের বাঁদিকে একটা দোতলা লম্বা অট্টালিকা দেখিয়ে কুদ্দুস বলল, এখন ওটাই ছাত্রাবাস। উক্ত মাঠের ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের সময়ের সেই বড় জিমনেজিয়ামটাও পরিত্যক্ত। সেদিকে তাকিয়ে বহু পুরানো সব স্মৃতির কথা ভাবতে ভাবতে, আমাদের সকলের প্রিয় কুস্তিগীর যশোদা মালের কথা মনে হল। জেনেছিলাম, যশোদামাল কিশোরগঞ্জেরই লোক, আর সেই ভাষায়-ই কথা বলতেন। আরও জেনেছিলাম যে কুস্তিগীর 'বড় গামার' চাইতেও তাঁর Wrist ছিল আরও বেশি চওড়া ও মজবুত। কিন্তু মানুষটা শুধু গরীব বলেই উপরে উঠে আসতে পারল না। এ রকম একটা দৈত্যের মতো স্বাস্থ্যবান মানুষ পূর্বে আমি আর কোথাও দেখিনি।

শুনেছিলাম, মহারাজ শশীকান্ত মহাশয়ের এস্টেট থেকে মাসিক একশত টাকা আর আমাদের কলেজ থেকে মাসিক একশত টাকা ভাতা তাঁকে দেয়া হত। এতে আর কি হয়! মোট কথা, যে মানুষটা মদত পেলে, দেশ-বিখ্যাত এমন কি হয়তো পৃথিবী বিখ্যাতও হতে পারত, তাঁর সব বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা, অজ্ঞাতে-অখ্যাতে শুকিয়ে গেল! হয়তো বয়স অনুপাতে এখন আর তিনি বেঁচে নেই! আমি তাঁর খুব স্নেহ-ধন্য ছিলাম। উক্ত জিমনেজিয়ামে তিনি আমাদের নানা রকম ব্যায়াম শেখাতেন। আমাদের 'কব্‌জি' শক্ত করার জন্য, আমাদের প্রায় আড়াই-গুণ বড় নিজের ডান হাতের কব্‌জি, সামনে ধরে রাখতেন আর আমরা সে কব্‌জি বাঁকাবার চেষ্টা করে নিজেদের কব্‌জি শক্ত করতাম। আমি লোভে পড়ে একদিন তাঁর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে, তাঁর কব্‌জি সামান্য হেলিয়ে দিতেই, তিনি নিজের কব্‌জি সোজা করতে যেয়ে একটু বেশি ঘুরিয়ে দিলে, আমার কব্‌জি ঠাস করে ফুটে ওঠে। তারপর সেই ফোলা কব্‌জি ঠিক করতে প্রায় দেড়মাস লেগে

যায়। যশোদা মালের সে কি হায়-হুতাশ আর লজ্জা। প্রায় প্রত্যহ আমার খোঁজ নিয়ে যেতেন। কলেজের ফুটবল খেলার দিনে, তিনিতো মাঠে যেতেনই, খেলার মাঝের বিরতির সময়, মাঠে প্রবেশ করে আমার মাথা-পিঠ হাতিয়ে উৎসাহ দিতেন আর বলতেন, 'আপনিই কিন্তু ভরসা!' এখনও, পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় আমার ডান হাতের 'কব্জি' প্রিয় যশোদা মালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধীরে ধীরে এবার রিকশা চলল আমাদের খেলার মাঠের দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখি, দোতালা পণ্ডিতপাড়া ক্লাব বাড়িটা অবিকল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো কাউকে পাব, এই ক্ষীণ আশায়, দোতালায় উঠে গেলাম। কিন্তু উপস্থিত পাঁচজন মানুষের মধ্যে পরিচিত কাউকেই দেখতে পেলাম না। তারাও কেউ আমাকে চিনতে পারল না। দেশভাগের কি অদ্ভুত ও বেদনাদায়ক পরিণতি! যে ক্লাবে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল, যার সব সদস্য আমাকে খুব ভাল করেই চিনতো—জানতো, যে ক্লাবের বহু সদস্য এখনো জীবিত কিন্তু তারা আজ সবাই এপার বাংলায় ও ভারতে চলে এসেছে বলে সামান্য একজন পরিচিত মানুষেরও দেখা পেলাম না। হায়রে আমার দুর্ভাগ্য! হায়রে আমার বাল্য থেকে পরিচিত ঐ ক্লাব-ঘর! আদাব কায়েদে আজম জিন্না সাহেব! প্রণাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু! বেহস্তেই থাকুন বা স্বর্গেই থাকুন, জানি না সেখানেও আপনারা এই রকম করুণ ও বেদনাদায়ক ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করে গদিতে আসীন হয়েছেন কিনা!

যা হোক, উক্ত পাঁচ জন সদস্যকে আমার পরিচয় দিলে, তাঁরা অবশ্য সমাদর করে আমায় বসতে ও চা খেতে আহ্বান করলেন। কিন্তু ভিসার জন্য আমার হাতে একদম সময় ছিল না বলে, ওঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও আদাব জানিয়ে নেমে এলুম। সারকিট হাউসের মাঠে দেখলাম দুদল ক্রীকেট খেলছে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে খেলা দেখলাম। খুবই হালকা ধরনের খেলা হচ্ছিল। সিটি স্কুলে পড়ার সময় বাল্যে, এই মাঠে কিছু নামিদামী লোকের ক্রীকেট খেলা দেখেছি। ৺গণেশ বসু, ৺হেমাঙ্গ বসুর (ক্রীকেটার শিবাজী বসুর পিতা) নাম মনে পড়ছে। উক্ত শিবাজী, আমি আনন্দ মোহন কলেজে পড়ার সময় আমার খুব প্রিয় ছিল। আমাদের বেঙ্গল স্টুডিওর মেসে আমার রুমে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতো। ভারত International Cricket Club-এ প্রবেশের পূর্বে, এই মাঠেই মহারাজ শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে, ভারত বিখ্যাত রামজী, গুঠুঠু ও মেঠার মতো ক্রীকেটারদের পুরো একটা সীজন খেলা দেখেছি।

মনে পড়ে মহারাজ নিজে ও তাঁর বড় ছেলেও ওঁদের সঙ্গে খেলতেন। সত্যি-ই বড় সুন্দর, নিরহঙ্কারী, সদাশয় মানুষ ছিলেন আমাদের ময়মনসিংহের এই মহারাজ শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী। ফুটবল খেলায়ও, এই সারকিট হাউস গ্রাউণ্ডে বহু নামিদামী খেলোয়াড়দের দেখেছি সেই বাল্য থেকে। কিশোরগঞ্জের ভানু দত্ত রায়, হাচুদাস, রাখাল মজুমদার, গৌরীপুরের পাখী সেন, বাঘা সোম, এমন কি ১৯১১ সালের আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান টীমের কানু রায়কেও ময়মনসিংহের পুলিশ টীমে মাঝে মাঝে খেলতে দেখেছি! কলকাতা থেকে বড় বড় ফুটবল টীম এবং বিখ্যাত খেলোয়াড়রা তো কতবার ঐ মাঠে খেলে গেছে। বাল্য, কৈশোরের সেই স্বপ্নের মাঠে যৌবনে ফুটবল খেলতে নেমে, প্রথমদিন বাল্য —কৈশোরে দেখা পূর্বের আমাদের সব 'হিরোদের' কথা মনে করে খুব আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেছিলাম। তারপর দেখতে দেখতে নিজেও একদিন ঐ মাঠের 'হিরো' হয়ে গেলাম। কলেজের হয়ে এই মাঠে বহু শীল্ড-কাপ জয় করেছি। প্রিন্সিপ্যাল, বেঙ্গাবাবু, কলেজের শত শত ছাত্র আর শহরের শত শত মানুষের, ডি. এম. এ. ডি. এম. ও শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কত বাহবা ও স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি। ১৯৪১ সালে এই মাঠেই বাৎসরিক ঢাকা ইলেভন্ Vs. ময়মনসিংহ ইলেভনের প্রদর্শনী খেলায় ঢাকার ফুটবল টীম নিয়ে এলেন তখনকার মোহনবাগানের ভারত বিখ্যাত হাফ্-সেণ্টার এ. হামীদ। খেলা আরম্ভ হবার পূর্বে, ময়মনসিংহের ডি. এম মনে হয় হিউজ সাহেব, প্রিন্সিপ্যাল কুমুদবাবুর সামনেই একেবারে বিশুদ্ধ বাংলায় আমাকে বললেন, মানিক! ঢাকা যেন একটি গোলও দিতে না পারে, খবরদার! আমি তখন লেফ্‌ট ফুল ব্যাকে খেলি। ডি. এম সাহেবের সম্মান রেখেছিলাম। খেলার শেষে টাউন হলের ডিনার পার্টিতে, হামীদ সাহেব আমাকে সামান্য কিছু খেলার 'tips' দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। ঐ মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিন বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত এমনি কত স্মৃতি ছায়াছবির মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠল। একেবারে বাল্য থেকে আমার কুড়ি-একুশ বছরের নানা ঘটনা ও স্মৃতির জাবর কেটে চলেছি আজ সত্তর বৎসর বয়েসের এক বৃদ্ধ! কেমন লাগছিল, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু মনে হচ্ছিল, প্রায় সব কিছুই তো তেমনই আছে, শুধু আমিই বৃদ্ধ হয়ে গেছি, হয়েছি বিদেশী!

আবার রিকশায় বসে একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদের পারের রাস্তায় এসে দেখি, মহারাজ শশীকান্ত মহাশয়ের সেই সুন্দর ও বিখ্যাত বাগান-বাড়ি আলেকজ্যান্দার

ক্যাসেলের চিহ্ন মাত্রও আর নেই। সেখানে গড়ে উঠেছে ময়মনসিংহের বি. টি. কলেজের দোতালা দালান বাড়ি। আলেকজ্যান্দার ক্যাসেলের অবলুপ্তিতে খুবই বেদনা বোধ করলাম! পূর্বেই কোনও এক জায়গায় লিখেছি, ১৯৪৪ সালে বি. এ. পরীক্ষার শেষ দিনে, ময়মনসিংহ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে, বিকেলে এসে এই বাগান বাড়ির সামনে, ব্রহ্মপুত্রের পারে বসে, দূরে গাড়ো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে এখানের স্মৃতি তর্পণ করছিলাম। সেই স্থানটি মোটামুটি অনুমান করে নিয়ে কিছুক্ষণ রিকশায় বসে রইলাম, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদ ও ওপারের বহু দূরের গাড়ো পাহাড়ের দিকে চেয়ে, মনে হলো, ছেচল্লিশ ব'ছর পূর্বেও এই নদী ও পাহাড়কে এমনই দেখেছিলাম। রাস্তা-ঘাট, পাশে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা নদীর পার, এখানেই তো বসে বসে সেদিন স্মৃতি তর্পণ করছিলাম। ওদের তো কোন পরিবর্তন হয়নি, হয়েছে শুধু আমার, বয়সের ভারে আর রাজনৈতিক দাবার প্যাঁচে! আবার কুদ্দুস মিঞার রিকশা চলল জুবলী ঘাট হয়ে (যেখানে সাক্ষাৎ সেই কালান্তক সাত-আট ফিট লম্বা গোখরো সাপের স্পর্শ লেগেছিল)। এবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে কোর্ট-কাছারি পার হয়ে, মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুল ও রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় হয়ে, গোল পুকুর পারে পেঁছে, ডানদিকে একেবারে বেঙ্গল স্টুডিওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, যেথায় দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে কলেজ হোস্টেল থেকে বাস্তুহারা হয়ে, অনেকের সঙ্গে আমিও বাণীর দাদা অমল একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। রাস্তার ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, একপাশে সেরপুরের ন-আনির জমিদার বাড়িও তার উলটো দিকে মদনবাবুর (মট্‌কি) জমিদার বাড়ি, যেখানে অনুমান ১৯২৮ সালে প্রয়াত জে. এম. সেনগুপ্ত এসে উঠেছিলেন। আমি তখন কংগ্রেস টুপি মাথায় দিয়ে বালক ভলান্‌টীয়ার। উক্ত ন-আনির বাড়ির প্রয়াত কল্যাণ চৌধুরীর কথা মনে হল, যে ময়মনসিংহ জেলের সভায় আমার চরম দণ্ডের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল। তার ও তার পিতা-মাতার আদর যত্নের কথা ভোলার নয়। ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে প্রয়াত উকিল বঙ্কীম গাঙ্গুলীর কাছারী ঘর নজরে পড়ে। সেই সাথে মনে পড়ে বিনীত—বুলবুল কাহিনী।

এবার, ঐ মোড় থেকে ডান দিকের রাস্তায় ময়মনসিংহের মহারাজ প্রয়াত শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের প্রাসাদ শশী লজের সামনে যেয়ে দাঁড়ালুম। এটাকে করা হয়েছে কলেজ অব ড্যান্স এন্‌ড মিউজিক। প্রাসাদের গায়ের মেরুন রং ঝলসে গেছে। গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট অশ্বত্থ গাছ। চারদিক ঘেরা

অসংখ্য গ্ল্যাণ্ডিফ্লোরা গাছের একটাও নজরে পড়ল না। বাউণ্ডারি ওয়াল স্থানে স্থানে ভেঙে পড়েছে। কোন রক্ষণাবেক্ষণ আছে বলে মনে হয় না। এ দৃশ্য আর ভাল লাগছিল না বলে পুনরায় রিকশা চেপে স্বদেশী বাজারের ভেতর দিয়ে, নারায়ণ ঔষধালয় বাঁপাশের রাস্তায় রেখে, কে. ভি. দন্তের পুরানো দোকান ও স্টুডিও পার হয়ে (যার পুত্র আমার বাল্য বন্ধু কেতকী এখন কলকাতার P-3র মালিক), ফলপট্টি হয়ে, একটা কুপাড়ার রাস্তা ও বাঁদিকে মেছুয়া বাজার দিয়ে, লাহিড়ীবাড়ির সামনে এসে থামলাম। মনে পড়ল বাবা প্রত্যহ আপিস থেকে ঐ ফলপট্টি হয়ে বাড়ি ফিরতেন। আর ফলওয়ালারা বাস্তবিক প্রায় জোর করেই নানা রকমের ফলের ঝুড়ি ওঁনার হাতে তুলে দিতেন। ফলের ঝুড়ি ছাড়া বা খালি হাতে আপিস থেকে বাবাকে খুব কমই ফিরে আসতে দেখেছি।

যা হোক, তখন বেলা প্রায় দুটো বেজে গেছে বলে কুদ্দুস মিঞা কথা মত আমায় রেল স্টেশনে পৌঁছে দিল। তাকে ভাড়ার উপর আরও দশ টাকা বকসীস দিয়ে এবং তার যে দরদী ব্যবহার আমার ময়মনসিংহ দর্শনকে রমণীয় করে তুলেছিল, তার জন্য বার বার তাকে ধন্যবাদ জানালাম। ভাগ্নে টীপুর কাছে জানলাম বেলা চারটের পূর্বে কোন ট্রেন নেই, তা ছাড়া সেটা সত্যি কখন আসবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। টীপু মনে হয় তিন দিনেই একটু হোম-সীক্ হয়ে পড়েছিল। তার জোরাজুরিতেই একটা ঢাকাগামী বাসে চেপে বসলাম।

১৯২১ সালে জন্মের পর থেকে ১৯৩৩ সাল অবধি প্রতি ব'ছর পুজোর ছুটিতে, ময়মনসিংহ থেকে নারায়ণগঞ্জে যে রেল লাইনে যাতায়াত করেছি বাবা, মা ও সব ভাইবোনদের সঙ্গে, সেই পুরানো পথে, সব দেখতে দেখতে পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে যাব, আজ প্রায় সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে এই আশাই মনে মনে পোষণ করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তা আর হল না। স্বপ্নের সেই প্রিয় স্টেশন, সুতিয়াখালি, ধলা, গফরগাঁও, ভাওয়াল সন্যাসীর মামলা খ্যাত জয়দেবপুর, কাওরাইত ইত্যাদি আরও কত ছোটবড় স্টেশন, জয়দেবপুরের লালমাটির গড়, যা মা ও আমি গাড়ির কামরায় বসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দেখতাম, সে সব কিছুই এ জীবনে আর দেখা হল না।

নূতন বাস পথে যেতে যেতে সেই চিরন্তন বাক্যটিই বার বার মনে হল, 'মানুষের সব আশা তো পূর্ণ হয় না।' ১৯৮৬ সালে মার মৃত্যু পর নিজেরও স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেলে, বাংলাদেশে আর যাওয়া হবে না বলে যখন স্থির করে চোখের জল ফেলতাম, তখন বাণী আমাকে সান্ত্বনা দিতে এই কথাটাই বলত,

'কোন মানুষেরই জীবনের সব আশা পূর্ণ হয় না, এই ভেবে মনকে শক্ত কর। কিশোরগঞ্জে তো আমারও কত সুখস্মৃতি পড়ে আছে, আমার এতো রোগ না থাকলে তো তোমার সঙ্গে আমিও সেখানে যেয়ে কত আনন্দ পেতাম। আমিতো আমার রোগের কথা ভেবেই নিজের মনকে শক্ত করে রেখেছি।' সেদিন বাস যাত্রাপথে বাণীর এই কথাগুলো বারবার হয়তো হালকা মনেই ভেবে চলেছিলাম। কিন্তু আজ আমার এই স্মৃতি চারনার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে, বাণী কি মৃত্যু দিয়ে তার ঐ সান্ত্বনা বাক্যকে আরও প্রকৃষ্টরূপে বুঝিয়ে দিয়ে গেল ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ আর ১৯৪৪ সালের পরে ময়মনসিংহ শহরের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না।

কোচবিহারের একটা হারিয়ে যাওয়া কাহিনী খুঁজে পেয়ে এখানে সংযোজন করে দিলাম।

বড় ছেলে ফল্গু কোচবিহারের এক বাড়ি থেকে একটি সুন্দর কালো কুকুর ছানা পোষার জন্য নিয়ে আসে। সে-ও তখন একেবারেই বাচ্চা। অনিচ্ছা থাকলেও, ছেলের আবদার রক্ষার জন্য কুকুর ছানাটাকে রেখে দিলাম। ওটার শরীরের লোম ছিল মিশমিশে কালো এবং glossy. খুব সুন্দর কিন্তু দো-আঁশলা। একদিন ঐ বাচ্চাটার মাকে দেখলাম আমাদের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। ঐ মা-কুকুরটাকে দেখে বুঝলাম ওটা খুব ভাল জাতের। তাই বাচ্চাটার যত্ন-আদর আরও বেড়ে গেল। এটা ছিল বিচ্। বাণীদের কিশোরগঞ্জের বাড়িতে দিশী-বিদেশী অনেক কুকুর থাকলেও, তাদের কেউ ট্রেনিং দিতে জানত না। বাল্যকালে আমিও কুকুর পুষেছি, কিন্তু ট্রেনিং দিতে শিখিনি। বাচ্চাটা যত্নে ও আদরে বড় হতে থাকে। কিন্তু কোনও রকম ট্রেনিং না পেয়েও কুকুরটা বেশ বোঝদার হয়ে ওঠে। ওর নাম রাখা হলো 'কেটি'। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই উগ্র জাতীয়তা বোধের "অ্যাংরেজী হটাও"-এর মানসিকতায় ঐ 'কেটি' নাম অনেকের 'না-পছন্দ' হওয়ায়, আমরা ওটাকে 'কতি' বলে ডাকতাম। এই সময় একবার বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে আকাশ পথে আমায় কলকাতা আসতে হয়। তখন কোচবিহারের ঐ অনেকটাই কাঁচা বাড়িতে, বাণী ও দুই শিশু পুত্রকে এক গভীর অন্ধকার রাতে ঐ 'কতি'-ই চোরের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

যেবার 'কতি'-র প্রথম বাচ্চা হয়, সেবার সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে। রাত তখন এগারটা। কাজের চাপে আমি তখনও আপিসে। দুই ছেলেই ঘরে

ঘুমুচ্ছে। বাণী আমার অপেক্ষায়, বিছানায় মশারির ভেতর শুয়ে একটা বই পড়ছে। ঘরের পেছনে পার্টিশান দেয়া একটা ছোট ঘরে 'কতি' থাকতো। সেখান থেকে উঠে এসে, কুঁই কুঁই শব্দ করে সে বারবার মুখ ও সামনের পা দিয়ে মশারি টানাটানি করতে লাগল। বাণী দু-একবার তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে, তারপর হঠাৎ খেয়াল করে যে কতির হয়তো প্রসব ব্যথা হচ্ছে। তখন, ঘরের বারান্দায় পাহারারত সেপাই 'মোদককে' ডেকে তার সাহায্যে ঝুড়ি, বস্তা ইত্যাদি দিয়ে ঐ ছোট ঘরেই 'কতি'-র প্রসবের ব্যবস্থা করে দিলে সে শান্ত হয় ও বাচ্চা প্রসব করে। কোচবিহার ও পরে কলকাতায় এসেও 'কতি' এমন বোঝদার অনেক কাণ্ডকারখানা করেছে। আমরা বদলি হয়ে কলকাতা আসার সময় কতির চারটে বাচ্চা ছিল। সেগুলো কাকে কাকে দেয়া হবে, সেটা সেপাই মিশিরের উপর দায়িত্ব দিয়ে কতিকে একটা শেকলে বেঁধে আমরা কোচবিহার রেল স্টেশনে এসে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে তাকে একটা বেঞ্চের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখি। অন্যদিকে, যখন বিদায় মুহূর্তে আমরা সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছি, তখন হঠাৎ বড় ছেলে ফল্গু চীৎকার করে বলে, 'কতি' শেকল ছিঁড়ে বাড়িতে যেয়ে তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছে। ওদিকে গাড়ি ছাড়ারও সময় হয়ে গেছে। মিশির, শেরপা ও মোদক তিন জন সেপাইকেই কতিকে ধরে নিয়ে আসতে বলে, আমি গাড়ির গার্ডকে ঘটনাটা জানালে, পূর্ব পরিচিত গার্ডসাহেব আমাকে বলেন, আপনার কুকুর এলেই গাড়ি ছাড়ব। কতির বাচ্চাগুলোকে কোচবিহারেই রেখে আসাটা ফল্গুর অবুঝ মনে খুব আঘাত লাগায়, সে বারবারই আমাকে বলছিল, "এটা খুব নিষ্ঠুর কাজ হচ্ছে।" কলকাতার ছোট্ট ভাড়াটে বাসায়, একটা কুকুর পোষাই নানা অসুবিধার সৃষ্টি করবে, সুতরাং সেখানে পাঁচ-পাঁচটা কুকুর নিয়ে আসা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু বালক ফল্গুর পশুর প্রতিও ঐ সূক্ষ্ম অনুভূতি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। যা হোক, কতিকে আবার নিয়ে আসার পর, প্লাটফর্ম ভর্তি বহু আপন ও প্রিয়জনকে চোখের জলে বিদায় জানাবার ফাঁকে এক সময় গাড়ি ছেড়ে দিল। 'কতি' আমাদের সঙ্গে কলকাতা এসে টালিগঞ্জ চণ্ডীতলার ভাড়া বাড়িতে পাঁচ ব'ছর কাটিয়ে, আমার বর্তমান নিজস্ব বাড়িতে এসে ১৯৬৫ সালে আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে যায়। কতবার যে তাকে পশুচিকিৎসক দিয়ে, এমন কি বেলগাছিয়ার পশু-হাসপাতালে পাঠিয়েও চিকিৎসা করেছি তার কোন হিসেব নেই। কতির মৃত্যুদিনে পরিবারের সবার চোখেই জল ঝরেছে। 'কতির' কথা আমরা ও আমার ছেলেরা এখনও মাঝে মাঝে স্মরণ করি, এলবামে রাখা তার ছবি দেখি। কুকুর বড়ই মায়াভরা প্রভুভক্ত জীব।

পিতৃভূমি হামছাদি

বাংলাদেশে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায়, পরগণা 'সোনারগাঁও'এ হামছাদি গ্রামে ছিল আমাদের বাড়ি। নারায়ণগঞ্জ এখন জেলা শহর হয়ে গেছে। এই নারায়ণগঞ্জের দশ মাইল পূর্বে ছিল ঐ গ্রাম আরও আধ মাইল পূর্বে মেঘনা নদী, যার অন্য পাড়ে কুমিল্লা জেলা। বর্ষারম্ভ থেকে ছ-সাত মাস জলপথে, নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টীমার, লঞ্চ ও নৌকো যোগে হামছাদি যেতে হত। অন্যসময়ে পায়ে হেঁটেও মানুষ যাতায়াত করত। আমরা বেশিরভাগ নৌকো করে শীতলক্ষা নদী পার হয়ে, নানা নামের খাল দিয়ে যেয়ে একেবারে বাড়ির ঘাটে নৌকো লাগাতাম। পথে পড়ত, 'কাইক্যার টেক্' 'মোগরার পার', 'উদ্ধবগঞ্জ' ও 'মুনসিডাইলের' মতো নামী হাট-গঞ্জ ও বহু হিন্দু ও মুসলমান গ্রাম। ত্রিবেণী খালের পারেই ছিল ঈশাখাঁর এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ। আর মোগরার পারেও তেমনই আরও একটি। শুনেছি এই মোগরার পারই ছিল ইশাখাঁর রাজধানী।

শীতলক্ষা ছিল বড়ই সুন্দর নদী। এর জল-হাওয়াও ছিল তেমনি স্বাস্থ্যকর। বহু ধনী ও মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে, এই শীতলক্ষার উপরে গ্রীন্ বোটে (পিনিশ) বাস করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেত। আমরা বহু ব'ছর, একেবারে শিশুকাল থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত বাবার চাকুরিস্থল ময়মনসিংহে ও পরে কিশোরগঞ্জে থাকতাম। ময়মনসিংহ থেকে ই. বি. আর.-এর (East Bengal Rly.) গাড়িতে ৪/৫ ঘণ্টায় নারায়ণগঞ্জে বেলা বারটা নাগাদ পেঁছে, নৌকোয় হামছাদি রওনা হতাম। পূর্ব ব্যবস্থা মত দেশের বাড়ি থেকে জেঠামশাই তিন চার মাল্লাই (মাঝি) এর পরিচিত নৌকো নিয়ে নারায়ণগঞ্জে অপেক্ষা করতেন। 'ডাকাতে' নৌকোর ভয়ে পরিচিত নৌকোর এ ব্যবস্থা। নারায়ণগঞ্জে থাকতেন ছোটমামা প্রয়াত হেমেন্দ্রনাথ দেব, এম. এ বি. এল। ঐ পরিবারে আমার এক মাসতুত ভাই শ্রীঅনিল দত্তও থাকতেন এবং স্কুলে পড়তেন। পূর্বে খবর দিলে, মামা অথবা অনিলদা টিফিন কেরিয়ারে ঐ নৌকো ঘাটে আমাদের খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতেন। নৌকোয় বসেই সকলে ভাত খেয়ে হামছাদির পথে রওনা হতাম। ছোটমামাকে খবর দিতে না পারলে, নারায়ণগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রয়োজন মত দুপয়সা (পুরানো) মূল্যের একেকখানি বিখ্যাত ঢাকাই-বাখরখানি এবং বার পয়সা (পুরানো) সেরের ক্ষীরমোহন বা চৌদ্দ পয়সা

সেরের ঢাকাই স্পেশাল লাল-মোহন কিনে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেয়া হত। তারপর শীতলক্ষার বড় বড় ঢেউ-এ, ভয়ে ভয়ে দুলতে দুলতে নদী পার হয়েই ত্রিবেণী খালে পড়ে সকলে একসঙ্গে খেতে সুরু করে দিতাম।

পূর্বে, ময়মনসিংহ থেকে প্রতি ব'ছরই সকলে মিলে পুজোর এক মাসের ছুটিতে হামছাদি বেড়াতে যেতাম। দেশের প্রতি বাবার খুবই আকর্ষণ ছিল এবং সেটা পরে আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়। রওনা হবার দশবারো দিন পূর্ব থেকেই আমাদের ভাইবোনদের ছোটাছুটি ও উল্লাস সুরু হয়ে যেত। তারপর এক কাকভোরের আধো-অন্ধকারে ময়মনসিংহের বাসা থেকে ঘোড়ার গাড়ি চেপে আসতাম রেল স্টেশনে। অন্য সব প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্গে থাকতো এক গাঁট ধুতি ও শাড়ি। বাবা প্রতি ব'ছর সেগুলো বাড়িতে নিয়ে যেয়ে গরীব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের দিতেন।

এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিলে, আমি ও মা, কিছুটা অন্য ভাইবোনেরাও প্রত্যেকটা স্টেশন এক ব'ছর পরে পুনরায় দেখবার জন্য এবং নামগুলো পড়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতাম। "সুতিয়াখালি, ধলা, গঁফরগাঁও, জয়দেবপুর, টঙ্গি, ঢাকা (ফুলবাইরা), দোলাইগঞ্জ, ফতুল্লা, চাষারা" ইত্যাদি আরও কত স্টেশন পথে পড়তো। এগুলো দেখা আর নাম পড়ার মধ্যে কেমন একটা আনন্দ পেতাম। জয়দেবপুরের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা খ্যাত, ভাওয়াল গড়ের লাল মাটির গভীর জঙ্গল দিয়ে যখন গাড়িটা হুইসল্ দিতে দিতে দ্রুত এগিয়ে যেত, তখন সবাই মিলে কেমন একটা আনন্দ-শিহরণ অনুভব করতাম। কামরায় কোন ভীড় থাকতো না। আমরা সারা কামরা ঘুরে বেড়াতাম, যে কোন জানালার পাশে বসে বাইরে গ্রামের দৃশ্য দেখতাম। প্রতিবারই, এই যাত্রাপথে কোনও না কোন সহযাত্রী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ও হত, যাদের সঙ্গে এ জীবনে পুনরায় আর বড় একটা সাক্ষাৎ হয়নি। ঢাকা স্টেশন থেকে গাড়িটা ছাড়লেই ডানপাশের জানালা দিয়ে দেখতাম বিরাট লম্বা লম্বা দেয়ালে, তেমনি বিরাট হরফে লেখা, "জি ঘোষের তিল তেল," "শক্তি ঔষধালয়" নাকি "সাধনা ঔষধালয়" ইত্যাদি আরো কতো কিছুর প্রচার। নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতাম আর নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে প্ল্যাটফরমে আমাদের সকলের অতি প্রিয় জেঠামশাইকে খুঁজে দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠতাম।

নারায়ণগঞ্জ স্টেশনের মত এমন সুন্দর ও পরিস্কার স্টেশন আমি আর বড়

একটা দেখিনি। একদিকে রেল স্টেশন আর উলটো দিকে স্টীমার জেটি। দেখতেও অপূর্ব, ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। শীতলক্ষা বড়ই ব্যস্ত নদী ছিল। কত স্টীমার দাঁড়িয়ে থাকতো। বহু মোটর লঞ্চ হুইসল্ দিতে দিতে ব্যস্তভাবে এদিক সেদিক যাতায়াত করত। নৌকোর তো সীমা-সংখ্যা ছিল না। স্টেশনে নেমেই মনে হতো যেন একটা 'মেলায়' এসেছি।

যাহোক, পূর্বে উল্লিখিত ত্রিবেণীর খাল দিয়ে যেতে ঈশাখাঁর ভাঙ্গা দুর্গ দেখলেই, মা খানিকক্ষণ নৌকো থামিয়ে দুর্গটা দেখতেন আর নানা ঐতিহাসিক আলোচনা করতেন। কেদার রায়, ঈশাখাঁ, শ্রীমন্ত, চাঁদ রায়ের বিধবা মেয়ে 'সোনা', সেনাপতি 'কার্ভালো'-র ইতিহাস! এই 'সোনার' নামেই নাকি ঈশাখাঁ তাঁর রাজ্যের নাম রেখেছিলেন সোনার-গাঁও। আবার সেই খাল দিয়ে নৌকো এগিয়ে চললে, আমরা দেখতাম, ছোট্ট খালের দুদিকেই হালকা ঝোপ জঙ্গলের মাঝে চাষী কৃষক ইত্যাদি মানুষের বাড়ি ঘর। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে খালের জলে বড় বড় গাছের মোটা শুকনো ডালের বাঁধানো ঘাট। কোনটায় কেউ করছে স্নান, কোনটায় বড়শি দিয়ে কেউ ধরছে মাছ, কোনটায় কেউ পাট ধুচ্ছে আর কোনটায় কোন গাঁয়ের বধূ মাজছে বাসন। ছোট ছোট কত নৌকো এদিক ওদিক যাচ্ছে। খালের দুপারেই সবুজের সমারোহ। জল এতই স্বচ্ছ যে দুহাত জলের নিচেও মাছের চলাফেরা নজরে পড়ে। ধীরে ধীরে নৌকো এসে পড়ত ব্রহ্মপুত্র নদে। ব্রহ্মপুত্র এখানে বেশ ছোট। তবু দেখতাম, এর উপর দিয়ে একশত থেকে পাঁচশত মনি (Mound) নৌকো সোনা রঙের সব পাঠ বয়ে নিয়ে চলেছে নারায়ণগঞ্জের পাটগুদামে পেঁছে দিতে। সেখান থেকে বড় বড় স্টীমারে সব যাবে জলপথে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার গঙ্গার ধারের জুট মিলগুলোতে।

ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে নানা নামের খাল দিয়ে, 'মোগরার' পারের ঈশাখাঁর ভগ্ন দুর্গ—প্রাসাদ ও রাজধানী দেখে যখন হামছাদির নিকটে পেঁছিতাম, তখন দূর থেকে আমাদের গ্রামের খুব একটা উঁচু ঝাউগাছ দেখে, কেউ নৌকোর সামনের গলুই-এ দাঁড়িয়ে আর কেউ 'ছৈ'-এর উপর বসে হাততালি দিয়ে আনন্দে নেচে উঠতাম। খালে চলার পথে আশেপাশের কচুরিপানার হাজার-হাজার বেগুনি রং এর সুন্দর ফুলের ছড়াছড়ি, মাঝে মাঝে সাদা বা লালা রং-এর শালুক ফুল, অনেকটা জায়গা নিয়ে হিজল গাছের ঝরে পড়া লাল রং-এর ছোট ছোট ফুলে জলে রং খেলার মেলা, গাছে গাছে নানান পাখির ডাক, কচুরীপানা বা জংলী

গাছের জলে ভাসা 'দামে' দাঁড়িয়ে বহু রং-এর বকের মাছ ধরার প্রয়াস, খালের ধারে গাছের ডালে মাছরাঙ্গা পাখির নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার প্রচেষ্টা, দূরে থেকে ভেসে আসা ঘুঘু পাখির 'মনকারা' ডাক, সব মিলিয়ে কি সুন্দরই না ছিল আমাদের সেই স্বপ্নের দেশ ও গ্রাম। আজ এই চল্লিশ ব'ছরের অদর্শনেও সে সব স্মৃতি স্বচ্ছ হয়ে চোখে ভাসে, মনকে কাঁদায়। বিকেল-সন্ধ্যায় বাড়ির ঘাটে নৌকো পেঁছুলে একেবারে হৈ চৈ লেগে যেত। আশেপাশের বাড়ির বহু লোকই ঘাটে জড়ো হয়ে থাকতো। নৌকো থেকে মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম, কোলাকুলি ও আদরের হিড়িক পড়ে যেত। এক ব'ছর পরে, আপন ও প্রিয়জনদের সঙ্গে এই মিলনের আনন্দ ভোলার নয়।

বাবারা ছিলেন চার ভাই এক বোন। সর্বশ্রী রমেশ রায়, উমেশ রায়, দীনেশ রায়, নরেশ রায় ও বোন শ্রীমতি লবঙ্গ রায়। শেষের দুজন পিতামহ প্রয়াত মহেশ রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের। জেঠামশাই রমেশবাবু দেশভাগের পরেও সেখানে থেকে যান এবং দেহ রাখেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে, আমার ছোট বোন রাণী স্বামী পুত্র কন্যাসহ বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে আছে। জেঠীমা সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বড় কাকা দীনেশবাবু ঢাকায় চাকুরি করতেন। দেশ ভাগের পর তিনি ও কাকিমা আগরতলায় যেয়ে মেজ ছেলে পথিকের বাড়িতে মারা যান। ছোটকাকা নরেশবাবু ১৯২৮/২৯ সাল থেকেই কলকাতা ট্রাম কোম্পানীতে চাকুরি করতেন। কয়েক ব'ছর পর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পিসিমা বিয়ের পরে রংপুরে থাকতেন। দেশ ভাগের পর বিধবা অবস্থায় এক পালিত পুত্রকে নিয়ে অসমের বরপেটায় চলে যান। সেখানেই তাঁরও মৃত্যু হয়। এঁদের সকলের সঙ্গেই আমার গভীর পরিচয় ছিল, তাঁদের অফুরন্ত স্নেহ-ভালোবাসাও পেয়েছি। আমাদের ময়মনসিংহের বাসায় এঁরা সকলেই যাতায়াত করতেন। কিশোরগঞ্জের বাসায়ও অনেকেই গেছেন। আমার শ্রীরামপুরের, টালিগঞ্জ চণ্ডীতলার বাসায় আর বর্তমান বাড়িতেও কেউ কেউ এসেছেন।

আমরা যে 'হামছাদি' দেখেছি তাকে একেবারে অজগ্রাম বললেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ষাকালে তো আশেপাশের গ্রামে যেতে হলে নৌকো ছাড়া উপায় ছিল না। শুকনোর দিনেও গরু-মোষের গাড়ি চলত না, সোয়ারি, পালকি, ঘোড়া আর পায়ে হাঁটা ছাড়া কোথাও যাবার উপায় ছিল না। বিজলী বাতির তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত এই গ্রাম একদিন খুবই উন্নতমানের ছিল। ছোট চৌকো ইটের গাঁথুনিতে গড়া তিনটি বহু

পুরানো দুতিন তলা বাড়ি আমি দেখেছি। একটিকে বলা হত পাঁচআনি বাড়ি, অন্যটি একআনি আর একটি দশআনি বাড়ি। প্রথম দুটিতে প্রবেশ করতে সাহস পাইনি সাপের ভয়ে। দশআনি বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির খুব নিকটেই, দোতলা বাড়ি আর একপাশে বৃহৎ ও মজবুত পুজামণ্ডপ। খুব ছোটবেলায় একটি বিধবা বৃদ্ধা মহিলাকে সে বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখতাম। কিন্তু একটু বড় হয়ে আর দেখতে পাইনি। কিছুদিন পর সেই দোতলাটাও ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। একতলাটা খালি পড়েছিল। এসব বাড়ির সঠিক ইতিহাস কাউকে জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারিনি। কিন্তু এসব বাড়ির খানদান তাকালেই অনুমান করা যেতো। ঐ দশআনি বাড়ির একপাশে যে বিরাট লম্বা ঘোড়ার আস্তাবল ছিল তার চিহ্ন তখনও বর্তমান। গ্রামের দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি দুটো দেখবার মতো বিরাট দিঘী ছিল, একটার নাম 'কৃষ্ণসায়র', অন্যটা 'রামসায়র'। এগুলো সবই ঐ গ্রামের উন্নতমানের চিহ্ন। কিন্তু আমাদের সময় তার কিছুই আর ছিল না, কেউ বোধ হয় এর ইতিহাসও জানত না। আমি ওগুলো দেখতাম আর অতীতকে কল্পনা করতাম। আমি যে ইতিহাসের ছাত্র!

চারটে পাড়া নিয়ে প্রায় দুশত বাড়ির গ্রাম। দুঘর ব্রাহ্মণ আর প্রায় মোটামুটি বৈদ্য ও কায়স্থ। বৈদ্যরাই ছিল শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে খুব উন্নত। ঐ সব বৈদ্যবাড়ির লোকেদের সাংস্কৃতিক মান আমি অনেক ছোট শহরেও দেখিনি। ঐ সব পরিবারের লোকেরা শিক্ষিত কায়স্থ পরিবারের লোকেদের নিয়ে প্রায়ই বেশ উচ্চমানের যাত্রা-থিয়েটার করত। আমিও বাল্য-কৈশোরে ঐরকম এক বাড়ির বদান্যতায় ছেলে-মেয়েরা একসাথে মিলে থিয়েটার করেছি। এটা ১৯২৭/২৮ সালের কথা। গ্রামে আমি একটা জেলা বোর্ডের মাইনর স্কুল দেখেছি। গ্রামের ছেলেরা ঐ স্কুল থেকে পড়াশুনো করে অনুমান দেড়/দু মাইল দূরে 'পানামের' জি. আর. ইনষ্টিটিউশানে পঞ্চম শ্রেণী থেকে এনট্রান্স বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়তে পারত। পাড়াগুলোর নাম ছিল কাশীপুর, দুর্গাপুর, গয়াপাড়া ও ভবানীপুর। প্রথম দুটো পাড়াই ছিল বেশি উন্নত।

যাক, পূর্বে উক্ত পুজোর এক মাসের ছুটিতে বাড়িতে এসে মনে হত, মাসটা বড়ই ছোট, কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরই পেতাম না। নৌকোয় চেপে সবাই মিলে আশেপাশের গ্রামের আত্মীয়-কুটুমের বাড়িতে যেয়ে সারাদিন হৈ চৈ করে, ভাল-মন্দ খেয়ে আবার বিকেল-সন্ধ্যায় ফিরে আসা। পালটা আবার আত্মীয়-স্বজনের নৌকো এসে আমাদের ঘাটে লেগে বাড়িতে আনন্দ-উৎসব, বছরের ঐ

একবারের দেখা-সাক্ষাৎ ও মিলনের মধ্যে সকলের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের গভীরতা বুঝি বলে বা লিখে বোঝাবার নয়। গ্রামের বহু প্রতিবেশীকেই মনে হতো আত্মীয় বা তার চাইতেও বেশি। ঐ একমাসে, পনের দিনও বাড়িতে খেতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

যে দুটো বাড়ির কথা মনে হলে, আজও খুব আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি, তার একটি হ'ল প্রয়াত সুরেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও অন্যটি প্রয়াত কৃষ্ণচন্দ্র দাস-গুপ্তের বাড়ি। প্রথমটি 'দশ-ভাইয়া' বাড়ি বলেও পরিচিত ছিল। সবার ছোট ঐ সুরেন্দ্রবাবুই শুধু দেশে থাকতেন, অন্য ভাইরা সব বাইরে বিভিন্ন স্থানে চাকুরি করতেন। সুরেন্দ্রবাবুকে আমি দাদু বলে ডাকতাম। বড়ই স্নেহ করতেন আমাকে। বাড়িতে গেলে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। ঐ বাড়ির আরও অনেকের আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছি, পেয়েছি ওঁদের অনেকের নিকট থেকেই আমার জীবনের অনেক শিক্ষা ও কৃষ্টি। তাই আজও ওঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ঐ বাড়ির লালুতো আমার বাল্য বন্ধু, যার সঙ্গে আজ ষাট ব'ছরেও আমার যোগাযোগ নষ্ট হয়নি। ঐ বাড়ির মনু কাকু, ছুট্টু কাকুর আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি, এখনও পাই। আর দ্বিতীয় বাড়িটির কাকীমা, তাঁর মেয়ে পুতুলদি, খুনুদি, রুনু, ওঁদের ভাই প্রয়াত স্বরাজ, লবু-কুশু ইত্যাদি আমাকে যে কি অপার স্নেহ ভালবাসার বন্ধনে আজও বেঁধে রেখেছেন তা বলে বা লিখে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। ওঁরা আমার প্রতিবেশী, একথা আমি কোনদিন মনে করতেই পারিনি। দেশ বিভাগের ঝড়-বাতের ধাক্কা বা উৎপাতও আমাদের বন্ধন এতটুকু ছিন্ন করতে পারেনি। উক্ত খুনুদির সঙ্গে আমার স্ত্রী বাণীর পরিচয় বহু দিনের। ১৯৮৪ সালে আমাদের পরিবারের সকলে বেড়াতে গিয়েছিলাম দার্জিলিং-এ। সেবার আমরা ঐ ভ্রমণে পশুপতি ও ধুলাবাড়ি (নেপাল), মিরিক লেক, সিকিম, কালিমপং, জলদাপাড়া, ফুন্‌সিলিং (ভুটান) ইত্যাদি বেড়িয়ে কলকাতা ফেরার পথে, পূর্ব ব্যবস্থা মতো, নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের স্টাফ কোয়ার্টারে, খুনুদি, রুনু, তাদের ভাই মানিক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসি। খুনুদির খুব ইচ্ছে ছিল আমার ছেলে, বৌ ও নাতি-নাতনীদের দেখা। এই সুযোগে সেটা ঘটে গেল। খুনুদির সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে বাণী বলতো, এতো ভাল মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি। উক্ত সাক্ষাতের পরও বাণী তার ঐ কথার পুনরুল্লেখ করেছিল।

আমাদের গ্রামে চৈত্র মাসের শেষ দিনে ও ১লা বৈশাখে ৺পাগলনাথের পুজো হত। সুরেন্দ্রবাবুদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে 'জিয়স' পুকুরের পারে এই উপলক্ষে চার দিনের মেলা বসত। লোকে বলত, 'পাগলা (মহদেব) মেলা'। এই মেলায় হিন্দু মুসলমানের প্রায় সমান সমাবেশ হত। এই পুজোর পেছনে সুন্দর একটা প্রবাদ আছে। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেটা আর লেখা হল না। ঐ সুরেন্দ্রবাবু অন্য শরিকদের সঙ্গে এটা পরিচালনা করতেন। দুতিন বার ঐ পুজোর সময় আমি বাড়িতে ছিলাম বলে, তিনি আমাকেও নানান কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। চাকুরিতে যোগ দেবার পর আমি দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঐ পুজো ও মেলার খরচের জন্য প্রতি ব'ছর সুরেন্দ্র দাদুর কাছে M. O. করে সামান্য টাকা পাঠাতাম। ঐ পুজো ও মেলা উপলক্ষে, গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ি আত্মীয়-কুটুমে ভরে যেত। প্রায় সাতদিন উৎসবের আনন্দে আমাদের গ্রামতো বটেই, আশেপাশের কিছু গ্রামও মেতে উঠতো। সুরেন্দ্রবাবুর সেই সুন্দর ও সুপুরুষ চেহারা এখনও চোখে ভাসে। দেশ ছেড়ে এসে ঐ ধরণের মানুষ আর চোখে পড়েনি।

হামছাদি গ্রামে দু-তিনখানা দালান-বাড়ি থাকলেও আমাদের তা ছিল না। কিন্তু প্রায় পনের বিশ কাঠা জমির উপর চক মেলানো অমন সুন্দর বাড়ি খুব কমই দেখেছি। মাঝখানে বিরাট উঠোন রেখে প্রায় জ্যামিতিক মাপে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চারখানা বিরাট বিরাট ঘর। ঘরের বেড়া হয় ভাল কাঠের নয়তো কাঠের ফ্রেমে লাগানো টিনের, কোন ঘরে টিনের আর কোনটায় ছনের চাল। প্রত্যেকটি ঘর ছবির মতো সুন্দর করে গড়া। ভেতরে কাঠের বা টিনের শীলিং, উপরে বহু মাল-পত্র রাখার জায়গা। ঐ চারখানা বড় ঘর ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে, যথা, বৈঠকখানা, আমিষ-নিরামিষ রান্না ইত্যাদির জন্য ছয়-সাত খানা ছোট ছোট ঘর ছিল। পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে ছিল আব্রু দেয়া ভারি সুন্দর তিনখানা ছোট্ট উঠোন মেয়েছেলেদের জন্যে। উত্তর সীমানায় এমন ঠাসা বাঁশের ঝাড় ছিল যে সাপও গলে আসতে পারতো কিনা সন্দেহ। এতে শীতে উত্তরের হাওয়াও আট্‌কাতো। পূর্ব দিকে ছিল পুকুর। পুরুষ ও স্ত্রীলোক-দের আলাদা আলাদা ঘাট। দক্ষিণে ছোট মাঠ, তারপরেই খাল। মেঘনার জোয়ার ভাটায় খালের জলে মৃদু আলোড়ন বোঝা যেত। ঐ খালের সঙ্গে পুকুরের একটা যোগাযোগ পথ ছিল, মাছ চাষের জন্যে। সেটা প্রয়োজন মত খোলা বা বন্ধ করা যেত, একটা বাঁশ ও সুতোর মিশ্রিত জালে।

উপরিউক্ত পানামের হাই-স্কুলে (জি আর ইন্‌স্টিটিউশান) আমার পড়ার কোন সুযোগ না হলেও, একবার এই স্কুলের হয়ে আমাকে ফুটবল খেলতে হয়েছিল। ১৯৩৮-এর মার্চে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে, দেশের সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে, জেঠামশাই-এর কথা মতো দু-মাসের জন্য হামছাদি এসেছিলাম। উক্ত হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রী ডি. এল. দাস (পরে উনি, পি. এইচ ডি. পেয়ে কিশোরগঞ্জের নতুন কলেজে প্রিন্‌সিপাল হয়ে যোগ দেন) তখন জেঠামশাই-এর গানের আসরের বন্ধু। জেঠামশাই খুব ভাল তবল্‌চী ছিলেন। আমি তখন ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে ইনটারস্কুল ফুটবলে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের একজন। জেঠামশাই-এর নিকট ঐ খবর জেনে উক্ত হেডমাষ্টার মশাই আমাদের বাড়িতে এসে পানাম স্কুলের হয়ে একটা শীল্ড কমপিটিশানের সেমিফাইনাল ও প্রয়োজনে ফাইনাল গেম্‌টাও খেলে দিতে অনুরোধ করেন। গ্রামে আমার খেলায় বাবার বারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত হেড্‌মাষ্টার ও জেঠামশাই-এর অনুরোধে আমি খেলতে বাধ্য হই। আমি তখন "লেফ্‌ট-ইন" পজিশানে খেলি। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল দুটো গেমেই পানাম স্কুল জয়ী হয়, অন্যদিকে দুটোতেই আমি জয় সূচক গোল করায়, আমাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ করা হয়। আমাদের গ্রামের, পূর্বে উল্লিখিত সুরেন্দ্র সেন মহাশয়, ঘোড়ায় চেপে 'কোদালিয়ার' মাঠে খেলা দেখতে এসেছিলেন। ফাইনাল খেলার শেষে মাঠে প্রবেশ করে উনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে বলেন, "আজ তুমি 'হামছাদির' গর্ব। আমার ঐ ঘোড়ায় চেপে তুমি বাড়ি যাও, আমি হেঁটে আস্‌ছি। আর আজ রাতে তুমি আমাদের বাড়িতে খাবে, ভুলনা যেন।" আমার কোনও আপত্তি-ই উনি শুনলেন না।

ফাইনাল খেলাটা খুব 'টাফ্‌' হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের একটা টীমে, পাট-গুদামের কয়েকটা 'টেশ্‌' সাহেব আমাদের বিরুদ্ধে খেলছিল। দুটো গোল খেয়ে একটা সাহেব রেগে যেয়ে তৃতীয় গোল বাঁচাতে ওদের পেন্যালটি এরিয়ার মধ্যেই বুট পরা জোড় পায়ে আমার পেছন দিক থেকে কোমরে লাফিয়ে পড়ে আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর এক ব'ছর আমি আর খেলতে পারিনি। পরে নানাভাবে চিকিৎসা করে সুস্থ হলেও, ক্ষিপ্রতা হারিয়ে আমাকে ডিফেন্‌সে ফুলব্যাক পজিশানে চলে আসতে হয়। জানি না, এটা বাবার অবাধ্যতার শাস্তি কিনা! যা হোক, সেই পজিশানেও আমি ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত, ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ ফুলব্যাকের সম্মান পেয়েছি। অন্যদিকে পানাম স্কুলের উক্ত জয়ের জন্য, Ex-student জেঠামশাই, বাবা, কাকা ও মামাদের আশীর্বাদও

পেয়েছি। উক্ত ডঃ ডি এল দাস তাঁর অবসর জীবনে আমাদের বর্তমান এলাকাতেই বাড়ি করেছিলেন। আমার স্ত্রী বাণী কিশোরগঞ্জ কলেজে ওনার প্রিয় ছাত্রী ছিলো। মাঝে মাঝে, ডঃ দাস আমাকে ও বাণীকে ওনার বাড়িতে ডেকে আদর-যত্ন ও আলাপ-আলোচনা করতেন।

১৯৪৭ সালের অগাস্টে হয়েছিল দেশভাগ। পাশপোর্ট-ভিসা চালু হবার পূর্বেই, জেঠামশাই-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শ্রীরামপুর থেকে, ১৯৫০ সালে ছুটে গিয়েছিলাম দেশের ঐ বাড়িতে শুধু মাত্র একটা বিকেল ও রাত্রির জন্যে। জেঠীমা তখন হামছাদির নিকটেই নীহারদিদের 'গাবতলির' গ্রামের বাড়িতে একাই ছিলেন। সেখানেই জেঠামশাই মারা যান। 'গাবতলির' ঐ বাড়ি ছিল যেমন বিরাট তেমনই সাজানো। নীহারদিরা তখন সকলেই ইম্ফলে থাকেন। বাড়িটা বে-দখলের ভয়ে, জেঠামশাই কিছুদিন ওখানেই বাস করছিলেন।

আমি গাবতলির পথে, নারায়ণগঞ্জ থেকে নৌকোয় বেলা দশটা নাগাদ সেখানে পোঁছে জেঠীমাকে প্রণাম করি ও যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিই। তারপর আরও কিছু এটা সেটা কর্তব্য করে, স্নান-খাওয়া সেরে, মাইল দুই দূরে মামা বাড়ি 'তাছপুরে' যাই। সেখানে অতি বৃদ্ধা আমাদের সকলের প্রিয় দিদিমাকে প্রণাম ও এক মামাতো ভাই আমার সমবয়েসী গণেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার বিকেলে 'গাবতলি' ফিরে আসি। তারপর জেঠীমাকে অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে, সন্ধ্যার সামান্য পূর্বে হামছাদির বাড়িতে যাই। সেই অতবড় বাড়িতে তখন একাই ছিলেন এক বৌদি (দুলুর মা)। আমাদের বাড়ির অন্য হিস্যার, বাবার পিসতুত ভাই এর বড় ছেলে আমাদের নিখিলদার স্ত্রী। নিখিলদা অল্প বয়সেই ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এ চাকুরিরত অবস্থায় মারা যান। আমার চেয়ে সামান্য বড় ওঁদের বড় মেয়ে পরিমল হামছাদিতে তের/চৌদ্দ ব'ছর বয়সে টাইফয়েডে মারা যায়। সে আমাকে খুবই ভালবাসতো। ওঁদের একমাত্র ছেলে দুলু, আমার ছোট, সেদিন বাড়িতে ছিল না। পাশের বাড়ির প্রয়াত মেনাদার স্ত্রী জামসেদপুর থেকে এসে কয়েকদিন পূর্বে, সামান্য কাজের প্রয়োজনে উক্ত দুলুর মার কাছে উঠেছিলেন। ওঁরা দুজনাই আমাদের বাড়ির সব চাইতে ভাল ও সুন্দর পশ্চিমের ঘরে ছিলেন। নিখিলদার ছোট ভাই ছিলেন আমাদের প্রিয় অরুণদা। উনি, নিখিলদা ও বৌদিরা আমাকে ও মাকে খুব ভালবাসতেন। অরুণদাও চাকুরিরত অবস্থায়, উত্তর কলকাতার এক ভাড়া বাড়িতে মারা যান। ওঁর ছেলে মেয়েরা, বেহালার সরসুনায় ৪/২, যাদব ঘোষ

রোডে নিজেদের বাড়ি করে আছে। উক্ত দুই বৌদিও বর্তমানে আর জীবিত নেই।

যাহোক, সেদিন সন্ধ্যায় হামছাদি পৌঁছে, সময়ের অভাবে উক্ত দুই বৌদিকে আমার জন্য সামান্য সেদ্ধ-ভাতের ব্যবস্থা করতে বলে, ওঁদের নিকট থেকে একটা হেরিকেন লণ্ঠন নিয়ে একা রাতের অন্ধকারে, কাশীপুর, গুয়াপাড়া ও দুর্গাপুরের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে আসি। আমার মনে হয়েছিল, পিতৃভূমি হামছাদির সঙ্গে এটাই আমার শেষ সাক্ষাৎ! সেবার প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িই অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলাম। কোন কোনও বাড়ি ছিল খালি, বাকীগুলোয় আছে দু'তিনজন করে লোক কোনওক্রমে বাস করছে, পশ্চিমবঙ্গ কি আসামে চলে যাবার অপেক্ষায়। ওরা সব এতই অভাবে ছিলেন যে দু'চারজনকে আমার সামান্য টাকা দিয়েও সাহায্য করতে হলো। আমাকে দেখে সকলেই যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, আনন্দিতও হয়েছিলেন তেমনি। দু'একজন গুরুস্থানীয় প্রতিবেশী আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'দেশের প্রতি ওর মনের টান অসাধারণ।' যাহোক, এমনি করে ঘুরে ঘুরে, উপস্থিত সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, ঐ প্রাণ-প্রিয় গ্রামকে রাতের অন্ধকারেই শেষ বিদায়ের মন ও দৃষ্টি দিয়ে দেখতে দেখতে রাত্রি প্রায় দশটায় ফিরে এলাম বাড়ির সেই পশ্চিমের ঘরে, যেটা বাবা বড় সখ করে, চট্টগ্রাম থেকে শাল কাঠের খাম্বা এনে, এখান-ওখান থেকে সব ভাল ভাল জিনিষপত্র জোগাড় করে, বড় সুন্দর করেই করেছিলেন, চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ঐ ঘরে থাকবেন বলে। কিন্তু সেটা আর হয়নি। সেদিন আমারও ছিল ঐ ঘরে শেষ রাত্রিবাস।

জামসেদপুরের বৌদি তো পাশের বাড়িরই মানুষ। কয়েক ব'ছর পূর্বে দেশ ছেড়ে একমাত্র মেয়ে জ্যোৎস্নার কাছে চলে গিয়েছিলেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার বুঝি আদি-অন্ত ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই ছিল ওঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

অন্য বৌদিও (দুলুর মা) আমাকে ও বাণীকে বড়ই ভালবাসতেন। উনি পরে আমার শ্রীরামপুরের অফিস বাড়িতেও কিছুদিন ছিলেন। তাঁর ছেলে দুলুকে আমি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে চাকুরি করে দিয়েছিলাম। তারপর মা ও ছেলে চলে যান 'পাণ্ডেৎদামে'। সেখানেই বেশ কয়েক ব'ছর পূর্বে বৌদি মারা যান। শ্রীরামপুরের পরে আর ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

যাক, সেদিন প্রায় রাত্রি বারটা/একটা পর্যন্ত দুই বৌদির সঙ্গে, দেশ-গ্রামের সব

সুখ-দুঃখের কত গল্প করে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেশ-বাড়ির সঙ্গে সেটাই শেষ সাক্ষাৎ মনে করে মনের বেদনায় আর ঘুম এলো না। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে মনে হল, একেবারে বাল্যকালে এই ঘরে ঘুমিয়ে মাঝে মাঝে গভীর রাতে হুতুম পেঁচার 'হুতুম-ভুতুম-হুতুম,' ডাকে ঘুম ভেঙ্গে পাশে মা বা জেঠুমা যেই থাকুন, ভয়ে জড়িয়ে ধরতাম। নিস্তব্ধ গভীর রাতের অন্ধকারে দূর থেকে ভেসে আসা ঐ গুরুগম্ভীর আওয়াজে সত্যি বুক কেঁপে উঠত। আবার বড় হয়ে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে ঐ হুতুম পেঁচার ডাক না শুনলে ভাল লাগতো না। মনে হত গ্রাম্য রাতের অঙ্গহানি হল।

সন্ধে হতে না হতেই উঠোনে বা ঘরের বারান্দায় বসে শেয়ালের ডাক শুনতাম, হুক্কা-হুয়া। বহু শেয়াল নিকট থেকেই ডাকাডাকি সুরু করলে, বাড়ির কুকুর-গুলো ক্ষিপ্ত হয়ে শেয়াল তাড়াতে ছুটোছুটি করত। গ্রামের দুপুরটা থাকত বড়ই নিস্তব্ধ। কচিৎ, মানুষের চলাচল দেখা যেত। ছুটির দুপুরে বাবা ঘুমিয়ে পড়লে, লুকিয়ে সংলগ্ন বা নিকটস্থ কোন খালে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতাম। তখন দূর থেকে সুন্দর ও মনোরম ঘুঘু পাখির ডাক ভেসে আসত। এখনও টালিগঞ্জের বাড়িতে বসে কখনো ঘুঘুর ডাক কানে ভেসে এলেই একেবারে সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাড়ির সেই দৃশ্য মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। এটাকেই মনোবিজ্ঞানে বলে, Law of association.

আমাদের গ্রামের সোজাসুজি আধ মাইল পূর্বদিক দিয়ে বয়ে যেত ভয়ঙ্করী মেঘনা নদী। আকাশে মেঘ করলেই মেঘনার ঢেউ-এর নাচন-কুদন বেড়ে যেত বলেই নাকি এর নাম মেঘনা। একথার সমর্থন অবশ্য কোন বই-এ পাইনি। কিন্তু গভীর রাতে, আকাশে মেঘ উঠলে বা সামান্য জোরে বাতাস বইলে, ঘরে শুয়েই মেঘনার জলের গর্জন শুনতাম। এ নদী দিয়ে যাত্রী ও মালবাহি স্টীমার যাতায়াতের পথে, নীরব-নিস্তব্ধ রাতে তা থেকে হুইস্‌লের গুরুগম্ভীর আওয়াজ বাড়ি থেকেই শোনা যেত। সে আওয়াজ শোনার আমেজই আলাদা!

কয়েকখানা ছাড়া, গ্রামের আর সব বাড়ির চাল ছিল টিনের। মুষলধারে বৃষ্টি নামলে টিনের চালে যে আওয়াজ হতো, আমরা তাকে বলতাম বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্‌ রাত্রি। বিদ্যুতহীন কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরেও গভীর রাতে রেলগাড়ি অনেক সময় ঘুম ভাঙ্গিয়ে থোর-বড়ি-খারা, খারা-বড়ি-থোর আওয়াজ তুলে দূরে চলে যেত। মফঃস্বল শহর ও গ্রামের নীরব-নিঝুম পরিবেশে এ সব কিছুরই একটা

আলাদা আমেজ-অনুভূতি আছে যা দেশভাগের পর গত চুয়াল্লিশ ব'ছরে আর তেমন করে না পেয়ে এখনও হা-হুতাশ করি। এসব ঠিক বলে কয়ে বা লিখে বোঝাবার জিনিষ নয়।

আখ খেতে ইচ্ছে হলে, একটা দা নিয়ে চলে যেতাম নিজেদের আখ ক্ষেতে। হলুদ রঙের মোটা মোটা রসে টইটম্বুর গেণ্ডারিয়া আখ। পুরো একটা আখ একা খেতে পারতাম না।

মুলো খেতে ইচ্ছে হলে, চলে যেতাম বাড়ি-সংলগ্ন মুলো ক্ষেতে। সাদা রঙের সামান্য লালচে বার/চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা মুলো কেটে নিয়ে খেতাম।

মাঝে মাঝে সকালে, জেঠামশাই-এর সঙ্গে ছোট্ট নৌকোয় চেপে বাড়ির ঘাট থেকে পঞ্চবটী বা মুনসিডাইলের বাজারে যেতাম। ভৃত্য গফুর লগি-বৈঠা দিয়ে নৌকো চালাত। আমি যেতাম শুধু নৌকো চড়ার লোভে। আর খালবিলের কচুরি-পানার বেগুনি ফুল, সাদা ও লাল শালুক ফুলের বাহারের আকর্ষণে। শহরে থাকার এগার মাস তো এসব চোখেই পড়ত না। ছুটির ঐ একমাসই বিকেলে গ্রামের বড়, ছোট ও সমবয়েসী ছেলেদের সঙ্গে হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্দা ইত্যাদি খেলতাম জিয়স পুকুরের দক্ষিণের মাঠে নয়তো দুর্গাপুরের প্রয়াত ফণীন্দ্র দাসগুপ্তের বাড়ির সামনের মাঠে। প্রয়াত সুরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ির মনুকাকু, ছুটুকাকু, লালু, দিলু, ভুলু ও আর অনেকেই আমরা একসঙ্গে খেলতাম। ঐ বাড়ির যাদের নিকট থেকে খুব আদর যত্ন ও স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি তাদের মধ্যে এরা ছাড়াও ছিলেন পুতুল পিসি, পারুল পিসি, নেনী পিসি, তরী পিসি এবং আরও অনেকে।

চল্লিশ ব'ছর পর, পাসপোর্ট-ভিসা করে, আবার একদিন মাত্র তিন/চার ঘণ্টার জন্য ঐ হামছাদি গ্রামে যাবার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রয়াত মামাতো ভাই গণেশের তাছপুরের বাড়িতে এক রাত্রি কাটিয়ে, সেখান থেকে ১৯৯০-এর ২৫শে মার্চ সকালে, রিক্‌শায় 'পানামে' পৌঁছে, দুমাইল পায়ে হেঁটে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে পৌঁছেছিলাম সেখানে। গ্রামের পথঘাটের চরম দুরবস্থা, খালের উপর প্রায় সব সুন্দর কাঠের পুলগুলো ভাঙ্গা, হাতে প্রাণ নিয়ে পার হতে হয়। মুসলমান গ্রামগুলোর কোন উন্নতি চোখে পড়ল না। আমাদের গ্রামে মাত্র তিন/চার ঘর হিন্দু বাস করছে। তাও, তাদের আদি বাড়ি নয়। আদি বাড়ির উঠানেই কোনও প্রকারে বস্তি-বাড়ির মতো ঘর বেঁধে আছে। সেই দশআনি বাড়ির মজবুত দালান আর মজবুত পুজামণ্ডপ মাটিতে মিশে

গেছে। পূর্বোক্ত 'দশভাইয়া' সুন্দর বাড়িখানার দশবারোখানা ঘরের মাত্র বড় ঘরটি দীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। চারদিকের আব্রু কোথায় উড়ে গেছে। এ বাড়ির সঙ্গে কত প্রিয় স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কতই না আনন্দ-উৎসব আর আদর স্নেহের স্মৃতি। বন্ধু লালু, মনুকাকু, ছুট্টুকাকু, পারুল পিসিমা, তরু পিসিমা যারা আজও বেঁচে আছেন বলে জানি, মনে হলো, তাঁরা আজ আমার সঙ্গে থাকলে নিশ্চয় সকলে ওখানে দাঁড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতাম। তাঁরা ভাগ্যবান/ ভাগ্যবতী, তাই হয়তো আসেননি, আমি শুধু একাই চোখের জল ফেললাম, 'হারাধনের একটি ছেলের মতো', মনে মনে ভেউ ভেউ করে! গুয়াপাড়া, দুর্গাপুরও ঘুরে এলাম। সেই একই দৃশ্য। দুর্গাপুরের প্রয়াত ফণীন্দ্র দাসগুপ্তের দোতলা দালান বাড়ির করি-বর্গা ভেঙ্গে পড়েছে, হামছাদির পোস্ট-অফিস উঠে গেছে। পাঁচ-ছয়জন হিন্দুদের মধ্যে আমাদের সময়কার মাত্র দুজনকে চিনতে পারলাম, তার মধ্যে গুয়াপাড়ার বৌদিকে (প্রয়াত বেঙ্গাদার স্ত্রী) প্রণাম করলাম। অন্যজন কবিরাজ বাড়ির লাট্টুদা, এখনও পিতার আবিষ্কৃত 'বাত-রাক্ষসী' তেলের কবিরাজি করেন। অন্যেরা সব পরের প্রজন্মের, আমার নাম শুনেছে বলে বললো, আমি সঠিক চিনতে পারলাম না। আরও কিছুটা এদিক-সেদিক দেখে চলে এলাম নিজেদের বাড়ির উঠোনে।

দেখলাম, উঠোন তো আর নেই। সেখানে চাষ-আবাদ চলছে, আশেপাশের আরও তিনখানা বাড়ির জমি নিয়ে। বাড়ি ঘরের তো চিহ্নও নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ সীমানায় একেবারে খালের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে দেখলাম, খালটা অবিকল তেমনিই আছে। জোয়ার-ভাটার আলোড়নও মনে হয় চোখে পড়ল। মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রিয় আমার খাল! তুমি তো তেমনিই আছো, আমাদের কথা কি তোমার মনে আছে? তোমার উপর দিয়ে নৌকোয় চড়ে এসেই তো বাড়ির ঘাটে নামতাম। তোমার পাড়ে বসেই তো বড়শি দিয়ে কত মাছ ধরতাম।" নিজের মনেই যেন জবাব পেলাম খাল বলছে, "আমি তো বদলাইনি ভাই, এসো না আবার আমার উপর দিয়ে নৌকোয় চেপে, ধরো না, ধরবে কত মাছ! তোমরাই তো আমায় ফেলে বিদেশে চলে গেছ!"

চোখের জল আর তখন কোন বাঁধ মানছে না। গাল বেয়ে জামায়-বুকে পড়ছে। ফিরে তাকালাম উঠোনের দিকে। সেখানে যে একটা সুন্দর বাড়ি ছিল তার সামান্যতম চিহ্নও কোথাও নেই। পিতৃভূমির পবিত্র মাটির একমুঠো তুলে একটা কৌটায় রাখলাম। সেটা এখন আমার লেখার টেবিলে চোখের সামনেই

রেখেছি। হামছাদিকে এখন ওখানেই দেখি। চারদিকে তাকিয়ে, বাড়ি ও গ্রামের কত প্রিয়জনদের কথাই না চোখে ভেসে উঠল। তাঁদের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। গয়াপাড়ার চিরকুমার ও অতি সজ্জন হীরাদার কথা। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল ইম্ফলে ১৯৫৭ সালে। আমার নীহারদির 'জা' পাশের হেমদির বাড়িতে। আমাকে, বাণী ও ছোটছেলে টুসুনকে তিনি কি আদরই না করেছিলেন! হীরাদা ইম্ফলেই মারা যান। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বার আমি ও বাণী ইম্ফলে যেয়ে, হেমদিকে পেলেও তাঁকে আর পাইনি। প্রয়াত সুরেন্দ্র দাদুর বড়মেয়ে পুতুল পিসিমা। দেশভাগের পরেও ১৯৫০-৫১ সালে, আমার শ্রীরামপুরের আপিস-বাড়িতে পুতুল পিসিমাকে কয়েকদিন সেবা-যত্ন করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। আমার স্ত্রী বাণী বল্‌তো, পুতুল পিসি সত্যিই পুতুলের মতো সুন্দরী। শুনেছি, সেই পুতুল পিসিও আর নেই। যাঁরা আছেন তাঁরাও পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছেন।

আমাদের আর পশ্চিমদিকের জ্যোৎস্না ভাইঝিদের, উত্তরে বালবিধবা মাখনিদিদের আর তার পশ্চিমে আমার অতি প্রিয় স্নেহময়ী ও মহিয়সী খুনুদিদের বাড়ির সমস্তটা জমি নিয়ে চলছে চাষাবাদ। এ দৃশ্য সহ্য করা বড়ই কঠিন! খুনুদিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল কাকীমার (খুনুদির মা) সেই স্নেহময়ী মুখখানা, পুতুলদি, তার ছোটবোন রুনু ও তাঁদের ভাইদের কথা। খুনুদির মহান হৃদয় ও চরিত্রের নারী আমি খুব কমই দেখেছি। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ, ভালবাসা ও ত্যাগ নিয়ে বড় একখানা কাহিনীই লিখে ফেলা যায়। ইচ্ছেও ছিল তাই। কিন্তু বড়ই বিলম্ব হয়ে গেছে, সে সাধ বোধহয় আর পূরণ হবার নয়। ফ্রক পরা ছোট্ট রুনু সারাদিন এদিকে-সেদিকে কাজে বা হাঁটাহাঁটিতে গলা ছেড়ে কত গান গাইতো। এসব কথা ভাবতে ভাবতে হাওয়ায় যেন তার গলা শুনতে পেলাম, 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।' 'কোন লগনে জনম আমার।' 'আমি কান পেতে রই।' 'পৃথিবী আমারে চায়।' জানি, খুনুদি ও রুনু এখন শিলিগুড়ির 'শক্তিগড়ে'। ওটা ছিল হয়তো আমার মতিভ্রম (hallucination) !!!

জন্মভূমি তাছপুর

তাছপুর গ্রাম (তাছপুর—গোয়ালদি) আমার মামাবাড়ি আর জন্মভূমিও বটে। নারায়ণগঞ্জ থেকে অনুমান সাত মাইল, উত্তর-পূর্ব কোণে, পিতৃভূমি

হামছাদির পথে। আমার বাল্যে পাঁচ-ছ ব'ছর বয়েস পর্যন্ত, মা প্রায়ই তাছপুরে গ্রামে থাকতেন। আমার ঐ বয়েসটা ময়মনসিংহ আর তাছপুরেই কেটেছে, হামছাদি বড় একটা যাইনি। বড় মামা প্রয়াত বরদা কান্ত দেব চাকুরি করতেন কলকাতায়। আর তাঁর পরিবার থাকত তাছপুরের বাড়িতে। ছোট মামাও তখন ছাত্র। মাতৃহারা মাসতুত ভাই শ্রীঅনিল দত্ত ও ঐ বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করতেন। আমি ছিলাম বৃদ্ধা দিদিমার নয়নের মণি। আমার জন্মের পূর্বে মার তিন তিনটে সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর আমি বেঁচে ছিলাম বলেই, সকলে মিলে আমার নাম রেখেছিল, সাত রাজার ধন এক 'মানিক'।

মামাবাড়ির গঠন ভঙ্গি বড়ই সুন্দর ছিল। এখনও চোখে ভাসে। গাছ-গাছালি, পুকুর, ভেতর বাড়ির আঙ্গিনা, বাহির বাড়ির সবুজ মাঠ, ডাইনে বাঁয়ে পাতা-বাহারের কেয়ারি দিয়ে ফুল-বাগান, যেন একটা ছবি! ঐ বাড়িরই দক্ষিণ হিস্যায় থাকতেন মামাদের জেঠতুত ভাই প্রয়াত রামকমল দেব। তাঁর একমাত্র ছেলে গণেশ ছিল আমার সমবয়েসী ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাসতুত ভাই অনিল দত্ত ছিলেন আমাদের পরিবারের খুব অন্তরঙ্গ। তিনি বহুবার আমাদের ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের বাসা আর হামছাদির বাড়িতে গেছেন। বড়মামা ব্যবসা করে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন। তাঁর ছিল আট কন্যা, কোন পুত্র ছিল না। আমার বাড়ির খুব নিকটেই চণ্ডীতলায় তিনি সব মেয়েকে পাশাপাশি একখানা করে বাড়ি করে দেন। ঐ বাড়িগুলো এখন আট মেয়ের বাড়ি বলে সুপরিচিত। দাদা অনিল দত্তের বাড়িও নিকটেই আমার বাড়ির পূর্ব দিকে।

তাছপুরের বড় আকর্ষণ ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। মামা বাড়ি থেকে দুমিনিটের হাঁটা পথে। যেমন সুন্দর ছিল আশ্রমটির গঠন, তেমনই কার্যকরি ছিল তাঁদের সমাজ সেবা। প্রতি সন্ধ্যায় মহারাজ ও গ্রামবাসীরা যে আরতির অনুষ্ঠান করতেন তা ছিল দেখবার মত। দেশ ভাগের পূর্বে আমি বহুবার অন্ততঃ প্রিয় দিদিমাকে প্রণাম করতে তাছপুর গিয়েছি, কিন্তু কোনদিন সন্ধ্যায় আশ্রমের আরতি না দেখার ভুল করিনি। ঠাকুর দালানের সম্মুখে চওড়া ও লম্বা লাল সিমেণ্টের ঝকঝকে বারান্দায় বসে আরতি দেখতাম। আরতির শেষে এক জ্ঞাতি মামা প্রয়াত অনন্ত দেবের অনুরোধে শ্যামা সঙ্গীত ও ভজন গাইতাম, তিনি তবলায় সংগত করতেন। সঙ্গীতের আবেগে, ভুল করে একবার একটা আধুনিক গান গেয়ে, এক মহারাজের মৃদু ধমক খেয়ে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম,

সে কথা এখনো মনে আছে।

এই আশ্রম যাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি সকলের নিকট ধীরেন মহারাজ নামে খ্যাত। পূর্বে ছিলেন পানাম হাইস্কুলের শিক্ষক। পরে হ'ন স্বামী শম্ভূদানন্দ। উনি বম্বের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ থাকা কালীনও তাছপুর আশ্রমের উৎসবে আসতে একবারও ভুল করতেন না। এমন কি দেশ ভাগের পরেও কলকাতা থেকে বড়মামা ও প্রয়াত গোপালসিংহ রায়কে সঙ্গে নিয়ে ধীরেন মহারাজ ঐ উৎসবে যেতেন। গোপাল সিংহরায় ছিলেন তাছপুরের বিখ্যাত জমিদার সিংহ বাড়ির ছেলে। কলকাতার নামজাদা 'জলযোগের' প্রতিষ্ঠাতা। আমার মা তাঁকে গোপাল বলে ডাকতেন। বলতেন সে ছিল তাঁদের বাল্যে খেলার সাথী। আমার বাল্যকালে খোকা মহারাজ নামে আরও এক স্বামীজিকে তাছপুরের মামাবাড়ির বৈঠকখানায় বসে জনসমক্ষে ধর্মালোচনা করতে দেখেছি। পরে শুনেছি, তিনি ছিলেন স্বামী সুবোধানন্দ। তাছপুরে ঐ আশ্রম বাড়ি ও সংলগ্ন অনেকটা জমি-ই উক্ত সিংহ বাড়ির দান।

তাছপুরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছিল সর্দার বাড়ি। এঁরা ছিলেন সাহা সম্প্রদায়ের বড় ব্যবসায়ী। তাঁদের ছিল যেমন বড় ও সুন্দর বাড়ি, তেমনি সুন্দর দু-তিনটে পাকা ঘাটের পুকুর। মেয়েদের স্নানের জন্য আব্রু দেয়া পাকা স্নানাগার। লাল পাথরের লাইফ সাইজের দুটো ঘোড়া যেন লাফিয়ে পুকুরে পড়ছে। এ বাড়ির ঝুলন উৎসব সোনারগাঁও এ বিখ্যাত ছিল। কেষ্টনগরের তৈরি বহু লাইফ সাইজের পুতুল ইত্যাদি ঝুলনের উৎসবে যেভাবে তাঁরা সাজাতো, এমন আর কোথাও দেখিনি। এখানে এখন বাংলাদেশের সিনেমার শুটিং হয়।

তাছপুর—গোয়ালদির আশেপাশে পাঠান আমলের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ দেখতে পেতাম। বহু বাড়ি-ঘর ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, বহু সুন্দর সুন্দর পাকা কবর, প্রাচীন ছোট্ট চৌকো ইটের পুরানো কাঠামোর পুল। কিন্তু এ সবের সত্যি ইতিহাস কারুর নিকট-ই জানতে পারিনি। গিয়াসুদ্দিন নামে বাংলার কোনও নবাবের কবর ওখানে বা মোগরার পাড়ে আছে বলে যেন কোথাও পড়েছিলাম।

চল্লিশ ব'ছর পরে, ১৯৪৬ সালের চব্বিশে মার্চ পুনরায় তাছপুর দেখার সুযোগ হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে বাসে চেপে মোগরার পাড় এসে, সেখান থেকে দেড়-দু মাইল রিকশায় এসে নামলাম, উক্ত সর্দার বাড়ির নিকটস্থ রাস্তার মোড়ে।

ঐ মোড় থেকে পূর্বে উল্লেখিত রামকৃষ্ণ আশ্রম মাত্র দশ মিনিটের পথ। বছর দুই পূর্বে মামাতো ভাই গণেশের মৃত্যু হয়েছে, এটা তার স্ত্রীর চিঠিতেই জানতে পেরেছিলাম। সুতরাং তারা কেউ গ্রামে আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে, ঐ মোড়ের একটা মুসলিম চা-এর দোকানে গণেশের খোঁজ করলে উপস্থিত স্থানীয় পাঁচ-ছয় জন লোকের কেউ তাকে চিনতেই পারল না। এমন পরিস্থিতির আশঙ্কায়, কিশোরগঞ্জের বাণীদের আদিবাড়ির নুরমিঞার নিকট থেকে গোয়ালদির অধিবাসী ফকির বাড়িতে তার ভগ্নীপতির নামে একটা চিঠি সঙ্গে রেখেছিলাম। ফকির বাড়িতে গেলে নুরমিঞার বোন ও ভগ্নীপতি আমাকে চেপে ধরলেন তাঁদের বাড়িতে থাকতে। অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁদের সাহায্যেই, সামান্য দূরে গণেশের বিধবা স্ত্রী ও তার ছেলে মেয়েকে পেয়ে গেলাম সিংহ বাড়ির প্রায় পাশে। ওদের কান্নাকাটিতে যথাসম্ভব প্রবোধ দিয়ে, সময়ের অভাবে গণেশের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সিংহ বাড়ির পাশ দিয়ে প্রথমেই গেলাম আশ্রমে। লক্ষ্য করলাম সিংহ বাড়ির জমিটুকু ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই। ১৯৬৫ সালে রামকৃষ্ণ আশ্রম আক্রান্ত হয়েছিল তা জানতাম। দেখলাম, ঠাকুর দালানের পাশা-পাশি তিনটে ঘরে একই পরিবারের তিন ছেলে ও তাদের পরিবার বাস করছে। ঐ বাড়ির পূর্বের চাকচিক্য আর নেই। কত পুরানো স্মৃতি ও কাহিনী, বিশেষ করে আশ্রমের সান্ধ্য—আরতি মনের পর্দায় ভেসে উঠল। অন্ততঃ, আশ্রমের একটা বাৎসরিক উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। হিন্দু-মুসলিম জনতার সেই ভীড় ও আনন্দ উৎসব, সবই মনের চোখে ভেসে উঠল। কথা বলতে পারছিলাম না। সেখান থেকে দুমিনিটের পথ হেঁটে গণেশের স্ত্রীর সঙ্গে সেই মামাবাড়ির ভিটে-মাটিতে যেয়ে মনে হলো নতুন কোথাও এসেছি। শুধু পুকুরটাকেই চিনতে পারলাম। তার পাড় দিয়ে যেয়ে বাহির বাড়ির প্রাঙ্গণে উঠতেই মা—দিদিমাদের নিকট থেকে শোনা একটা বহু পুরানো ঘটনা মনে পড়ে গেল। পুকুর আর ঐ প্রাঙ্গণের এক কোণে ছিল মামাদের সুন্দর ফুলের বাগান। এক সকালে তিন ব'ছর বয়সের আমি চুরি করে গাছের ঝোপে লুকিয়ে ফুল তুলছি। বাবা হামছাদির বাড়ি থেকে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে আসার পথে সামান্য দূর থেকে আমার সেই লুকিয়ে ফুল তোলা দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা গান তৈরি করে সুর দিয়ে গেয়ে ওঠেন। তার প্রথম দু লাইন এখনো মনে আছে। 'চুপি চুপি মালা গাঁথো কাহার লাগিয়া, দূর থেকে তাহা আমি দেখিনু ফেলিয়া,' ইত্যাদি। বাবার গান শুনে বাড়ির অনেকেই ঐখানে ছুটে এলে আমি ধরা পড়ে যাই। আর সবাই

মিলে নাকি আমাকে চোর চোর বলে হৈ চৈ করে হাসি আর আনন্দ প্রকাশ করে।

যাহোক, মামা বাড়িতে দেখলাম, তিনটি মুসলিম পরিবার আলাদা আলাদা ঘর বেঁধে বাস করছে। তারা অবশ্যাই আমার সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগীতা করে আরু না মেনে সারা বাড়িটা আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছেন। আমি ঘুরছি আর কল্পনা করছি কোথায় কোন ঘরে কে কে থাকতো, ঐ বাড়ির উঠোনে কার কার বিয়ে আমি দেখেছি, কোন ঘরটায় আমার জন্ম হয়েছিল বলে বড় হয়ে জানতে পেরেছিলাম। যদিও সে ঘরের চিহ্ন মাত্রও নেই, তবু জায়গাটা অনুমান করে, সেখান থেকে এক কৌটো মাটি তুলে এনে, টালিগঞ্জের বাড়িতে, জন্মভূমির নিদর্শন স্বরূপ আমার লেখার টেবিলে সাজিয়ে রেখেছি। কিশোরগঞ্জ, তাছপুর আর হামছাদির মাটি, তিনটে পাশাপাশি সাজানো কৌটোয় নজর পড়লে, আমার মন গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে ওঠে 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, সেই যে আমার নানা রং-এর দিনগুলি।' এই স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় কত প্রিয়জনের কথা যার অনেকেই আর বেঁচে নেই, আর কত ঘটনার কথা যা আজও মনে আনন্দের দোলা দেয়। "স্মৃতি যেমন আনন্দের, তেমন বেদনারও।" ধীরে ধীরে এক সময় ফিরে এলাম গণেশের নতুন গড়া জীর্ণ কুটিরে, আদি বাড়িতে একলা থাকার ভয়ে, পাশে আরও দুটো হিন্দুর বাড়ির সঙ্গে যা সে করেছিল কয়েক ব'ছর পূর্বে। গণেশের এই নতুন বাড়ির উপরে বা সামান্য আশে পাশে মামাদের এক পিসি থাকতেন, একলা নিজের বাড়িতে শুধু একজন সাহায্যকারী নিয়ে। আমি ও মামাতো বোনেরা তাঁকে ডাকতাম 'বৈইনদি' বলে। তখনই ওনার বয়েস প্রায় নব্বুই, চোখে ছানি পড়ায় ভাল করে দেখতে পান না। অথচ স্বামীর ভিটেও ছাড়বেন না। নিকটে যেয়ে প্রণাম করে পরিচয় দিলে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। ঘরে নাড়ু-মুড়ি যাই থাক, তাই খেতে দিতেন আর আনন্দ প্রকাশ করে বলতেন, 'আমাগো ছোট্ট সপির পোলা হেই মইমনসিং থেইক্যা আমারে দেখতে আইছে, কপাল আমার !'[1]

তাছপুরের কথা লিখতে যেয়ে, তৎকালীন 'লাঙ্গলবন্দের' বিখ্যাত ললিত সাধুর কথা অবহেলা করা যায় না। নারায়ণগঞ্জ থেকে মোগরার পারের রাস্তায়, মার্চ মাসে ছোট একটা খালের মত দেখতে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর পুল পার হতে

১। আমাদের সেই ছোট্ট শৈবলিনীর ছেলে (আমার মা সবার ছোট সন্তান ছিলেন) সেই ময়মনসিংহ থেকে আমাকে দেখতে এসেছে ! কি আমার ভাগ্য !

হয়। এর অতি নিকটেই অষ্টমী স্থানের বিখ্যাত তীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে লাঙ্গলবন্দ। প্রবাদ আছে, পরশুরামের লাঙ্গল এই খানে এসেই আটকে গিয়েছিল বিধায় স্থানটির ঐ নামকরণ। আরও একটা প্রবাদ এই যে কেদার রায়ের পরমা সুন্দরী বাল-বিধবা ভাইঝি, চাঁদ রায়ের কন্যা 'সোনাকে' তাঁদেরই প্রজা শ্রীমন্তের কৌশলে, এই লাঙ্গলবন্দের ঘাটে দেখে, ঈশা খাঁ মুগ্ধ হন। তারপরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা।

তাছপুর সংলগ্ন বিখ্যাত পানামে, অনুমান ষাট-সত্তর ব'ছর পূর্বে ললিত সাহা ছিল এক কুখ্যাত লম্পট। হেন অপকর্ম নেই যা সে করত না। কিন্তু মাঝ বয়সে তার হঠাৎ সাধুমতি হল। ফলস্বরূপ, তাছপুরে আমার মামাবাড়ির পাশেই এক ধনী কর্মকার বাড়ির সুমুখের একটা বড় গাছতলায় ললিত তার কয়েকজন গ্যাঁজাড়ে সঙ্গী সাথী নিয়ে অবস্থান আরম্ভ করল। কিন্তু গ্রামের কিছু মানুষ স্বীকৃত লম্পটকে সাধু বলে না মেনে নিয়ে, তাদের উপর নানা অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ করলে, ললিত লাঙ্গলবন্দের নিকটে একটা গ্রামে গিয়ে সেখানেই ললিত সাধু নামে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হন। কথিত যে মূক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ ভাবেই একাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর এক পায়ের চর্ম অন্য পায়ের সঙ্গে লেগে গিয়েছি , দাড়ি প্রায় পেটে এসে পড়েছিল, মাথার চুল জট পাকিয়ে প্রায় কোমরে। চতুর্দিকে হু হু করে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেল। দর্শনার্থীর ভিড় আরম্ভ হল। তারা সাধুর মুখে যা তুলে দিতেন তাই উনি খেতেন। আমার বাল্য-কৈশোরে নারায়ণগঞ্জ থেকে হামছাদির বাড়ি যাবার পথে, মার সঙ্গে নৌকো চেপে আমার বিকলাঙ্গ বোন কনাকে নিয়ে একবার ললিত সাধুর আশ্রমে গিয়েছিলাম। মা, বোন কনাকে সাধুর পদ্মাসনের সামনে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে আশীর্বাদ চাইলে, তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। কনা অবশ্য চার ব'ছর বয়সে আমাদের ময়মনসিংহের বাসা বাটিতে মারা যায়।

যা হোক, সেই রাত্রিটা গণেশের নতুন বাড়িতে, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও স্থানীয় কিছু হিন্দু ও মুসলমানের সঙ্গে প্রায় রাত একটা পর্যন্ত নতুন-পুরানো, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নানা আলোচনা করে কাটালুম। খুব ভাল লাগলো। কিছুক্ষণের জন্য সেই পুরানো দিনকে ফিরে পেয়ে আমিও খুব প্রগলভ হয়ে উঠেছিলাম।

রাতে আর খুব একটা ঘুম হল না। সেই একই চিন্তা, একই দুর্বলতা! জন্মভূমিতে, জীবনের শেষ রাতটি কাটিয়ে যাচ্ছি আর একনাগাড়ে পুরানো সব

কিছুর আগা-পাছতলা ভেবে চলেছি। পরের দিন সকাল ছয়টায়, ঐ বাড়ির সকলের নিকট থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে সিংহ বাড়ি ও আশ্রমের পাশ দিয়ে, চৌধুরী (চদুরী) বাড়ির শুধু ভিটেমাটি বাঁপাশে রেখে পঁচিশে মার্চ রওনা হলাম পিতৃভূমি হামছাদির পথে। বিখ্যাত পানামের ভেতর দিয়ে পানাম হাইস্কুল (G. R. Institution) ও প্রাক্তন ব্যবসায়ী, জমিদার ও এম. এল. সি. প্রয়াত আনন্দ মোহন পোদ্দারের বিশাল অট্টালিকা ও বাগান দেখতে দেখতে, নোয়াইলের কালী বাড়ি ও বাউল্লাদিঘীর পাড়ে যেয়ে দূর থেকে হামছাদির গাছ-গাছালি দেখতে পেলাম।

চোখ বুঝে টালিগঞ্জের বাড়িতে বসে স্মৃতির আয়নায় জন্মভূমি তাছপুরকে আরও একবার দেখে নিয়ে এই পর্ব শেষ করলাম। হামছাদি ও তাছপুরের আর বহু কথা ও কাহিনীই 'না—বলা' রয়ে গেল।

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১০	১৬	কাউনসেলর	কাউনসিলের
১১	৭	সভ্য	সভা
১১	৮	কাজে	কাছে
১২	২ (ফুটনোট)	গোরসিয়া	পোরসিয়া
১৪	১	Dharmasri	Dharamvira
১৬	শেষ লাইন	আন্দোলনকরীরা	আন্দোলনকারী
১৮	২৭	জড়িয়ে	জড়িয়ে ধরে
২৩	৪	'চেয়েছিন,'	পরে , (কমা) হবে না।
২৬	১৩	British, East Africa.	British এর পর (কমা) হবে না।
২৯	৩	ল…এর পর	(কমা) হবে না।
২৯	৭	ক্লাসিকেল	ক্ল্যাসিকেল।
৪১	৩	আজও	আরও
৪১	৭	আম্যর	আমার
৪১	২২	নিবেদন	নিবেদন,
৪৩	৯	ক্রিকেটের	ক্রিকেটার
৪৪	২০	আমরা	আমার
৪৫	২৯	দোলত্যে	দৌত্যে
৪৬	১১	ছুরি	ছুরি,
৪৬	১২	দেয়।"	দেয়।
৪৮	১	সুরম্য সুরম্য ভ্যালীর	সুরম্য সুরমা ভ্যালীর
৪৯	২১	হেমাঙ্গ বাবুও অবনীবাবুর	হেমাঙ্গবাবুর ও অবনীবাবুর
৫৩	২৮	বর্মার	বার্মার
৫৮	১০	rate of study.	rate of study,
৫৯	১৬	she	she[১]
৬৫	১৪	রাণু	চানু
৬৬	৯	'বাসে	"বাসে
৬৭	২৫	যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'-এর	যাযাবরের লেখা 'দৃষ্টিপাত'-এর
৬৮	৯	বিশাল কমপ্লেক্সে	বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্সে।
৭৪	২৩	কুসংস্কারে	কুসংস্কারের
৭৫	৭	অচিন্ত্য	শ্রীঅচিন্ত্য
৭৫	২৩	সুপারিনটেণ্ডেণ্ট	সুপারিনটেনডেন্ট-এর

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৭৭	৮	সুরম্য	সুরমা
৭৭	২১	সুরম্য	সুরমা
৮১	২৪	আমাদের	আসামের।
৮৪	২০	একতলা	একতালা।
৯২	২৬	স্ত্রী	স্ত্রীকে।
৯৫	৯	দাদার	দাদুর।
১০৪	১৪	ঘাসে	ঘাটে
১০৫	২	সৃষ্টি	সৃষ্ট
১০৭	শেষ লাইন	মহা-যাত্রার	মিলন-যাত্রার
১১০	১	বাড়ীতে	বাড়িতে।
১১২	১৯	করেছিলেন	করছিলেন।
১২৫	৯	মহাযাত্রার	
১৪১	শেষ লাইন	সভ্যের	সভ্য
১৫০	২	মহাযাত্রার	শুভযাত্রার
১৫১	১৩	এক দুই	এক কি দুই
১৫১	শেষ লাইন	হবে।	হবে।”
১৫২	১	বোন	“বোন
১৫২	২৪	টুকরাতে	টুকরোতে
১৫৩	১	উঠানে	উঠোনে
১৫৩	৯	করল	করলেন
১৫৫	৬	আমার	আমায়
১৫৫	২০	শুয়েও	শুলেও
১৫৬	৩	এই	বাদ
১৫৭	২২	সেটা	যেটা
১৫৯	১৯	এতে	এতো
১৫৯	২৫	অন্ধকার	অন্ধকারে
১৫৯	২৭	ঘুটঘুট	ঘটঘুটে
১৬০	৬	দিয়ে	দিয়েই
১৬৫	২০	৬’৭	৬/৭
১৭৪	১৭	পারছিামনা	পারছিলাম না।
১৭৬	২	বলেন	বললেন
১৬১	৩ (নিচ থেকে)	দুর্দশাকেই	দুজনাকেই
১৯১	৩ „	রমেশ	রমেশ

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১৯২	১২	Basak	P Basak.
১৯৮	১৬	অনেকদিন	(অনেকদিন
২০২	৪ (নিচ থেকে)	মথুরা	মথুরা,
২০২	২ „	আমেদাবাদ	আমেদাবাদ,
২০৩	১৬	বারবার	বারোবার।
২১৪	১	তালের	তাদের
২১৬	১১ (নিচ থেকে)	ছেলেছে	ছেলেকে
২১৯	১০	blessings,	blessing
২২৩	৬	করতলে	করতালে
২২৪	১৪	আসরে	আসরের
২৩৬	৯	Renegade এর পরে	full stop চিহ্ন পড়বে
২৩৬	১২	wa	was
২৩৬	১৮	আত্মীয়।আত্মীয়া	আত্মীয়/আত্মীয়া
২৪০	৫	হুল্লোড়	হুল্লোড়
২৪০	৭	কোন	কোন্
২৪৬	৩ (নিচ থেকে)	"চোখের	চোখের
২৪২	৬ (নিচ থেকে)	স্কুল	স্কুল
২৪৯	শেষ লাইন	life	life.
২৫১	৭ (নিচ থেকে)	কুল	কূল
২৫২	২ „	আঁধার	আধার
২৫৩	৫ „	অসুস্থ্য	অসুস্থ
২৫৬	৬ „	পশ্চিমবঙ্গে	পশ্চিমবঙ্গের
২৫৭	৮ „	সুন্দর	সুন্দরী
২৬২	৩	হিসাব	হিসেব
২৬৪	৬ (নিচ থেকে)	মনে হলো যেন	সবটাই বাদ যাবে।
২৬৯	৬ „	উপরের	উপরে
২৭২	২	এক চল্লিশ	এক-চল্লিশ
২৭৩	৬	হাই'স্কুলের	হাইস্কুলের
২৭৩	১৩	রমতুলসীর	রামতুলসীর
২৭৮	৭	মহানন্দগিরি	মহাদেবানন্দগিরি
২৮৫	১৪	ডি. এম. এ. ডি. এম.	ডি. এম., এ. ডি. এম.
২৯২	শেষ লাইন	কচুরীপানা	কচুরিপানা
২৯৮	৯ (নিচ থেকে)	চাকুরিরত	চাকুরিরত